“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

বিবিধ :—

৩য় বর্ষ।) জানুয়ারী, ১৯১৪। (১ম সংখ্যা।

সম্পাদকীয়।

"বিজ্ঞান"—তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের অনুগ্রহে বিজ্ঞান দুই বৎসর জীবিত রহিয়াছে ও পুষ্ট হইতেছে, তাঁহাদিগকে—গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, লেখক, বঙ্গীয় জন সাধারণ ও বঙ্গভাষাবিৎ সকলকেই—আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের ত্রুটি যথেষ্ট—তথাপি তাঁহারা সে সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া বিজ্ঞানকে পুষ্ট করিতে যত্নবান হইয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহারা বিজ্ঞানকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার সময় বঙ্গ দেশে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালন বিষয়ে আমরা তিনটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম যে সেই অসুবিধাগুলি কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। পূর্ব্ববৎ অসুবিধার হাত আমরা হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। আমাদের যাবতীয় ত্রুটির একমাত্র কারণ সেই অসুবিধা তিনটি।

বঙ্গদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা সুপ্রসারিত হইবে কি?—সার তারক নাথ পালিত ও ডাক্তার রাস বিহারী ঘোষ মহাশয় বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে যে দানশৌণ্ডতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গের উন্নতির ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে বটে, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চার কতটুকু সুবিধা হইবে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহার ফলাফল ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত।

৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের আর একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম ও আমরণ চেষ্টার দ্বারা বঙ্গবাসীকে—শুধু বঙ্গবাসীকে কেন সমগ্র ভারতবাসীকে—বিজ্ঞানের মহীয়সী শক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের অমর কীর্ত্তি বঙ্গের রাজধানী বক্ষে "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা" রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি

যখন অদম্য উৎসাহে বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বার উন্মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন ভারতবাসী সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদির প্রবল স্রোতে গা-ভাসান দিয়া চলিয়া যাইতে-ছিলেন; তাঁহারা আর কিছু লক্ষ্য করা বাতুলতা মাত্র মনে করিতেন। ডাক্তার সরকার ভারতবাসীর এই ভ্রান্তি দেখিয়া বজ্রকণ্ঠে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন, সম্মুখে অগাধ সিন্ধু দেখাইয়া দিলেন, ভারতবাসীও স্বীয় ভ্রান্তি কতকটা বুঝিলেন, আর অগ্রসর না হইয়া বিজ্ঞানের দ্বারে ২।১ জন করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আজ ডাক্তার সরকারের সেই আহ্বানের ফল—সার তারক নাথ পালিত, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের ভারতে অশ্রুত-পূর্ব্ব মহাদান। যদি ৩৫ বৎসরে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা নিশ্চয়ই কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারি।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শিক্ষিত বঙ্গবাসীকেও বিজ্ঞান কি বুঝাইতে হইত। কিন্তু আজ বদ্ধ পল্লীর নিরক্ষর কৃষকও কলের গাড়ী, তারের খবর, হাওয়া গাড়ী, কলের গান ইত্যাদি শুনিতে পাইতেছে, তাহারাও একটা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইতেছে। ভারতবাসীর প্রাচীনতা-রক্ষণশীল প্রবৃত্তির কঠোরতাও মন্দীভূত হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া বঙ্গ দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা সুপ্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, তাহা কেবল বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞগণের বিচার্য্য বিষয় নহে, আমরাও ন্যায় সঙ্গত অনুমান করিয়া লইতে পারি। ভারতেও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে; ভারতবাসীও বিজ্ঞান চর্চ্চায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইবে, ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডাক্তার গাঙ্গার, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার মিঃ সি, ভি, রামণের ন্যায় বহু মনীষী ভারত জননীর মুখোজ্জ্বল করিবে। তখন "বিজ্ঞানের" সমস্ত অসুবিধাও বিদূরিত হইবে, তখন "বিজ্ঞান" আর মন্থর পদে লোকের দ্বারে উপস্থিত হইবে না। কিন্তু আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। Longfellowর অমর শ্লোক

"Trust no future howe'er pleasant"
"Act act in the living present"

উপদেশ অনুসরণ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। আমরাও তাই নানা অসুবিধা স্বত্তেও বর্ত্তমানে কাজ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। অসুবিধা থাকে থাকুক, ত্রুটি হয় হউক, আমরা কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। অসুবিধায় যে ত্রুটি হয় তাহা দুর্ব্বণীয় হইলেও অমার্জ্জনীয় নহে। যাহা হউক আমরা পত্রিকার উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথাসাধ্য পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্ব শক্তিমান ভগবৎ চরণে পুনরায় প্রণাম করিয়া এবং পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক, অনু-গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই সহানুভূতি, উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ পাইব এইরূপ আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা এবৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ হইতেছি।

নিদ্রা।

"O Sleep! it is a gentle thing beloved from Pole to Pole!"

মহাকবি কোলরিজের এই শ্লোকাংশে প্রকৃতির এক মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। বাস্তবিক নিদ্রা প্রাণশক্তি বিশিষ্ট পদার্থ জগতে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তুষার ধবল মেরু-প্রদেশ অথবা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দগ্ধ সাহারা, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বা প্রশান্ত মহাসাগরের সুগভীর তলদেশ, যে স্থানে প্রাণশক্তি বিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যমান, সেই স্থানেই নিদ্রার প্রভাব বিরাজিত। আমরা সাধারণতঃ অনেক প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ নিদ্রিত হয় না বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃই নিদ্রা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিদ্রা বাস্তবিকই বড় কোমল, বড় মধুর, বড় তৃপ্তিদায়ক, বড় gentle। বিশ্রাম বলিলে যাহা বুঝায় সেই বিশ্রামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিকাশ—নিদ্রায়! কিন্তু নিদ্রাকালে আমরা যে বিশ্রাম সুখ লাভ করি, অথবা বিশ্রাম বলিলে যাহা বুঝায়, নিদ্রাকালে জীবজগৎ যেরূপ ভাবে নিদ্রা উপভোগ করে, তাহা প্রধানতঃ বিশ্রামের অন্তরায় বলিয়াই মনে হয়।

প্রথমে দেখা যাউক মানবজাতি কিরূপে নিদ্রা যায়। ইহা সকলেরই নিকট পরিচিত। অধিকাংশ মানবই দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই হাঁটু গুটাইয়া মুখের দিকে অগ্রসারিত করা থাকে। কিন্তু আফ্রিকা দেশীয় কয়েকটি মানবজাতি চিৎ হইয়া শয়ন করে এবং গলদেশের পৃষ্ঠ একখণ্ড কাষ্ঠের উপর রক্ষিত থাকে। এই কাষ্ঠখণ্ড দুইটি অতি ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর শায়িত থাকে। হস্তি সমূহ সাধারণতঃ দণ্ডায়মান হইয়াই নিদ্রাগত হয়। অশ্ব সমূহের অবস্থাও তাহাই। দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা যাওয়া, অর্থাৎ সর্ব্বশরীরকে বিশ্রাম প্রদান করা একরূপ আশ্চর্য্য জনক বলিয়া মনে হয়। নিদ্রায় সমস্ত শরীর শিথিল হয়, মাংস পেশীর শক্তি তিরোহিত হয়, আমরা বাহ্যতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ি। হস্তীর ন্যায় মহাকায় প্রাণী অজ্ঞান অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপে নিজের ভারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তদ্ব্যতীত এরূপ গুরুভার প্রাণীর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়াই যেন অনেকটা নিরাপদ বলিয়া মনে হয়। গবাদি পশু শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, অথবা যখনই তাহারা রোমন্থনে নিযুক্ত হয়, তখন প্রায়ই শয়ন করে। আরও কয়েক প্রকার প্রাণীর নিদ্রাকালে বা বিশ্রামকালে মস্তক ঝুলিতে থাকে। বাদুড় জাতীয় জীব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষে ও মালয় দেশে

কয়েক প্রকার তোতাপাখী জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারাও এইরূপে দোদুল্যমান হইয়া অর্থাৎ নিম্ন মস্তক হইয়া নিদ্রা যায়। অন্য কোনরূপ পক্ষীর স্বভাব এরূপ নহে, তাহারা সাধারণতঃ মস্তক পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করে এবং চঞ্চুপুট ডানা এবং শরীরের মধ্যস্থিত পালক গুলিতে প্রবেশিত করিয়া দেয়। অনেকে মনে করেন, চঞ্চু ডানার মধ্যে প্রবেশিত করা থাকে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন যে পক্ষিকুল এরূপ অদ্ভুত অবস্থায় বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে অথবা কিরূপেই বা এরূপ অবস্থায় বিশ্রাম পাইতে পারে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পেন্‌গুইন নামক এক জাতীয় পক্ষী রহিয়াছে। তাহাদের পালক অত্যন্ত অল্প। এই পেন্‌গুইনও তাহার চঞ্চু বিরল-পক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়; অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই চঞ্চু পক্ষ দ্বারা আবৃত হয় না। কিন্তু পেচকের নিকট পক্ষীকুলের বিশ্রাম সুখের স্বাভাবিক অবস্থান ব্যতিক্রান্ত হইয়াছে। কয়েক জাতীয় কূর্ম্ম নিদ্রার সময় তাহারা মস্তক পৃষ্ঠ দেশে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা করিয়া নিদ্রা যায়। অনেক পক্ষী নিদ্রাকালে কেবল এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা যায়। সারস, বক ইত্যাদি দীর্ঘপদ পক্ষী সমূহের মধ্যেই এই স্বভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহংস ইত্যাদি জলচর পক্ষিসমূহ উন্মুক্ত জল রাশিতে ভাসমান হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। কিন্তু পাছে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কূলাভিমুখে নীত হইয়া কোনরূপ আহত হয় বা অপরিচিত দেশে নীত হয়, সেই জন্য ক্রমাগত এক পায়ে জল বাহিতে থাকে, ফলে যে স্থানে নিদ্রিত হয়, সেই স্থানেই অল্পে অল্পে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। স্লথ নামক এক প্রকার জীব রহিয়াছে; ইহারা চারি পায়ে ঝুলিয়া ঘুমাইতে থাকে, এবং ঘুমাইবার সময় মস্তক সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। স্লথগুলি বৃক্ষকাণ্ড হইতে যে বৃক্ষশাখা, সমকোণে বা প্রায় সমকোণে বাহির হইয়া আইসে, সেই সমস্ত ডালেই ঝুলিয়া থাকে। ঐরূপে আফ্রিকান পোটোস বা স্লো-লেমার চারি পায়ে ঝুলিয়া ঘুমায় বটে, কিন্তু তাহারা যে সমস্ত ডাল একবারে খাড়া দণ্ডায়মান সেই সমস্ত ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে, এবং মস্তক ঊর্দ্ধভাগে রক্ষিত হয়। এক মাত্র মানব ব্যতীত আর কোনই জীবই পৃষ্ঠদেশ শয্যায় রক্ষা করিয়া নিদ্রাগত হয় না।

লোকে বলিয়া থাকে যে, কয়েকটি জীব আদৌ নিদ্রা যায় না। লোকের এরূপ ধারণার একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত জীব নিদ্রাকালে আদৌ চক্ষু নিমিলিত করে না। খরগোস, সর্প, এবং মৎস্য ইত্যাদিকেই আমরা নিদ্রাহীন জীব বলিয়া জানি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। তিমি এবং ইহার সগোত্র অন্যান্য জীবকে লোকে একবারে নিদ্রাহীন জীব বলিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু অনেকের বিশ্বাস যে যদি এই জীব ভুলিয়াও ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা সহসা নিমজ্জিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ অন্ধকারে নিদ্রা আবির্ভূত হয়। কিন্তু অনেক জীবের অন্ধকারে নিদ্রা আকর্ষিত হয়। যেমন বাদুড়, পেচক ইত্যাদি। ইহাদিগকে সাধারণতঃ

নিশাচর জীব বলে। এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার এক মাত্র কারণ খাদ্য চেষ্টার পার্থক্য। যে সমস্ত জীব রজনীযোগে খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়, অথবা যাহারা দিবসের আলোক সহ্য করিতে পারে না, বা যাহাদের দিবসে খাদ্য চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই রজনীযোগে বিনিদ্র থাকিয়া খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের কোন শ্রেণী হইতে নিদ্রা আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয়ের মীমাংসা করা তত সহজ সাধ্য নহে। সাধারণতঃ মনে হয় কীট পতঙ্গাদি হইতে উচ্চতর প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থই নিদ্রা দ্বারা বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে উদ্ভিদ জগতেও নিদ্রার ন্যায় এক প্রকার অজ্ঞানাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কেবলমাত্র জীব নিদ্রা সুখ লাভ করে এবং উদ্ভিদ এ সুখে বঞ্চিত এ কথা তত সত্য নহে। যদি নিদ্রা অর্থে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রাম বুঝায়, যদি পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আবশ্যক হয় এবং জীবন ধারণ চেষ্টা যদি পরিশ্রম সাধ্য হয়, তাহা হইলে সকল জীবকেই জীবন ধারণ করিতে হইবে, অতএব খাদ্য চেষ্টা করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে,—অতএব কি জীব কি উদ্ভিদ, প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই বিশ্রাম প্রয়োজন। সেই জন্য নিদ্রা কয়েক জাতীয় প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের উপভোগ্য না বলিয়া পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থেরই উপভোগ্য এ কথা বলাই যুক্তি সঙ্গত ;— অতএব কোলরিজের পূর্ব্বোক্ত উক্তির ন্যায় মহান সত্য আর কি আছে! উদ্ভিদজগতেও নিদ্রা অন্ধকারে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক ব্যাকটিরিয়া, ছ্যাতা ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ নানাবিধ দুর্দ্দম নিশাচর জীবের ন্যায় এবং তাহাদের অন্ধকারময় অনিষ্ট জনক কার্য্যের ন্যায়, অন্ধকারেই খাদ্য সঞ্চয় করে এবং অন্ধকারেই বৃদ্ধি পায়। অন্যথা অন্ধকারে অবস্থানই নিদ্রাকর্ষণের প্রকৃত সহায়ক।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

জার্ম্মান-সিলভার।

সাধারণ লোকের ধারণা "জার্ম্মান-সিলভার" রোপ্য বিশেষ। কাকের সহিত কোকিলের যে সম্বন্ধ জর্ম্মাণ সিলভারের সহিত রৌপ্যের সেই সম্বন্ধ, কাক ও কোকিল যেমন দুই পক্ষিজাতীয় প্রাণী, জার্ম্মান সিলভার ও রৌপ্য তেমন দুই ধাতব পদার্থ মাত্র। 'কেমিক্যাল স্বর্ণের' সহিত যেমন স্বর্ণের সম্বন্ধ, রৌপ্যের সহিত জার্ম্মান সিলভারেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। জার্ম্মান সিলভার ত রৌপ্য নহেই তদ্ব্যতীত এই ধাতব পদার্থের সহিত জর্ম্মান দেশেরও কোন সংশ্রব নাই। অনেকে জার্ম্মান সিলভারের অর্থ বলিয়া থাকেন—জার্ম্মানীতে প্রস্তুত বা আবিষ্কৃত মিশ্রিত ধাতু বিশেষ। কিন্তু বাস্তবিক এই মিশ্রিত ধাতু জার্ম্মানিতে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিম্বা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসা উহাদের এক চেটিয়া নহে। কিন্তু তথাপি ইহাকে কেন জার্ম্মানির সিলভার বলা হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ঐতিহাসিক ভাবে ধরিতে গেলে দেখা যায়, যে চীন দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নিকেল, তাম্র ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের মিশ্রণে একটি মিশ্রিত ধাতু (alloy) প্রস্তুত করা হইত। চীন দেশে ইহাকে 'প্যাকফং প্যাকটং' নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা এসিয়া খণ্ডে আবিষ্কৃত হইলেও, ভাগ্য দোষে ইহার নাম ইউরোপের সহিত জড়িত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েকটি ধাতুর মিশ্রণে জার্ম্মান সিলভারের উৎপত্তি। কিন্তু এই কয়েকটি ধাতু। উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। আর ইহার প্রস্তুতেরও একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই। শুভ্র মিশ্রিত ধাতুকেই জার্ম্মান সিলভার বলা চলে। শুভ্র অতএব রৌপ্যের সহিত ইহার একটা সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে সিলভার, বা রৌপ্য নামে অভিহিত করা হয়। Nickel silver, Silveriod argentoid, nickaline navoline—ইত্যাদি জার্ম্মান সিলভারের নামান্তর মাত্র। ব্যবসায়ে সুবিধার জন্য ও গুণের সামান্য তারতম্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসাদার ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে বাজারে বাহির করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ইহার উপাদানের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করিয়া বা কোন একটা বিশেষ নাম দিয়া সেই নাম রেজিষ্টার্ড, ইত্যাদি করাইয়া আইনানুযায়ী নিজস্ব করিয়া লন। সাধারণতঃ শতকরা ৫০ ভাগ তাম্রের সহিত ২৫ ভাগ নিকেল ও ২৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া জার্ম্মাণ সিলভার তৈয়ারী করা হয়, স্থল বিশেষে আবার টিন, cadmium, লৌহ প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব ইহার গুণের সামান্য তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই মিশ্রিত ধাতু পরে 'ঢাল' করিয়া রাখা হয়। তার, দণ্ড (rods) নল বা চাদরের আকৃতিতে বাজারে বিক্রয় হয়।

আজকাল জার্ম্মান সিলভারের তৈজস পত্রাদি অপ্রতুল নহে। সহরের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, সুদূর পল্লীগ্রামেও আজকাল জার্ম্মান সিলভারের চামচ, থালা, গেলাস, পানের কৌটা এমন কি পূজার কমণ্ডলু ইত্যাদিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে শুভ্র মজবুত ও নয়নরঞ্জক বাসন ও অন্যান্য তৈজস পত্রাদি পাওয়া যায় বলিয়া অতি অল্প দিনেই ইহা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে বিজ্ঞানের আদর অল্প কাজেই ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যবহারও অতি অল্প। বৈজ্ঞানিক জগতে জার্ম্মান সিলভারের তাড়িৎ তার অত্যাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তড়িৎ প্রবাহে ইহার প্রতিরোধ শক্তি (resistance) যথেষ্ট আছে বলিয়াই ইহার আদর। তাহা ছাড়া ইহাতে মড়িচা পড়ে না সেইজন্য ইহা তাড়িৎ স্রোতবাহী দুইটি তার-প্রান্ত সংযোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। তড়িৎ বিজ্ঞানে বিশেষ প্রয়োজনীয় Wheatstone bridge নামক যন্ত্র উক্ত তারে নির্ম্মিত।

আমেরিকার কোন বিখ্যাত তালা কারখানায় চাবি প্রস্তুতের জন্য জার্ম্মাণ সিলভার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর যে লৌহ নির্ম্মিত চাবি ব্যবহৃত হয় তাহাতে প্রধান অসুবিধা এই যে ইহা বড়ই ভঙ্গপ্রবণ। তাহা ছাড়া যাহাকে অনেক চাবি ব্যবহার করিতে হয় তাহাকে একটি বিষম ভার বহন করার দরুণ একটু বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। লৌহ নির্ম্মিত চাবিতে অতি সহজেই মড়িচা পড়ে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা জার্ম্মাণ সিলভারের চাবিতে আদৌ নাই। অনেকগুলি চাবি একটি 'রিং' অথবা 'চেনে' একত্রে রাখিলে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে না। তাহা ছাড়া চাবিগুলি অতিশয় মজবুত ও উজ্জল থাকে।

কলিকাতায় অনেকগুলি তালার কারখানা আছে। যদি ঐ সমস্ত কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ মামুলি ধরণের প্রস্তুত প্রণালী ছাড়িয়া দিয়া জার্ম্মান সিলভারের নির্ম্মিত তালা ও চাবি প্রস্তুত করেন তাহা হইলে দেশের ও দশের উপকার করা হয় অথচ বিলাতী তালার কাটতিও অতি শীঘ্রই অনেক কমিয়া যায়। আমাদের দেশে আলীগরের তালা বিখ্যাত। এই তালার আরও উন্নতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কি তালার কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ হস্তক্ষেপ করিবেন? পাশ্চাত্য দেশবাসী সহিত সমান পদবিক্ষেপ না করিতে পারিলে বিংশ শতাব্দীর এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে আমদের স্থান কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মান সিলভারের বাসন ভারতে অল্প বিস্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং আর দু দশ বৎসরের মধ্যে আরও বেশী করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত তৈজস পত্রাদির অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ইহাতে দেশের অনেক ধন বিদেশে চলিয়া যায়।

চামচ, কাঁটা, ছুরি (অবশ্য আমাদের দেশে ইহাদের ব্যবহার কম) নানা প্রকার

কল, মটরকার, বাইসাইকেল, বাসন, ঘড়ির ঢাকিনা প্রভৃতির প্রচলন আজকাল বড় অল্প নহে। $\frac{1}{8}$ ইঃ পুরু জার্ম্মান সিলভারের চাদর কাটিয়া চামচ তৈয়ারী করা হয়। আজকাল "Gun metal"এর ঘড়ির ঢাকিনা বড়ই ফ্যাসান হইয়াছে। সেই জন্য জার্ম্মান সিলভারের ঢাকিনার উপর এরূপ রঙের পালিশ করা হয়। আজকাল সৌখীন অথচ অল্প মূল্যের সমস্ত দ্রব্যাদি জার্ম্মাণ সিলভারের নির্ম্মিত। বিলাতী হোটেল, বোর্ডিং, যানাদিতে যে স্থানে পূর্ব্বে নিকেল ব্যবহার চলিত এখন জার্ম্মান সিলভার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিকেল অপেক্ষা জার্ম্মান সিলভারের উপর পালিশ অতি সহজে হইয়া থাকে।

জার্ম্মান সিলভারের দ্রব্য তৈয়ারী করার একটা বিশেষ প্রণালী আছে। "তাল" হইতে তার করিতে হইলে প্রথমে ইহাকে চাপিয়া (rolling) লম্বা করা হয়; এইরূপ না করিলে ইহা বড় ভঙ্গপ্রবণ হয়। পরে উত্তপ্ত অবস্থায় ইহাকে draw platesএর মধ্যে দিয়ে টানা হয়। Draw plate বলিতে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিধির লৌহ নির্ম্মিত ছিদ্র বুঝায়। উত্তপ্ত অবস্থায় draw plateএর ভিন্ন ভিন্ন পরিধির ছিদ্রের মধ্যে দিয়া টানিয়া ইহাকে আবশ্যক মত সরু বা মোটা তারে পরিণত করা হয়।

তদ্ব্যতীত জার্ম্মান সিলভারের চাদরও বাজারে দৃষ্ট হয়, ইহা হইতেই তৈজস পত্রাদি প্রস্তুত হয়। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে মজবুত ও সুদৃশ্য দ্রব্যাদি কেবলমাত্র জার্ম্মান সিলভারেই সম্ভব।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতি ও হৃদ্‌যন্ত্র।

হৃদ্ যন্ত্রের আকৃতি কিরূপ তাহা প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। ইহার কার্য্য প্রণালীর দ্বারা আমরা পীড়িত হইতে পারি কি না তাহাই আলোচ্য। আমাদের শরীর রক্ষার্থ শোণিত নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। শোণিত খাদ্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই শোণিত হৃদ্‌যন্ত্র দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়। সমস্ত শারীর যন্ত্রের প্রধান পুষ্টিদায়ক পদার্থ শোণিত; তাহা লইয়াই হৃদ্‌যন্ত্রের কারবার। অতএব অন্য যন্ত্রের খাদ্যাভাব হইতে পারে, হৃদ্‌যন্ত্রের কখনই পুষ্টির অভাব হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যদি কখনও জীবের শোণিতের অভাব হয়, তাহা হইলে হৃদ্‌যন্ত্রের অগ্রে হইবে। যখন অন্যান্য যন্ত্রে শোণিত পরিচালিত করিবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্র প্রবল ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তখনই হৃদ্‌যন্ত্রকে উপবাস

দিতে হয়। মনে হয় হৃদ্‌যন্ত্র বুঝি বড় সদাশয়, তাই নিজে উপবাস দিয়াও পরকে খাওয়াইয়া থাকে; কিন্তু তাহা নহে। ইহাকে বাধ্য হইয়া এইরূপে উপবাস দিতে হয়। ইহার গঠন প্রণালী স্বভাবতঃই এরূপ অসম্পূর্ণ যে, ইহার উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইতর জীবের হৃদ্‌যন্ত্রের (যেমন ভেক ইত্যাদি) প্রকোষ্ঠ প্রাচীর রক্ত শোষণ করিতে পারে, কাজেই তাহাদের পুষ্টির অভাব হয় না। কিন্তু মানবের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত। মানবের হৃদ্‌যন্ত্রের প্রকোষ্ঠ প্রাচীরে একরূপ লাইনিং দেওয়া থাকে, এই লাইনিং এইরূপে শোষণ প্রতিরুদ্ধ করে। এইরূপে রক্ত স্বতঃই শোষিত হইবার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে কতকগুলি ধমনী (artery) রহিয়াছে। এই সমস্ত ধমনী বা রক্তবহা নাড়ী ঠিক য়্যাওর্টার (aorta বা হৃদয়যন্ত্র হইতে বহির্গত রক্ত প্রবাহক বৃহন্নাড়ী) মুখের উপর অবস্থিত। কিন্তু এই স্থানটিতে ধমনী গুলি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত শোষণের তত সুবিধা হয় না। এই স্থানেই বৃদ্ধত্বের প্রথম লক্ষণ সমূহ আবির্ভূত হয়। এই স্থানে তন্তুবৎ টিসু সমূহ (fibrous tissue) অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তশোষক ধমনীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে হৃদ্‌যন্ত্র রক্তে ডুবিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু রক্তপানের অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের তাহার তেমন সুবিধা জনক উপায় নাই। বরং অন্যান্য বহুবিধ ইতর প্রাণী আমাদিগের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমাদের (angina Pectoris) য়্যাঞ্জিনা পেক্‌টোরিস পীড়ার কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত শোষণের অভাব।

জন্ম সময়ে শিশুর হৃদ্‌যন্ত্রের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। ইহা দ্বারা প্রায়ই নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে শিশু জন্ম গ্রহণকালে নীল বর্ণ হইয়া ভূমিষ্ট হয়। যখন শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে সেই সময়ে ভ্রূণের হৃদ্‌যন্ত্রের দুই পার্শ্বে দুইটি মুখ থাকে। জন্মকালে মুখ বন্ধ হইয়া যায়। যদি বন্ধ হইয়া না যায়, তাহা হইলে নানা কারণে শিশু নীল বর্ণ হয় এবং সহসা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। হৃদজনিত অন্যবিধ উপসর্গ বা পীড়া অপেক্ষাকৃত অল্প, অথবা কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের গঠন জন্মকালে যেরূপ অসম্পূর্ণ থাকে, তাহাতে নানাবিধ পীড়া হওয়া অসম্ভব নহে। হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমাগত কার্য্য করিতেছে, একবারও অবসর বা বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে না, ইহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। দুইবার স্পন্দনের ব্যবহিত সময়ে হৃদ্‌যন্ত্র বিশ্রাম উপভোগ করিয়া লয়। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সম্পূর্ণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হৃদ যন্ত্র মাত্র ৯ ঘণ্টা অর্থাৎ মাত্র এক তৃতীয়াংশ কাল কার্য্য করে। যে যন্ত্র শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্ত পাম্প করে, সেই যন্ত্র ৯ ঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করে! ইহা নিতান্তই অন্যায়।

আমাদের শরীরস্থ ধমনীগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। ঠিক যেন বহু পয়ঃপ্রণালী পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে সংযুক্ত হইয়া থাকার উপকারিতা

যথেষ্ট। কেননা যদি কোনক্রমে একটা ধমনী বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে অন্য ধমনী দ্বারা রক্ত পরিচালিত হইতে পারে, অতএব কোথায়ও রক্তের অভাব হয় না; কিন্তু শরীরের অনেকগুলি প্রধান যন্ত্রে এইরূপ ভাবে ধমনী সংযুক্ত নহে। ধমনীগুলি একবারে হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর শাখা প্রশাখা নাই। ইহাতে নানারূপ ব্যাধি ও বিপদ হইতে পারে। এইরূপ যদি মূত্রাশয়ের (Kidney) কিম্বা হৃদযন্ত্রের কোন একটি আর্টারীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থানে আর কোনকালে রক্ত উপস্থিত হইতে পারে না, শোণিত অভাবে সেই স্থানে মৃত মাংসস্তুপ মাত্র হইয়া থাকে। সমস্ত শরীর যন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। মস্তিষ্ক অপেক্ষা প্রধানতম যন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। এই মস্তিষ্কের জন্যই আমরা মানব। এ হেন যন্ত্রেও রক্ত চলাচল প্রণালীর বন্দোবস্ত সুচারু নহে। মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশে রীতিমত রক্ত চলাচল প্রয়োজন। যদি কোনরূপে কোন অংশে রক্ত উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দুরারোগ্য ব্যাধি এমন কি মৃত্যুও অনিবার্য্য। য্যাপোপ্লেক্সি (appoplexy) বা অপস্মার ব্যাধির একমাত্র কারণ এইরূপে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়া। যদি মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের প্রণালীগুলি পরস্পরের সহিত নানারূপে সংযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে কোনরূপে একটি প্রণালী কোন কারণবশতঃ বন্ধ হইয়া যাইলেও অন্য প্রণালীর দ্বারা রক্ত সেই স্থানে পরিচালিত হইয়া স্থানটিকে কোনরূপে বিপদাক্রান্ত হইতে দিত না।

ধমনী যখন অস্থি খণ্ডের উপর দিয়া চালিত হয় তখন অস্থির খিলানের ন্যায় একপ্রকার দৃঢ় আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়, অর্থাৎ ধমনী গুলি অস্থির খিলান দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু ইহাতে যতটা উপকার তদপেক্ষা অপকার অধিকতর। অস্থি কঠিন, কোনরূপ গুরুতর আঘাতে অস্থি ভগ্ন হইতে পারে অর্থাৎ আর্টারিও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। মস্তকের খুলিতে যে সমস্ত ধমনী আছে, তাহাদের একটির নাম মেনিন্‌জিয়াল আর্টারি, এই ধমনী অস্থির একটি নালির মধ্য দিয়া পরিচালিত। এই অস্থি নালি এই ধমনীকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মস্তকের খুলির মধ্যে এরূপ সাবধানতার কোন প্রয়োজন নাই। বরং ইহাতে ক্ষতি এবং যথেষ্ট রক্তপাত হইয়া থাকে। যদি কেহ মস্তকে আঘাত করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই ধমনী সংরক্ষক অস্থি ভগ্ন হয়, আর্টারি ছিঁড়িয়া যায় এবং অত্যন্ত রক্তপাত হইতে থাকে।

শিরা সমূহের সাধারণ পীড়া,—অযথা স্ফীতি বা Varicosity। ভেরিকোজ ভেইন্‌স্ কিরূপ তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। অনেকের পদদেশে হাটুর নিম্নে শির সমূহ যেন দড়ি পাকাইয়া থাকে এই সমস্ত ভেরিকোজ শিরা। যদি শিরা সমূহ বহির্দিক হইতে প্রচুর অবলম্বন পাইত এবং যদি শিরাগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক ভ্যাল্‌ভ

থাকিত তাহা হইলে ভ্যারিকোজ শিরা বলিয়া জগতে কোনরূপ বিকৃত শিরা দেখিতে পাওয়া যাইত না। মানব নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানব যখন মানব ছিলনা তখন তাহাকে চারি পায়ে চলিতে হইত। সেই সময়ে চলা ফেরার জন্য বক্ষস্থলেরও শিরা সমূহের প্রচুর ভ্যাল্ভ আবশ্যক হইত, এখনও সেই সমস্ত ভ্যাল্ভ রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। কেননা এক্ষণে আমরা পদদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে উচ্চ এবং খাড়া হইয়া চলিতে পারি। অতএব শরীরের নিম্নপ্রদেশেই প্রচুর ভ্যাল্ভ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বক্ষে অনাবশ্যক ভ্যাল্ভ রহিয়াছে, অথচ পদে প্রয়োজনানুরূপ ভ্যাল্ভেরও অভাব। অর্শ, ভ্যারিকোসিল, শিরার স্ফীতি ইত্যাদির একমাত্র কারণ এই সমস্ত শিরা বহির্দেশ হইতে প্রচুর অবলম্বন পায় না এবং ইহাদের উপযুক্ত সংখ্যক ভ্যাল্ভ নাই। অল্পক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে, একটু জোর করিয়া চলা ফেরা করিলে, কোষ্ঠ বদ্ধতা উপস্থিত হইলে কিম্বা রমণীর গর্ভাবস্থায় congestion হইলেই অমনই কষ্ট ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

এইরূপে আমাদের শরীরের মধ্যে নানাবিধ যন্ত্র সংস্থান এরূপ অসঙ্গত এবং যন্ত্র গঠন এরূপ অসম্পূর্ণ, যে আমরা পীড়ার হস্ত হইতে স্বভাবতঃই পরিত্রাণ পাইতে পারি না। বরং এইরূপ দোষের জন্য আমরা স্বতঃই নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ি।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

তাম্বূল চর্ব্বণ।

ভারতের সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর তাম্বূল চর্ব্বণের প্রচলন আছে। তবে, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ইহা অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশে কাহাকেও আদর অভ্যর্থনা করিতে হইলে "পান তামাক" দিতে হয়। এমন কি দেবার্চ্চনা ও বিবাহাদি নানা সংস্কার কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আজ এই প্রবন্ধে আমরা তাম্বূল চর্ব্বণের উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অনেকে বলেন যে ইহা অত্যন্ত উপকারী আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা কেবল বিলাসিতার অঙ্গমাত্র; অন্যান্য "নেশার" ন্যায় ইহাও এক নেশা অতএব উপকার করা দূরে থাকুক বরং ইহা নানা প্রকার অপকারই করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক উপকারী কি অপকারী বিচার করিতে হইলে প্রথমে ইহার প্রত্যেক উপকরণগুলির দ্রব্যগুণ জানা আবশ্যক, তাহার পর গুণাগুণ আলোচনা সম্ভবপর। কোনও প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মত প্রচার করিলে চলিবে না। প্রত্যেক

উপকরণেরই বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইজন্য এ ক্ষেত্রে আমি প্রথমে তাম্বূলের উপকরণগুলির প্রত্যেকটির দ্রব্যগুণ (পাশ্চত্য চিকিৎসা শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে) আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। কেহ যেন না মনে করেন যে, এইরূপ দ্রব্যগুণের তালিকা দিয়া আমি প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতেছি; কেন না দ্রব্যগুণ জানা না থাকিলে গুণাগুণ বিচার সম্ভবপর নহে।

পানের সাধারণ উপকরণ—চূণ, খদির, কেতকীপুষ্প, সুপারি, ধনের চাল, লবঙ্গ, এলাচ, জোয়ান, মৌরী, দারুচিনি, বচ, কাবাবচিনি ইত্যাদি।—

দ্রব্যগুণ:—

১। তাম্বূল:—নাগর বল্লিক; নাগবল্লী; পান; Piper Betel, Cœvica Betel.

পানের আকৃতি:—আমাদের সকলেরই ইহার আকৃতি জানা আছে, অতএব ইহার বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া কোনও লাভ নাই।

গুণ:—ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈলাক্ত পদার্থ (aromatic oil) আছে। এই তৈলের লালা নিঃসারক ও অতি সামান্য পরিপাক গুণ আছে। খাঁটি সরিসার তৈলের সহিত গরম করিয়া বুকের উপর বসাইয়া রাখিলে সর্দ্দি কাশি, pleurisy, Bronchitis রোগে অনেক উপকার হয় স্ত্রীলোকের ঠুনকা হইলে ইহা স্তনের উপর বসাইয়া রাখিলে দুগ্ধের হ্রাস হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে:—বল্য, মুখের দুর্গন্ধহর, কান্তি বৃদ্ধি কর, কফনাশক পীনসবাতঘ্ন।

২। চূণ (Slaked lime.)

গুণ:—চূণের অম্ল (অম্বল) দমনের শক্তি আছে।

৩। খদির, (খয়ের) uncaria gambier (Nat. Ord. Rubiaceæ) নামক বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল ও পত্রের কাথ।

গুণ:—ইহাতে অধিক মাত্রায় tannin বিদ্যমান থাকায় ইহার সঙ্কোচক (astringent) গুণ আছে। এ কারণে উদরাময় রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। কণ্ঠ নালীতে ঘা থাকিলে মুখে খদির চুষিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে:—সঙ্কোচক, দন্তরোগঘ্ন, এবং কাস ও অতিসার প্রভৃতিতে হিতকর।

৪। কেতকীপুষ্প (কেয়াফুল), Pandanus odoratissimus (Nat. Ord. Gramineæ).

গুণ:—সুন্দর গন্ধযুক্ত পুষ্প। অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরা ইহার সহিত খদির মিশ্রিত করিয়া "কেয়া খয়ের" প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহাতে পান সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত

হয়। ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী (volatile) তৈল আছে। উহার লালা ও পাচক-রসনিঃসারক গুণ আছে। ইহা British Pharmacopiaয় ব্যবহৃত হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ঃ—কফঘ্ন, বৃংহণ, নেত্র হিতকর ও কামোদ্দীপক।

৫। গুবাক, পুগ বা সুপারি Areca catechu ; আকৃতি—সকলেই জানেন।

গুণ ঃ—ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে। এ কারণ লালা ও পাচক রস নিঃসারণে ইহা যথেষ্ট সাহায্যতা করিয়া থাকে। ইহাতে এক প্রকার কষায় রস (tannin) বর্ত্তমান আছে। ইহার গুণ সঙ্কোচক। অধিক মাত্রায় সুপারি চর্ব্বণ করিলে অনেক সময় কোষ্ঠ কাঠিন্য লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া সুপারিতে এক প্রকার মাদক দ্রব্যও আছে। এই জন্য সুপারি ব্যবহারে অনেক সময় মাথা ঘুরিয়া থাকে।

৬। ধনের চাল। ধনে (Corrindum Sativum) এক প্রকার গাছের ফল। ইহার খোলা ছাড়াইয়া শুষ্ক করিয়া ধনের চাল তৈয়ারী করা হয়।

গুণ ঃ—ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল (volatile oil) আছে এই তৈলের ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বায়ু নিঃসরণ গুণ আছে। ইহাতে অল্প সুগন্ধও আছে। ইহা লালা নিঃসারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ত্রিদোষঘ্ন, দীপন, পাচন, গ্রাহী, জ্বরঘ্ন, দোষের উৎক্লেশক, সুগন্ধি, মুখ রোচক ও ঈষৎ কটু।

৭। লবঙ্গ। লবঙ্গ Eugenia caryophyllata (Nat. Ord. Myrtaceæ) নামক বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক পুষ্প।

গুণ ঃ—ইহাতে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে oleum caryophylle নামক এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে। লবঙ্গের গুণের এই তৈলই মূল কারণ। ইহা লালা নিঃসারক, পাচক রস নিঃসারক ; ক্ষুধা বর্দ্ধক ও বায়ু নিঃসারক। অনেক সময় ইহা শূল বেদনা (colic pain) উপশম করিয়া থাকে। ইহার কফঘ্ন গুণও যথেষ্ট আছে। দন্তশূল রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ঃ—ত্রিদোষঘ্ন, শিরোরোগনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক।

৮। এলাইচ ঃ—এলাইচ মালাবার অঞ্চলের Elettaria cardamomum (Nat. Ord. Scitamineæ) বৃক্ষের ফল।

গুণ ঃ—ইহাতে Terpinine নামক এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে। এই তৈলের লালা নিঃসারক ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বায়ু নিঃসারক গুণ আছে। ইহা ব্যতীত ইহা সুগন্ধযুক্ত। ইহার ক্বাথ লাল রং হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতেঃ—সূক্ষ্মৈলা বা ছোট এলাইচ মূত্রকৃচ্ছ নাশক, কফ, শ্বাস, অর্শ প্রভৃতি রোগে হিতকর, পিত্তঘ্ন ও বমন নাশক।

বৃহদেলা—বড় এলাইচ (Ammun Sublutum) সুরভি, কফপিত্ত নাশক, হৃদ-রোগ নাশক।

৯। যমানিকা, যমানী Lingusticum ajwan.

গুণ :—শূল রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী অতিসার ও উদরাময় রোগে ও ইহা অত্যন্ত কার্য্যকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—পচন, বাড়শ্লেষ্ম, গুল্ম, প্লীহা উদরি রোগে হিতকর, রুচিকারক, অগ্নি উদ্দীপক, দৌর্গন্ধহারক, হৃত্ত ও পিত্তের উৎক্লেশক।

১০। মিশ্রেয়ী, মধুরিকা—মৌরী Fœniculun Vulgari.

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—বাত পিত্তোত্থ দোষ নাশক, প্লীহা ও ক্রিমিঘ্ন।

১১। দারুচিনি ত্বক্ :—গুড়ত্বক বা দারুচিনি cinnamomum Zeylanicum (Nat. Ord. Lawrinæ) নামক এক প্রকার বৃক্ষের ত্বক।

গুণ :—ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি উদ্বায়ী তৈল আছে, এই তৈলের লালা নিঃসারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বায়ু নিঃসারক গুণ আছে। ইহাতে Tannin নামক কষায় পদার্থ থাকায় ইহার সংকোচক গুণও যথেষ্ট আছে। উদরাময় রোগে প্রাতে ও সায়াহ্নে ৬০—৯০ গ্রেণ আন্দাজ দারুচিনির গুঁড়া অত্যন্ত উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—কফ কাশঘ্ন, কণ্ঠশোধক।

১২। বচ Acorus calomus.

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—কফঘ্ন এবং কাসি বাতজ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর। ইহার লালা নিংসারক গুণও যথেষ্ট আছে।

১৩। কাবাবচিনি Cubebs। Piper cubeba (Nat. Ord. Piperaceæ) নামক বৃক্ষের ফল বিশেষ; অনেকটা গোলমরিচের আকৃতি।

গুণঃ—ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে। ইহা অত্যধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণ করে। অল্প মাত্রায় ইহা পরিপাক ও বায়ু নিঃসরণে সহায়তা করে বটে, মাত্রা অধিক হইলে পরিপাকের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ইহার মূত্র নিঃসারক গুণও যথেষ্ট আছে। শ্লেষ্মা রোগে বিশেষতঃ গল নালীর (hay fever) রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—শ্লেষ্মা, রক্তপিত্তঘ্ন।

১৪। কর্পুর Camphor :—কর্পুর cinamomum camphora নামক বৃক্ষের দারুমধ্যস্থ নির্য্যাস। ইহার গুণ অনেকাংশে উদ্বায়ী তৈলের সমতুল্য। অনেক সময় ইহা বায়ু নিঃসারকের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মা সরলকারক। পেটের রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—শ্লেষ্মা রক্তপিত্তঘ্ন, দাহ নাশক ও অন্নবৃষ্য।

১৫। জাতীফল, জায়ফল Myristicæ officinalis মলয়া দ্বীপপুঞ্জের Myristica fragrans নামক (Nat. Ord. Myristicaceæ) এক প্রকার গোলাকার ফল। ইহা অতি সুন্দর গন্ধযুক্ত ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে এই তৈলের পরিপাক শক্তি আছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—গ্রাহী ও বাতাতিসার, মেহঘ্ন।

১৬। পিপারমেণ্ট : –Mentha piperata (Nat. Ord. Labiateæ) বৃক্ষের পুষ্পের নির্য্যাস।

গুণ :—এই তৈলের পরিপাক লালা, বায়ু নিঃসারক শক্তি আছে। ইহার ক্ষত-শোধক গুণও যথেষ্ট আছে। তাহাতে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

১৭। যষ্টীমধু—Liquorice. যষ্টীমধু Glycyrrhiza Radix (Nat. Ord. Leguminosæ)। এক প্রকার শিকড়।

গুণ :—ইহা সুগন্ধি, সুস্বাদু, সুমিষ্ট, ও গলনালীর ক্ষত শোধক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—শোষতৃষ্ণাব্রণঘ্ন, পিত্ত নাশক ও চক্ষুর হিতকর।

১৮। কমলা লেবুর খোসা বা ছাল :—orange peel কমলা লেবুর খোসা—Aurantii corticis Siccatus (Nat. Ord. Rutaceæ).

গুণ :—ইহাতে oleum Aurantii corticis নামক এক প্রকার তৈল আছে। ইহা সামান্য কটু ও পাচকরস নিঃসারক। ইহার সুগন্ধের জন্য পানের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—তৃষ্ণাদাহ হারক ও কান্তিকারক।

কেহ কেহ পানের সহিত নারিকেলের কুচা এবং বাদাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই কারণে তাহাদেরও গুণাগুণ আলোচিত হইল।

১৯। নারিকেল Coconut :—

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—নারিকেল cocos nucifera শীতল, পিত্তঘ্ন, তৃষ্ণাশোষঘ্ন, অম্ল নাশক, বলকারক।

২০। বাদাম—বাতাদ :—বাদাম Prunus amygdalus (Nat. Ord. Rosaceæ) এক প্রকার ফল।

গুণ :—ইহাতে oleum amygdalæ নামক তৈল আছে। ইহা বহু মূত্ররোগে (diabetes) বিশেষ উপকারী। এই তৈলের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা পিত্ত-কোষস্থ পাথরিকে (Gall Stone) দ্রব করিয়া দেয়। ইহা সরল ভেদকও বটে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে :—সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রজনক, বৃষ্য।

বিচার।

তাম্বুলের উপকরণ গুলির দ্রব্যগুণ আলোচনা করা গেল। একণে আমরা তাম্বুল চর্ব্বণের দোষ গুণ বিচার করিতে পারি।

উল্লিখিত দ্রব্যগুণের তালিকা হইতে এ ধারণা স্বতঃই হইতে পারে যে তাম্বুল চর্ব্বণে কোন অপকার নাই। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আমরা দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেক উপকরণটিরই লালা নিঃসারক শক্তি আছে। একণে আমরা এই লালার পরিপাক বিষয়ে কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের মুখ নিঃসৃত লালাতে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে Ptyalin নামক এক প্রকার দ্রব্য আছে। Ptyalinএর স্বধর্ম এই যে ইহা অদ্রবণীয় শ্বেতসার জাতীয় (Starchy food) খাদ্য দ্রব্যকে dextrine ও maltose নামক দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত করে। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস যে তাম্বুল চর্ব্বণে নিঃসৃত Ptyalin খাদ্যের শ্বেতসার (Starch) অংশের পরিপাক বিষয়ে সহায়তা করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈত্য আছে। Ptyalinর ক্ষার ও অম্ল বিবর্জ্জিত ক্ষেত্রে (neutral) কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অল্প ক্ষার সংযুক্ত ক্ষেত্রেও (alkaline) ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। তবে অতি সামান্য অম্লের সহযোগে ইহার স্বধর্ম একেবারেই লোপ পায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকের বিশ্বাস যে তাম্বুল চর্ব্বণে নিঃসৃত লালা পরিপাকের সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু পাকস্থলিতে পাচকরসে যথেষ্ট অম্ল (Hydrochloric acid) থাকে সেই কারণে এইরূপে নিঃসৃত লালায় কোনও উপকার হয় না।

১৯০৫ সালে Grutzner এবং ১৯০৬ সালে Connon প্রমাণ করেন যে লালার পরিপাক কার্য্য (Salivary digestion) পাকস্থলীতে পৌঁছিয়াই শেষ হয় না। তাঁহাদের মত এই যে খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছিবার পরও কয়েক ঘণ্টা এইরূপ পরিপাক চলিয়া থাকে। তাঁহারা X-raysএর সাহায্যে দেখিয়াছেন যে, পাকস্থলীর অন্ত্র নালীর দিকের অংশে (Pylorus) প্রথম হইতেই পরিপাক তরঙ্গ চলিতে থাকে (Peristalsis) ; কাজেই ঐ অংশের খাদ্য সামগ্রী প্রথমেই পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে কিন্তু কণ্ঠনালীর অংশে (œsophageal or cardiac end) এই তরঙ্গ না থাকায় পাচক রস প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই লালার কার্য্য চলিতে থাকে।

"In the stomach the gastric juice is sufficiently acid to destroy the ptyalin and it was formerly supposed that the salivary digestion is promptly arrested on the entrance of the food and is therefore normally of little value as a digestive process. Our recent increase of knowledge regarding the conditions of the stomach shows on the

contrary that some of the food in an ordinary meal may remain in the fundic end of the stomach for an hour or more untouched by the acid secretion. There is every reason to believe therefore that the salivary digestion may be carried on in the stomach to an important extent" Howell.

Cannon এবং Grutznerএর মত দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে তাম্বুল চর্ব্বণে নিঃসৃত লালা পরিপাক বিষয়ে সাহায্যতা করে কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেন না এই লালা কোনও প্রকারে খাদ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না কাজেই পাকস্থলীতে পৌঁছিবামাত্রই অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া একবারে নিগুর্ণ হইয়া পড়ে। এক্ষণে বেশ বুঝা গেল যে তাম্বুল চর্ব্বণে নিঃসৃত লালার দ্বারা পরিপাকের কোনও উপকারই হয় না। উপকার ত দূরের কথা পুনঃপুনঃ বিনা কারণে অনৈসর্গিক উপায়ে লালা কোষ বা গ্রন্থিকে (Salivary gland) উত্তেজিত করিলে তাহাদের নিঃসৃত লালার পরিপাক হিসাবে অনেক গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। কাজেই এ হিসাবে তাম্বুল চর্ব্বণে বিশেষ দোষ আছে।

কেহ কেহ বলেন পানের সহিত চুণ থাকায় অনেক সময় অম্ল দমনে (dyspepsia) সহায়তা করে। কিন্তু এ কথাও যথার্থ নহে। অম্ল দমন করিতে হইলে যে পরিমাণ ক্ষার (চুণের) আবশ্যক সে পরিমাণ ক্ষার পানের সহিত ব্যবহার একেবারে অসম্ভব। কাজেই এ হিসাবেও তাম্বুল চর্ব্বণে কোনও উপকারিতা নাই।

মশলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি উদ্বায়ী তৈল আছে। তাহার ফলে অধিক মাত্রায় পাচক রস নিঃসৃত হয়। ইহাদের অনেকেরই আবার বায়ু নিঃসারক গুণ আছে। এই কারণে অনেক সময় ইহাদের দ্বারা পরিপাক বিষয়ে উপকার হয়। Tanin নামক কষায় পদার্থ থাকায় উদরাময় রোগে ইহাদের দ্বারা অনেক উপকার হয়। কয়েকটিতে সুগন্ধ আছে বলিয়া মুখের দুর্গন্ধ নিবারণে সহায়তা করে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে পরিপাকে সহায়তা করে বলিয়া অবাধে তাম্বুল চর্ব্বণ করা যাইতে পারে কি না। আমি ইহার অনুকূলে মত দিতে পারি না।

প্রথমতঃ—সুস্থ শরীরে স্বতঃই প্রচুর পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাজেই পাকস্থলীস্থিত পাচক রস নিঃসারক কোষ বা গ্রন্থি (gastric glands) অনৈসর্গিক উপায়ে উত্তেজিত করিয়া লাভ কি? এইরূপ পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় কোষগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ নিয়মিত ভাবে তাম্বুল চর্ব্বণ করিলে এই কোষগুলিকে উত্তেজিত না করিলে পাচক রস স্বতঃই বহির্গত হয় না। তখন অধিকমাত্রায় রস বহির্গত হওয়া দূরে থাকুক উপযুক্ত পরিমাণেও হয় না।

তৃতীয়তঃ আমরা বিনা কারণে কতকগুলি ভৈষজ্যের অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ি। ফলে যথাকালে ইহা আমাদের উপকারে আইসে না। কাজেই নিয়মিত তাম্বুল চর্ব্বণে পরিপাক সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উপকার হয় না।

অনেকে বলেন যে, তাম্বুল চর্ব্বণে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পানে কতকগুলি সুগন্ধি মশলা থাকায় প্রথমে মুখে বেশ সুগন্ধ হয় বটে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পানের "কুচা" লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পচিতে থাকে এবং এক প্রকার দুর্গন্ধ হয়। যাঁহারা মুখের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য পান ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা এলাইচ লবঙ্গ ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে আরও একটি লাভ এই যে দাঁতে কোনও প্রকার দাগ বা "ছোপ" ধরে না; দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল থাকে। অনেকের ধারণা মুখ বা ঠোঁট লাল হইলে সুন্দর দেখায় কিন্তু ইহার বিপরীতই সত্য।

তবে কি পান অব্যবহার্য ? ইহার কি কোনও উপকারিতা নাই ? পরিমিতরূপে এবং ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে ইহা অনেক সময়ে আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ইহা অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাদের কোনও উপকার ত হয় না বরং নানা প্রকার অপকার হইয়া থাকে।

পানের সহিত কেহ কেহ দোক্তা, সুর্ত্তী, জরদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রধান উপাদান তামাকের পাতা (Tobacco folia)। এই তামাকের পত্রে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে nicotine নামক এক প্রকার অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ আছে। দোক্তা ব্যবহারে শরীরের যথেষ্ট অপকার হইয়া থাকে। দোক্তা তামাক প্রভৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলিবার আশা রহিল।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্বাদির বিস্ফোটক।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গবাদি গৃহ-পালিত পশু বিস্ফোটক ইত্যাদিতে কষ্ট পাইয়া থাকে। বিস্ফোটকের কারণ নানাবিধ। তন্মধ্যে বহিরাগত কোনরূপ আঘাত, কণ্টক ইত্যাদি বিজাতীয় বা বিষাক্ত দ্রব্যের প্রবেশ, "এঁটুলি" পোকা প্রভৃতি পরপোষক জীবাদির আক্রমণ ইত্যাদিই বিস্ফোটকের প্রধান কারণ। শরীরের কোন স্থানে অস্বাভাবিক স্ফীতি এবং স্ফীত স্থানের অভ্যন্তরে পুঁযের সঞ্চারকেই আমরা বিস্ফোটক বলিয়া থাকি। বিস্ফোটক একবারেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

পুঁষ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বে আক্রান্ত স্থানটি ক্রমাগত স্ফীত হইতে থাকে এবং যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, এ সময়ে ব্যথা এত অধিক হয় যে স্পর্শও কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। কত দিনে যে একটি স্ফোটক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বলা অত্যন্ত দুরূহ, কেননা ইহাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় পুঁষ সঞ্চারিত হইবার গভীরতার উপর নির্ভর করে। সময়ে সময়ে ছাগাদি পশুর মাংস কাটিতে কাটিতে দুইটুকরা মাংসের সংযোগ স্থানে পুঁষ সঞ্চিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ পশুপালক পশুটিকে হত্যা করিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঐ স্থানে যষ্টি ইত্যাদির দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাতের ফলে পূঁষ উৎপাদিত হইয়াছে। যদি পেশী সমূহ তন্তুবৎ হয় এবং আহত স্থান সুগভীর হয় তাহা হইলে সময়ে সময়ে এক একটি স্ফোটকের পূর্ণতা পাইতে ১ মাস ২ মাস পর্য্যন্ত সময় আবশ্যক হয়। কোমর ইত্যাদি কোমল পেশীময় স্থান সমূহে আঘাত লাগিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ফোটক দেখা দেয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অশ্ব সমূহের পৃষ্ঠ দেশে যে স্থানে জিনের অগ্রভাগ শেষ হয়, অথবা গাড়ীর অশ্বের গলদেশে ক্রমাগত ঘর্ষণ জন্য যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, সেই স্ফোটক পূর্ণতা পাইতে সপ্তাহ, মাস, সময়ে সময়ে বৎসরাবধি সময় গ্রহণ করে। কেননা এই সমস্ত স্থানের মাংস ও টিস্যু সমূহ ঘন সান্নিবিষ্ট এবং রুক্ষ ও দৃঢ়। স্ফোটকের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহা ক্রমাগতই আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং অভ্যন্তরস্থ পুঁযের চাপ এত অধিক বৃদ্ধি পায়, যে চামড়ার যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত কোমল সেই স্থানটি তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া যাইয়া পুঁষ নির্গত হইয়া যায়। এই পুঁষ সাধারণতঃ মাংস বা টিস্যু সমূহ গলিত হইয়া উৎপাদিত হয়। যখন স্ফোটক এইরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার "মুখ" হয়। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াস বিদার্য্য স্থানেই মুখ প্রকাশিত হয়। যদি স্ফোটককে লইয়া কোনরূপ অন্য কার্য্য না করা হয়, তাহা হইলে ইহা আপনাআপনি স্বভাবতঃই ফাটিয়া যায়। গবাদি অন্য ইতর জন্তুর স্ফোটক কোন দ্রব্যে আঘাত লাগিয়াও ফাটিয়া যায় এইরূপে ফাটিয়া যাইলে পুঁষ নির্গত হইয়া আইসে, এবং ক্ষত সহজে ও শীঘ্র নিরাময় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ন্যায় নূতন মাংস ক্ষতের তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে এবং প্রকৃতির যত্নে ইহা সহজেই আরাম হয়।

যদি এইরূপ স্ফোটকের জন্য কোন পশু কার্য্য অক্ষম হয়, অথবা অত্যন্ত রুগ্ন হইতে থাকে, তাহা হইলে যাহাতে পুঁষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং স্ফোটকের মুখ দেখা দেয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। ফোমেণ্টেশন, পুলটিশ, বা কোন উত্তেজক লিনিমেণ্ট, বিশেষ ফলপ্রদ। যে সমস্ত জন্তু অত্যন্ত চঞ্চল এবং যাহাদিগকে সহসা আয়ত্বগত করা কষ্ট কর, তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই পুলটিশ লাগাইয়া দেওয়া উচিত। গলদেশের স্ফোটকে পুলটিশ লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। যখন স্ফোটকের ভিতরে রীতিমত পুঁষ সঞ্চিত হয়, তখন তাহার উপরিভাগে হাত দিলেই বুঝিতে

পারা যায় অভ্যন্তরে পূয টলটল করিতেছে। উপরের চর্ম্ম নরম এবং অত্যন্ত পাতলা হইয়া উঠে। এই সময়ে বেশ সাহস করিয়া ও দৃঢ়তার সহিত একবার বেশ গভীর ভাবে ছুরি চালাইয়া অবরুদ্ধ পূযকে নিষ্কাশিত করিয়া দিলে, পশুর অত্যন্ত আরাম হয় এবং ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইবার অবসর পায়। পিচকারী সহযোগে কোন পচননিবারক দ্রাবণ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অধিকাংশ ক্ষোটকই কিঞ্চিৎ অধিক সময় লইলেও প্রায়ই পাকিয়া উঠে এবং সময় মত আপনাআপনিই পূয নির্গত হইয়া যায় এবং ক্ষতও নিরাময় হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে ক্ষোটক আদৌ বিদীর্ণ হয় না। এরূপ স্থলে অভ্যন্তর ভাগে প্রায়ই ছানা অথবা পনীরের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, এই পদার্থের জলীয় ভাগ শোষিত হইয়া যায় অবশেষে সময়ক্রমে ইহা শক্ত হইয়া উঠে এবং ইহা একটি কঠিন পর্দায় আবৃত হইয়া যায়।

গভীর প্রদেশে ক্ষোটক উৎপন্ন হইলে কোন কোন সময়ে তাহাতে আদৌ পূয উৎপাদিত হয় না। সেই অংশ ক্রমে অত্যন্ত কঠিন হয়, ফুলিয়া উঠে অবশেষে অসাড় হইয়া পড়ে, এবং বেদনা বা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। গাড়ীর অশ্বের প্রায়ই এইরূপ হইতে দেখা যায়। স্কন্ধের সংযোগ স্থল ইত্যাদিতেই এইরূপ পীড়া হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে স্ফীতি এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে সেই পশুর দ্বারা আর কোন কার্য্যই হয় না। এই সমস্ত ক্ষোটক ২ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ স্ফীত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ দীর্ঘ সময় অতীত হইয়া যাইলে ক্ষোটকে কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ (যেমন সমভাগ তারপিন ও টিংচার আইওডিন) অনুপ্রবেশিত করাইয়া দেন। ফলে ক্ষোটক পাকিয়া উঠে, তখন সাধারণ ফোঁড়ার ন্যায় ইহার চিকিৎসা হইতে পারে। এই জাতীয় ক্ষোটককে ইংরাজীতে cold abscess বলে।

আরও এক প্রকার ক্ষোটক আছে ইহাকে ইংরাজীতে Serous abscess বলে। এই সমস্ত ক্ষোটকের মুখ অতি শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্ষোটক সমূহের ন্যায় গাঢ় পূয থাকে না। কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই শোণিত বর্ণ জলীয় এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয়। এই সমস্ত ক্ষোটক অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং স্ফীত হইয়া উঠে। ইহার বৃদ্ধির দ্রুততা দেখিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ইহা বুঝি স্বভাবতঃই ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু কখনই ইহা আপনা আপনি ফাটিয়া যায় না। এই সমস্ত ক্ষোটকের সেরূপ মুখ হয় না। এবং অন্যান্য পূয-গর্ভ ক্ষোটকের ন্যায় তত যন্ত্রণাদায়কও নহে। ক্ষোটকটি বেশ পাকিয়া উঠিলে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। এবং তারপিন বা অন্য কোন পচন নিবারক দ্রব্য-সিক্ত বা মিশ্রিত পটির আচ্ছাদন দেওয়া উচিত। এই সমস্ত ক্ষোটক যদ্যপি অস্ত্রোপচারের পর কোনরূপ পচন নিবারক পটীর দ্বারা আবৃত করা না থাকে এবং প্রতিদিন রীতি মত

ধৌত না করা হয়, তাহা হইলে ক্ষতের উপরিভাগ জুড়িয়া নূতন চর্ম্ম উৎপাদিত হয়, কিন্তু ভিতরে ঘা থাকিয়া যায় এরূপ অবস্থায় পুনরায় সেই স্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। সেই জন্য এই সমস্ত স্ফোটকে অস্ত্রোপচার করার পর যতদিন ক্ষত লাল এবং দানাকার হইয়া না উঠে ততদিন নানা উপায় অবলম্বনে ইহার মুখ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা কর্ত্তব্য। গবাদি পশুর এইরূপ স্ফোটক প্রায়ই হইয়া থাকে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বর্ত্তমান সময়ের দশটী প্রধান আবিষ্কার।

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে দশটী কার্য্যে ব্যবহার করিয়া জন সাধারণের উপকার হইতেছে বা উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, নিম্নলিখিত কয়েকটী অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে তাহাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

১। বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ড।

পরিমিত ব্যয়ে এই বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ড দ্বারা আমরা উচ্চ শ্রেণীর লৌহ প্রস্তুত করিতে পারি। ভাল রেলের লাইন (rails) ও অন্যান্য বস্তু নির্ম্মাণ করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। অপকৃষ্ট রেল হইতেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প (Arc lamp) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা প্রজ্জ্বলন করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বিত হয়, আধুনিক বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যখন দুইটী অঙ্গার দণ্ডের (carbon) ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হয়, তখন অঙ্গার দুইটী যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানটা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ প্রখর আলোকরূপে প্রকাশিত হয়। যে গিরড (Girod) বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডে ইস্পাত নির্ম্মাণ করা হয়, তাহার বিবরণ এইরূপ। বৈদ্যুতিক প্রবাহ একটি Electrode এবং দ্রবীভূত ধাতুর মধ্য দিয়া চালিত হয়। এই দ্রবীভূত ধাতু বৈদ্যুতিক উপায়ে কয়েকটি লৌহ প্রান্তের সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাতে সর্ব্ব সমেত ছয়টী লৌহ দণ্ড থাকে। Electrode এবং দ্রবীভূত ধাতুর মধ্যে একটী আর্ক উৎপন্ন হয়। এই আর্কটী ধাতুকে উত্তপ্ত করে এবং ইহাকে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখে। ইস্পাতে যে ফস্ফরাস, গন্ধক ইত্যাদি মল থাকে তাহা ধাতুকে আবদ্ধ করিয়া যে সমস্ত ধাতু-মল থাকে

সেইগুলি দ্বারা ক্রমে ক্রমে শোধিত হয়। Stassano প্রভৃতি অন্যান্য অনেক রকমের বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ড আছে। এগুলিতে কতকগুলি আর্ক সন্নিবিষ্ট থাকে। Girod অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় আজকাল Heroult অগ্নিকুণ্ডও নির্ম্মল ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। Rochling-Rodenhauser অগ্নিকুণ্ড—Induction typeএর অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। দুইটী লৌহের কোরের (core) চতুর্দ্দিক দিয়া একটী alternate তড়িৎ প্রবাহ চালিত হয়। এই লৌহের দণ্ড দুইটী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে এরূপ ভাবে আছে যে, যে লৌহটীকে নির্ম্মল করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে কোনও রকমে লাগিয়া থাকিবে না। সে ধাতুটী এই দণ্ডের চতুর্দ্দিকে বাঙ্গালা চারের (৪) মতন হইয়া যায়। যখন এই দণ্ডের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ চালিত হয়, তখন এই তড়িৎ প্রবাহ ধাতুটীর উপর আর একটী তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং ধাতুটীর যতটুকু উত্তাপ আবশ্যক হয়, এই প্রবাহই ইহাকে ততটুকু উত্তপ্ত করে। আর এক প্রকার অগ্নিকুণ্ড আছে, ইহাতে তড়িৎ প্রবাহ, একটী অঙ্গার দণ্ড resistorএর ভিতর দিয়া চালিত হয়। এই অঙ্গারসারই ধাতুটীকে উত্তপ্ত করে। এই রকমের অগ্নিকুণ্ডকে Acheson typeএর অগ্নিকুণ্ড বলে। এই সকল বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ড হইতে ইস্পাত, calcium carbide; carborundum প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু উৎপাদিত হয়।

২। শুভ্রালোক ব্যাম্প।

আজকাল বৈদ্যুতিক শুভ্রালোক (incandesent) ল্যাম্প নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোককে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, অন্য কোন আলোককে সেরূপ করা যায় না। Thomas A. Edison কৃত অঙ্গার সূত্রের আলোক সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু Edison সাহেব এই আলোক আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার আলোকের সহিত ব্যবহৃত হইবার জন্য কতকগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার আলোক উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে Tungsten সূত্রের আলোক ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধাতু দ্রবীভূত করিতে হইলে অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হয়, প্রায় ৩,০০০ ডিগ্রি ফারেনহিট্ উত্তাপ আবশ্যক। ন্যূনাধিক দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ধাতুটীকে সকলেই অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া জানিত, কিন্তু আজ কাল, General Electric Companyর শিল্পশালায়, এই ধাতুটীকে অতিশয় টানিয়া সূক্ষ্ম তন্তুবৎ দীর্ঘ করা হইতেছে। এক্ষণে এই ধাতুকে টানিয়া সূক্ষ্ম তার করিয়া বায়ুশূন্য গর্ভ কাচকন্দে সন্নিবেশিত হইয়া ল্যাম্প প্রস্তুত হইতেছে। অঙ্গার সূত্র হইতে যে ল্যাম্প নির্ম্মিত হয়, তাহাতে যে পরিমাণে তড়িৎ ব্যয়িত হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ এই ল্যাম্পে খরচ হয়, এবং ইহার আলোক অঙ্গার সূত্রের আলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তর।

৩। চলন্ত চিত্র।

Thomas A. Edison কেবল যে ল্যাম্প আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি এক প্রকার সঞ্চলনশীল চিত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারটী অতীব হিতকর, কারণ ইহা সুলভ এবং অনেক শিক্ষাপ্রদায়ক কার্য্যের ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সঞ্চালিত চিত্র উপাদান প্রণালী আলোক চিত্রণের কার্য্যের অনুরূপ ইহার ফিলম দীর্ঘ, একটি ড্রামে গুটান থাকে, এবং এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে, ফিলম্ ড্রাম হইতে খুলিতে আরম্ভ হইলে আলোক চিত্র যন্ত্রের মুখ ঘন ঘন খোলা ও বন্ধ হইতে থাকে। এই ফিলম নেগেটিভ; পরে অনুরূপ দীর্ঘ ফিল্‌মে সাধারণ উপায়ে positive করিয়া লওয়া হয়।

সাধারণ আলোকচিত্রণের ফিলমে যেরূপ ভাবে চিত্র গ্রহণ করা হয় সেইরূপে এগুলিরও কার্য্য শেষ করিয়া সঞ্চালিত চিত্রাগারে প্রেরিত হয়। তথায় ইহা একটী তীক্ষ্ণ আলোক বিশিষ্ট আর্ক ল্যাম্পের সম্মুখ দিয়া, চিত্র উঠাইবার সময় যেরূপ বেগে চালান হইয়াছিল, সেইরূপ বেগে চালিত হয়। চিত্র উঠাইবার সময় যেরূপ বেগে চালিত হয় সময়ে সময়ে তদপেক্ষা বেগে চালিত হয়। পর্দ্দার উপর দর্শনার্থে যখন ছবিটী প্রক্ষিপ্ত হয় তখন একটীর পর আর একটী করিয়া চিত্র আবির্ভূত হয়। পর্দ্দার উপর দুইটী ছবি আবির্ভূত হইবার মধ্যে কিঞ্চিৎ সময় আবশ্যক। কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট বেগের অধিক হইলে দুইটী চিত্র আবির্ভূত হওয়ার ব্যবহিত সময়টুকু আমরা বুঝিতে পারি না। অবশেষে এই মনে হয় যে, যে ছবিটী পতিত হইয়াছে তাহাতে বস্তুগুলি ও মনুষ্যগুলি নড়িতেছে।

৪। ফনোগ্রাফ।

Thomas A. Edison ফনোগ্রাফ নামক একটী কল আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন এই কলটী প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, তখন ইহার যেমন মর্য্যাদা ছিল, এখন আর সেরূপ মর্য্যাদা নাই। কোনও প্রতিবেশী এখন যদি অনবরতঃ ফনোগ্রাফ বাজাইতে থাকেন অবশ্য আমরা বিরক্ত হই, তথাপি, ইহা দ্বারা আমরা সাময়িক গায়কগণের গলা record করিয়া রাখিতে পারি। ইহার দ্বারা আমাদের পরবর্ত্তী বংশীয়গণ আমাদের সময়ের ভাল ভাল গায়কদিগের গান অনায়াসে শুনিতে পাইতে পারে। অধুনিক সঞ্চালিত চিত্র যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই ফনোগ্রাফও যখন সেইরূপ উন্নতি লাভ করিবে এবং যখন সঞ্চালিত চিত্রের সহিত একত্রে ব্যবহারোপযোগী হইবে, তখন ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমোদের বস্তু হইবে। ফনোগ্রাফ কি, তাহা আজকাল সকলেই জানেন। ইহার প্রধান জিনিষ একটি পাতলা পটহ তাহার সহিত একটী পিন

সংযুক্ত থাকে, এই পিন্‌টী একটী মোমের চুঙ্গী বা চাকতীর খাঁজের সহিত চালিত হয়। মনুষ্যের কণ্ঠস্বর বা অন্য কোন শব্দ আসিয়া এই পটহ স্পর্শ করিলে পিন সহ পটহটী সঞ্চালিত হয়, এবং পিনটী যখন খাঁজের উপর দিয়া চালিত হয়, তখন সেই মোমের চুঙ্গী বা চাকতীর উপর চিহ্ন পড়ে। যখন পিন্‌টী এই চিহ্নের উপর দিয়া পুনর্ব্বার চালিত হয়, তখন পূর্ব্বের শব্দগুলিই উচ্চারিত হয়। এই রেকর্ড উঠান হইয়া গেলে মোমে, কিম্বা কঠিন রবারের উপর সেই রেকর্ডের নকল করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়।

৫। তারবিহীন তড়িৎ বার্ত্তাবহ।

১৮৯৯ খৃঃ অঃতে Gugliemo Marconi, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত তারবিহীন তড়িৎ সংবাদ প্রথা স্থাপিত করেন। এই প্রথা যদিও এত কাল কার্য্যগত হইয়াছে, তথাপি, সমুদ্রের উপর কথোপকথন করিবার জন্য, এই আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা মাত্র দুই বৎসর হইল উপলব্ধ হইতেছে। আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ বৃহৎ জাহাজে এই তারবিহীন তড়িৎ সংবাদের যন্ত্র আছে। যখন তারবিহীন তড়িৎ বার্ত্তাবহ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে তখন আধুনিক তড়িৎ সংবাদ প্রেরণের যে প্রথা আছে, তাহা অপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতর উপকার হইবে! আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে এই প্রথাটীকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে পারি। ইহাতে একটি induction coil আছে, তাহার ভিতরদেশে একটী প্রাইমারি কয়েল আছে, এইটী এমন একটী যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত, যে যন্ত্রটীর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ চালিত হইলে, তাহা ঘন ঘন প্রতিরুদ্ধ ও সঞ্চালিত হয়।

প্রথমে যে তার জড়ান থাকে, তাহার উপর আর একটী সূক্ষ্ম তার জড়ান হয়, এবং দুইটী গোলকের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই coilটীকে secondary coil বলা হয়। প্রথম কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ অতি ঘন ঘন অবরুদ্ধ হইলে secondary কুণ্ডলীতে এবং পিত্তলের দণ্ড দ্বারা উপরোক্ত উক্ত দুইটী গোলকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে তড়িৎ প্রবাহ চালিত হয়। এই পিত্তলের দণ্ড দুইটীর মধ্যে ব্যবধান থাকে। যখন তড়িৎ charge একটী নির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রাপ্ত হয় তখন পিত্তলের দণ্ড দুইটির মধ্যবর্ত্তী ব্যবহিত স্থানে একটি তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যায়। দুইটি গোলকে যে বৈদ্যুতিক charge হয় তাহা দুই রকমের, এবং এই তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ এই chargeএর পথের ন্যায় কার্য্য করে, এই দুইটী তড়িৎ একত্রীভূত হইয়া পরস্পরে মিশ্রিত হয়। এইরূপে মিশ্রিত ও একত্রীভূত হইবার সময় একটী দ্রুত কম্পন আরম্ভ হয়, এবং ইহাই কোন একটি গোলকে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার বেগ কম করিয়া দেয়। যখন এই কম্পন আরম্ভ হয়, তখন, যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী যে কোন ধাতুময় বস্তু এই তড়িৎ

স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত স্বরিত আন্দোলন, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এবং এইগুলি ইথরের ভিতর দিয়া চালিত হয়। কতকগুলি তার secondary কুণ্ডলীর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সমস্ত তরঙ্গ এক শুষ্ক তারের দ্বারা সংগৃহীত হয়, এবং এই তারগুলি একটী cohererএর সহিত সংযুক্ত। এই coherer একটী নল, ইহা রৌপ্য চূর্ণে পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল তরঙ্গের শক্তিতে এই সমস্ত রৌপ্য চূর্ণ সংলগ্ন হয় এবং ব্যাটারীর তড়িৎ প্রবাহ চালনের নিমিত্ত একটী পথ হয়। এই প্রবাহ একটী তড়িৎ বার্ত্তাবহের যন্ত্রকে কার্য্যক্ষম করে, এবং প্রেরিত স্থানে তড়িৎ বার্ত্তাবহের যন্ত্রের সহিত সমভাবে শব্দ করে।

রেডিয়াম।

১৮৯৮ খৃঃ অঃ প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্যাবিদ কুরী মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী কুরী পিচব্লেণ্ড নামক অপরিষ্কৃত ধাতু তাল হইতে তীক্ষ্ণ রশ্মি বিশিষ্ট একটী পদার্থ পাইয়াছিলেন, এবং তিনি ইহাকে রেডিয়াম নাম দিলেন। এই নূতন মৌলিক পদার্থটীকে পৃথক করা অতি কষ্ট সাধ্য ছিল। Barium নামক মৌলিক পদার্থের সহিত যত রকম রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে, সে সমস্তগুলির সহিত রেডিয়ামের সংস্রব আছে। যখন একটী দ্রাবণ হইতে Barium sulphateকে Barium রূপে অধঃস্থ করা হয়, কিম্বা যখন অধিক পরিমাণে সুরাসার আছে এরূপ দ্রাবণে Barium chlorideকে অধঃস্থ করা যায়, তখন রেডিয়ামের যৌগিকও বেরিয়ামের সহিত অধঃস্থ হয়। পরিশেষে ইহা জানা গেল যে, সুরাসার দ্রাবণে যখন Barium chlorideএর অধিকাংশ পৃথক করা হয়, এবং এই অংশটুকু দ্রবীভূত করিয়া, পূর্ব্বের মত পুনরায় পৃথক করা হয় তখন রেডিয়াম concentrate হইয়া যায়। এই প্রথাকে fractional piecipitation বলা হয়। যতঃক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ একটী অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হওয়া না যায় যে, যে সময়ে দ্রাবণটীতে বেশী পরিমাণে রেডিয়াম থাকিবে, ততঃক্ষণ এই প্রথানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। খনিজ রেডিয়াম হইতে রেডিয়ামকে পৃথক করিবার জন্য যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। কয়েক গ্রেণ রেডিয়াম পাইবার নিমিত্ত বহু টন্ খনিজ রেডিয়াম এই যন্ত্রে ঢালিতে হয়।

তেজ প্রস্রবণ্মী নির্গত হওয়াই এই নতুন মৌলিক পদার্থের একটী প্রধান গুণ এবং এই কারণেই ইহার এত আদর। এই রশ্মিগুলি ধাতু বিদীর্ণ করিতে পারে, আলোক চিত্রণের প্লেটের উপর ক্রিয়া করে। এবং অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চতুর্দ্দিকস্থ সামগ্রীর উপর ক্ষণস্থায়ী radio-activity উৎপন্ন করে। চিকিৎসায় রেডিয়াম কার্য্য প্রদায়ক হইতেছে, অধিক পরিমাণে রেডিয়াম পাইলে আরও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ লাল সরকার।

বিজ্ঞানের চক্ষে রন্ধন

রন্ধন সভ্যতার চিহ্ন। যে জাতি যত সভ্য তাহার রন্ধন প্রনালীও তত জটিল। রন্ধন বিজ্ঞানের একটী অংশ ; বৈজ্ঞানিক হিসাবে রন্ধনে আমরা সাধারণতঃ তিনটি উপকার পাই।

সর্ব্বপ্রধান উপকার এই, খাদ্যে যত প্রকার অনিষ্টকর বীজাণু থাকে তাহা উত্তাপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাজেই সংক্রামতার ভয় দূর হয়। অনেক সময় খাদ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জীবও থাকে, যেমন Tapeworms, trichinæ, ইত্যাদি। উত্তাপে ইহারাও বিনষ্ট হয়। অনেকে শুনিয়াছেন যে সাঁওতাল, ছোটনাগপুর অঞ্চলে অসভ্য লোক সাপ আহার করিয়া থাকে।

আমরা সকলেই জানি যে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর কোষাত্বক্ (cellulose) আছে। দেহতত্ত্ব বিদগণ বলেন যে কোষাত্বক্ একেবারে অপরিপাচ্য (undigestible) ; রন্ধনের ফলে কোষাত্বক্ অনেক অংশে খুলিয়া যায় কাজেই লালা পাচকরসাদি অতি সহজেই এই সমস্ত কোষের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে ; একারণে অতি সহজে হজম হইয়া থাকে। কাঁচা ফল মূলাদি আহার করিলে অনেক সময় পেট কামড়াইয়া থাকে এবিষয় সকলেই অল্প বিস্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার কারণ যে অপাচ্য কোষাত্বক অন্ত্রকে অত্যাধিক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া থাকে ফলে আন্ত্রিক প্রবাহ (peristalsis) ও অত্যাধিক পরিমাণে চলিতে থাকে। অনেক সময় এই কারণে পেটের পীড়া হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রন্ধনে অর্থাৎ সিদ্ধ করিলে কোষত্বক্ ফাটিয়া যায় এই কারণে খাদ্য সহজে পাচ্য হয়।

তৃতীয় কথা এই যে প্রাণিজ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অদ্রবণীয় ও অপাচ্য collagen আছে। রন্ধনে এই অদ্রবণীয় collagen দ্রবণীয় gelatinএ পরিণত হয়। তাহা ছাড়া মাংসের বন্ধন অনেকটা শিথিল হয় কাজেই পরিপাকরসাদি অতি সহজেই ইহাদের উপর নিজের কার্য্য চালাইয়া থাকে একারণে সহজে হজম হয়। মাংসাদি সম্বন্ধে আরও একটা কথা এই যে মৃত্যুজনিত আড়ষ্টভাব (Rigor mortis) নষ্ট না হইলে মাংস রন্ধন শ্রেয় নহে।

পাশ্চাত্য দেশে দুই প্রকার রন্ধন প্রচলিত আছে Roasting বা ঝলসান ও boiling বা সিদ্ধ করণ। কিন্তু আমাদের দেশে এই শেষোক্ত প্রথাই অধিক পরিমাণে প্রচলিত। দেহতত্ত্ববিদগণ বলেন যে Roastingই মাংস জাতীয় খাদ্য রন্ধনের প্রকৃষ্ট উপায়। তাহারা বলেন যে roasting দ্বারা মাংসের উপর অদ্রবণীয় অন্নসারের

আচ্ছাদন পড়ে, ফলে আভ্যন্তরিক রস অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া সিদ্ধ করিলে সহজ পাচ্য অন্নসার দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। এই কারণেই অনেকে কাঁচা বা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্বাদি আহারের উপদেশ দিয়া থাকেন।

খাদ্যকে সুস্বাদু করা রন্ধনের আর একটি কার্য্য। খাদ্য সুস্বাদু না হইলে সহজে লালা পাচকরসাদি নিঃসৃত হয় না। অনেকে জানেন যে সুপাচ্য খাদ্যের দর্শনে বা ঘ্রাণে মুখে "জল" আসে। এই "জল" লালা ছাড়া আর কিছুই নহে। খাদ্যের দর্শনে বা ঘ্রাণে পাচকরসও নিঃসৃত হইয়া থাকে ইহাই দেহতত্ত্ববিদের মত। এই রস নিঃসারণকে Psychical secretion বলা হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ খাদ্যের সারাংশকে vitamines বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সারাংশ বা vitamines সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে এই vitamines একটি কাল্পনিক বা ভৌতিক বস্তু ইহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। আবার কাহারও কাহারও মতে vitamine খাদ্যের vital part বা মর্ম্ম স্থান। Leonard Hill জগত বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ বলেন যে vitamine এর উপাদান সম্বন্ধে আমরা সকলেই এক প্রকার অজ্ঞ। তবে ইহা সমস্ত খাদ্যেই অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান। খাদ্যে ইহার অস্তিত্ব অতি প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত দৈহিক উন্নতি ও পুষ্টি অসম্ভব।

চাউল, গম প্রভৃতি "মাজিবার" সময় vitamines নষ্ট হইয়া যায়। বেরীবেরী রোগের কারণ নির্ণয়ের সময় এই vitamines সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। Hill প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, vitamines জলে দ্রবণীয় কাজেই সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে ইহা খাদ্য হইতে চলিয়া যায় একারণে খাদ্য "অন্তঃসার-শূন্য" হইয়া পড়ে। তাঁহারা আরও বলেন যে ১২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ইহাদের স্বধর্ম্ম লোপ পায় এমন কি জলে ফুটাইলেও ইহাদের ধর্ম্মের হ্রাস হয়। আটা বা গমে যে vitamine থাকে তাহা রুটি করিবার সময় নষ্ট হয়। Mooreএর মত যে রন্ধনে vitamines নষ্ট হয় না। Professor Hopkins বলেন যে, দুগ্ধের সহিত রুটি খাইলে খাদ্যের পুষ্টি হিসাবে মূল্য বিশেষ কমে না। Hill, Martin, Klack, Hophins সকলেরই মত যে দুগ্ধ ফুটাইলে ইহার vitamines নষ্ট হয় না। কাজেই দুগ্ধ নিঃসঙ্কোচে ফুটান বা "জাল" দেওয়া যাইতে পারে।

আচার্য্য রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Halliburton বলেন যে vitaminesএর অস্তিত্ব অনেকটা কাল্পনিক। এ সম্বন্ধে তাহার মত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"At present the existance of vitamines is very largely a matter of inference; the inference is doubtless correct but as the research

proceeds it may be necessary to modify the immature views and guesses at present in the air as to the way in which these substances influence growth and nutrition. In order to obtain them it is necessary to work with hundred-weights of the raw material and even then the total weight of the crude product amount only to a few centigrammes."

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক জগতে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, রন্ধনে এই vitaminesএর স্বধর্ম্ম লোপ পায় কিনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১২০ ডিগ্রি উত্তাপে ইহার স্বধর্ম্মের লোপ পায় এবং অনেকক্ষণ ফুটাইলে বা সিদ্ধ করিলে ইহার গুণের হ্রাস হয়। বাস্তবিক vitaminesএর স্বধর্ম্ম যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে ভয়ের কথা, কেন না আমরা সবই ফুটাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া খাই। তাহা ছাড়া আমাদের (বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের) ভাতের "ফেন বা মাড়" বাহির করায় খাদ্য অন্তঃসার শূন্য হয়।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মত যে রন্ধনে খাদ্যের vitamines'এর স্বধর্ম্মের হ্রাস ঘটে। Leonord Hill বলেন যে শ্বেত ময়দার রুটি খাওয়ায় লোক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ময়দাকে শ্বেত করিতে বৃথা অর্থ ব্যয় ও খাদ্য নষ্ট হইয়া থাকে। ধনী ব্যক্তিদের এরূপ ময়দা বা চাউল খাইলে বিশেষ অপকার হয় না। কেন না তাহারা ইহা ছাড়া দুগ্ধ ডিম্ব ও কাঁচা ফল মূলাদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের vitaminesএর অভাব ঘটে না। কিন্তু দরিদ্রের মাজা চাউল বা সাদা আটা কোনও ক্রমেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

এ সম্বন্ধে Halliburton সাহেবের মত যে রন্ধনে খাদ্যের vitaminesএর বিশেষ অনিষ্ট হয় না; তিনি বলেন এই ধারণা অতি ভ্রান্ত "The statement has been made by those who have taken of the subject that very prolonged heating to high temperatures lessens the activity of these essential constituents of food but in ordinary cooking injury to them does not appear to be pronounced" তিনি বলেন যে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আবশ্যকতা কি? অনেকে বলেন যে "মাজা" চাউলে বেরীবেরী হইবার সম্ভাবনা অধিক কিন্তু প্রাচ্যে "মাজা" চাউল ব্যবহার করা সত্ত্বেও বেরীবেরীর প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাড়া আমরা সকলেই জানি যে শিশুগণ "জ্বাল দেওয়া" দুগ্ধ খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে রন্ধনে খাদ্যের সারাংশের কোন কিছুরই হ্রাস হয় না। তিনি বলেন যে হঠাৎ দুই একটা পার্থক্য দেখিয়া কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করা বড়ই অন্যায়। জগতের ঘটনা দেখিয়া এ সমস্ত বিষয় মত প্রকাশ করাই শ্রেয় :—

A much safer guide is the accumulated experience of the past centuries of mankind, which is really a physiological experiment on a vast scale.

কাজেই Halliburtonএর মতে আমরা নির্ব্বিবাদে রন্ধন করিতে পারি।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এনামেল।

আজকাল সকলেই এনামেল কিরূপ তাহা অবগত আছেন। লৌহের পাত্রের উপর কাচের ন্যায় চিক্কণ এবং সুদৃঢ় যে আবরণ থাকে, তাহাই এনামেল। এনামেল প্রস্তুত সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য বুঝিবার পূর্ব্বে এনামেল জিনিষটা কি তাহা জানা আবশ্যক। ইংরাজিতে ইহাকে বোরো-সোডিয়াম-পোটাসিয়াম-আলুমিনিয়াম-সিলিকেট বলে, এবং ইহাতে কোনরূপ ধাতব অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া ইহাকে বিভিন্ন বর্ণের করা হয়। অতএব এনামেল বলিলে এইরূপ বুঝায় যে ইহা এক প্রকার কাচ, এই কাচ অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, এবং বোরেট এবং সিলিকেটের সহিত এক রাসায়নিক যৌগিক উৎপাদন করে। এনামেল প্রথমে বর্ণহীন থাকে কিন্তু ইহা কোনরূপ ধাতব অক্সাইডের সহিত অতি সহজে মিলিত হয় এবং এই অক্সাইডের যেরূপ বর্ণ এনামেলেরও সেই বর্ণ হইয়া যায়।

যে সমস্ত উপাদান লইয়া এনামেল উৎপাদন করিতে হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাদের উপাদান সর্ব্ব সময়ে একরূপ থাকাও একান্ত আবশ্যক। যদি সন্দেহ হয় যে পদার্থগুলির উপাদান যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে, তাহা হইলে তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা উচিত। যে যে সমস্ত পদার্থ মিলাইয়া এনামেল উৎপাদিত হয়, সেই সেই মসলার পরিমাণের কমবেশ বা অন্য কোন নূতন পদার্থের সন্নিবেশ ইত্যাদির উপরেই এনামেলের নূতনত্ব ও উৎকর্ষ নির্ভর করে, এই সমস্ত উপাদানের মিশ্রণ ও পরিমাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও রীতিমত এবং নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। যে লোক উৎকৃষ্ট পদ্ধতির ওজন প্রণালী অবগত আছে, তাহার হস্তেই উপাদান মাপিয়া দিবার ভার অর্পণ করা উচিত। সাধারণতঃ উপাদানগুলি ওজন করিয়া পৃথক পৃথক পাত্রে রক্ষিত হয়। এই সমস্ত পাত্রের গাত্রে নম্বর দেওয়া থাকে। অতঃপর ইহাদিগকে রীতিমত মিশ্রিত করা আবশ্যক। সুবৃহৎ ন্যায়

খানায় মিশ্রিত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় কোদালী বা শভেলের সাহায্যে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

রীতিমত ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলে এই সমস্ত উপাদানগুলিকে চুল্লিতে লইয়া যাওয়া হয়। অগ্নির উত্তাপে এগুলি দ্রবীভূত হইয়া কাচের ন্যায় হয়। যাঁহারা রট আবরণ প্রস্তুত করিবার চুল্লী দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ চুল্লীতে এনামেলের উপাদান গলাইতে হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। চুল্লীর সম্মুখ প্রান্তে ঝাঁঝরীর উপর কয়লা রাখিতে হয় এই কয়লার উপর দিয়া প্রজ্জলিত গ্যাস চুল্লীর ছাদ স্পর্শ করে এবং তথা হইতে বক্র হইয়া এনামেলের উপাদানের উপর পতিত হয়। এইরূপে উত্তাপ প্রযুক্ত হইলে এনামেলের উপাদানে পরে পরে যে সমস্ত পরিবর্তন হয় তাহা লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়, সোহাগায় যে জল রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে মিলিত থাকে, তাহা নির্গত হইয়া যায় কাজেই উপাদান মণ্ড স্ফীত হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে মণ্ডটি গলিতে থাকে। যদি উপাদানগুলি বিশুদ্ধ থাকে, উত্তাপে দ্রবীভূত হইবার সময় বেশ সাবধানতার সহিত মণ্ডটিতে নাড়া চাড়া করা হয়, এবং চুল্লীর উত্তাপ উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মণ্ডটি দ্রবীভূত হইয়া স্বচ্ছ কাচের আকার ধারণ করে। ইহাতে কোনরূপ খিচ থাকেনা বা ইহার মধ্যে অদ্রবীভূত কোন পদার্থই রহিয়া যায় না। যখন মণ্ড এইরূপে নির্দোষ দ্রবীভূত কাচ হইয়া যায়, তখন চুল্লী নির্ব্বাপিত করিয়া তরলীকৃত গ্যাস জলের উপর চালিত করিয়া সেই জলকে অত্যধিক শীতল করিয়া তাহাতে এই উত্তপ্ত দ্রবীভূত কাচ ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপে শীতলতা সংস্পর্শে কাচ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই বিচূর্ণ দানাদার কাচকে "ফ্রিট" বলে।

অতঃপর এই ফ্রিটকে চূর্ণ করা আবশ্যক। ইহাকে একবারে অতি সূক্ষ্ম ধূলির ন্যায় করা উচিত। যে ধাতব পাত্রে এনামেল করিতে হইবে তাহার গাত্রে ফ্রিট চূর্ণ লাগাইয়া দিতে হয়। যে জাঁতায় ফ্রিট চূর্ণ করা হয়, তাহা সাধারণ পেবলের জাঁতা। কিন্তু এই পেবল্ অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন। কাষ্ট্ আয়রণের উপর এনামেলের কারখানায় দুইটি প্রণালী অবলম্বিত হয়, একটি জলসিক্ত একটি বিশুষ্ক। কিন্তু, ইস্পাতের চাদরে কেবল মাত্র জলসিক্ত প্রণালীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাষ্ট্ আয়রণে ব্যবহারের জন্য ফ্রিটকে শুষ্ক অবস্থায় চূর্ণ করিতে হয়। এই শুষ্ক চূর্ণ ফ্রিট অতঃপর উত্তপ্ত কাষ্ট্ আয়রণে ছড়াইয়া দিতে হয়। জল সিক্ত প্রণালীতে শতকরা কিয়দংশ হোয়াইট্ ক্লে (white clay) ফ্রিটের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরিশ্রুত জল প্রয়োগ করিয়া জাঁতায় দিতে হয়। এনামেল নানা বর্ণ রঞ্জিত উজ্জ্বল ইত্যাদি করিতে হইলে এই সময়ে তাহাতে অন্য নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত করা প্রয়োজন হয়। রন্ধনের জন্য যে সমস্ত শাদা এনামেলের পাত্র

ব্যবহৃত হয়, তাহার ফ্রিট চূর্ণ করিবার সময় জাঁতায় টিন অক্সাইড মিশ্রিত করিতে হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ফ্রিট ধূলিবৎ সূক্ষ্ম চূর্ণ হওয়া উচিত। জলসিক্ত ফ্রিটে হোয়াইট ক্লে প্রয়োগ করিতে হয়, ইহার কারণ এই যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিবৎ ফ্রিট চূর্ণ ভাসমান হোয়াইট ক্লের গাত্রে লাগিয়া ভাসিয়া থাকে।

যে পদার্থে (লৌহ ইত্যাদি) এনামেল করিতে হয় তাহার বিশুদ্ধতা নিতান্ত প্রয়োজন। কাষ্ট আয়রণের কোন পদার্থে এনামেল করিতে হইলে যেরূপ আকৃতির কাষ্ট আয়রণ পাওয়া যাইবে তাহাতেই এনামেল করা সম্ভব। রন্ধন পাত্রগুলি সাধারণতঃ পিটিয়া বা ছাঁচে ঢালিয়া বা সামান্য কুঁদিয়া প্রস্তত করা হয়। অধিকতর গুরু ভার বিশিষ্ট পাত্রগুলিকে সাধারণতঃ ঝালিয়া বা দুইটি পাতকে রিভেট্ করিয়া গাঁথিয়া প্রস্তুত করা হয়। কেটলী ইত্যাদি এইরূপেই নির্ম্মিত হয়। যে ইস্পাত পাত্রে এনামেল করিতে হয়, তাহার লৌহের রাসায়নিক উপাদান নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজনীয়। ইস্পাতে লৌহ ব্যতীত নিম্নলিখিত পদার্থগুলি এইরূপ থাকা প্রয়োজনীয়।

গন্ধক	০·০৪০	অপেক্ষাও অল্পতর
ফস্‌ফরাস্	০·০৩০	„ „
ম্যাঙ্গানীজ	০.৪০	(প্রায়)
সিলিকন	০.০১০	„
অঙ্গার	০·১০	„

এনামেলের ইস্পাতের যেন গঠনে কোনরূপ দোষ না থাকে। অত্যন্ত গুরুভার পাত্রগুলির স্থূলতা $\frac{৩}{১৬}$ ইঞ্চ হইতে $\frac{৩}{৮}$ ইঃ হওয়াই উচিত। সাধারণতঃ দুই উপায়ে এনামেল করা হয়। প্রথমতঃ যে পাত্রটিকে এনামেল করিতে হইবে, তাহার এক একটি অংশ গ্রহণ করিয়া সেই সেই অংশে এনামেল করিয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রত্যেক অংশের চতুর্দ্দিকে কিয়দংশ "কানা" বাহির হইয়া থাকে। যখন সমস্ত অংশগুলি এনামেল করা হইয়া যায়, তখন বিভিন্ন অংশের কানাগুলি জুড়িয়া দিলেই চলে। কিন্তু এরূপে এনামেল করার পরিবর্ত্তে সমস্ত পাত্রটিকে একবারে এনামেল করাই সাধারণ নিয়ম। এরূপ স্থলে প্রথমে পাত্রের বিভিন্ন অংশে ঝালিয়া ফেলা আবশ্যক। অতঃপর সংযুক্ত স্থল উকা দিয়া এরূপ ভাবে ঘসিয়া ফেলিতে হয় যেন সমগ্র পাত্র বেশ মসৃণ হয়। পাত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিশূন্য করা আবশ্যক। সর্ব্বশেষে স্যাণ্ড ব্লাষ্ট (Sand blast) দিয়া ধাতব পাত্রটিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে পাত্রটি এনামেল করার উপযোগী হয়।

পূর্ব্বেই এনামেলের ফ্রিট সাধারণতঃ কি কি দুইটি উপায় অবলম্বনে নির্ম্মিত হয় তাহা উক্ত হইয়াছে। এই এনামেলকে পাত্রস্থ করিবার তিনটি বিভিন্ন প্রথা রহিয়াছে।

(১) যদি টুকরা টুকরা ইস্পাত হয়, তাহা হইলে টুকরাগুলিকে নিমজ্জিত করিয়া লইতে হয়। যে প্রয়োজনাতিরিক্ত এনামেল লাগিয়া থাকে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিলেই অপসারিত হয়। (২) এনামেল, পাত্রের গাত্রে ঢালিয়া দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। (৩) কমপ্রেসড এয়ার (compressed air) সাহায্যে পাত্রের গাত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। এই প্রথাই সাধারণতঃ অবলম্বিত হইয়া এনেমেলকে থাকে।

অতঃপর এমামেল সংযুক্ত পাত্রকে চুল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই চুল্লীর গঠন নানাবিধ। একরূপ চুল্লী আছে, তাহাকে মাফল ফারনেশ (muffle furnace) বলে। এই চুল্লী ফায়ার ক্লে (fire clay) নামক একরূপ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই চুল্লী পাথুরিয়া কয়লা, গ্যাস বা যে কোন ইন্ধন প্রয়োগে প্রজ্জলিত করা হয়। এই সমস্ত চুল্লীর উপর আচ্ছাদন থাকে। যে যন্ত্র উত্তপ্ত করিতে হয়, তাহাকে এই আচ্ছাদনের উপর নিয়মমত ও সুবিধামত কোনরূপ দণ্ডের বা অবলম্বের উপর স্থাপন করা হয়। যে সমস্ত চুল্লীতে এরূপ ভাবে আচ্ছাদন থাকে না, সেই সমস্ত চুল্লীর উপরেই উত্তপ্ত করিবার যন্ত্র স্থাপিত হয় এবং তাহারা অপ্রতিহত উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত চুল্লীতে র‍্যাক (rack) থাকে। সামান্য সামান্য কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ আবৃত চুল্লীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি বৃহৎ কারখানা হয় অথবা বৃহৎ বৃহৎ পদার্থ এনামেল করিতে হয়, তাহা হইলে যন্ত্র যাহাতে অপ্রতিহত উত্তাপ পাইতে পারে এরূপ যন্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আচ্ছাদিত চুল্লীর একটা উপকারিতা রহিয়াছে। চুল্লীর উপরে আচ্ছাদন থাকিলে এবং আচ্ছাদনের উপর উত্তপ্ত করিবার যন্ত্র বা পাত্র রক্ষা করিলে, চুল্লীর অভ্যন্তরস্থ ধূলি, ছাই, ইত্যাদি পাত্রের গাত্রে লাগিতে পারে না। অপ্রতিহত উত্তাপ পাইবার চুল্লীতেও এরূপ ভাবে বন্দোবস্ত করা যায়, যে তাহাতেও ধূলি ইত্যাদি উড়িতে পায় না। গ্যাসের চুল্লীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ছোট ছোট পাত্র এনামেল করা অতি সহজ। সাধারণতঃ একটা চিমটায় করিয়া ধরিয়া চুল্লীর উপরে পাত্রটি বসাইয়া দিলেই চলে। কিন্তু কোন এঞ্জিনিয়ারিং বা ঐরূপ কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযোগী জিনিষ পত্রাদিতে এনামেল করিতে হইলে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত জিনিষ শারীরিক শক্তিদ্বারা নাড়াচাড়া করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহাদের কোন কোনটি ৫০।৬০ মণ বা তদপেক্ষা অধিকতর ভারী হইতে পারে। বৃহৎ কারখানার সমস্ত ব্যাপারই বৃহৎ। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কার্য্যই হাতে হয় না। সমস্ত কলে পরিচালিত হইয়া থাকে।

ফ্লিট সংযুক্ত পাত্র এইরূপ নানা উপায়ে নানারূপ চুল্লীর উপর স্থাপন করা হয়। এই চুল্লীর তাপমাত্রা নিয়ম মত হওয়া উচিত। এনামেলের গুণানুসারে তাপমাত্রারও

হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রাবকে নষ্ট হয় না এরূপ অতি উৎকৃষ্ট সিলিকন এনামেলের জন্ত প্রায় ২,৫০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা আবশ্যক। চুল্লীর উপরে পাত্র বসাইয়া দিলে প্রথমে ফ্রিট চূর্ণগুলি গলিতে আরম্ভ করে তখন সমস্ত পাত্র গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে। এবং সমস্ত পাত্রটি কেমন অপরিষ্কার হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেমনই এনামেল পকতা প্রাপ্ত হইতে থাকে অমনই এই অপরিষ্কার ভাব ধীরে ধীরে নষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে উজ্জ্বল এবং চিক্কণ হইলেই পাত্রটিকে চুল্লী হইতে অপসারিত করিতে হয়। কতক্ষণে যে এনামেল ঠিক সম্পূর্ণ ও পক্ক হইবে তাহা স্থির করিয়া বলা দুরূহ। সাধারণতঃ ধাতব পাত্রের স্থূলতা এবং এনামেলের প্রকৃতির উপরেই তাপমাত্রা ও সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত এনামেল করিবার কার্য্য প্রণালী বর্ণিত হইল। অতঃপর কতবার এনামেলের আবরণ দেওয়া আবশ্যক এবং কোন কোন পদার্থের মিশ্রণে এনামেল উৎপাদিত হয়, তাহাই বিবৃত হইবে। সাধারণতঃ দুই প্রকার এনামেল রহিয়াছে। এক প্রকারের নাম 'গ্রাউণ্ড কোট (ground coat) এবং অন্য প্রকারের নাম কভার কোট (cover coat)। ধাতব পাত্রের ধাতব উপরিভাগের অব্যবহিত পরেই যে এনামেলের আবরণ দেওয়া হয়, তাহাই গ্রাউণ্ড কোট। এই গ্রাউণ্ড কোট ইস্পাতকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে। কভার কোট এনামেলের পাত্রের উপরিভাগ। গ্রাউণ্ড কোটে কোনরূপ বর্ণ মিশ্রিত করিবার আবশ্যক হয় না। ইহাতে যে সমস্ত উপাদান থাকে তাহা লৌহকে বেশ রীতিমত ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে মাত্র। সাধারণতঃ যে যে উপাদান মিশ্রিত করিয়া গ্রাউণ্ড কোট উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত কোবাল্ট অক্সাইড (cobalt oxide) মিশ্রিত করিয়া দিলে গ্রাউণ্ড কোট আরও উৎকৃষ্টরূপে লৌহকে কামড়াইয়া ধরে। কোবাল্ট অক্সাইড মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা আজও পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, কেননা তাহার কিরূপ ক্রিয়া হয়, তাহা আজও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। গ্রাউণ্ড কোটের উপাদান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গোলমাল নাই। কভার কোটের সৌন্দর্য্যই এনামেলের উৎকর্ষ সাধক। যেরূপ ইচ্ছা বর্ণে ইহাকে রঞ্জিত করা যাইতে পারে। কিরূপ ভাবে এই সমস্ত রং মিশাইতে হয় তাহা প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। জাঁতাতে ফ্রিট প্রস্তত করিবার সময় রং মিশাইয়া দিতে হয়। যদি এনামেলকে সম্পূর্ণরূপে দ্রাবকের (acid) ক্রিয়ার অক্ষত রাখিতে হয়, তাহা হইলে কভার কোটে কোনরূপ টিন্ অক্সাইড, লৌহ অক্সাইড, লেড অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নহে। এরূপ কোটে, কভার কোটে অধিক পরিমাণে সিলিকেট থাকা উচিত। প্রথমতঃ যে পাত্রটিকে এনামেল করিতে হইবে, তাহাকে রীতিমত উত্তপ্ত করিয়া গ্রাউণ্ড কোট লাগাইয়া দেওয়া হইল। এই বিষয়ে চুল্লীর উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হওয়া আবশ্যক। গ্রাউণ্ড

কোট একবার লাগাইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু দ্রাবকে অক্ষত এরূপ এনামেলের জন্য কভার কোট অন্ততঃ তিনবার লাগান উচিত। অন্যত্র দুইবার লাগাইলেই যথেষ্ট। দ্রাবকে অক্ষত এনামেল বাস্তবিকই বোরোসিলিকন কাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এনামেল করিবার সময় যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা বাস্তবিকই বড় কৌতূহলোদ্দীপক। যাহাহউক এক্ষণে গাঢ় নীল কভার কোটের জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন, তাহাই লিখিত হইল।

ফেলস্পার	১২০ পাউণ্ড
কোয়ার্টজ্	৭২ ,,
সোহাগা	৮০ ,,
ক্রিয়োলিট	৩০ ,,
নিশাদল (saltpeter)	৭ ,,
কোবাল্ট অক্সাইড	৭½ ,,
ম্যাঙ্গানিজ্ অক্সাইড্	১ ,,
মৃত্তিকা	৪ ভাগ শতকরা

এই সমস্ত জিনিষ উত্তপ্ত করিলে ইহাদের ওজন পরিমাণ অত্যন্ত অল্পই হ্রাস পায়। এই সমস্ত উপাদানে যে জলীয় অংশ থাকে তাহাই বাষ্পীভূত হইয়া হ্রাস পায়।

উৎকৃষ্ট শ্বেত বর্ণের এনামেল উৎপাদনের জন্য ফ্রিট'এ টিন্ অক্সাইড মিশ্রিত করিতে হয়। টিন অক্সাইডের মূল্য অত্যন্ত অধিক, ইহার পরিবর্ত্তে অল্প মূল্যবান লেড বা এন্টিমনি অক্সাইড মিশ্রিত করা হয় বটে, কিন্তু টিন মিশ্রিত করিয়া যে শুভ্র বর্ণ উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত তুলনায় অন্য উপাদান জাত শুভ্র বর্ণ অতি অপকৃষ্ট। শ্বেত বর্ণে সমস্ত বর্ণ সমাবিষ্ট রহিয়াছে এবং কৃষ্ণ বর্ণে সমস্ত বর্ণেরই অভাব। এক্ষণে শুভ্র বর্ণের জন্য টিন্ অক্সাইড মিশ্রিত করিলেই চলে, কৃষ্ণ বর্ণের জন্য নানারূপ পদার্থ মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু কোনটিতেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পাওয়া যায় না। কোনটা বাদামী আভাবিশিষ্ট কৃষ্ণ, কোনটা নীলাভ কৃষ্ণ, কোনটা বা রক্তিমাভ কৃষ্ণ হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, কপার, নিকেল ইত্যাদি ধাতুর অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া এনামেল কৃষ্ণ বর্ণ করা হয়। কেহ কেহ বা সমস্তগুলিই মিশ্রিত করেন। যাহাহউক বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও বর্ণ এত গাঢ় হয় যে তাহাকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বলিলেও কোনরূপ অন্যায় হয় না।

সাধারণতঃ এনামেলপাত্রের বহির্দ্দেশের বর্ণ নীল অভ্যন্তর শুভ্র। অভ্যন্তরের জন্য টিন অক্সাইড মিশ্রিত হয় এবং বহির্দ্দেশের জন্য কোবাল্ট ব্যবহৃত হয়। এই কোবাল্ট

ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ব্যবহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গাঢ়তার নীলবর্ণ করা যায়। ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহারে লাল ও বেগুনিয়া বর্ণ উৎপাদিত হয় এবং ইহার সহিত কোবাণ্ট মিশ্রিত করিলে লোহিতাভ নীল বর্ণ হইয়া থাকে।

সবুজ এনামেল ক্রোমিয়াম অথবা তাম্র অক্সাইড ব্যবহারে উৎপাদিত হয়। কোন কোন স্থলে তাম্র এবং কোবাণ্ট অক্সাইড একত্রে ব্যবহৃত হয়।

লোহিত বর্ণ উৎপাদন করিবার জন্য লৌহ অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত টিন অক্সাইড মিশ্রিত করিলে অতি শীঘ্র বর্ণ লাল হয় এবং এনামেলও বেশ সুদৃশ্য অস্বচ্ছ হইয়া উঠে। বাদামী বর্ণের জন্য ফেরাস ক্রমেট এবং হরিদ্রা বর্ণের জন্য ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং ইউরেনিয়ম লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গোলাপী এবং সুদৃশ্য রক্তিম বর্ণের জন্য সুবর্ণ যৌগিক ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গ দেশে বা ভারতে আজকাল নানাবিধ কারখানার সূত্রপাত হইতেছে। অনেক শিক্ষিত যুবক বিদেশে যাইয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এনামেল উৎপাদন করিবার প্রণালী কেহই শিক্ষা করিয়া আসেন নাই। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার এনামেল করা জিনিষ আমদানী হয়। আমাদের দেশে এখন অনেকেরই শিল্প কার্য্যের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। দেশের জননায়কগণ ও ধনাঢ্যগণ চেষ্টা করিলে এই অত্যাবশ্যক পদার্থের উৎপাদন এদেশে সম্পাদন করিতে পারেন।

প্রতিদিন এনামেলের আদর বাড়িতেছে। আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান উপাদান অম্ল। অনেক খাদ্য অম্লগুণ সম্পন্ন না হইলেও তাহাতে এমন একটা পদার্থ থাকে, যে তাহার সহিত ধাতব পদার্থের সংস্পর্শ হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং খাদ্য ও পাত্র উভয়ই বিকৃত হয়। কাচ, প্রস্তর ইত্যাদি পদার্থে খাদ্য রক্ষিত হইলে খাদ্য বিকৃত হয় না বটে; কিন্তু এই সমস্ত পাত্রের মূল্য অধিক এবং অত্যন্ত ভঙ্গুর। একমাত্র এনামেল পাত্র ব্যতীত এরূপ সুলভ অথচ সর্ব্ব বিষয়ে নিরাপদ পাত্র পাওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশে লৌহের অভাব নাই। যে সমস্ত উপাদানে এনামেল প্রস্তুত হয় তাহাও সংগ্রহ করা আদৌ দুরূহ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন লোক এনামেল করিবার প্রণালী রীতিমত শিক্ষা করিয়া আসিয়া এ দেশে কারখানা চালাইলে বিশেষ লাভ করিতে পারেন। প্রথমে অবশ্য কিছু মূলধন আবশ্যক হয় বটে; কিন্তু অন্যান্য লাভজনক কারবারে যেরূপ প্রভূত টাকা মূলধন আবশ্যক হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। আমরা এদিকে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

কাগজের অপ্রতুলতা।

কাগজ তিন জাতীয়,—উৎকৃষ্ট অর্থাৎ যে সকল কাগজ লিখিবার বা ছাপাইবার জন্য সচরাচর ব্যবহার হয় না; মধ্যশ্রেণী অর্থাৎ যে, সকল কাগজ, সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র পুস্তক এবং অন্যান্য সকল প্রকার লেখা বা ছাপার কার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ যে সকল কাগজ লেখা বা ছাপার জন্য ব্যবহার হয় না বটে, তবে অন্য কোন দ্রব্য মুড়িবার ও বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সকল প্রকার কাগজেরই "কাটুতি" ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে কিন্তু আজ কাল Rotary Printing Machineএর আবিষ্কার হওয়া অবধি মধ্যশ্রেণীর কাগজের "কাটুতি" এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে বাধ্য হইয়া কাগজ ব্যবসায়ীদিগকে বড় বড় কাগজের কল তৈয়ার করিতে হইয়াছে। এই সকল কলে চব্বিশ ঘণ্টায় হাজার মণ দেড় হাজার মণ করিয়া কাগজ তৈয়ার হয়।

এদিকে যেমন বড় বড় কলের সৃষ্টি হইতেছে তেমনি প্রচুর পরিমাণে কাগজের উপাদানেরও প্রয়োজন হইতেছে।

উৎকৃষ্ট কাগজের "কাটুতি" অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু মধ্যশ্রেণী কাগজের মত তত বেশী নয়, সেইজন্য উৎকৃষ্ট কাগজের উপাদানের তত অভাব হয় না; কিন্তু মধ্যশ্রেণী কাগজের "কাটুতি" অত্যন্ত অধিক হওয়ায় উপাদানের জন্য বনের গাছ গাছড়া "উজার" হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন আর যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ পাওয়া যাইবে না তখন কোন বস্তুর দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইবে?—তখন এই সকল বড় বড় কল চলিবে কি প্রকারে?—এই লইয়া কাগজ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এক হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে।

হেন্‌রী মণ্টেসন্ কাগজ ব্যবসায়ীদিগের ভবিষ্যতের এই সমস্যা দূর করিবার মানসে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট শিল্পসংক্রান্ত পুস্তকে এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং বনের গাছ গাছড়া ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত গুটিকতক পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহারা মধ্যশ্রেণী কাগজের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ যে সকল গাছ আপনা আপনিই জন্মাইয়া থাকে, যেমন ঘাস, বাঁশ, শর, উলুখড় প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ব্যবসায়ের পরিত্যক্ত বস্তু—যেমন—ছেঁড়া কাপড়, পাটের ফেঁসো, তুলা, পচা দড়ি প্রভৃতি; কৃষিকর্ম্মের পরিত্যক্ত বস্তু যেমন, ধান, গম, যব প্রভৃতি ফসলের খড়, আকের ছিবড়া প্রভৃতি এই সকল দ্রব্য এবং

পরীক্ষা করিয়া কাগজ প্রস্তুত বিষয়ে তাহাদের বিশেষ উপযোগীতা নির্দ্দেশ করতঃ হেনরী মণ্টেসার কাগজ ব্যবসায়িদিগের ভবিষ্যতের চিন্তা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন।

বিবিধ।

বিলাতি মদ্য।—গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১,৬৩,৮৬,৭৬৫ টাকা মূল্যের বিলাতি মদ্য আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮৬৪৮৯৭৫ টাকার বিলাতি মদের আমদানী হয়। সম্মিলনী।

নূতন কুষ্ঠাশ্রম।—গয়াতে সম্প্রতি একটী নূতন কুষ্ঠাশ্রম খোলা হইয়াছে। মাননীয় কমিশনার বাহাদুর গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে ইহার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এই নব নির্ম্মিত আশ্রম "সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল এসাইলাম ফর লেপার এ্যাট গয়া" এই নামে অভিহিত হইবে। সম্মিলনী।

প্রস্তরে পদরেখা।—দিল্লীর পুরাতন অস্ত্রাগারের নিকট পাহাড় ভাঙ্গা হইতেছে। এই পাহাড়ের এক স্থানে, ওয়াজিরাবাদ রোডে পাহাড়ের গায়ে এক পদরেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে বত্রিশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে দশ ইঞ্চি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কি রায়ের অনুমান,—এই পদরেখা পাণ্ডব রাজত্বকালের। দিল্লীর চিফ-কামিশনর ইহা দেখিয়া, এই রেখাঙ্কিত স্থানের চতুর্দ্দিকে রেলিং দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লালা শিওপ্রসাদ সি-আই-ই রেলিং দিবার তাবৎ ব্যয় প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্মিলনী।

পৃথিবীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা।—পৃথিবীতে ২৫ লক্ষ মোটর গাড়ী আছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রত্যেক গাড়িখানির জন্য ৫ গজ করিয়া স্থান গড়ে ধরিলে এই

গাড়ীগুলি একত্র করিলে ৭২০০ মাইল লম্বা মিছিল হইতে পারে এবং সমগ্র ইউরোপে তিন্‌সেণ্ট অন্তরীপ হইতে রুশিয়ার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত দোহারা করিয়া সাজান যাইতে পারে। এই শকটশ্রেণী এক ঘণ্টার মধ্যে ৫০ লক্ষ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির ২০০০ গুণ ভ্রমণ করিতে পারে। সম্মিলনী।

কৃষি কলেজ।—এলাহাবাদের ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের পশ্চিমে যমুনা নদীর দক্ষিণে পুলের নিকট এক কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য প্রায় ১৬০ বিঘা জমি ক্রয় করিতেছেন। খৃষ্টানদিগের পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সঞ্জীবনী।

চা ও চুরুট।—ইংরেজ বিশেষতঃ বিলাত ফেরতদের অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালীরা চা ও চুরুট খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার কোনটাই শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয়, বরং দেহের অনিষ্টকর তবু বাঙ্গালীরা ঘরের পয়সা খরচ করিয়া এই দুই অহিতকর পদার্থ ব্যবহার করিতেছেন। চা বালকদের পক্ষে বিষবৎ তবু অনেক পিতা মাতা আদর করিয়া সন্তানদিগকে তাহা পান করাইতেছেন। কোন পিতা মাতা সন্তানকে চুরুট খাইতে দেননা বটে কিন্তু পিতার কুদৃষ্টান্তে বালকেরা গোপনে ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়া শরীরের অনিষ্ট করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালী স্বদেশের প্রাচীন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে চা ও চুরুট সেবন করিয়া বিদেশী অনিষ্টকর প্রথা এদেশে প্রচলনের সহায়তা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে এমন এক দল লোক দেখিতে চাই যাঁহারা শরীর রক্ষা ও অপব্যয় নিবারণের জন্য চা ও চুরুটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সঞ্জীবনী।

গয়া জেলায় রেডিয়াম।—গয়া জেলার অন্তর্গত সিঙ্গর জমিদারীর এলাকাভুক্ত ভালেখাপ গ্রামের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বদিকে আবরাখি নামক এক গণ্ডশৈল বিদ্যমান। কোন ইংরেজ কোম্পানী এই স্থান ইজারা লইয়া ভূগর্ভ হইতে নানাপ্রকার ধাতু উত্তোলন করিতেছেন। এই স্থানে ৪২ ফিট গর্ত্ত করিয়া প্রায় ১০ মণ পিচব্লেণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই পিচব্লেণ্ড হইতেই প্রসিদ্ধ রেডিয়াম উৎপন্ন হয়। কয়েক রতি রেডিয়াম লক্ষ টাকায় বিক্রয় হয়। এমন মূল্যবান ধাতু গয়া জেলায় ছিল, ইতঃপূর্ব্বে কেহ তাহা জানিত না। ঐ স্থান আরও গর্ত্ত করিলে আরও উৎকৃষ্ট পিচব্লেণ্ড পাওয়া যাইবে।

গত মার্চ্চ মাসে ঐ স্থান ইজারা লওয়া হইয়াছে। এই ৩ মাসে আবরাখি পাহাড় ব্যতীত অন্য স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই কিন্তু সিঙ্গর জমিদারীর নানা স্থানে আরও নানারকম ধাতু দেখা গিয়াছে। ইজারাদার গত জমিদারের নিকট হইতে বহু বিস্তৃত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। জানি না তাঁহারা কত রত্নের অধিকারী হইবেন। সঞ্জীবনী।

স্বাস্থ্য সংবাদ।—পৃথিবীর হাস্পাতাল সমূহে যত রোগীর মৃত্যু হয়, তাহাদের মৃত দেহ পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে চিকিৎসকগণ তাহাদের ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের রোগ আদৌ নির্ণয় করিতে পারেন না। মানুষের জ্ঞানের বড়াই ত এই।

কর্ণরোগ।—ফরাসী ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কর্ণরোগ পুরুষের যত বেশী, স্ত্রীলোকের তত নয়। প্রৌঢ়দের ৭ জনের মধ্যে ২ জন এক কাণে কম শুনিতে পায়। ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক হাজার বালক বালিকার মধ্যে শতকরা ৪ জনের কর্ণরোগ দেখা যায়, ৬ জন কাণে কম শোনে। জন্ম হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া আইসে। সঞ্জীবনী।

নূতন রেল লাইন।—সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে লাইন হইতে যমুনা নদী পর্য্যন্ত ৩১২ মাইল দীর্ঘ, রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করিবার জন্য ৩১২ বিঘা জমি ক্রয়ের বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সঞ্জীবনী।

ভারতের রেল লাইনের পরিমাণ।—সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮০০০ মাইল ব্রডগেজ, এবং ১৪০০০ মাইল মিটার গেজ, এবং ৩০০০ মাইল ২ ফিট অথবা আড়াই ফিট প্রশস্ত রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত আছে। সমস্ত রেল লাইনগুলিকে ব্রডগেজে পরিণত করিবার পরামর্শ ও চেষ্টা চলিতেছে। সম্মিলনী।

সর্প বিষের প্রতিষেধক।—বোম্বাএর অন্তর্গত প্যারেল ল্যাবোরেটরীতে সর্পের মুখস্থিত বিষস্থলী হইতে বিষ লইয়া তাহা হইতে ঐ বিষের প্রতিষেধক তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমে কসৌলিতে এইরূপ সর্পের বিষ প্রেরণ করা হইয়াছিল। তথায় উহা হইতে অতি সামান্য মাত্র বিষ লইয়া দু' একটা ঘোটকের গায়ে বিদ্ধ (inject) করা হয়। তাহার পর সময়ক্রমে ঘোটকের গা হইতে রক্ত টানিয়া লওয়া হয়। অতঃপর সেই রক্তকে একটি টিউব বা নলের মধ্যে পুরিয়া উহার ঘনাংশ পৃথক্ করিলে পারিলেই যেটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, সেই টুকুই সর্পবিষের প্রতিষেধক।

ইহা দ্বারা বোম্বাইএ কয়েকজন সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবনরক্ষা হইয়াছে। কোষালা পাহাড়ে সম্প্রতি এক ব্যক্তিকে সর্পে কামড়াইয়াছিল, সে অচেতন হইয়াছিল, দেহ শীতল ও অবশ হইয়া উঠিয়াছিল, এমন অবস্থায় তাহার অঙ্গে এই নূতন প্রতিষেধক ঔষধটী বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কুড়ি মিনিটের মধ্যে লোকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন মালীকে একটা বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছিল, এই প্রতিষেধক ঔষধের দ্বারা সেও বাঁচিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি পারেলের লেবোরেটরীতে সমগ্র ভারতবর্ষে সরবরাহ করিবার উপযোগী এই প্রতিষেধক ঔষধ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। সম্মিলনী।

কলিকাতা, ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ।) ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪। (২য় সংখ্যা।

ভারতবর্ষের চক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

ভারতবর্ষের আধুনিক অবস্থায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই যে উন্নতির পক্ষে যথার্থ অনুকুল হইবে ইহা বোধ করি এক্ষণে সর্ব্ববাদী সম্মত। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বলিতে আমরা যে কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝাইতেছি এমন নহে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বুঝিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক নীতিমূলক শিক্ষা; সে শিক্ষা, পাশ্চাত্যই হউক আর প্রাচ্যই হউক, আমাদের তুল্য আদরণীয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সমাজনীতির আদর্শ ভারতবর্ষের পক্ষে অনুকরণীয় নহে; ইহার এক প্রধান কারণ, ভারতের জাতীয় আদর্শের ভিন্নতা। সমাজ সম্বন্ধে এ মত আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে; তবে জ্ঞান ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে ঐ মতের উপযোগিতা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহার কারণ,—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বৈজ্ঞানিক নীতি কোন জাতিবিশেষের বা দেশবিশেষের নিজস্ব নহে। যাহা বিজ্ঞানসম্মত, তাহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালীন এবং সার্ব্বভৌম সত্য, সুতরাং সকলেরই অপরিহার্য্য। দেশকাল ভেদে যে সামাজিক আদর্শের পার্থক্য ঘটে, এবং সমাজ-তন্ত্রও যে তদনুযায়ী করিয়া গড়িতে হয় ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। তবে, দেখিতে হইবে, যে ভিন্ন দেশ সমূহের সমাজে কি গ্রহণীয় আছে; সে সকল যদি নিজ সমাজের পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না। যদিও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায়শঃই বুঝিতে সক্ষম, তথাপি আমাদের বোধ হয় যে, সাধারণ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট

ধারণা এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই; এবং যাঁহারা বাষ্পীয়যান, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতির আবিষ্কারকেই বৈজ্ঞানিকের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরও বুঝিতে বাকী আছে, বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য কি। অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক কেবল মানবের ঐহিক সুখবৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই। ইঁহাদের বুঝিতে হইবে যে মানবের সুখবর্দ্ধন বৈজ্ঞানিকের একটী গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র; মুখ্য উদ্দেশ্য অতি উচ্চ, অতি প্রশংসনীয়; মুখ্য উদ্দেশ্য, সত্যের আবিষ্কার; সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে বিজ্ঞানচর্চ্চার পরিণাম ঐশীশক্তির পূর্ণ বিকাশ—ইহা অভিমান নয়। এ স্থলে আমাদের আর একটী সুন্দর কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কথাটি এই—ভারতীয় কোন সম্প্রদায়বিশেষ বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব—ভক্তি। সুতরাং ভক্তিমূলক যে প্রণালী, তাহাই আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত মিশিবে; অন্যথা, পরিণাম শুভ হইবে না। ইঁহারা বুঝিয়া দেখিবেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী সত্যের ভিত্তির উপর গঠিত, অতএব, ভক্তিমার্গের কণ্টকস্বরূপ নহে; অহৈতুকী ভক্তি মানবের পক্ষে শুভই হউক আর অশুভই হউক, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসমূহের সহিত উহার বিরোধ হইতে পারে না। অতএব, বুঝা গেল ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কোন অসদ্ভাব নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্যানুসন্ধিৎসাই বৈজ্ঞানিকের পরিচালক; তার্কিক বলিতে পারেন, তোমাদের অনুসৃত পথই যে বিজ্ঞানানুযায়ী, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি না যে আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনই তাহার প্রমাণ; তবে বৈজ্ঞানিক তদনুসৃত পথে গিয়া যে সফলতা পাইতেছেন, তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি সত্যের একটু আভাষ পাইতেছেন; এবং ভ্রম প্রমাদ করিতে করিতে একদিন অবশ্যই প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হইবেন।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কি, এবং প্রচলিত শিক্ষার সহিত ইহার অনৈক্য কোথায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অবৈজ্ঞানিক জ্ঞানে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত জ্ঞানের ভিত্তি কোনও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, এবং উহা এরূপ নীতিসমূহের উপর গঠিত যে, সেই নীতির সাহায্যে নানাবিধ রহস্তের উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে; কিন্তু, দ্বিতীয়োক্ত জ্ঞান সেরূপ কার্য্যের সহায়তা না করিতেও পারে। এই অর্থে জ্ঞানের সকল বিভাগই কতিপয় মূল নীতির উপর সংগঠিত। কি প্রাকৃতিক ঘটনা, কি ঐতিহাসিক ঘটনা, কি মানবচিত্তের জটিল ক্রিয়া, কি সামাজিক পরিবর্ত্তন, সকলই সূক্ষ্ম দার্শনিকের চক্ষে এক অত্যাশ্চর্য্য নিয়মাধীন; আধুনিক জগৎ এখনও প্রকৃতির সকল রহস্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ

হয় নাই; তবে জগতের ঘটনাপ্রবাহ পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ একটী স্থূল ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, বিবিধ বিজ্ঞান বিভাগের এবং দার্শনিক বিভাগের যে সকল মূলতত্ত্ব মানব স্থিরীকৃত করিয়াছেন, সে সকলেই যে প্রকৃত পক্ষে মৌলিক (absolutely original) এরূপ না হওয়াই সম্ভব। হয় ত অনন্ত ঘটনাপ্রবাহ পরিশেষে এমন এক মূলতত্ত্বে গিয়া উপনীত হইবে যাহা অতীব বিস্ময়কর এবং আধুনিক জগতের ধারণার অতীত। কিন্তু, সে কথা যাউক; বিজ্ঞান-নীতির মূল,—পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণ। সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের পার্থক্য এই যে প্রথমটী চিন্তাশূন্য, দ্বিতীয়টী চিন্তাপূর্ণ। কিম্বা সাধারণ পর্য্যবেক্ষক অতি অসম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করেন অথবা যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসত্ত্বেও মানসিক সংস্কার সমূহের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারেন না। স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ না হইলে কোনও রহস্যের প্রকৃত অর্থ বুঝা মানচিত্তের পক্ষে অসম্ভব। ঘটনার মূলভিত্তি বুঝিতে পারিলে তাহার ব্যাখ্যা তখন পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়; এবং সেই ভিত্তির সাহায্যে অন্যান্য অনেক ঘটনার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায়। সুতরাং জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গঠিত হইলে পর প্রাকৃতিক অনেক জটিলতা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া থাকে: এবং এক শ্রেণীর রহস্য লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন শ্রেণীবিশেষের কারণ বাহির করা সুসাধ্য হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করিবার জন্য আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। মনে করুন, আমরা সকলেই শৈশব হইতেই লক্ষ্য করিয়া থাকি যে একটী ভারী পদার্থ হস্তচ্যুত হইলেই পড়িয়া যায়, কিন্তু, ইহার যে আবার একটা কারণ থাকিতে পারে, তাহা কেবল নিউটনের মনেই জাগরূক হইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন পৃথিবীর আকর্ষণই ইহার কারণ; এই নীতির সাহায্যেই সৌরজগতের আশ্চর্য্য গতিসমূহ ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্যাত হইল। একটী পিচ্‌কারীর দণ্ড (piston) টানিলেই জল উঠে;—এইটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কয়জন স্থির করিতে পারেন, হিমালয়ের উচ্চতা কতটা? কিন্তু, বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষক ইহা সহজেই স্থির করিতে পারেন। পিচ্‌কারীর ভিতর জল উঠে ইহার কারণ বায়ুর চাপ, বায়ুর চাপের কারণ বায়ুমণ্ডলের ওজন এবং উচ্চতা, এবং এ কথাটী সহজেই অনুমান করা যায় যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুমণ্ডলীয় চাপের হ্রাস হইতে থাকে; সুতরাং এই চাপের হ্রাস স্থিরীকৃত করিতে পারিলেই, পর্ব্বতের উচ্চতা নির্ণয় করা যাইতে পারে; ইহা সকলেরই অনুমান করা উচিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তি এতদূর চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন না। ইহার প্রধান কারণ নির্ব্বুদ্ধিতা নহে,—প্রধান কারণ মানসিক সংস্কার এবং চিন্তাশক্তির স্বাধীনতার অভাব। আমাদের বিশ্বাস এই স্বাধীনচিন্তার অভাব প্রধানতঃ ভারতবাসীরই প্রকৃত কর্ম্মের ফল। নচেৎ,

পাশ্চাত্যজাতিগণ আমাদের অপেক্ষা এত উন্নত, এত শ্রেষ্ঠ কেন? আমরা স্বীকার করি, পাশ্চাত্য দেশের জলবায়ু, ভৌগলিক পার্থক্য, এবং অন্যান্য কয়েকটী কারণ, তাহাদের উন্নতির পক্ষে বিশেষ আনুকুল্য সাধন করিয়াছে; কিন্তু এইগুলিই একমাত্র কারণ নহে। আমাদের রীতি-নীতি সমূহ, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের প্রকৃতি এরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিল যে, পাশ্চাত্য-সংঘর্ষ না ঘটিলে কয়েক-শতাব্দীর মধ্যেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য এরূপ শোচনীয় ভাবে নষ্ট হইয়া পড়িত যে হয়ত, আমাদের জাতিগত অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইত। এরূপ স্বাতন্ত্র্যাপহারী রীতি-নীতিই বা কি প্রকারে ভারতবর্ষে এত প্রভাব-বিস্তার করিল, তাহা চিন্তা করিলে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস, এ সকলের জন্য আমাদের মধ্যবর্ত্তী যুগের পূর্ব্বপুরুষেরাই প্রধান দায়ী। বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতিই হয়ত, এই স্বাতন্ত্র্যাপহরণের পক্ষে অনুকুল হইয়াছে; এবং পরিণাম এমনই হইয়া উঠিতে ছিল যে, পাশ্চাত্য-সংঘর্ষের ফলে যদি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হইত তাহা হইলে ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িত। আমাদের এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এমন নহে যে পাশ্চাত্য-সংঘর্ষ আমাদের পক্ষে সর্ব্ববিষয়েই শুভ হইয়াছে; তবে, জ্ঞান-সম্বন্ধে যে এ সংঘর্ষ আমাদের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক, জাতীয় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি-নীতি-সমূহের বিষয় আমরা যাহা বলিলাম, তাহা দ্বারা আমরা এরূপ কিছু প্রমাণ করিতে চাহি না যে, আমাদের মনুপ্রমুখ মনস্বিগণ সমাজতত্বে কিম্বা ধর্ম্মতত্বে অপারদর্শী ছিলেন; পরন্তু, আমাদের বিশ্বাস, আর্য্যমনু এবং তাঁহার সমসাময়িক মহাপুরুষগণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিভাগে প্রায় অমানুষী শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদের সমাজতত্বের মৌলিকতা, ধর্ম্মতত্বের ব্যাপকতা এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টির প্রাখর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা এ যুগেও প্রায় অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ইঁহাদের পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ যে সেই সকল আদি তত্বের সূক্ষ্মতা এবং যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন না, সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ; এবং ইঁহাদেরই কৃত ভ্রম প্রবাদ যে সেই মহাত্মাগণের বাঞ্ছিত সুফলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নির্দ্দয় আঘাত করিতে করিতে বর্ত্তমান যুগে, সমাজ, ধর্ম্ম, এবং জাতীয়তাকে মৃতকল্প করিয়া তুলিয়াছে, ইহা প্রায় স্থির। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সহজেই মনে হয় যে পাশ্চাত্য-প্রভুত্ব এবং পাশ্চাত্য-সংঘর্ষ ভারতবর্ষের পক্ষে ঐশবিধান ক্রমেই ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে পাশ্চাত্যজ্ঞানসমূহ জরাগ্রস্থ বৃদ্ধের পক্ষে মহৌষধির ন্যায় কাজ করিতেছে এবং করিবে। পাশ্চাত্যশক্তির অপ্রতিহত স্রোতঃ আসিয়া ভারতের জড়তা ও সংস্কার সমূহের বহু শতাব্দী সঞ্চিত আবর্জ্জনা একেবারে ধৌত করিয়া

ফেলিতেছে; ইহাতে আমাদের শুভ বই অশুভ নাই। আমরা বুঝি যে এই বন্যার এক আশু ফল এই হইবে যে পাশ্চাত্য মন্দগুলি ভাল'র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে. এবং সেই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া সামাজিক এবং জাতীয় কার্য্যকরী শক্তিসমূহ এককালে স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে; কিন্তু, সে কেবল ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই; এবং আমাদের ধারণা এই যে, সেই ক্ষণস্থায়ী সময়েরও প্রায় অবশান হইতেছে। শীঘ্রই আমাদের ভাগ্যে এমন সুদিন আসিবে যে দিন ভারতের জড়তা এবং মোহ সমূহ প্রায় তিরোহিত হইয়া জ্ঞানালোকে তিমিরপুঞ্জ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িবে। কেননা, ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ বহুকাল বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সংস্কার-বিমুক্ত হইয়া সাধারণচিত্ত যে দিন সকল বিষয়ে স্বাধীন-চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিনই আমরা দশ জনের এক জন হইতে পারিব। এই চিন্তার স্রোত বহাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তৃতি। বিজ্ঞান-নীতি-সমূহ চিত্তের সংস্কার-আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া ফেলে; এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকে। এই জন্যই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীন দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি পড়িবার এ যুগ নহে; এ যুগে দরকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও এ যুগের উপযোগী শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই আত্মশক্তির সাহায্যে প্রত্যেক বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিবে; ফলে, ভারতের জাতীয় কলঙ্ক লোপ পাইবে। ভারতবর্ষে মৌলিকতা আসিবে, অনুচিকীর্ষা দূর হইবে। পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী বড়ই অনুকরণপটু তাহাদের মৌলিকতা নাই। ইহা ভুল; কেননা, অনুচিকীর্ষাতেই মৌলিকতার বীজ নিহীত রহিয়াছে। যেমন খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বীজ বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি অনুকরণ করিতে করিতেই মৌলিক ক্ষমতা বাহির হইয়া পড়ে। নচেৎ, ডারুইন কখনই বলিতেন না, যে বানর মানবের পূর্ব্ব-পুরুষ। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে প্রতিভার অভাবে মৌলিকতা বাহির হইতে বড়ই বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, ভারতবাসী যেরূপ অনুকরণদক্ষ, তাহাতে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে তাহার মৌলিক-ক্ষমতা খুবই আছে; কেবল বহুকাল'সঞ্চিত কুপ্রভাবে চাপা পড়িয়াছে। ভারতবাসীর চরিত্রের বিশেষত্ব অধ্যয়ন করিলে অনেকেই বোধ হয় আমাদের সহিত একমত হইয়া বলিবেন যে, সাধারণ ভারতবাসী উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগণের মধ্যে সকল বিষয়েই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। মহেন্দ্র সরকার, মাইকেল, রবি. বঙ্কিম, জগদীশ, সুরেশ, প্রভৃতি ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের লোক স্বীয় আত্ম-শক্তি বুঝিয়া উঠিতে পারে না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। এ সম্বন্ধে আগামী বারে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন।

বৈজ্ঞানিক।

স্কটল্যাণ্ডের এক কৃষক কোনও সময়ে নগ্নকায় নৃপতি তনয় দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছিল—"এ আমাদের শিশুরই অনুরূপ!" রাজাও যে আমাদেরই মত এক জন মানব, অতএব তাঁহার তনয় যে আমাদেরই তনয়ের মত হইবে, সে কথা সরল কৃষক স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

একজন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিকের কোনও সাধারণ ক্রিয়া কলাপ দেখিলে আমারাও বিস্ময়ের সহিত মনে করি "এই বৈজ্ঞানিকও তবে আমাদেরই মত!" বাস্তবিক একজন বৈজ্ঞানিক ও একজন সাধারণ লোকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু বহুস্থলে উভয়েরই ক্রিয়াকলাপ একরূপ।

সকলেরই জীবন কর্ম্মময়। এই কর্ম্ম কোন স্থলে শরীর দ্বারা আবার কোথাও বা মনঃ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অলস অধম ব্যক্তিও কার্য্য করে। এই কর্ম্মই সকল মানবের বন্ধন স্বরূপ, এবং কর্ম্ম দ্বারাই পৃথিবীর যাবতীয় মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। একজন অত্যন্ত মেধাবী হইতে পারেন বটে, অথবা তাঁহার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি তিনি কর্ম্ম পরাঙ্মুখ হয়েন বা একজন অলসের ন্যায় কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল জনক কোন কর্ম্মই সম্ভবপর নহে। অতএব মানবের সাধারণ কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই সমান।

কিন্তু কর্ম্ম সম্পাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে। কতকগুলি লোকের সমগ্র জীবন স্থৈর্য্যের উদাহরণ স্থল; তাঁহারা আজীবন কর্ম্ম-ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবন এক মুহূর্ত্তেও কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করে না। তাঁহারা প্রতিদিন এক এক পদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সমস্ত লোকের কর্ম্ম পথে যদি কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সেই বাধা ধীরতার সহিত অতিক্রম করেন, বেশ বিচক্ষণতা সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েন।

আবার কতকগুলি লোক কর্ম্মশক্তির প্ররোচনায় উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কর্ম্ম সম্পাদন পথে কোনরূপ বাধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বকীয় শক্তি প্রভাবে বিঘ্ন নষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। সময়ে যে আপনা আপনিই সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর হইতে পারে, তাহা বিচার করিতে তাঁহারা অবসর পান না। তাঁহাদের বাধা বিঘ্ন নষ্ট করিবার অধ্যবসায়ের সম্পূর্ণ

অভাব থাকে। কাজেই বাধা বিঘ্ন নষ্ট না হইলে তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়েন। এইরূপে ক্রমাগত অবসাদের ফলে তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনও নিতান্ত অকর্ম্মণ্যের ন্যায় অতিবাহিত হয়।

আবার কেহ কেহ কর্ম্ম পথের নানা বাধা বিঘ্ন স্বকীয় শক্তি প্রভাবে অথবা নানাবিধ বুদ্ধি জাল বিস্তার করিয়া অপসারিত করেন। তাঁহারা কর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, অথচ তাঁহাদের অবসাদ আসে না। অকৃতকার্য্যতা তাঁহাদিগকে কাতর করিতে পারে না। তাঁহারাই বলেন—"Failures are but the pillars of success."

এই ত্রিবিধ কর্ম্ম-শক্তি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে প্রথমের নিকট কর্ম্ম অনেকটা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত; এ কর্ত্তব্য তাঁহার কষ্ট দায়ক নহে। দ্বিতীয়ের নিকট কর্ম্ম প্রথমে আনন্দদায়ক এবং পরিণাম মহা অনর্থের আকর। তৃতীয়ের নিকট কর্ম্ম শুধু আনন্দদায়ক নহে, অপরিহার্য্য। তাঁহারা কর্ম্মই ভালবাসেন একজন কলাবিদ্যাবিদের কলায় আসক্তির ন্যায় তাঁহার কর্ম্মে আসক্তি প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়, তিনি কর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতে চান। কেন লোকে কর্ম্ম সম্পাদনের এরূপ বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে?—ইহার কারণ বিভিন্ন মাসিক অবস্থা; ইহার জন্যই এরূপ বিভিন্ন কর্ম্ম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের বিভিন্নতা এইরূপ মানসিক শক্তির বিভিন্নতা উৎপাদন করে।

আবার সকল মানবই আবেগময়। আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহা একটা মানসিক আবেগের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক যে কার্য্য করেন, তাহাও তাঁহার মানসিক আবেগের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এইরূপ আবেগের কারণ সত্যানুসন্ধিৎসা। বৈজ্ঞানিক-তথ্য-উদ্ঘাটনের অর্থই এই—নূতন সত্যের প্রচার। কিন্তু পৃথিবীস্থ তাবৎ অবৈজ্ঞানিক জন সঙ্ঘের আবেগ নানারূপ ক্রিয়া দ্বারা শীঘ্র প্রকাশিত হইয়াই সহসা হ্রাস হইয়া পড়ে, আর বৈজ্ঞানিক আবেগ বশীভূত হইয়া নিভৃতে বসিয়া কার্য্য করেন, সহসা তাঁহার কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, যদি কোনরূপ ব্যাঘাতও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচিত্তে সেই ব্যাঘাত নষ্ট করিয়া বা সেই ব্যাঘাতে ব্যতি ব্যস্ত না হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার আবেগ বহ্নি যেমন সহসা প্রজ্জ্বলিত হয় না, সেইরূপ সহসা নির্ব্বাপিত হয় না। যাহা হউক সকলেই আবেগময় অর্থাৎ সকলেই একটা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস সাধারণ মানবের বিশ্বাসের ন্যায় নহে। তাঁহার সমস্তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার শক্তি থাকে। তিনি সত্যের সমালোচক। তাঁহার মনে সহসা কোন বিশ্বাস উপস্থিত হইতেই পারে না, বরং

তাঁহার অন্তরে কোনও রূপ আবেগ উপস্থিত হইলেই তিনি সহসা কোনও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী না হইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া সত্যানুমোদিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করেন। সেই জন্যই জন সাধারণ বৈজ্ঞানিককে ঘোরতর নাস্তিক বা অবিশ্বাসী বলিয়া মনে করে। যদি আমরা সহসা কোন একটা কিছু বিশ্বাস করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের নিকট সেই বিশ্বাসের প্রতিকূল সমালোচনা বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে এবং আমরাও সে প্রতিকূলতা সহ্য করিতে পারি না। এমন কি কোন একটা বিশ্বাসকে যদি আমরা অবিসংবাদী সত্য বলিয়াও ঠিক করিয়া লই, তাহা হইলেও সেই বিশ্বাসের প্রতিকূল সমালোচনার নাম শুনিলেই আমরা ভীত ও বিরক্ত হই। অথচ মনে মনে যেন বুঝিতেছি আমার বিশ্বাস সত্য—আনুমানিক নহে। কিন্তু বিশ্বাস উৎপত্তির কারণের আদর্শ পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত করিয়া রাখা বা অনুমান করিয়া লওয়া বৈজ্ঞানিকের কার্য্য নহে। প্রথমে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাসই অস্পষ্ট, তাঁহার নিকট প্রথমে কিছুই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই তিনি রীতিমত সমালোচনা করিবার অবসর পান। তাঁহার বিশ্বাসকে সত্য-জ্ঞানানুমোদিত করিবার জন্য তিনি বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসই প্রকৃত ও সত্যানুমোদিত।

জগতে কয়েকটি ধর্ম্ম রহিয়াছে। সভ্য জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মেই নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম এই সমস্ত সামাজিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম্ম বলিলেই দুইটী বিষয় মনে উদিত হয়। একটি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ও গুঢ়তত্ত্ব বাদ এবং অন্যটি সর্ব্বথা প্রমাণীকৃত সত্যতত্ত্ববাদ। এই দুইটি বিভিন্ন বাদ একই মানব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যিনি প্রথমবিধ ধর্ম্মে আসক্ত তিনিই শাস্ত্র বিশ্বাসী ধার্ম্মিক। যিনি দ্বিতীয় ধর্ম্মানুরক্ত তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিকের ধর্ম্মানুরূপ নহে। সমাজ ধর্ম্মের সত্যে বিশ্বাস ও প্রকৃত অবিসংবাদী সত্যে বিশ্বাস এই দুইটিতে পার্থক্য যথেষ্ট। সমাজ ধর্ম্মের সত্যে অনেক প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা স্থান পাইয়াছে। যদি সমাজ ধর্ম্মের সত্য অবিসংবাদী হইত, তাহা হইলে সকল সমাজ ধর্ম্মই এক হইত। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মে পার্থক্য যথেষ্ট। কাজেই একটা ধর্ম্ম সত্য হইলে অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা হইবেই। কিন্তু সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম অবিসংবাদী সত্য বলিয়া মনে করেন বলিয়াই প্রত্যেক ধর্ম্মে "গোঁড়ামী" প্রবেশ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্মে 'গোঁড়ামীর" একান্ত অভাব। বরং তাঁহার ধর্ম্ম অনেকটা নাস্তিকের ধর্ম্মের ন্যায়। নাস্তিকের ধর্ম্মে বিপ্লব নাই, শান্তিও নাই বিশ্বাস নাই, কার্য্যও নাই। নিবৃত্তি

নাই প্রবৃত্তিও নাই। তবে নাস্তিক ক্রমাগত একটা কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, নিরন্ত বসিয়া থাকিতে পারে না। নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিকের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়ই নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্মে ও নাস্তিকের ধর্ম্মে প্রভেদ যথেষ্ট। নাস্তিকের কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক একটা অস্পষ্ট কিছু দেখিতে পান, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি কিছুতেই সেই অস্পষ্ট অথচ উজ্জ্বল আদর্শের সমতুল্য হইতে পারেন না বটে কিন্তু তিনি সেই আদর্শের সমতুল্য হইবার চেষ্টা করিলে তাঁহার চেষ্টা একবারে ফল শূন্য হইতেই পারে না।

পদার্থবিদ্যাবিৎ, জ্যোতির্ব্বিৎ, গণিত শাস্ত্রবিৎ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত অন্যবিধ বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্মমত সর্ব্বসময়ে আবার একরূপ নাও হইতে পারে। যাঁহারা অতি ধীর চিত্তে সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্লেষণ করিতে পারেন, তাঁহারা ভগবানের উপর আস্থা স্থাপন করেন, এবং এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহাদিগকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। কোন কোন গণিতবিৎ প্রশস্ত শ্যামল বীথিকার অনুরাগী। গণিত মূলক কোন সত্য তথ্য উদ্ঘাটিত হইলেই তাঁহারা সেই সত্যকে সর্ব্ব বিষয়ের সত্য বলিয়া মনে মনে অনুমান করিয়া লয়েন, এবং এইরূপ একই জাতীয় সত্য গুলিকে সংগৃহীত করিয়া একটা সুদৃঢ় সৌধের ভিত্তি গঠন করিতে চেষ্টা করেন, অতঃপর সেই সৌধ শিখরে আরোহণ করিয়া আরও দূরতর প্রদেশ অবলোকন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা বীথিকার শ্যামল সম্পদে ও চক্রবালের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। কিন্তু কোন কোন গণিতবিৎ এরূপ প্রশান্ত দৃশ্যের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন, শ্যামলতা সুন্দর হইতে পারে বটে কিন্তু দিগন্তবৃত্তের দৃশ্য বড়ই অস্পষ্ট তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে চাহেন, প্রত্যেক জিনিষ ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ভাস্করের ন্যায় প্রত্যেক স্থান কাটিয়া খুদিয়া সৌন্দর্য্য গড়িতে চাহেন। প্রথম শ্রেণীর গণিতবিৎ ভাবুক কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিতবিৎ পরিশ্রমী শিল্পী।

মোটের উপর বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম আস্তিকতা ও নাস্তিকতা সংমিশ্রিত। কিন্তু ইহাতে আস্তিকের কঠোরতা নাই, প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে উপেক্ষা নাই, সত্য উদ্ঘাটনে শিথীলতা নাই, অথচ নাস্তিকের অশান্তি নাই, সংশয় নাই। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম প্রশান্ত। তিনি এরূপও বলিতে পারেন—

My religion is religion of love for all mankind, for all animals, plants, living organisms—for all the world in general. (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বৰ্ত্তমান সময়ের দশটী প্রধান আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৭। লুথার বারব্যাঙ্ক।

আমরা লুথার বারব্যাঙ্কের এত সুখ্যাতি করি, কারণ পূর্ব্বে যেখানে ঘাসের একটী পাতা জন্মাইত, এখন সেইখানে দুইটী ঘাসের পাতা উৎপাদনের উপায় তিনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, আমাদিগকে, ফল, গোলাপ ফুল, শস্য, ঘাস প্রভৃতি উৎপাদনের নূতন প্রথা শিখাইয়াছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তঃপাতী স্যাণ্টা রোজায় (Santa Rosa) তাঁহার প্রণালী অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহণার্থে কার্নেজি ইনষ্টিটিউট্ তাঁহাকে ১০,০০০ ডলার বাৎসরিক দান করে। এক জাতীয় বৃক্ষের বীজ বপন করাই, তাঁহার একটী প্রধান প্রথা। এই গাছগুলি যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, কিম্বা যে জাতীয় গাছ আবশ্যক, সেই গুলি বাছিয়া লওয়া হয় এই সকল মনোনীত বৃক্ষের বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী বৃক্ষ রোপণের সময় সেইগুলি রোপণ করা হয়। কাজেই বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজগুলি আবার রোপণ করা হয়, এবং বৃক্ষ জন্মাইলে তাহা হইতে ভাল গুলিকে পুনরায় বাছিয়া লওয়া হয়। যতকাল পর্য্যন্ত যেরূপ বৃক্ষ আবশ্যক সেইরূপ না পাওয়া যায়, ততকাল পর্য্যন্ত এইরূপ করা হয়। কথনওকথনও ফল উৎপাদনের নিমিত্ত পুষ্পরেণু একটী পুষ্প হইতে অন্যে পরিচালিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন গাছে কলম বাঁধিলে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ অনেক প্রথা আছে যে গুলি প্রত্যহ ব্যবহৃত হইতেছে কিন্তু আমরা সেগুলির কারণ জানিনা। তবে বারব্যাঙ্ক সাহেব নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা আমাদিগকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ফল দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা প্রথা গুলির কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

৮। উড্ডীয়মান কল।

ওহিয়োর (Ohio) মধ্যবর্ত্তী ডেটন্ (Dayton) নামক একটী স্থান হইতে রাইট ও তাঁহার ভ্রাতা (Wright Brothers) সহজে ও সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ একটী উড্ডীয়মান যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। Wrightএর উড্ডীয়মান যন্ত্রের চিত্র প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই যন্ত্রে দুইটী horizontal planes একটীর উপর আর একটী রহিয়াছে।

পশ্চাৎদিকের মধ্যভাগে একটী হাল্কা, ও বেগবান gasoline এঞ্জিন আছে, ইহা একটী চাকার সহিত সংযুক্ত বলিয়া কলটীকে বায়ুর ভিতর দিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এই plane গুলি একটু কোণ করিয়া বাঁকান আছে বলিয়া, বায়ুর চাপ নিম্নদিকেই অধিক পরিমাণে পড়ে, সেইজন্য যন্ত্রটী উপরদিকে উঠে। কলটীকে উপরে, নীচে, দক্ষিণে ও বামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কর্ণের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে এরূপ একটী উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। Wrightএর উড্ডীয়মান যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পর অন্যান্য কল বাহির হয়। Wrightএর যন্ত্র ভিন্ন Bleriotএর monoplane ও Curtissএর উড্ডীয়মান যন্ত্র আছে।

৯। ডিসেলের তৈলদ্বারা পরিচালিত ইঞ্জিন।

উড্ডীয়মান যন্ত্রের সফলতার নিমিত্ত একটী বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। ইহাতে এমন একটী ইঞ্জিন আবশ্যক যাহার ভার অতি অল্প হইবে অথচ অধিক পরিমাণে কার্য্যক্ষম হইবে। যতকাল পর্য্যন্ত এই পরিচালক ইঞ্জিন বা মোটর নিখুঁত না হইয়াছিল, ততদিন উড্ডীয়মান যন্ত্রের সাফল্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

অবশ্য gasoline ইঞ্জিন অনেক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার ব্যবহার, হাল্কা পেট্রোলিয়াম তৈল হইতে উৎপন্ন gasoline, benzene, naphtha, প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, এবং ইহার সঞ্চয় শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়, কাজেই ইহা দ্বারা বেশী দিন কার্য্য চালান যাইতে পারে না। Diesel নির্ম্মিত তৈল দ্বারা চালিত ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে বাষ্পীভূত গ্যাসোলিন দগ্ধ (internal combustion) হয়, এবং ইহা ভারি তৈল দ্বারা চালিত হইতে পারে, আর ভারি তৈল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কারণ এই তৈল স্বভাবতঃ কাঠ এবং পাথুরিয়া কয়লা পরিশ্রুত করিয়া পাওয়া যায়। Rudolf Diesel এই ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। তিনি দেখিলেন যে সে সময়ের মধ্যে যত রকম ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতেই কম খরচ হয়। সাধারণ explosive type এর ইঞ্জিন যে প্রথায় চলে এ গুলি সে প্রথায় চলে না। প্রথমে নলের মধ্যে পিষ্টন দিয়া বায়ু প্রবেশিত হয়। এই পিষ্টনকে আবার যখন ঠেলা যায় তখন এই বায়ু প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪৫০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড চাপে সঙ্কুচিত হয়। বায়ু যখন এইরূপে সঙ্কুচিত হইতে থাকে তখন বায়ু এত উত্তপ্ত হয়, যে, piston এর শেষ ভাগে যে তৈল বহির্গত হয়, তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তৈল বাহির করিতে হইলে তাহা নলের ভিতর এইরূপে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৭০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড চাপে প্রবেশিত করিতে হইবে। একেবারেই সমস্ত তৈল প্রবেশ করান হয় না, তবে নলটী যখন বাহির দিকে যায় সেই সময়ে

এই তৈল ভিতরে যায়; এবং সেই প্রতিঘাতে যত কাজ হয়, সেই অনুসারে তৈল ভিতরে যায়। Piston এর শেষ আঘাতে নল হইতে সমস্ত দগ্ধ গ্যাস বহির্গত হয়। এতকাল যন্ত্র সম্বন্ধীয় অসুবিধার জন্য ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই, মাত্র চারি বৎসর হইল ইহা সফলতার সহিত নির্ম্মিত হইতেছে। Diesel ইঞ্জিন ক্রমশঃ যে একটী প্রধান বলপ্রদায়ক যন্ত্র হইতেছে, তাহা আমরা যে সমস্ত জাহাজ সমুদ্রে যায় তাহাদের পরিচালন দেখিয়া, বেশ বুঝিতে পারি। যখন দেশে ইন্ধন কম পড়িবে তখন দেশে দেশে এই ইঞ্জিন প্রচলিত হইবে।

১০। পার্‌সনের বাষ্পীয় টার্‌বাইন।

Rotor নামক একটী নলে শ্রেণী শ্রেণী সঞ্চলণীয় ফলক সজ্জিত করা আছে। Rotorকে ব্যাপৃত করিয়া যে থাকে, এবং তাহাতে যে সমস্ত অসঞ্চলণীয় ফলক সজ্জিত থাকে, পূর্ব্বোক্ত ফলক গুলি তাহার চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়। এক প্রকারের টার্‌বাইন্ আছে যাহাতে বাষ্প, ফলকের যেরূপ শক্তি তাহার দ্বিগুণ জোরে আঘাত করে। এই গুলিকে impulse ধরণের টারবাইন বলা হয়। আর এক প্রকার টারবাইন আছে, এগুলিকে প্রতিঘাত টারবাইন বলা হয়, কারণ, ইহাতে বাষ্পের জোর প্রায় ফলকের জোরের সমান। ফলকগুলির মধ্যবর্ত্তী যে বাষ্প থাকে তাহার স্ফীতির বেগ rotor কে ঘুরায়।

ইংলণ্ড নিবাসী Charles A. Parsons সর্ব্ব প্রথমে ব্যবহার্য্য চক্র প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নলিখিত কারণে তাঁহার আবিষ্কারকে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে ঃ—

(ক) সম শক্তি বিশিষ্ট অন্যান্য বল প্রদায়ক যন্ত্র যতটা স্থান অধিকার করে এই যন্ত্র তদপেক্ষা কম স্থান অধিকার করে।

(খ) অন্যান্য শক্তি উৎপাদক যন্ত্র যত মেরামত করিতে হয় ইহা তত মেরামত করিতে হয় না ও ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না।

(গ) বাষ্পীয় চক্রের কার্য্য সম্পাদিকা শক্তি বহুকাল সমান থাকে, কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কার্য্য সম্পাদিকা শক্তি কার্য্য করিতে করিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) এই চক্রের মিতব্যয়িতা যে কেবলমাত্র কম বাষ্প খরচ তাহা নহে, ইহার প্রথম খরচ কম হয় এবং ইহাতে এক জন লোককে ক্রমাগত উপস্থিত থাকিবার আবশ্যক হয় না ও কার্য্যতঃ ইহা ধীরে ধীরে চালিত ইঞ্জিনকে ক্রমশঃ অধিকতর বল প্রদান করিতে থাকে।

শ্রীপ্রমথ লাল সরকার।

স্বাস্থ্য-নিবাস।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-নিবাসের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্পতার কারণ ব্যাধির অল্পতা নহে। ভারতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে শত করা কত জন নিরাময় দেহে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন? আমাদের দেশের রোগের প্রাবল্য নিতান্ত অল্প নহে। তথাপি স্বাস্থ্য-নিবাসের সংখ্যা অল্প। ধর্ম্ম ও সামাজিক নানা কারণে এইরূপ একটি মহৎ হিতকর অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে।

ইউরোপ বা আমেরিকার প্রতি দেশে শত শত স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় অভাব উপস্থিত হইলেই অভাব মোচনের জন্য লোকে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠে। আমাদের মধ্যে অভাব থাকিলেও, সে অভাব কোন কালে পূরণ করিবার জন্য কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন না। যাহা হউক স্বাস্থ্য-নিবাস, সাধারণ চিকিৎসালয় ইত্যাদির সহিত মানব সমাজের কি সম্পর্ক, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

(১) বর্ত্তমানে প্রতিদিন সামাজিক জীবনের নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। গমনাগমনের নানাবিধ সুবিধা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর স্থানে লোকে অনায়াসে গমন করিতে পারে। কাজেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্য-নিবাস বা চিকিৎসালয় থাকিলে দূরতর দেশ হইতেও লোকে অনায়াসে এই সকল আশ্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য গমন করিতে পারে।

(২) প্রথম যখন হাঁসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, লোকে তখন ইহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সেই জন্য প্রথমাবস্থায় এই সমস্ত সাধারণ চিকিৎসাগার যমলায় সদৃশ অনুমিত হইত। পক্ষান্তরে হসপিটাল প্রভৃতিতে চিকিৎসকগণও সেরূপ যত্ন লইয়া পীড়িতের চিকিৎসা করিত না। কিন্তু এক্ষণে এই উভয়বিধ সংস্কারই দূরীভূত হইয়াছে। হস্‌পিটাল ইত্যাদিতে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং লোকেও প্রতিনিয়তই সুবন্দোবস্তের পরিচয় পাইতেছে।

(৩) আমাদের গার্হস্থ্য জীবন এরূপ কঠোর সংগ্রাম-সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে এবং আমাদেরও স্কন্ধে এত অধিক কর্ত্তব্যের বোঝা চাপান রহিয়াছে যে, কোন কঠিন পীড়ায় সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা বা রীতিমত চিকিৎসা করাইবার অবসর পাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে।

(৪) মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্যের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। জাতি জাতিতে, রাজায় রাজায়, সভ্যতায় সভ্যতায় ঘোরতর কলহ, যুদ্ধ, গোলমাল প্রতিনিয়তই চলিতেছে বটে, ব্যবসায় জীবনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্যায় মানব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে বটে, তথাপি গত ২৫ বৎসরের মধ্যে মানবে মানবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই অন্যের কষ্টে আর একজন ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

হস্‌পিটাল আদির—কেবল হস্‌পিটাল কেন অন্য নানাবিধ সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মূলে যে সমস্ত কারণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ঐ চারিটিই প্রধান। হস্‌পিটালের দ্বারা সমাজের বা জাতির কতটুকু উপকার সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। ক্রমশঃই আমাদের সামাজিক জীবনে সাধারণ চিকিৎসালয় ইত্যাদির অনুষ্ঠান সমাজের অঙ্গ স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে এবং অতি নিকট ভবিষ্যতেই আমরা হসপিটাল ইত্যাদির সার্থকতা রীতিমত বুঝিতে পারিব। হসপিটাল বলিলেই প্রধানতঃ এই বুঝায় যে এই সমস্ত মন্দিরে ঔষধ দ্বারা লোকের ব্যাধি প্রশমিত হয়। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ একমাত্র সহর অঞ্চলেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার আশা করা সহরের ধনাঢ্যগণের পক্ষেই সম্ভব; বহুদূর দেশের দরিদ্রের নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব। হস্‌পিটালে কৃতবিদ্য চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। পীড়িতগণ হসপিটালে অবস্থান করিয়া চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পায়। হস্‌পিটাল স্থাপিত হওয়ায় বহুদূর পল্লীর দরিদ্র ব্যক্তিও উৎকৃষ্ট চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইতেছে।

পূর্ব্বে একজন চিকিৎসকই সমস্ত পীড়ার চিকিৎসা করিত। এক্ষণে এক এক বিষয়ে অভিজ্ঞ বহুদর্শী সুদক্ষ চিকিৎসক তাঁহার মনোনীত পীড়ার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কাজেই দন্ত, চক্ষু, মস্তিষ্ক, সূতিকা ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাগার স্থাপিত হইতেছে। যাহাহউক কঠিন এবং সহসা বিপজ্জনক রোগ প্রশমনের জন্যই হস্‌পিটাল ইত্যাদির প্রয়োজন।

কিন্তু বহুকাল স্থায়ী পীড়ার চিকিৎসার জন্য এই সমস্ত হসপিটাল উপযোগী নহে। সেইজন্য স্বাস্থ্য-নিবাস প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে ২।১ টি করিয়া স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-নিবাস ব্যতিরেকে আধুনিক সমাজ সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে না। যে ২।১ টি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অভাবে দেশের দরিদ্রের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িত। উদাহরণ-স্বরূপ কুষ্ঠাশ্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সাংঘাতিক পীড়া মহাদেবের অসাধ্য বলিয়া উল্লিখিত, যাহার তীব্র যন্ত্রণায় মানব জীবিত অবস্থায় নরকভোগ করে, যাহাদের রোগের বিষ সহসা অন্য নির্দ্দোষ শরীরে সংক্রা-

মিত হইতে পারে, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা এবং মানবের প্রতি মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধন জন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দান করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি রোগী ধনাঢ্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য সে নিজেই যথাবিধি সাবধান ও চিকিৎসিত হইতে পারে। কিন্তু দরিদ্র হইলে তাহার কষ্টের অবধি থাকে না এবং সে সমাজের আতঙ্কস্থল হইয়া উঠে। সেইরূপ উন্মাদগণও উন্মাদাগার ব্যতীত সমাজে কত কি বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত আগার প্রায়ই অন্যের অনুকম্পায় প্রতিষ্ঠিত। কাজেই অনেক লোকে ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে কাতর হয়েন। এই জন্য ব্যবসায়ী পরিচালিত স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ স্থানে পরিমিত অর্থব্যয় করিয়া যে কোন লোক স্বচ্ছন্দে চিকিৎসিত হইতে পারেন।

স্বাস্থ্য-নিবাস ইত্যাদির আরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কোন পীড়ার কোন একটা বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক। যন্ত্রটি হয়ত প্রচুর মূল্যবান। এক জন চিকিৎসক কিছুতেই এক জন রোগীর জন্য সেরূপ যন্ত্র ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন না। কেননা সেই যন্ত্র পুনরায় কবে ব্যবহৃত হইবে তাহার আর স্থিরতা থাকে না। কিন্তু কোন এক বিশেষ স্বাস্থ্য-নিবাসে প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসিত হইতে থাকে, কাজেই সেরূপ স্থানে যন্ত্রপাতি বা বিশেষ বিশেষ ঔষধের অভাব থাকিতে পারে না।

এইরূপ নানা কারণে স্বাস্থ্য-নিবাস ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় এরূপ প্রকাণ্ড দেশে অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্য-নিবাস নাই। যাহাতে বহু সংখ্যক স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

লৌহ বা ইস্পাতের আয়ুর্বৃদ্ধি।

সকল ধাতু অপেক্ষা লৌহ, বায়ু ও তৎসংশ্লিষ্ট জল বিন্দুর প্রভাবে অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকে। পরিস্কার এক খণ্ড লৌহকে যদি এক রাত্রি মাত্র শিশিরে রাখা যায়, তাহার পর দিবস আমরা দেখি যে, সেই লৌহ খণ্ডের ধাতব কান্তি নষ্ট হইয়া তাহার উপর লোহিত বর্ণের এক প্রকার চূর্ণ পদার্থ জমা হইয়াছে। এই গুঁড়াকে "মরিচা" বলে। "মরিচা" অপর কোন বস্তু নহে; বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

নামক দুইটি মৌলিক বাষ্পীয় পদার্থ আছে। লৌহ ও অক্সিজেন জল বিদ্যমানে একত্রে থাকিলে এক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়; "মরিচা"ই এই যৌগিক পদার্থ। অবশ্য সকল ধাতুই অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে, এক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। তবে লৌহ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু অতি সহজেই এবং কতকগুলি অতি বিলম্বে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অতি শীঘ্র এবং অতি সহজেই অক্সিজেন সহিত মিলিয়া এই যৌগিক পদার্থ (rust —Oxide of Iron) প্রস্তুত করে, এবং এই কারণেই লৌহ অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অতি শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ যত্ন সহকারে না রাখিলে লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

সকল ধাতু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, লৌহ নানা প্রকার কার্য্যে এতই প্রয়োজন হয় যে ইহা নিকৃষ্ট হইয়াও সকল ধাতুরই শ্রেষ্ঠ বলিলেও বিশেষ দোষজনক হয় না।

সভ্য জগতে আজ কাল এমন কোন্ কার্য্য আছে, যাহাতে লৌহ প্রয়োজন হয় না? কি শিল্প, কি কৃষি, কি বাণিজ্য, সকল কার্য্যই লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সুতরাং যাহাতে লৌহ নির্ম্মিত কোন দ্রব্য শীঘ্র মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া না যায় সেই জন্য লৌহ ব্যবসায়ীরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর রাসায়নিক প্রণালীতে দস্তার মোটা প্রলেপ লাগাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা লৌহকে অক্সিজেনের ক্ষয়কারী শক্তি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে জল রাখিবার বিলাতি টব, বাল্‌তী, বেড়া লাগাইবার তার বা জাল, করুগেটেড্ টিন্ প্রভৃতি দ্রব্য লৌহ নির্ম্মিত হইলেও তাহাদের বর্ণ লৌহের ন্যায় নহে; ইহার কারণ এই যে শুধু লৌহ নির্ম্মিত হইলে মরিচা ধরিয়া খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া উক্ত ব্যবসায়ীরা রাসায়নিক প্রণালীতে সেই সকল দ্রব্যের উপর দস্তার পুরু প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। উক্ত দ্রব্যগুলিতে যে শাদা শাদা, মেটে মেটে রং দেখা যায় তাহা ঐ দস্তার।"

দস্তা অতি বিলম্বে অক্সিজেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া দস্তা প্রলিপ্ত (Galvanised) লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য শীঘ্র মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয় না। কিন্তু Galvanised লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য যদিও বহুদিন স্থায়ী, তথাপি তাহাদিগকে তৈয়ারি করা বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য; সেই জন্য আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অন্য কোন প্রকার স্বল্প ব্যয় ও অনায়াসসাধ্য উপায় আবিষ্কার করিবার মানসে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন; Back, Aston Bargess প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, কোন ধাতু বা অপর কোন মৌলিক পদার্থ (element) দ্রব

লৌহের সহিত মিশাইলে সেই লৌহের স্থায়িতার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কোন কোন দ্রব্যের সংমিশ্রণে লৌহের স্থায়িতার বৃদ্ধি এবং কোন কোন দ্রব্যের সংমিশ্রণে লৌহের স্থায়িতার হ্রাস হইয়া থাকে।

উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা ইহা দেখিয়াছেন যে লৌহের সহিত Silicon নামক মূল পদার্থটি মিশাইলে সেই মিশ্রিত ধাতু বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষা দশ গুণ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ নির্ম্মিত কোন দ্রব্য যদি দশ বৎসরে নষ্ট হয় তাহা হইলে Silicon সংমিশ্রিত লৌহের সেই প্রকার দ্রব্য এক বৎসরে নষ্ট হইয়া যায়।

পরন্তু যদি Nickel কিংবা Copper (তাম্র) গলিত লৌহের সহিত মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে এই মিশ্রিত ধাতুর স্থায়িতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপর কোন ধাতু বা মূল পদার্থ (element) এবম্প্রকারে লৌহের সহিত মিশাইলে তজ্জনিত মিশ্রিত ধাতুর স্থায়িতার বৈলক্ষণ্য বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না। লৌহের স্থায়িতা বৃদ্ধি করিতে Nickel এবং তাম্র সকল ধাতু অপেক্ষা উপযোগী; কিন্তু Nickel মূল্যবান ধাতু বলিয়া এবং সাধারণ লৌহ দ্রব্যের স্থায়িতার বৃদ্ধি করণার্থে ঈদৃশ মূল্যবান ধাতুর সংমিশ্রণ যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে তাম্র মিশ্রণই ন্যায় সঙ্গত। লৌহ অপেক্ষা তাম্র অধিক মূল্যবান হইলেও লৌহকে অধিককাল স্থায়ী করিবার জন্য এত অল্প তাম্র প্রয়োগ হইয়া থাকে যে তাহা বিশেষ ক্ষতি জনক বলিয়া মনে হয় না। ১২।১৩ মণ লৌহে এক সের মাত্র তাম্র মিশাইলে যে মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয় তাহার এক অংশ যদি কোন অম্ল পদার্থে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহা বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষা দশগুণ অধিক সময়ে নষ্ট হয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ সেই অম্লে যদি এক ঘণ্টায় গলে তাহা হইলে উক্ত মিশ্রিত ধাতু দশ ঘণ্টায় গলিয়া যাইবে।

অম্লে না ফেলিয়া কেবল বায়ু ও তচ্ছংমিশ্রিত জল বিন্দুর সংস্পর্শে রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষা এই মিশ্রিত ধাতুর স্থায়িতা তিন গুণ অধিক; অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ নির্ম্মিত কোন দ্রব্য বায়ুর সংস্পর্শে থাকিয়া যদি এক বৎসরে নষ্ট হয় তাহা হইলে এই মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য তিন বৎসরে নষ্ট হইবে।

আরও দেখা গিয়াছে যে হাজার ভাগ গলিত লৌহে দুই ভাগ তাম্র মিশাইলে যে ফল হয়, তদপেক্ষা অধিক তাম্র মিশাইলেও সেই ফল হয় অর্থাৎ অধিক তাম্র মিশাইলেই যে মিশ্রিত ধাতুর স্থায়িতা অধিক হইবে তাহা নহে; সুতরাং এত অল্প মাত্রায় তাম্র মিশাইলে যদ্যপি লৌহের স্থায়িতা এতই বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে লৌহ ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা যে একেবারেই ক্ষতিকারক নহে তাহা অল্প চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

হাজার সের (২৫ মণ) ওজনের কোন বিশুদ্ধ লৌহ পদার্থে যদি মাত্র দুই সের তাম্র মিশাইলে তাহাদিগের স্থায়িতা তিন গুণ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে দুই সের মাত্র তাম্র দুই হাজার সের (অর্থাৎ ৫০ মণ) লৌহের কার্য্য করিতেছে; এবং ৫০ মণ লৌহের মূল্যের তুলনায় ২ সের তাম্রের মূল্য কিছুই নহে। সুতরাং লৌহ ব্যবসায়ীরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে তাহাদের ব্যবসায় যে বহুপরিমাণে সচ্ছল হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার বি,এ।

সুরা।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক সময়ে মদ্যের প্রবল প্রতাপ বর্ত্তমান ছিল। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সুরা সভ্যতার ও ভদ্রতার অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হইত। কিন্তু আজকাল সে অবস্থা আর নাই। কাজেই সুরা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সঙ্কলন নিতান্ত দূষণীয় নহে।

বর্ত্তমান কালে অনেকে মদ্য পানের আধিক্য সম্বন্ধে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তাহা শুনিলে মনে হয় বুঝি আজকালকার ন্যায় আর কোন কালেই মদ্য পান এত প্রবল ছিল না। আমাদের দেশে এইরূপ মন্তব্যে কোন কুফল ফলিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় ইহার এই কুফল হইতেছে যে, লোকে এইরূপ প্রায় অলীক মন্তব্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, কাজেই সুরার অভ্যাস হ্রাস পাইতেছে না।

মদ্য পানের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ভারতের আর্য্য সমাজেও সুরাপান প্রচলিত ছিল। সে সুরা যে কিরূপ পদার্থ ছিল, তাহা আমাদের জানা নাই বটে, কিন্তু তৎকাল প্রচলিত পানাসক্তিতে প্রাচীন লোকের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহা পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক সময়ে সমগ্র ইংলণ্ড এক মাতাল জাতির বাস ভূমি ছিল। সে সময়ে মদ্য পান জনিত সাময়িক উন্মত্ততা অপমান জনক ছিল না। তখন পান জনিত উন্মত্ততাই সভ্যতা ছিল। কাজেই যে শয়নের পূর্ব্বে মদ্য পানোন্মত্ত না হইত সেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইত। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিম্ন উদ্ধৃত সঙ্গীত ঘরে ঘরে গীত হইত।

He that drinks small bear and goes to bed sober,
Will fall as the leaves do,
Fall as the leaves do,
Fall as the leaves do,
And die in October.

While he that drinks strong bear and goes to bed mellow,
Lives as he ought to live
Lives as he ought to live
Lives as he ought to live
And dies a jolly fellow.

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজগণ বৈকাল ৪।৫ ঘটিকার সময় প্রধান ভোজনে ব্যাপৃত হইত। রীতিমত ভোজন সমাধার পর টেবিল হইতে আচ্ছাদন বস্ত্র অপসারিত হইত, এবং পরিবেশক ডিকাণ্টার লইয়া মদ্য পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিত। কিয়ৎকাল গল্প স্বল্পের পরে রমণীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতেন। সেই সময় হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত মদ্য পান চলিত। তখন health drink করা একটা সামাজিক প্রথা ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে গৃহিত কাহারও পান পাত্রে যদি সামান্য মদ্যও অবশিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে ভদ্রতা বিগর্হিত হইত ও গৃহ স্বামীর অপমান জনক বিবেচিত হইত—কাজেই পর দিন প্রভাতে সেই অভদ্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইত। আজ কাল সে সমস্ত প্রথা নাই।

তখন আজ কালকার ন্যায় তাড়িত আলোকে গৃহদ্বার সজ্জিত হইত না। বর্ত্তিকা লোকে গৃহ আলোকিত হইত। মধ্যে মধ্যে গৃহ ভৃত্যগণ, বর্ত্তিকা পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া সংজ্ঞাশূন্য মাতাল প্রভুগণকে সজাগ করাইয়া দিত, তাহারা জাগিয়াই আবার মদ্য পান করিত। অবশেষে মধ্য রাত্রে অর্দ্ধ মাতাল ভৃত্যগণ পূর্ণ মাতাল প্রভুগণকে কোনও রূপে শয্যাগত করিত।

রাজা, প্রজা, চিকিৎসক, পুরোহিত, ধার্ম্মিক, আইন ব্যবসায়ী, কৃষক সকলেই মদ্য পান করিত। প্রধান মন্ত্রী মদ্যোন্মত্ত হইয়া পারলিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইতেন, তাঁহার বিরুদ্ধবাদী যিনি তাঁহারও সেইরূপ অবস্থা। তাহারা দুই জনে মারামারির সূত্রপাত করিতেন। সেই সময়ে দয়া করিয়া কোন অর্দ্ধোন্মত্ত বক্তা হয়ত বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। তখন আবগারী ছিল না, তখন ইংলণ্ডে যত্র তত্র লিখিত থাকিত—"Here you may get drunk for a penny: dead drunk and clean straw for two pence.

ইংলণ্ডের প্রাচীন অবস্থা বিস্তারিত বিবৃত করা এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাঁহারা ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন বা প্রাচীন কালের সাহিত্য, কাব্য, ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, প্রাচীন কালে সুরাই ইংলণ্ডের অস্থি মজ্জা ছিল। জলের ন্যায় সুরা অবাধে প্রচলিত হইত। সুরা ভিন্ন কেহই এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিত না। কিন্তু সেই সময়েই সেক্সপিয়র, বেকন, মিল্টন, নিউটন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই ইংলণ্ডের বীরত্বে পৃথিবী প্রকম্পিত হইত। সেই সময়ের ইংরাজই Spanish Armadaর আগমনে ভীত হইয়াও বিচলিত না হইয়া স্থির মস্তিষ্কে সমস্ত বিচার করিতে পারিয়াছিল।

ইহার সহিত তুলনায় ইংলণ্ড বর্ত্তমান কালে সম্পূর্ণ শান্ত। এমন কি ইংলণ্ড হইতে মদ্য পান তিরোহিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ কাল ইংলণ্ডে নীচ জাতীয় লোক ব্যতীত ক্বচিৎ কোন ভদ্রলোক মাতাল হইয়া উঠেন। আবার এই সমস্ত নীচ জাতির মধ্যেও ঘোর মাতালের সংখ্যাও খুব অল্প।

এই পরিবর্ত্তনের ন্যায্য কারণও রহিয়াছে। আজকাল লোককে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য যেরূপ দারুণ পরিশ্রম করিতে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেরূপ দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতে হইতেছে, কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সতর্কতার এত প্রয়োজন, যে এ কালে ভদ্র লোক মাতাল হইলে কোন কার্য্য পরিচালন সুদুষ্কর হইয়া উঠে। প্রাচীন কালে গাড়োয়ান মাতাল হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিলেও অশ্ব গাড়ী সহ গৃহে প্রত্যাগত হইত। আজকাল সেদিন নাই। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন গাড়োয়ান গাড়ীর উপরে মৃত পড়িয়া থাকিলেও অশ্ব ও গাড়ী নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল একটা ট্রেণের ড্রাইভার যদি সামান্য মাতালও হয়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া ট্রেণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সিগ্‌নাল বক্স, পয়েণ্টসম্যান প্রভৃতি কার্য্যে এরূপ সাবধানতা আবশ্যক যে, মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হইলেই অমনই শত শত লোকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে। অন্য নানা লোকে মাতাল হইয়াছে বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে. কিন্তু রেলওয়ের প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের মধ্যে কেহই আজ পর্য্যন্ত মাতাল বলিয়া অভিযুক্ত হয় নাই। আজ কাল সর্ব্বত্রই দ্রব্যাদি কলে প্রস্তুত হইতেছে। কলে কিরূপ সাবধানতা আবশ্যক তাহা সকলেই অবগত আছেন। রেলওয়ে ইত্যাদিতে যে কারণে লোকে মাতাল হইতে পারে না, সেই একই কারণে অন্য যাবতীয় কারখানায় নিযুক্ত লোককেও মদ্যপান অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কেবল দুই একজন মোটর গাড়ী পরিচালক সময়ে সময়ে মাতাল বলিয়া

অভিযুক্ত হয়। অন্যথা যন্ত্র পাতি লইয়া কার্য্য করে এরূপ লোকের মাতাল হইবার অবসর নাই। এক্ষণে ইংলণ্ডের লোকের বৃত্তি কি দেখা যাউক। লক্ষ লক্ষ লোক যন্ত্রপাতি লইয়া কার্য্য করিতেছে। এই লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য প্রতিনিয়তই সাবধানে থাকিতে হইতেছে। অতএব এই লক্ষ লক্ষ লোক কিছুতেই মদ্যপান করিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি সকলেই মদ্যপান বিরত হইয়াছে, তবে পুলিশ আদালতে অসংখ্য মাতাল শাস্তি পায় কেন? সেখানে প্রতি বৎসর মোট ৮০,০০০ লোক মাতাল বলিয়া শাস্তি পায়। কিন্তু ৩,২০,০০,০০০ লোকের মধ্যে ৮০,০০০ কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত যে বাস্তবিক মাতাল সে বৎসরের মধ্যে ৫।৬ বার শাস্তি পায়। কাজেই অপরাধীর সংখ্যা এরূপ ভাবেও বাড়িয়া যায়।

অতএব ইংরাজ এক সময়ে ঘোর মাতাল ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে অতি শান্ত শিষ্ট জাতি। এখনও মদ্যপান অবাধে চলে বটে, কিন্তু প্রকৃত মাতাল অল্প সংখ্যক। তাহার উপর আবগারীর দারুণ যন্ত্রণায় মদ্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে তদ্দারাও দরিদ্র মজুরগণকে মদ্যপান হইতে বাধ্য হইয়া বিরত হইতে হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক জগতে গত পঁচিশ বৎসর।

নিম্নলিখিত দশটী বস্তু, গত ২৫ বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত এবং ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে।

১। উজ্জ্বল আলোকের নিমিত্ত Edison দ্বারা তড়িৎ প্রবাহের বিভাগ।

২। Alternating তড়িৎ প্রবাহের অবস্থান্তর ও রূপান্তর।

৩। কৃষিকার্য্য ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে Nitrogen-compounds প্রস্তুত।

৪। Internal combustion engine এর ইদানীন্তন পরিবর্ত্তন।

৫। উড্ডীয়মান যন্ত্র।

৬। X-ray উৎপাদন করিবার যন্ত্র।

৭। কোন চিত্রকে পুনরুৎপাদন করিবার প্রণালী।

৮। আলোক চিত্রণের নমনীয় পর্দা।

৯। বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ড।

১০। তারবিহীন তড়িৎ বার্ত্তাবহ।

(১) ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে Edison সাহেব ফিলাডেল্‌ফিয়া নামক প্রদেশে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের নিমিত্ত আনীত একটী ক্ষুদ্র আর্কলাইট্‌ উৎপাদনের যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালী Edison দেখিলেন, যে গৃহাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইবার নিমিত্ত, এই অনিশ্চিত এবং তীক্ষ্ণ জ্যোতি আলোক ভিন্ন অন্য প্রকার আলোক ব্যবহার করিতে হইবে। এই নিমিত্ত যে তড়িৎ প্রবাহ ব্যবহৃত করা যাইবে তাহাকে বিভক্ত করিতে হইবে, এবং এরূপ করিতে হইবে যে একটী আলোকের সহিত অপর আলোকের কোন সংশ্রব থাকিবে না। অবশেষে তিনি নির্দ্ধারিত করিলেন, যে বায়ুশূন্য নলের ভিতর অঙ্গার সারের আঁশ আশাপ্রদ ফল দান করিবে, কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, সে সময়ে কোন বস্তুকে যতদূর বায়ু শূন্য করিবার উপায় ছিল, যদি তাহা দ্বারা এই নলটীকে বায়ু শূন্য করা হয় তথাপি এই নলে এত Oxygen থাকে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অঙ্গার সার আঁশ দগ্ধ হইয়া যায়। তখনকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ জানিতেন যে, একেবারে বায়ু শূন্য স্থান হওয়া অসম্ভব, কাজেই একেবারে বায়ু শূন্য স্থান করিবার উপায় আবিষ্কারের নিমিত্ত Edison কাজে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্য সিদ্ধ হইবার পর, তিনি প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে আঁশের নিমিত্ত ভাল জিনিস অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অবশেষে, তিনি তাঁহার আলোক প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক ল্যাম্পটীকে স্বতন্ত্র রাখিবার নিমিত্ত, তড়িৎ প্রবাহ কতকগুলি তারের ভিতর দিয়া চালাইতে লাগিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি নিউ ইয়র্কে সাধারণের নিমিত্ত প্রথম যন্ত্র স্থাপন করেন, কিন্তু মোটে ২৫ বৎসর ইহা কার্য্যের ও ব্যবসার উপযোগী হইয়াছে।

(২) যখন Edison সাহেব বৈদ্যুতিক আলোকের প্রথা কার্য্যগত করিলেন তখন তিনি (continuous) অবিচ্ছিন্ন তড়িৎ প্রবাহ ব্যবহার করিতেন, এবং এই প্রবাহের দ্বারা প্রথম trolley লাইন চলিত হইয়াছিল। নগরেই অধিক পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহ আবশ্যক। জল দ্বারা চালিত ডাইনামো'তে অতি সন্তোষজনক অবিচ্ছিন্ন তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদিত হয়, কিন্তু ইহা অতি অল্পদূর পর্য্যন্তই চালিত হইতে পারে। কিন্তু আমেরিকায় জলপ্রপাত গুলি নগর হইতে বহু দূরে। দুইটী কারণে অবিচ্ছিন্ন তাড়িত প্রবাহ অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহ চালিত করিতে হইলে অধিকতর ব্যাসের তাম্র নির্ম্মিত তার আবশ্যক, এবং তাহাতে অত্যন্ত খরচ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ conductorএর বাধা (resistance) অতিক্রম করিবার নিমিত্ত অনেকটা প্রবাহ উত্তপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ডাইনামোকে অতি অল্প পরিবর্ত্তন করিলেই ইহা হইতে alternating তড়িৎ প্রবাহ

উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ তাড়িত প্রবাহটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক দিকেই প্রবাহিত না হইয়া পর্য্যায়ক্রমে একবার এক দিকে পরবারে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইবে। এই প্রবাহের একটী গুণ যে সরু তারের মধ্য দিয়া অধিক পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহ চালিত হইতে পারে, এবং ইহাতে অধিক প্রবাহ নষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে জলপ্রপাত হইতে শতাধিক মাইল অন্তরে যে নগর আছে, সেখানে পর্য্যন্ত ২০ হইতে ৫০ হাজার ভোল্ট চাপের প্রবাহ প্রেরণ করা যায়। এত অধিক ভোল্টের প্রবাহ, আর একটা নূতন সংশয় উপস্থিত করিয়াছিল, এবং যতদিন ইহার মীমাংসা না হইয়াছিল, ততদিন এই প্রবাহ ব্যবসায় চালান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংশয় মীমাংসার ফলে ট্রান্সফরমার নামক একটী অতি সহজ, এবং আশ্চর্য্য জনক ফলোৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। এই যন্ত্রটী এক প্রকার প্রকাণ্ড Ruhmkorff coil বলিলেও চলে। ইহা ডাইনামো হইতে অধিক চাপের তড়িৎপ্রবাহ লইয়া তারের মধ্য দিয়া চালিত করে এবং রাস্তায় আর্ক লাইট জ্বালাইবার নিমিত্ত, দোকানে মোটর চালাইবার নিমিত্ত কিম্বা বাড়ীতে আলো জ্বালিবার নিমিত্ত কম চাপের প্রবাহ চালিত করে। যখন এই রকম মহৎ কার্য্য প্রথমে আরম্ভ করা হয়, তখন নায়াগারা জলপ্রপাত (Niagara Falls) প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য চালাইবার জন্য সংশয়াত্মক বিষয় গুলির সমাধার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। এই গুলি সমাধার জন্য আমরা Teslaকে যেরূপ সম্মান করিতে পারি, অন্য কেহ অত সম্মান পাইবার অধিকারী হইতে পারে না।

(৩) মানবজাতির প্রত্যেকেরই সুখ ও ঐশ্বর্য্য জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে; কৃষি উৎপাদিত শস্যের মূল্যের উপর জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় নির্ভর করে, আবার শস্য উৎপাদক জমীর রক্ষণার্থে যে ব্যয় হয় তদনুসারে শস্যের দাম হয়। আজ কাল মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে, যে শস্যের জন্য পটাস্ (potash) ফস্‌ফরস্ (phosphorus) ও নাইট্রোজেন (nitrogen) এই তিনটী উপাদান (element) মৃত্তিকায় বৎসর বৎসর পুনঃ স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পটাস এবং ফস্‌ফরাস্ এই দুইটী উপাদান এখনও পর্য্যন্ত মাটী হইতেই স্বভাবতঃই পাওয়া যায়, কিন্তু মৃত্তিকাকে উর্ব্বর করিবার জন্য প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন কেবলমাত্র পশু ও উদ্ভিদের সহায়তায় পাওয়া যায়। এই কারণে নাইট্রোজেনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কত লক্ষ লক্ষ মণ নাইট্রোজেন রহিয়াছে। যাঁহারা ইহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে পারিবেন তাহাদিগকে ইহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে না। আজ পৃথিবীর সুধীগণের যতগুলি বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে তন্মধ্যে এইটী বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই মহৎ প্রশ্নের কিরূপে সুমীমাংসা হইতে পারে তাহার জন্য ইতি পূর্ব্বে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

"এ বিষয়ে একটী প্রধান দুরূহ বিষয় এই যে, নাইট্রোজেন গ্যাসটী কোন মৌলিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া সহজে দ্রবণীয় মিশ্রণে পরিণত হয় না।

এই গুরুতর প্রশ্নের সাফল্যের সহিত সমাধান করিবার জন্য Swedenএর Christiania বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রোফেসর বাষ্কল্যাণ্ড Professor Birkeland বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি যে কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে চালিত হয়। একটী Magnetic field এর ভিতর দিয়া অধিক ভোল্টের একটী arc light চালিত হয়, এবং উক্ত Magnetic field, আলোকের শিখাকে একটী বৃহৎ পাখার আকৃতিতে পরিবর্ত্তন করে। আলোক শিখার মধ্য দিয়া বায়ু মণ্ডল জোর করিয়া চালিত হয়, এবং এই শিখা Nitrogen এবং Oxygenকে সংযুক্ত করে, এবং যখন এই মিশ্রণ জলের মধ্য দিয়া যায় তখন নাইট্রিক এ্যাসিড. নির্ম্মিত হয়, এবং ইহা পটাস্ potash এর সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকায় ব্যবহৃত হয়।

যখন নাইট্রেট খনি কমিয়া আসিবে, তখন স্বাভাবিক নাইট্রেট অধিকতর মূল্যবান হইবে, এবং কৃত্রিম নাইট্রোজেন উৎপাদনের উপায় অবশ্যই উন্নত হইবে এবং সুলভ হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ লাল সরকার।

সবুজ মক্ষিকার অদ্ভুত জীবনী।

এই জগতে মনুষ্যের অলক্ষ্যে কতই যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? কি প্রাণী রাজ্যে কি উদ্ভিদ্ রাজ্যে আমরা কত যে শিখিবার জিনিষ পাই তাহা অল্প বিস্তর গবেষণার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি।

ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকে আমরা সচরাচর তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি কিন্তু যাঁহারা তাহাদিগের জীবনের ঘটনাবলী একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এই সূক্ষ্মতম মস্তিষ্ক বিশিষ্ট প্রাণিগণ যে কিরূপ বুদ্ধিসহকারে স্ব স্ব কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গে যে সকল বুদ্ধিমত্তা শিল্পচাতুর্য্য ও কার্য্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিপুল কায় প্রাণিগণ ত দূরের কথা, ভগবানের চরম সৃষ্টি, প্রাণী জাতির শীর্ষস্থানীয় মনুষ্যের নিকটও সে সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

অবশ্য সকল কীটের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বহু প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ বুধগণ ইতিপূর্ব্বে বহু কীট পতঙ্গের জীবনের নানাপ্রকার ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া এই বিষয়ে জন সাধারণের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার কাহিনী আজ কাল অনেকেই জানেন। তবে John J. Ward, F.E.S. তাঁহার উদ্যানে এক প্রকার সবুজ বর্ণ মক্ষিকার যে ব্যাপার অব-লোকন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অপর কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মহোদয় লক্ষ্য করেন নাই।

Ward সাহেব তাঁহার উদ্যানে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছিলেন যে প্রত্যেক বৎসরের কোন একটা নিয়মিত সময়ে দুই চারি দিবসের মধ্যে তাঁহার গোলাপ গাছগুলি এক প্রকার সবুজ বর্ণের মক্ষিকার দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। প্রতিবৎসরে ঐ সময়ে এত অল্প কালের মধ্যে কোথা হইতে এত মক্ষিকা আইসে এই বিষয়ে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি সেই মক্ষিকাদিগের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, অবশেষে বহুদিবস ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের অদ্ভুত জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন।

কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই মক্ষিকারা রাশি রাশি জন্মিয়া থাকে এবং কিরূপে বা তাহাদিগের বিনাশ ঘটিয়া থাকে তাহা তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর শরৎকালের শেষ ভাগে এই সকল পক্ষ বিশিষ্ট সবুজ মক্ষিকারা অপরা-পর পতঙ্গাদির মত গাছের পাতার উপরে ডিম পাড়ে। মক্ষিকাদিগের শরীরের মধ্য হইতে এক প্রকার আঠা ডিমের সহিত নির্গত হয়, ইহাদ্বারা ডিম গুলি বৃক্ষশাখায় বা পত্রে লাগিয়া থাকে। ডিম গুলির খোলা অত্যন্ত পুরু ও কঠিন বলিয়া শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। বসন্তের প্রারম্ভে সেই ডিমগুলি ফুটিয়া "বাচ্ছা" বাহির হয়। এই বাচ্ছা গুলি সমস্তই স্ত্রী-জাতীয় এবং ইহাদের পক্ষ থাকে না। তিন চারি দিনের মধ্যে ইহারা বড় হইয়া উঠে। এই ডিম ফুটিয়া পুরুষ জাতি মক্ষিকা জন্মায় না। যদিও পুরুষ জাতির অভাব তত্রাপি উক্ত পক্ষবিহীন নবজাত স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকারা স্বতঃ আবার কতকগুলি পক্ষবিহীন স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকার জন্ম প্রদান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বোক্ত পক্ষ বিহীন স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকাগুলি তাহাদিগের মাতার ন্যায় ডিম না পাড়িয়া জীবন্ত মক্ষিকা প্রসব করে। কীট রাজ্যে ইহা যে এক অভিনব ব্যাপার সে বিষয় আর কোন সন্দেহ নাই যেহেতু অধিকাংশ কীট পতঙ্গাদি ডিম পাড়িয়াই থাকে; কতকগুলি বোল্‌তা ও মাছি জাতীয় পতঙ্গ আছে যাহারা জীবন্ত বৎস প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু এই যে সবুজ মক্ষিকার কথা Ward সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা বৎসরের সকল সময়েই জীবন্ত বৎস প্রসব করিয়া থাকে কেবল

মাত্র শরতের শেষাশেষি ডিম পাড়ে। কিন্তু কিরূপে যে এই ডিম্ব জাত পক্ষ বিহীন স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকাগুলি পুরুষ জাতীয় মক্ষিকার সাহায্য ব্যতীত বৎস গর্ভে ধারণ করে ইহা এক বিশেষ রহস্য জনক ব্যাপার। এই মক্ষিকাগর্ভজাত পক্ষবিহীন স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকা পুনরায় জীবিত বৎস প্রসব করে; তাহারাও চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়া পুনরায় জীবন্ত বৎস প্রসব করে। এইরূপ ব্যাপার বরাবর চলিতে থাকে; তাহার পর যখন একস্থানে বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া স্থানের অভাব বোধ করে তখন তাহাদের পক্ষবিশিষ্ট স্ত্রীজাতীয় বৎস হয়। ইহারা অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া আবার জীবন্ত পক্ষবিহীন স্ত্রীজাতীয় বৎস প্রসব করিতে থাকে; এবং সেখানে আবার যখন বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া একত্রাবস্থানের অসুবিধা বোধ করে তখন পুনরায় একদল পক্ষবিশিষ্ট স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা জন্ম গ্রহণ করে; এবং তাহারা অন্যত্র যাইয়া পুনরায় জীবন্ত পক্ষবিহীন স্ত্রী জাতীয় বৎস প্রসব করে।

শরতের শেষ ভাগে পক্ষবিহীন স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকার শেষ দল জন্মায়; এই মক্ষিকা গুলিই ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের জন্মিবার অব্যবহিত পরেই এক দল পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা জন্মায়। বৎসরের মধ্যে এই এক দল পুরুষ জাতি জন্মিয়া থাকে। এই পুরুষজাতীয় মক্ষিকার সহায়তার পূর্ব্বোক্ত শেষ দল স্ত্রী-জাতীয় মক্ষিকা ডিম পাড়িয়া থাকে; পরে এই দুই জাতীয় মক্ষিকা মরিয়া যায়। তাহার পর পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বসন্তকালে সেই ডিম গুলি ফুটিয়া পক্ষ বিহীন স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা জন্মিয়া থাকে। এবং পুনরায় পূর্ব্ব পুরুষদিগের মত তাহারা জীবন্ত বৎস প্রসব করিতে আরম্ভ করে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমান্বয়ে এই ব্যাপার চলিতে থাকে।

রোমার (Reaumur) নামক জনৈক ব্যক্তি গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক একটি মক্ষিকা তাহাদের জীবিত কালের মধ্যে (অর্থাৎ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে) ছয় শত কোটী মক্ষিকার জন্মের হেতু হইয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ Huxley এই মক্ষিকাদিগের অদ্ভুত বংশ বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলেন যে যদি কেবল মাত্র একটি মক্ষিকার নিম্নতর দশ পুরুষ একত্রিত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ৩॥০ মণ ওজনের ৫০ কোটী মানুষের একত্রে সমাগমে যতখানি সজীব পদার্থ (organic matter) হয় তাহাদেরও একত্রাবস্থানে তত খানি সজীব পদার্থ হইবে। অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডলে যত মনুষ্য আছে তাহাদের তিন অংশের এক অংশে যতখানি সজীব পদার্থ আছে কেবল মাত্র একটি সবুজ মক্ষিকার দশ পুরুষে যত মক্ষিকা হয় তাহাদের একত্র মিলনে ততখানি সজীব পদার্থ হয়। ইহা বড় সামান্য কথা নয়। এক একটি মক্ষিকার যদি এত সন্তান

সন্ততি জন্মে তাহা হইলে সকল মক্ষিকার যাবতীয় বৎসগণ যে সংখ্যায় কত হয় তাহা মানুষের কল্পনাতীত।

এই মক্ষিকাগুলি বৃক্ষের পত্র, কচি কচি ডাঁটা, ফল. ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করে। যদি এক বৎসর এই সমস্ত মক্ষিকা জীবিত থাকে তাহা হইলে সেই দেশীয় সকল গাছ পালা তাহারা খাইয়া ফেলিবে এবং তাহার ফলে উদ্ভিদ ভোজী অপরাপর যাবতীয় প্রাণী খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পড়িবে। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহা ঘটে না। যেমন এই মক্ষিকাদিগের ভূরি ভূরি সংখ্যায় বৎস উৎপাদিত হয় তেমনই বহুতর প্রকারে ইহারা বিনষ্টও হইয়া থাকে। ঝড় কিংবা অন্যান্য কীট ভোজী কীট, পক্ষী বা সরীসৃপ কর্তৃক বহুসংখ্যক মক্ষিকা প্রত্যহ বিনষ্ট হয়।

Ward সাহেব এই সবুজ মক্ষিকাদিগের আর একটি প্রবল শত্রুর বৃত্তান্ত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শুনিলে জনসাধারণ ত আশ্চর্য্য হইবেনই তাহার কোন সন্দেহ নাই উপরন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বহু পণ্ডিতবর্গ বিস্মিত হইবেন। ইহারা অতি সূক্ষ্ম কলেবরবিশিষ্ট বোল্‌তা বিশেষ। এই বোল্‌তাগুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহারা এক সূচের ছিদ্র দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় মক্ষিকা গুলি যে কি উপায়ে বৃহৎ-কলেবর সবুজ মক্ষিকা গুলিকে বধ করে তাহা শুনিলে বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

এই ক্ষুদ্র বোল্‌তাগুলি ডিম পাড়িবার সময় সবুজ মক্ষিকার অন্বেষণ করে, এবং একটিকে নিজ আয়ত্তাধীন করিলে পর তাহা পেটের মধ্যে নিজ ডিম্ব নলিটি (ovipositor) প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটি ডিম পাড়ে; ডিমের সহিত এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হইয়া সবুজ মক্ষিকার শরীরে প্রবেশ করে; দুই চারি মিনিটের মধ্যে মক্ষিকাটি মরিয়া যাইয়া বৃক্ষের ডালে কি পাতায় লাগিয়া থাকে; এইরূপে ক্ষুদ্র বোল্‌তাটি একটির পর একটি করিয়া সবুজ মক্ষিকাকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শরীরের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সবুজ মক্ষিকার শরীরের মধ্যে সেই ডিম ফুটিয়া বোলতার বাচ্ছা বাহির হইয়া থাকে এবং তাহার শরীরের মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করে; তাহার পর যখন বড় হয় তখন যেমন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয় সেইরূপ সেই মৃত মক্ষিকার দেহ কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে সেই ছোট বোল্‌তা বাহির হইয়া থাকে।

এইরূপে বহু সংখ্যক সবুজ মক্ষিকা বিনষ্ট হয়।

Ward সাহেব এই প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন যে এই সামান্য সবুজ মক্ষিকার জীবনী হইতে আমরা প্রচুর শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। তিনি বলেন যে প্রকৃতি

দেবী নানা কার্য্য পরায়ণা হইয়া অনেক সময় অনেক ভ্রম করিয়া থাকেন; তাহার পর যে মুহূর্ত্তে সেই ভ্রম তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া থাকেন।

এই সবুজ মক্ষিকা গুলির যদি এত প্রকার শত্রু না থাকিত তাহা হইলে জগতের এতই অমঙ্গল হইত যে তাহার নির্ণয় করা যায় না। এই সবুজ মক্ষিকাগুলি উদ্ভিদ্ খাইয়া জীবন ধারণ করে; সুতরাং যদি সকল মক্ষিকা গুলি জীবিত থাকিত তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদ্ বিলুপ্ত হইত। এবং ইহাও আমরা জানি যে অন্য সকল প্রাণী, কি পশু কি মানুষ উদ্ভিদ্ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই সময়ে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জীব গুলি ত উদ্ভিদ খাইয়া জীবন ধারণ করে না। কিন্তু সত্য তাহা নহে; বস্তুতঃই তাহারা একরূপ উদ্ভিদ খাইয়াই জীবন ধারণ করে। তাহারা যে সকল জীব বিনাশ করিয়া আহার করিয়া থাকে সে জীব গুলি উদ্ভিদভোজী; উদ্ভিদের অভাবে এই সকল জীবগুলি যদি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারাও (মাংস ভোজী পশু গুলি) অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়িবে। সুতরাং উদ্ভিদ যে প্রাণী মাত্রেরই জীবন-কারণ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এই অসংখ্য সবুজ মক্ষিকা কর্ত্তৃক যদি উদ্ভিদ্ বিলুপ্ত হইত তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল প্রাণীও মৃত্যুমুখে পড়িত; এবং এই জগতে একমাত্র সবুজ মক্ষিকা সজীব থাকিত তাহাও বোধ হয় বহু দিনের জন্য নয়। কিন্তু কিরূপে এই অসংখ্য মক্ষিকার সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রকৃতি দেবী নিজ ভ্রম সংশোধন করেন তাহা আর পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের এই দেশে অনেকেই জানেন যে "পঙ্গপাল" নামক এক প্রকার পতঙ্গ আছে; তাহারা ফসল একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। যখন এক সঙ্গে আকাশে উড়ে তখন তাহারা আকাশ একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; যখন এককালে তাহারা কোন শস্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন তাহারা মানুষের যে কি ক্ষতি সম্পাদন করে, তাহা সকলেরই অনুমেয়। দুই বৎসর বৃষ্টি না হইলে কৃষকেরা যত ভীত না হয় এক দিন মাত্র পঙ্গপাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তাহারা ততোধিক ভীত হয়। কিন্তু কিরূপ সুচারুরূপে প্রকৃতি দেবী স্বীয় রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যেই এই পতঙ্গদল আকাশে উড়ে অমনি পতঙ্গ ভোজী একদল বিহঙ্গ আসিয়া সেই সকল পতঙ্গগুলিকে খাইতে থাকে; এই বিহঙ্গদল বহু সংখ্যক পতঙ্গ নষ্ট করিয়া মানুষের বহু হিতসাধন করিয়া থাকে। কাহার আদেশে এই পতঙ্গভোজী বিহঙ্গম আসিয়া উপস্থিত হয়? কে তাহাদের এ সংবাদ দেয়? এ কার্য্য কাহার?

Ward সাহেব বলেন যে প্রকৃতি দেবী নিত্যই জগতের হিতের জন্য ব্যস্ত থাকেন বটে কিন্তু সময়ে সময়ে নানা ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া একটা একটা ভ্রম করিয়া থাকেন; কিন্তু সে ভ্রম তাঁহার জ্ঞান গোচর হইবামাত্রই তিনি সংশোধন করিয়া দেন।

সুতরাং আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আমরা প্রকৃতি দেবীর নিকট নিয়তই কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার বি,এ।

আধুনিক বালক-বালিকা।

বালক বালিকার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান মানব সমাজ যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, এরূপ বোধ হয় আর কোন কালেই হয় নাই। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে মানবের মূল্য অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ জনক-জননী, গভর্ণমেণ্ট, দেশ হিতৈষী জন সাধারণ ও ধনাঢ্যগণ শিশুজীবন রক্ষা এবং শিশু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন। কতকগুলি ইউরোপীয় রাজ্যে শিশু সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া, সৈন্য বলের অপচয় হইবার ভাবনায় দেশের জন-নায়কগণ ও গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আমেরিকায় শিশু-জীবন রক্ষার জন্য লোকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তথায় নানারূপ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে, এই সমস্ত সমিতির দ্বারা দেশের কত কল্যাণ সাধিত হইতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত সমিতির অভাব হইলে আমেরিকার বহু শত শিশু নষ্ট হইত। নিউইয়র্কে যে প্রধান সভা রহিয়াছে তাহার নাম The New York Child Welfare Committee। ইহার তত্ত্বাবধানে ঐ নগরেই ৯২৪টি শাখা-সভা রহিয়াছে। এই সমস্ত শাখা সমিতির কয়েকটি, মিউনিসিপ্যালিটি, গভর্ণমেণ্ট বা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, অবশিষ্ট সমস্ত সভাই নগরের ধনাঢ্যগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত। প্রতিদিন এই সমস্ত সভা সমিতির শাখা বা নূতন প্রধান সভা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ চলিতেছে।

বৈজ্ঞানিকগণ, চিকিৎসকগণ শিশুর জীবন কি করিয়া সর্ব্বদা সুন্দররূপে রক্ষিত হইবে, ভবিষ্যতে শিশু কিরূপে দেশের গৌরব-স্বরূপ হইবে, তাহার চেষ্টাতেই প্রতিনিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। সন্তান-পালন সম্বন্ধে জনক জননীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বিরচিত হইয়া অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে, বা

বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে নগরের পথ ঘাট যেরূপ বিপজ্জনক হইয়াছে, তাহাতে শিশুর জীবন বিপদাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে, তাঁহারা প্রতিনিয়তই বালক বালিকাগণকে ছবির দ্বারা বিপদ, তাহার কারণ, ও তন্নিবারণের উপায় বর্ণনা করিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

কোন পুস্তকে এইরূপ একটি প্রশ্ন আছে—What is a Child? তাহার উত্তরে লেখা আছে—"An experiment. A fresh attempt to make humanity divine. ... The precise formula for the *Superman*—the just man made perfect, has yet to be discovered. Until it is every birth is an experiment in the Great Research which is being conducted by the Life Force to discover that formula (*G. B. Shaw.*)

বর্ত্তমান কালে আমেরিকার চিকিৎসকগণ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই, কিরূপ খাদ্যে পুষ্ট হইবে, তাহার বিচারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধান বর্ত্তমানে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কেননা ইহার সূক্ষ্ম বিচার না হইলে বর্ত্তমানে উৎপন্ন শিশুর প্রাণ-রক্ষা হয় কেমন করিয়া। সন্তান-জীবনে পিতামাতার প্রকৃতির প্রভাব ইত্যাদি দূরতর কালে প্রয়োজনীয় অথচ অতীব গুরুতর বিষয় সমূহের আলোচনাও অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক খাদ্য সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ এত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদের বিশ্বাস জননীর স্তন্য নানা কারণ-বশতঃ প্রতিনিয়তই হ্রাস পাইতেছে। কাজেই কৃত্রিম খাদ্য ভিন্ন যখন শিশুর জীবন-রক্ষার কোনও উপায় নাই, তখন কৃত্রিম খাদ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ চেষ্টার ফলে পূর্ব্বে শিশুকে নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করিয়া যেরূপ বিপন্ন করা হইত, এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত, এখন সকল শিশুর পক্ষেই একরূপ খাদ্য স্থির না করিয়া, প্রত্যেক শিশুকে পরীক্ষা করিয়া তাহার কিরূপ খাদ্য প্রয়োজনীয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বিভিন্ন জীবের দুগ্ধ অবশ্যই ধর্ম্মে, গুণে ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন। কাজেই বিভিন্ন জীবের দুগ্ধ দানে শিশু প্রতিপালন করা অপেক্ষা যাহাতে জননীগণস্বীয় স্তন্যে শিশু পালিত করিতে পারে তাহার জন্যই বিধিমত চেষ্টা চলিতেছে। কাজেই শিশুর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জননীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ আরও চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে এখন অনেক জননী স্তন্য দানে শিশুপালনে সক্ষম হইতেছে।

বর্ত্তমান শিশু সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। প্রাচীনতা ও নবীনতার সহিত বর্ত্তমানে যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে আচার, ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম, সর্ব্ব বিষয়েই নূতন পুরাতন

হইতে পৃথক না হইয়া বরং তদ্দ্বারা রঞ্জিত হইতেছে। কাজেই সন্তান-পালনের নিয়মেও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সেই জন্য বর্ত্তমান শিশু-হৃদয়ে প্রাচীনকালের অনুরূপ কুসংস্কার বীজের বপন বন্ধ হইতেছে না। সেইজন্যই ধনাঢ্যের আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে। এই সমস্ত কারণের জন্য মানব জাতির যতটুকু উন্নতি সম্ভব হইত তাহা হইতে পাই তেছে না। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন স্বত্তেও কিরূপে শিশু জীবন উৎকৃষ্ট রূপে গঠিত হইতে পারে, তাহার আলোচনাতেই আমেরিকাবাসিগণ মনোনিবেশ করিয়াছেন।

আমেরিকার অনেক রমণী মনে করে যে, সন্তানকে স্তন্য পান না করাইলেও চলিতে পারে। কেননা সে জানে তাহার জননী এইরূপই করিয়াছিল। কাজেই এখন আমেরিকার সকল রমণী যদিও বুঝিয়াছে যে স্তন্য প্রদানে সন্তান প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তিসঙ্গত, তথাপি তাহাদের যেন "ফাঁকি" দিবার প্রবৃত্তি এখনও তিরোহিত হয় নাই। এমন কি চিকিৎসকের গৃহের রমণীগণও এইরূপে ফাঁকি দিয়া থাকে। ধনবতী রমণীগণ স্তন্যের মূল্য বুঝিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা স্তন্যদাত্রী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া সন্তান প্রতিপালন করেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকায় আর একটি প্রথা সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে। অনেক দরিদ্রা রমণী অর্থ বিনিময়ে আপন প্রচুর স্তন্যের মধ্যে স্বীয় সন্তানের উপযোগী স্তন্য রাখিয়া অবশিষ্ট স্তন্য বিক্রয় করিতেছে ইহার দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।

শিশুর খাদ্য বলিলেই প্রধানতঃ মনে হয় যে ২।৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশু যে খাদ্য খাইয়া বলিষ্ঠ হয় তাহাই। এই ২।৩ বৎসর বয়সে শিশু একমাত্র দুগ্ধই পান করিয়া থাকে। এ সময়ে শিশুর খাদ্য-সম্ভারও তত জটীল নহে। কিন্তু ৩ বৎসরের পর হইতে শিশুর বা বালকবালিকার খাদ্য কিরূপ প্রকৃতি ও ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমরা আদৌ আলোচনা করি না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সময় হইতে শিশু নানারূপ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইতে থাকে। এই সমস্ত মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণে জনক জননীও অভ্যস্ত, কাজেই তাঁহারা মনে করেন যে, এই খাদ্য শিশুর নিশ্চয়ই কোনরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে না। এই মিশ্রিত খাদ্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে সংগৃহীত হয়। শিশু প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানাবিধ সাংঘাতিক ও মারাত্মক পীড়ায় সহসা আক্রান্ত হইতে পারে, এবং অভিভাবকের খাদ্য সম্বন্ধে সামান্য অবহেলায় শিশু প্রাণে নষ্ট হইতে পারে, ৩ বৎসর পরে সেই সমস্ত বিপদের ভয় অনেকটা তিরোহিত হয় বলিয়াও অনেক সময় আমরা ৩ বৎসরের পরে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে সেরূপ সতর্কতা অবলম্বনে বিরত থাকি। কিন্তু ৩ বৎসরের পরে শিশু সাধারণতঃ যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা নিতান্তই অন্যায়। এই বয়সে একটা শিশু-

জীবের শরীর রক্ষা ও মানসিক পুষ্টির জন্য যেরূপ খাদ্য আবশ্যক, পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত এইরূপ মিশ্রিত খাদ্য দ্বারা সে প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হইতে পারে না। ইহার ফলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে ৩ বৎসর বয়সে শিশু যেরূপ বলিষ্ঠ, নির্ভীক, সদা হাস্য-প্রফুল্ল ছিল, খাদ্যের গোলযোগ বশতঃ সেই শিশুই ৬ বৎসর বয়সে দুর্ব্বল, সদা কাতর, স্ফূর্ত্তি বিহীন ও ক্রন্দন পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এই সময়েও অর্থাৎ ৩ বৎসর হইতে অন্ততঃ ১০ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর খাদ্যের দিকে রীতিমত লক্ষ্য রাখা উচিত। যেরূপ মিশ্রিত খাদ্য শিশুর পক্ষে উপকারী তাহা অভিজ্ঞগণের পরামর্শানুসারে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

খাদ্য সম্বন্ধে যদিও বা কোন কোন অভিভাবকগণ বিশেষ সাবধান হয়েন, তাহা হইলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ আমোদ প্রমোদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সমস্ত আমোদ প্রমোদে জনক জননী বা বয়স্ক লোক যোগ দান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, শিশুর বা বালক বালিকার নিকট তাহা আনন্দদায়ক নহেই, বরং এরূপ আমোদ উপভোগে সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিশুর খেলা যাহাতে সর্ব্বাংশে শিশুর উপযোগী হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য, যাহাতে শৈশব কল্পনার কোনও রূপ ব্যাঘাত না হয়, তাহা লক্ষ্য করা উচিত, যাহাতে শিশু আনন্দপ্রদ দ্রব্যের সমস্ত অংশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, তাহা করাই আবশ্যক। খেলনার ন্যায় শিশুর আনন্দদায়ক জিনিষ আর হইতেই পারে না। তাহাকে একটা কাঁসর দাও আর লাঠী দাও, সে সমস্ত দিন কাঁসরে লাঠী ঠুকিয়া গৃহস্থকে বিরক্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু তাহার বাদ্য সম্বন্ধে শৈশব কল্পনার কোন ব্যাঘাত হইবে না। কাঁসরকে সে যেরূপ ইচ্ছা ঠুকিতে পারিবে, আছড়াইতে পারিবে, তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে পারিবে, সে একটা ঘা দিয়াই বুঝিতে পারিবে, এরূপ আঘাতে শব্দ উত্থিত হয়। কিন্তু পিয়ানোর জটীলতা বোঝা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাকে একটা এক পয়সার বাঁশী দিলে মনের সুখে ফুঁ দিয়া বাজাইবে, কিন্তু ক্ল্যারিয়নেটের জটীল ফুঁ তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় বালক বালিকার আমোদ প্রমোদের জন্য নানারূপ আড়ম্বর পূর্ণ আয়োজন করা হয়। ইহার সুফল সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ আমোদে শিশু প্রবৃত্তি পূর্ণ হয় না, তাহার কল্পনা স্ফুরিত হয় না, আমোদের জটীলতায় তাহার অন্তরেও স্ফূর্ত্তি হয় না। হয় ক্লান্ত এরূপ আমোদ প্রমোদের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে অথবা তাহার উপযোগী আমোদ প্রমোদের বস্তু অনুসন্ধান করিবার জন্য ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, অথবা নিতান্ত বুদ্ধিহীনের ন্যায় চুপ করিয়া থাকে। এরূপ আমোদে তাহার প্রকৃত আমোদ হয় না, তাহার শৈশব সময়ের অপব্যয় করা হয় এবং যে সময় সে প্রকৃত শিক্ষায় ব্যয়িত করিতে পারিত, তাহার অপব্যয় হয়। আমেরিকার

এইরূপ ভাবে শিশুকে আমোদ প্রমোদে যোগদান করাইবার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা এরূপ আমোদ প্রমোদে শিশুগণকে সঙ্গী করি কেন? তাহার প্রধান কারণ আমাদের অজ্ঞতা; আমরা মনে করি "আমরা থিয়াটারে, সার্কাশে, বায়স্কোপে, নাচ গান দেখিতে যাইব, আর আমাদের প্রিয়তম শিশু সন্তান তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে?" অনেক জননী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বুকে করিয়া থিয়াটারে গিয়া থাকেন! কি ভয়ঙ্কর অন্যায়! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ অন্যায় কার্য্য আর হইতেই পারে না! ইহা দ্বারা শিশুর ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতে পারে। শিশু স্বভাবতঃই নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এইরূপ ভাবে জনসমাগমে শিশুকে লইয়া যাইলে নানারূপ সাংঘাতিক সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ সম্ভব।

বাল্যাবস্থায় শিশুর যে কোন অভ্যাস দৃঢ় হইয়া উঠে। এই সময়ে নানারূপ সৎ-কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন পরম মঙ্গলময় হইয়া উঠে। অনেক জননী শিশুকে এইরূপে পরম যত্নে লালন পালন করেন বটে কিন্তু অতি সামান্য ২১টি ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করেন না। অনেক শিশু নিজ হস্তাঙ্গুলী চোষণ করিবার অভ্যাস করে, কিম্বা যে কোন খেলনা, ধূলি স্পৃষ্টই হউক বা যেরূপই হউক না কেন তৎক্ষণাৎ মুখে পুরিয়া দেয়। এই কদভ্যাস ক্রমে এরূপ প্রবল হয় যে, বয়স্ক শিশুর সংশোধন জন্য বেত্রদণ্ড প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই অসাবধানতার জন্য শিশু নানারূপ রোগাক্রান্ত হইতে পারে, এবং তাহার সহসা মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। অথবা শিশু এরূপ ভাবে পীড়িত হইতে পারে যে, সেই পীড়ার প্রকোপ সমস্ত জীবনেও নষ্ট হয় না।

শিশু প্রতিপালন বিষয়ে যত প্রকার বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনাই শীর্ষ স্থানীয়। শিশু-খাদ্যের প্রধান সামগ্রী দুগ্ধ। এই দুগ্ধ অভাবে প্রতি দেশের শত শত শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অনেক পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত জনক-জননী শিশু-সন্তান লইয়া নগরাঞ্চলে বাস করে। ইহাতে কুফল ভিন্ন সুফল হইতেই পারে না। পল্লীগ্রামে অল্প ব্যয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ দুগ্ধ সহজ লভ্য, নগরাঞ্চলে সেরূপ কখনই নহে। তথাপি কেন যে তাঁহারা শিশুকে নগরে লইয়া আইসেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ইউরোপ, আমেরিকা, ইত্যাদি মহাদেশে দুগ্ধ দ্বারা গাভীর যক্ষ্মা ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি শিশুতে সংক্রামিত হয়। আমাদের দেশে চিকিৎসকগণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় গাভীর যক্ষ্মা নাই, কাজেই গাভীর যক্ষ্মা শিশু শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অধিকন্তু শিশুকে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিয়া বা ফুটাইয়া খাওয়ান হয়, সেই জন্য দুগ্ধে উৎপাদিত নানারূপ রোগ বীজাণু স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু কে বলিতে পারে

যে সহরের কদর্য্য স্থানে প্রতিপালিত গাভীর যক্ষ্মা হইবে না। পল্লীগ্রামের গাভীর যক্ষ্মা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রশস্ত মাঠ, নির্দোষ বায়ুমণ্ডল ;— ইহাতে রোগীর রোগ নষ্ট হয়, স্বাস্থ্যবানের পীড়ার সম্ভাবনা কোথায়! বর্ত্তমান বঙ্গে পল্লী-অঞ্চলের একমাত্র দুঃখ ম্যালেরিয়া। যদি শিশু ও শিশুর জননীকে একটু সাবধানে রাখা হয়, তাহা হইলে উভয়েই ম্যালেরিয়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর পল্লীগ্রামে থাকাই উচিত।

আমাদের দেশের শিশু সন্তানকে অধিকাংশ স্থলেই মোজা বা পায়ের কোন আবরণ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। ইহার দ্বারাও শিশুর নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। গ্রীষ্ম কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, শীত কালের প্রারম্ভে বা অবসানে, যখন জনক জননীই গরম কাপড় চোপড় ব্যবহার করিতে থাকেন, তখনও শিশুর পদযুগল অনাচ্ছাদিত থাকে। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুর মস্তক সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত কিন্তু পাদুটিতে কোনও আবরণ নাই। ইহাও নিতান্ত অন্যায়। আমরা সাধারণতঃ স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে জল দিয়া, পরে জলে অবতরণ অর্থাৎ পা প্রবেশ করাইয়া থাকি। প্রথমে পা জলে দিলে পা শীতল হইয়া যায়, মস্তক উত্তপ্ত থাকে, শীতল স্থান হইতে শোণিত বেগে উত্তপ্ত স্থানে অর্থাৎ মস্তকে প্রবেশ করে। মস্তকে শোণিতাধিক্য হওয়া অত্যন্ত মন্দ। অতএব শিশুর মস্তক ঢাকিয়া দিয়া পদযুগল খুলিয়া রাখিলে শিশুর শীত নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগা, সর্দ্দি কাশি হওয়া অসম্ভব নহে। বরং পা, গল-দেশ, কর্ণ-মূল রীতিমত আবৃত করিয়া মস্তক খুলিয়া রাখিলে অপকার হইতে পারে না। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও এরূপ ভাবে শৈশবে মোজা ব্যবহার করেন নাই, অথচ তাঁহারা বেশ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী ছিলেন। সাঁওতাল, ভিল, ইত্যাদি এখনও এরূপভাবে শিশুর শরীর রক্ষা করে না। ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, আমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম ও গুণ দুইটি জিনিষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি পিতৃ মাতৃত্ব বা heridity এবং অন্যটি স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা environment। সাঁওতালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পিতৃ মাতৃত্ব আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র; কাজেই কাহারও সহিত কাহারও তুলনায় পরিমাণ করা অসম্ভব ও অযুক্তিসঙ্গত।

আমাদের দেশের শিশুর অঙ্গ আবরণ সাধারণতঃ কিরূপ, ঋতু-ভেদেই বা তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা গৃহস্থমাত্রেই অবগত আছেন ;—অর্থাৎ কোন কালেই, শিশুর অঙ্গে উপযুক্ত আবরণ উঠে না। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমস্ত দেশে জননী শিশুকে সুন্দর দেখাইবার জন্য হাফ মোজা ব্যবহার করাইয়া থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ অর্দ্ধ আবরণেরও বিরুদ্ধবাদী। যাহাতে

শিশুর পদযুগল সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থাকে, তাহার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। জনক জননীকে ফুল মোজা ব্যবহারের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন। ফুল মোজা ব্যবহারে কতটুকু উপকার হইতে পাবে দেখা যাউক। প্রথমতঃ পদযুগল উত্তপ্ত থাকে বলিয়া মস্তক হইতে শোণিত প্রবাহ নিম্নাভিমুখী হয়। দ্বিতীয়তঃ পদযুগল শীতলতা সংস্পর্শে আসিয়া শরীরের অনিষ্ট করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ শরীর উপযুক্তরূপে আবৃত রাখিলে, শরীর হইতে অযথা উত্তাপ বিনির্গত হইয়া যাইবার অবসর পায় না। এতদ্ব্যতীত আরও নানারূপ উপকার রহিয়াছে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াদুষ্ট স্থানে শরীর বেশ উপযুক্ত রূপে এবং ঋতু উপযোগী আচ্ছাদনে আবৃত থাকিলে, মশকাদির দংশন হইতে শিশু পরিত্রাণ পাইতে পারে, কাজেই তাহার শরীর খারাপ হইতে পায় না। অনেক চিকিৎসক দুর্ব্বল শিশুকে ফুল মোজা পরাইয়া এবং শরীরে উপযুক্ত জামা আদির আচ্ছাদন দিয়া সবল ও সুস্থ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ আচ্ছাদন দিলে শরীরের উত্তাপ বহির্গত হয় না কাজেই শরীরের কার্য্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকায় শিশু শিক্ষার প্রণালী আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে এখন যে পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রণালী পরিচালিত হয়, বহু প্রাচীন কালে আমেরিকা ইত্যাদিতেও সেই প্রণালীতে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইত। আমাদের শিশুর ন্যায় তখন তাহাদের শিশুও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পাঠশালায় গমন করিত এবং সুযোগ পাইলেই পলায়ন করিত। তখন গুরু শিষ্যে বেত্র দণ্ডের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখন আমেরিকায় শিশু আনন্দের সহিত পাঠশালায় গমন করে, সে পুস্তক হাতে করিয়াই আনন্দে নৃত্য করে, সে শিক্ষককে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এখন শিক্ষক নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় শিশুর সহিত ব্যবহার করেন। কাজেই শিশুর শিক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, এবং ভবিষ্যৎ জীবন এই শৈশবেই অনেকটা গঠিত হইয়া উঠে। স্কুলে গমন করিয়া শিশু যেরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বোধ হয় গৃহে থাকিয়া সেরূপ হয় না। এখন পাঠ্য পুস্তক এরূপ পরিবর্ত্তিত ও শিশু জনোচিত হইয়াছে যে শিশুর নিকট পাঠ কষ্টকর নহে, বরং পরম আনন্দ দায়ক। নূতন প্রণালী, শিশু চিত্তের উৎকর্ষ বিধান, অল্পকাল ব্যাপী শিক্ষা প্রদান, নব নব বিষয়কে অভিনব প্রণালী দ্বারা মনোজ্ঞ করণ, কঠিন এবং সহজ ক্যার্য্যের অনুবর্ত্তিতা, মুক্ত বাতাস, স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম, ইত্যাদি আজ কালকার আমেরিকান শিশু পাঠশালার বিশেষত্ব। কাজেই শিশুর বিদ্যালয়ে গমন আনন্দ দায়ক। এইরূপ হইলে, তবে জ্ঞান লাভের জন্য মানবের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তি শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য অথবা আধুনিক শিশুর সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ-সাধন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা মানব সমাজের পূজ্য ও বরণীয়। তাঁহারা গ্রাম্য পাঠশালায় এবং

নাগরীক পাঠশালায় শিক্ষার পার্থক্য বিধান করিয়া দিয়াছেন। গ্রাম্য পাঠশালার শিশু-গণকে ফল, ফুল, গাছ, পাতা, জমী, শস্ত, কৃষি ইত্যাদি সম্বন্ধে অধিক শিক্ষা দেওয়া হয়, কেননা ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত বিষয়ই অধিক আলোচনা করিতে হইবে। সেইরূপ নগরের শিশু, শিল্প, বাণিজ্য, কারখানা ইত্যাদি সম্বন্ধেই অধিক-তর শিক্ষা পায়। এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে শিশু শিক্ষার অবস্থা লক্ষ্য করিলে শিক্ষার ব্যভিচার হইতেছে বলিয়া মনে হয়। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক মূর্খ, সেই আবার উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা দেয়। শিক্ষাও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষা কালে বালক বা যুবক জ্ঞান ভারে না হউক পুস্তক ভারে অবনত হইয়া পড়ে। কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকের উচ্চাভিলাষ নাই, তাহার চরিত্র গঠিত হয় না, তাহার কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, শরীর নিতান্ত জীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। শিক্ষায় তাহার উপকার করে না,—প্রভূত অপকার করে, তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকানগণ দেখিলেন যে বালিকার শিক্ষা বালকের অনুরূপ হওয়া উচিত নহে; আরও দেখিলেন, যে জননী কন্যাকে নানা কারণে স্ত্রী জনোচিত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দেশ হিতৈষী মহাপ্রাণগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াই বালিকা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। যাহাতে বালিকা ভবিষ্যত জীবনে গৃহকর্ম্ম নিপুনা, সন্তান পালনক্ষমা হইতে পারে তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে মাতৃভাব বিকশিত হয় এরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমেরিকানগণ শিশুর মূল্য বুঝিয়াছেন। শিশুই যে দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল তাহা তাঁহারা বুঝিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের উপযুক্ত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। বিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ণ করিতেছেন। তাঁহারা শিশুর জন্য যাহা করিয়াছেন এবং যাহা করিতেছেন তাহা সর্ব্ব দেশের অনুকরণীয়। আমেরিকার ন্যায় সম্পত্তিশালী দেশ আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহারা ধনে পুত্রে লক্ষ্মী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শিশু যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে মানব নামের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের আশাও সফল হইবে। আমেরিকায় শিশুকে ধাত্রী বা জননী সদুপদেশ শিক্ষা দেন, আর আমাদের দেশের শিশু পিতামহী বা মাতামহীর নিকট রূপ কথাচ্ছলে মিথ্যা, অন্যায় অত্যাচারীর বশানুবর্ত্তিতা, বিশ্রী গল্প, সর্ব্বকার্য্যে উত্তমহীনতা, নিষ্ঠুর অদৃষ্টবাদ, ভীরুতা ইত্যাদি শিক্ষা করে। এই শৈশবেই শিক্ষা এরূপ বীভৎস হইয়া উঠে যে আমাদের বালক-বালিকা পতি-পত্নীর সম্পর্ক একটা জঘন্য ঠাট্টার বিষয় বলিয়া মনে করিয়া লয়।

আমাদের দেশের অপেক্ষা সে দেশের শিশু সন্তান বাপ মাকে অধিক ভক্তি করিতেছে; বাপ মাকে ভয় করে না, বাপ মাও কখন অন্যায় আদেশে তাহাদিগকে

ব্যাকুল বা অশান্ত-চিত্ত করিয়া তুলে না। সন্তান জনক-জননীকে গুরু, বন্ধু, বা পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের ন্যায় মনে করে। আমাদের দেশে এক সময়ে ইহাই ছিল, এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের দেশের সন্তানের স্বাধীনতা নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন সংবাদ পত্রে শিশু সম্বন্ধে এইরূপ একটি কথা লেখা ছিল :—

Whatever our theory or no theory may be, our practice is to treat the child as the property of its immediate physical parents, and to allow them to do what they like with it as far as it will let them. It has no rights, no liberties, in short, its condition is that which adults recognise as the most miserable and dangerous politically possible for themselves: namely, that condition of slavery.

আমাদের দেশের জনক জননী বলেন :—

I am one of the successes of the Almighty, therefore imitate me in every particular, or I will take the skin off your back."

আমরা বলিয়া থাকি—ঐ এত বড় লোকের ছেলের কি অধঃপতন দেখিতেছ! কিন্তু এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে?—জনক জননী বা ছেলের অভিভাবক। তাঁহারা যদি সুশিক্ষা দিতেন, অন্যায় আদরে তাহার সুকুমার প্রবৃত্তি বিশৃঙ্খল করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে তাহার অধঃপতন কখনই সম্ভবপর হইত না। এতদ্ব্যতীত জনক জননীর যে কার্য্যে দক্ষতা এবং প্রবৃত্তি রহিয়াছে, সন্তানের সেরূপ না হওয়াও সম্ভব। চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎসক না হইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসক সন্তানকে চিকিৎসক করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠেন। সন্তানের মনের গতি কোন দিকে তাহা লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিলে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যদি তাহার স্বভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিহত হয়, তাহা হইলে তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য।

আমরা দেখিতেছি যে আমেরিকাদি বৈজ্ঞানিক দেশে শিশুর প্রকৃত শিক্ষার জন্য জনসাধারণ, গভর্ণমেণ্ট, জনকজননী রীতিমত চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা শিশুকে আধুনিক যুগের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য শিশুর প্রত্যেক ত্রুটি নষ্ট করিয়া দিতেছেন, তাহার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশ এমন গুরুতর বিষয়ে নিতান্তই অবহেলা করিয়া বসিয়া আছে।

আমাদের দেশে শিশু শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইবার নানারূপ অন্তরায় সহসা তিরোহিত হইতে পারে না। কাজেই যতদিন আমাদের জনকজননী শিশুর-শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষার দুরবস্থা নষ্ট হইবে না।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট আলোক-রশ্মি ও রোগ-বীজাণু।

বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন যে শ্বেত আলোক রশ্মি ৭টি বিভিন্ন বর্ণের আলোক দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ শ্বেত বর্ণ ৭টি বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টি। এই সাতটি বর্ণ বেগুনিয়া (violet), ইণ্ডিগো (indgo), নীল (blue), হরিৎ (green), পীত (yellow), কমলা (orange) এবং লোহিত (red)। শুভ্র আলোক বিশ্লিষ্ট করিলে, যে সাতটি বিশ্লিষ্ট বর্ণের আলোক পাশাপাশি সজ্জিত হয়, তাহার এক প্রান্তে লোহিত এবং অন্য প্রান্তে বেগুনিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বেগুনিয়া ও লোহিত বর্ণের আলোকের পরেও আলোক রশ্মি থাকে বটে, কিন্তু তাহা আমাদের নয়নগোচর হয় না। বেগুনিয়া প্রান্তের এই চক্ষুর অগোচর আলোক রশ্মিকে "বেগুনিয়া অতীত" বা আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি বলে। আলোক রশ্মি মাত্রেই ইথারে তরঙ্গোৎপাদন করিয়া প্রবাহিত হয়। উক্ত সাত বর্ণের আলোকের প্রত্যেকটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা আছে। প্রত্যক্ষীভূত সপ্তালোকের মধ্যে লোহিত আলোকের তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বেগুনিয়া তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। কাজেই বেগুনীয়া অতীত আলোক রশ্মির তরঙ্গ আরও ক্ষুদ্রতর।

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বেগুনিয়া অতীত আলোক রশ্মি রোগ-বীজাণু ধ্বংস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অল্প বলিয়া এই রশ্মি-সমূহ অতি শীঘ্র বায়ুমণ্ডল বা অন্য পদার্থ দ্বারা শোষিত হইয়া যায়; কাজেই তাহারা পৃথিবীতে পতিত হইবার অবসর পায় না। তবে একবারেই যে বেগুনীয়া অতীত আলোকরশ্মি পৃথিবীতে উপস্থিত হয় না, তাহা নহে, কিন্তু যাহা আইসে তাহা অতি সামান্য। কিন্তু বায়ুমণ্ডল যদি ঘন না হয়, তাহা হইলে এই রশ্মি অধিকতর শোষিত হয় না। উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশের বায়ু মণ্ডল তত ঘন নহে। সুতরাং পার্ব্বত্যপ্রদেশে যত বেগুনিয়া অতীত রশ্মি পতিত হয় সমুদ্র কুলবর্ত্তী বা অল্প উচ্চ প্রদেশে তত হয় না। এই জন্য উচ্চ প্রদেশ সমূহের রোগবীজাণু এই এই রশ্মির দ্বারা অধিক ধ্বংশ হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ এক্ষণে এই বেগুনিয়া অতীত আলোকরশ্মি মানব-শরীরে প্রবেশ করাইয়া অভ্যন্তরস্থ রোগবীজাণু নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মারকারি কোয়ার্টজ (mercury quartz) দ্বারা শুভ্র আলোক উৎপাদন করিলেন। পরে তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাহার বেগুনিয়া অতীত আলোক রশ্মিকে মনুষ্যের শরীরে

পাতিত করিলেন। কিন্তু মানবের শরীর যথেষ্ট স্থূল বলিয়া শরীরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই এই রশ্মি শোষিত হইয়া যায়। তবে যে সমস্ত রোগবীজাণু শরীরের উপরিভাগে বা গাত্রে বর্ত্তমান থাকিয়া পীড়া উৎপাদন করে, তাহাদিগকে এই বেগুনিয়া অতীত আলোক রশ্মি দিয়া ধ্বংস করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মুখ, নাসিকা, ইত্যাদি স্থানের রোগবীজাণু এইরূপে বেশ ধ্বংস হইতেছে। জারমানীর চিকিৎসক অধ্যাপক ক্রিডেনবারগার এবং জাপানীর চিকিৎসক ডাক্তার শিয়োগী এই সম্বন্ধে রীতিমত পরীক্ষা করিতেছেন। তাহারা খরগোস লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। একটী খরগোসের মুখে পূর্ব্বোক্ত মারকারী কোয়ার্টজ ল্যাম্প প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। মুখে প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম আলোক পাওয়া যাইতে পারে। কয়েক মিনিট পরেই খরগোসের মুখের বীজাণু অনেক হ্রাস পাইল, এবং ২০ মিনিট পরে একবারেই ধ্বংস হইল। তাহারা এইরূপে ডিপ্-থিরিয়া ইত্যাদি রোগের বীজাণু ধ্বংস করিয়াছেন। এইরূপ প্রণালী অবলম্বনের প্রধান অসুবিধা এই যে, আলোক মুখে নিরবচ্ছিন্ন দশ মিনিট রাখিবার পরেই মনে হয় যেন গাল পুড়িয়া যাইতেছে।

বিবিধ।

শ্যামন মৎস্তের দেশান্তর গমন।—নানাবিধ পক্ষী ঋতুভেদে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। কিন্তু কোন কোন জাতীয় মৎস্তও এইরূপে সময়ে সময়ে স্থানান্তর গমন করে। শ্যামন মৎস্ত এইরূপে দেশ পারভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা গর্ভাধান জন্য ইহাদের স্বাভাবিক আবাস গভীর সমুদ্রের তলদেশ পরিত্যাগ করিয়া নদীর উপরের দিকে গমন করিতে থাকে। অধ্যাপক এম লুই বাউলে ইহার কারণ সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জলে যে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তাহা অধিক পরিমাণে পাইবার জন্য শ্যামন মৎস্ত গভীর সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া নদীর মধ্যে প্রবেশ করে। গভীর সমুদ্রের তলদেশের জলে যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অল্প গভীর নদীর জলে অধিক অক্সিজেন থাকে। গর্ভোৎপাদন কালে স্ত্রী বা পুং উভয়বিধ শ্যামন মৎস্তই অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

ত্রিনেত্র মৎস্ত।—টমাস্ কেনিয়ন (Thamas Kenyon) উইণ্ডসারে (windsor) মৎস্ত ধরিবার সময় ডেস্ (dace) নামক একটি মৎস্ত ধরিয়া দেখেন যে মৎস্তটি ত্রিচক্ষু-

বিশিষ্ট। দুইটি চক্ষু স্বভাবতঃ যেরূপ হয় সেইরূপ, তৃতীয় চক্ষুটি তাহার একদিককার নাসিকার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে।

সরীসৃপের মধ্যে Hatteria নামক টিক্‌টিকি জাতীয় কতকগুলি জীব আছে এবং মৎস্য জাতির মধ্যে Lamprey নামক এক জাতি আছে স্বভাবতঃই ইহারা ত্রিচক্ষু বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের তৃতীয় চক্ষু মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। কিন্তু এই মৎস্যটির তৃতীয় চক্ষু যেরূপ স্থানে অবস্থিত তাহা একেবারেই অস্বাভাবিক কেন তাহা বলিতেছি। সকল জীবের মস্তিষ্কের উপরি ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে পাইনিয়াল পদার্থ (Pineal body) নামক মস্তিকাংশ থাকে; উপর্যুক্ত সরীসৃপ ও মৎস্যের এই পাইনিয়াল পদার্থটি বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া ললাটের অস্থি ভেদ করতঃ তৃতীয় চক্ষুরূপে অবস্থান করে। সেই জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ যাবতীয় মহোদয় বর্গ পাইনিয়াল পদার্থের কথা আলোচনা করিবার সময় এই কথা বলেন যে ইহাই অবস্থা ভেদে তৃতীয় চক্ষুতে পরিণত হয়। মস্তিষ্কে এমন অপর কোন অংশ নাই যাহা কোন প্রকারে তৃতীয় চক্ষুতে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং যদি কোনও জীবের তৃতীয় চক্ষু থাকে তাহা হইলে তাহা ললাটের কিম্বা মস্তকের মধ্য দেশে হওয়াই সম্ভব। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে কেনিয়ন সাহেব যে মৎস্যটি ধরিয়াছেন তাহার তৃতীয় চক্ষুটি অস্বাভাবিক স্থানে অবস্থিত। জানি না আর কেহ এরূপ ত্রিনেত্র বিশিষ্ট মৎস্য দেখিয়াছেন কি না।

জীবাণুর দীর্ঘায়ু—কতকগুলি "ছাতা" (fungus) জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ আছে যাহারা জলাভাবে ২০ ২২ দিন জীবিত থাকে। কতকগুলি বীজাণু (bacteria) বায়ু সংস্পর্শ বিরহিত হইয়াও কেবল মাত্র জল সংস্পর্শে ১৫।২০ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ১৯০৮ সালে জনৈক ব্যক্তি কতকগুলি পাত্রে কিছু জল ও কিছু Protozoa রাখিয়া তাহাদিগের মধ্যকার বায়ু বাহির করতঃ তাহাদিগের মুখবন্ধ করিয়া রাখেন। তিনি সম্প্রতি সেগুলিকে খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবাণুগুলির কোন নির্দ্দেশই পান নাই বটে তবে কতকগুলি Amoeba নামক জীবাণু কঠিন আবরণে (cyst) আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এই গুলি ৫।৬ দিনের মধ্যেই ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কলিকাতা, ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ।) মার্চ্চ, ১৯১৪। (৩য় সংখ্যা।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাস যথাসম্ভব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি বোধসৌকর্য্যার্থে অতি সংক্ষেপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়-গণের সময় হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাস পুনরালোচিত হইল।

তড়িতের ইংরাজি নাম "ইলেক্‌ট্রিসিটী" (Electricity) বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট কর্ত্তৃক গ্রীক বাক্য ইলেক্‌ট্রন (Electron) অর্থাৎ তৃণমণি (amber) হইতে গৃহীত হইয়াছে। তৃণমণির পারসিক নাম "কারুবা" অর্থাৎ তৃণাকর্ষক *। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের বহু ব্যক্তি অবগত ছিলেন যে, তৃণমণি (amber) ঘর্ষিত হইলে, পক্ষ, তৃণ ইত্যাদি অতি লঘু পদার্থসমূহকে আকর্ষণ করে। থিয়োফ্রাস্‌টাস্‌ এবং প্লিনি লক্ষ্য করেন যে, লিনকিউরিয়াম (Lyncurium) নামক অন্য আরও একটি পদার্থ এইরূপে লঘু পদার্থসমূহকে আকর্ষণ করে। এই লিনকিউরিয়াম সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের টুর-মালিন (tourmaline)। আরিষ্টটল্‌ এবং প্লিনি তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মৎস্য জাতীয় টরপিডো (torpedo) নামক এক প্রকার জলচর প্রাণী স্বীয় খাদ্য-জীবের পেশী সমূহকে অবসন্ন করিয়া শীকার করিয়া থাকে। তাঁহারা আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে, গেঁটে বাত (gout), ইত্যাদি প্রশমিত করিবার জন্য বাতগ্রস্ত স্থানে এই মৎস্য প্রযুক্ত হয়। ইউস্‌ট্যাথিয়াসের (Eustatheus) গ্রন্থে মাত্র উল্লিখিত আছে যে, মানব শরীর, বিশেষতঃ কেশ ঘর্ষিত হইলে সময়ে সময়ে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে।

* Fundamental Phenomena of Electricity—by Dr. Sircar.

কিন্তু এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক আছে কি না, অথবা ইহাদের সহিত মেঘমণ্ডলের বিদ্যুতের কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা কুত্রাপি উল্লিখিত নাই। ভগবান জুপিটারের বজ্রের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, লুক্রেশিয়াস্ বলিয়া গিয়াছেন যে, এই সমস্ত বজ্র ঐশ্বরীক কি না, তাহা সন্দেহ স্থল,—কেন না দেব-মন্দির সমূহেও, এমন কি জুপিটারের মন্দিরে পর্য্যন্ত ইহা প্রচণ্ড বেগে আপতিত হয়*।

তড়িতের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয় কল্পিত হইয়াছিল। এই সকল আনুমানিক মীমাংসা গ্রন্থাবলীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তথাপি মধ্য যুগের পূর্ব্বে তাড়িৎ বিজ্ঞানের কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। অবশেষে কল্‌চেষ্টার নিবাসী ডাক্তার গিলবার্ট নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহা সত্য কি না, এবং এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় কি না তাহা বুঝিবার জন্য, তড়িৎ বিজ্ঞানের প্রাচীন পরীক্ষাগুলি পুনঃ সম্পাদন করিলেন। তাঁহার পরীক্ষা সুসম্পাদিত করিবার জন্য কতকগুলি অতিলঘু ধাতব সূচী গ্রহণ করিলেন। এই সূচীগুলি সূচ্যগ্র দণ্ডের উপর স্থাপন করিলেন। নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া তিনি তড়িৎপ্রসূ কয়েকটি পদার্থের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ধাতব পদার্থ বা অকৃত্রিম চুম্বক ঘর্ষিত হইলেও তড়িন্ময় হয় না অর্থাৎ অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিবার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, যে দিবস মেঘ থাকে না, যে দিবস বেশ পরিশুষ্ক এবং যে দিন পূর্ব্ব-বায়ু বহিতে থাকে, সেই দিনেই তড়িতের নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ প্রদর্শিত হইবার উপযুক্ত দিবস†। অতঃপর রবার্ট বয়েল কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৈজ্ঞানিক মহাসভা রয়াল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে নরপতি দ্বিতীয় চার্লস্ এই সভাকে রাজকীয় করিয়া লইলেন। রবার্ট বয়েল এই সভার সদস্য হইলে পর তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং গিলবার্ট আবিষ্কৃত তড়িৎপ্রসূ দ্রব্য তালিকায় আরও কয়েকটি দ্রব্যের নাম সংযুক্ত করিলেন। ম্যাগ্‌ডিবর্গের বিচারপতি স্বনামধন্য অটোভন্ গেরিক্ লক্ষ্য করিলেন যে, কোন পদার্থ অধিক তড়িন্ময় হইলে তাহা হইতে আলোক ও শব্দ নির্গত হয়। তিনি একটি গন্ধক নির্ম্মিত গোলককে অক্ষদণ্ডে সংস্থাপন করিলেন; এবং ঘুরাইবার সময় হস্ত দ্বারা গোলকটিকে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাই সর্ব্বপ্রাথমিক তড়িৎ যন্ত্র। এই যন্ত্র দ্বারা তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন। অবশেষে তিনি এই আবিষ্কার করিলেন যে, কোন লঘুপদার্থ তড়িন্ময় পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তড়িন্ময় পদার্থে স্পৃষ্ট হইলেই লঘু পদার্থটি

---

* Whetham.

† Whetham.

সেই তড়িন্ময় পদার্থ হইতে বিপ্রকৃষ্ট হয়। অতঃপর এই লঘু পদার্থে অন্য পদার্থ স্পর্শ করিলেই তাহা পুনরায় আকৃষ্ট হইবার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। মহামতি হুইলার তড়িন্ময় কাচদণ্ড দ্বারা তড়িৎ পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবার সময়, ষ্টিফেন্ গ্রে'র সহিত এক-যোগে তড়িৎ-পরিচালক (conductor) ও তড়িৎ-প্রতিরোধক (non-conductor) পদার্থের তড়িৎঘটিত ধর্ম্মসমূহ আবিষ্কার করিলেন। প্রায় ঐ সময়েই ফ্রান্সদেশের ডুফে (Dufay) লক্ষ্য করিলেন যে, দুইটি লঘু পদার্থ তড়িন্ময় কাচদণ্ডকে স্পর্শ করিবার পরে পরস্পরকে বিপ্রকৃষ্ট করে, সেইরূপ তড়িন্ময় রঞ্জনদণ্ডকে স্পর্শ করিবার পরেও উভয়ে বিপ্রকৃষ্ট হয়। কিন্তু কাচদণ্ড স্পৃষ্ট কোন পদার্থ, রঞ্জন দণ্ড স্পৃষ্ট অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে। সেই হইতে তিনি দুই প্রকার তড়িৎ রহিয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন; এবং কাচ-তড়িতের কাচোদ্ভবতড়িৎ (vitrious) ও রঞ্জন-তড়িতের রঞ্জনোদ্ভব-তড়িৎ (resinous) এইরূপ নাম রাখিলেন।

ক্রমে তড়িৎ ঘনীভূত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। তড়িৎ শক্তি নিঃসারিত হইয়া যায় দেখিয়া এই প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। মুক্তবাতাসে অথবা আর্দ্র বাতাসে তড়িৎশক্তি ধীরে ধীরে নিঃসারিত হয়। অতঃপর তড়িৎশক্তিকে তড়িৎ প্রতিরোধক পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তড়িৎশক্তির অপচয় নিবারণের প্রস্তাব উত্থিত হইল।

"তড়িৎ ঘণীভূত করণ যন্ত্র একাধিক লোক দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। লিডেন নামক স্থানের পণ্ডিত মুসেন্‌ব্রোক ইহার নাম লিডেন জার (Leyden Jar) রাখিলেন। তিনি হাতে করিয়া ধরিয়া কোন কাচ আধারে রক্ষিত জলকে তড়িন্ময় করিতে যাইয়া এই লিডেন জারের ধর্ম্মসমূহ আবিষ্কার করিলেন" *। অধুনাতন কালে যে লিডেন জার পাওয়া যায়, অর্থাৎ বহির্গাত্রে ও অভ্যন্তর গাত্রে ধাতব প্রলেপযুক্ত লিডেন জার,—সার উইলিয়ম ওয়াটসন নির্ম্মাণ করেন। ওয়াটসন তড়িতের গতি পরিমাণ করিবার জন্য রয়াল সোসাইটিতে কতকগুলি পরীক্ষা করিবার সময় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, দুই মাইল ব্যবহিত স্থানে কোন দুইটি লোক ধাতব তার পরিবাহিত তড়িৎ দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তড়িৎ ৪ মাইল ঘুরিয়া আসিতেছে। এই ৪ মাইল পথের দুই মাইল পথ তার আর ২ মাইল পথ পৃথিবী, জল, বা উভয়। বোধ হয় এই সময়েই সর্ব্ব প্রথম স্থিরীকৃত হয় যে, পৃথিবী তড়িতের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

"কোন দ্রব্যের তড়িন্ময় হওয়া সম্বন্ধে যত কিছু উপপত্তি আজকাল যেরূপ পক্বতা ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত উপপত্তি প্রথমে প্রথিতনামা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্

* Whetham.

(Franklin) দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। মহামতি ক্যাভেণ্ডিসের অতি সূক্ষ্ম এবং নির্ভুল পরীক্ষাই তড়িৎ সম্বন্ধীয় আধুনিক উপপত্তির ভিত্তি স্বরূপ, কিন্তু তাহাতে জন সাধারণের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। তৎকালীন সমস্ত তড়িৎবিদের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া; তিনি নিজের সুবিধার জন্য কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্যই ফ্যারাডে, কোন বিষয়কে সম্প্রসারিত ও সংবৃদ্ধ করিবার স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ শক্তির সহিত ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা গুলিকে পুনঃ সম্পাদন করিয়াছিলেন" *।

"তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ ও স্ফুলিঙ্গ-নির্গম কালীন শব্দের সহিত বিদ্যুৎ ও বজ্র-নির্ঘোষের কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ উভয়ই এক ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ফ্রাঙ্কলিনের মন সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিল। সেই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, যে মেঘমালা হইতে বিদ্যুৎ চমকিত হয় তাহা তড়িন্ময় হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কোন উচ্চ টাওয়ার বা মন্দির চূড়ায় একটী লৌহ দণ্ড উত্তোলন করা আবশ্যক। মেঘ মণ্ডল হইতে বজ্র-নির্ঘোষ হইলে লৌহ দণ্ডের নিম্ন প্রান্ত হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যাইবে" †। এইরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাসিয়া ইত্যাদি বহুস্থানের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ে আরও অধিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপ পরীক্ষা করিতে যাইয়া সেণ্টপিটার্স বর্গের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক রিচ্‌মন্ মেঘজাত তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার উদ্দেশে স্বীয় আবাসে উত্তোলিত লৌহদণ্ড বিচ্ছুরিত তড়িৎ শক্তি দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন একটি ঘুড়ী উড্ডীন করিয়া তিনি লিডেন জারে তড়িৎ ঘনীভূত করিলেন, সুরাসার প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এইরূপ নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন, এবং প্রমাণ করিলেন যে মেঘমণ্ডলের বিদ্যুৎ এবং ঘর্ষিত কাচদণ্ডের তড়িৎ উভয়ই অবিভিন্ন। "অতঃপর ফ্যারাডে এই বিষয় লইয়া রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার উদ্‌ঘাটিত নিগূঢ়তত্ব সমূহকে এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকের নিকট দুর্ব্বোধ্য। তিনি স্বয়ং স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সহজ জ্ঞান পরিচালিত অভিনব পন্থা দ্বারা এক মহান সত্য উপলব্ধি করিতেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার ক্রিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইতেন না, অথবা তাঁহারই উদ্‌ঘাটিত নৈসর্গিক ঘটনাবলীর গূঢ় অর্থ কি তাহাও বুঝাইতে পারিতেন না। অতঃপর ম্যাক্‌সওয়েল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অনন্যসাধারণ ধৃতি শক্তি, গণিত বিজ্ঞানে তীক্ষ্ণ অনুপ্রবেশ শক্তি ও বিচার ক্ষমতা, এবং মনের ভাব যথাযথ রূপে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল। ফ্যারাডে যে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অথচ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এবং যে সমস্ত তত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন অথচ অন্যকে বুঝা-

* Lodge. † Whetham.

ইতে পারেন নাই, ম্যাক্স্ওয়েল সেই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লোক সমাজে প্রচারের উদ্যোগ করিলেন *।” “তিনি বলিয়াছিলেন—আমি যতই ফ্যারাডের উপলব্ধ সত্য সমূহের গবেষণা করি আমি ততই বুঝিতে পারি যে তিনি যে প্রণালীতে নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ বুঝিয়াছেন, সেই প্রণালীও গণিত শাস্ত্র সঙ্গত। তবে এই ব্যাপারগুলি গণিতের চির প্রচলিত চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয় নাই মাত্র। আমি আরও বুঝিতে পারিতেছি যে তাঁহার প্রণালীগুলিকে সাধারণ গণিতের পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত গণিত বিৎ পণ্ডিতগণের প্রণালীর সহিত তুলিত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, শক্তি বিস্তারক রেখা (lines of Force) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্যারাডে মনশ্চক্ষে দেখিলেন যে এই রেখা সমূহ সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু গণিতবিৎগণ এতৎস্থলে কেবল দূরতা লক্ষ্য করেন মাত্র। অথবা ফ্যারাডে যে আশ্রয়ের বা ক্ষেত্রের মধ্যে প্রকৃত ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে সেই আশ্রয়েই সেই ক্রিয়া জনিত কোন নৈসর্গিক ব্যাপারের অনুসন্ধান করেন; কিন্তু গণিৎবিৎগণ তৎপরিবর্ত্তে দূরস্থিত পদার্থের উপর শক্তির কোন ক্রিয়া অবলোকন করিলে তবে তাঁহারা শক্তির অবস্থান বুঝিতে পারেন।

আমি আরও দেখিতেছি যে গণিৎ-বিৎ পণ্ডিতগণ যে সমস্ত উত্তম প্রণালী দ্বারা তাঁহাদের গবেষণা কার্য্য পরিচালন করেন, তাহা ফ্যারাডের উপলব্ধ সত্য দ্বারা অধিকতর উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে †।”

“এইরূপে ম্যাক্সওয়েল, গ্রীনের, ষ্টোকস’ এর এবং টমসনের উপপত্তি সমূহকে ফ্যারাডের আবিষ্কৃত সত্যগুলির সহিত সংযোজিত করিলেন। এই সংযোগ হইতেই আধুনিক তড়িৎ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। তড়িৎ বিজ্ঞান এখনও শিশু, কিন্তু শৈশবেই যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে আমরা অতি নিকট ভবিষ্যতে আরও কোনও মহান আবিষ্কার শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছি *।”

অতি সংক্ষেপে তড়িতের ইতিহাস বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। বারান্তর হইতে তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে।

শ্রীআশুতোষ দে।

* Lodge.

† Dr. Sircar on “The Study of Physical Science in the Place of Mathematics.”

পরীর গল্প ও স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া।

বালক বালিকা মাত্রেই পরীর গল্প শুনিবার সময় প্রচুর আনন্দ পাইয়া থাকে। এই সমস্ত গল্পের দ্বারা শুভ বা অশুভ কি হইতে পারে এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করা হইবে।

শৈশব কল্পনার সহিত উপকথা গুলির বেশ সামঞ্জস্য থাকে বলিয়া, এই সমস্ত উপকথা বালক বালিকার স্বপ্ন ও স্নায়বিক লক্ষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে। সভ্যতার প্রথম বিকাশ হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সমস্ত বালক বালিকাই রূপ কথা শুনিয়া আসিতেছে। শুধু সভ্যতা কেন, অসভ্যতার মধ্যেও বোধ হয় এইরূপ গল্প প্রচলিত ছিল। আদিম অবস্থাপন্ন অতি অসভ্য বন্যদিগের মধ্যেও রূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সমস্ত গল্পের দ্বারা যে অনেকটা বাল-চরিত্র গঠিত হয়, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি মনে করেন যে, কোন লোকের ভবিষ্যত জীবনে স্নায়বিক বা অন্য কোন কিছুর অস্বাভাবিকতার মূলে সেই লোকের শৈশব জীবনের কোন ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এই সমস্ত পরীর গল্প সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই এই সমস্ত রূপ কথার দ্বারা স্বপ্ন বা স্নায়বিক বৈলক্ষণ্য কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হয় তৎসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই। স্বপ্নে যেরূপ অদ্ভুত খেয়াল দেখা যায়, অথবা মানুষ যেরূপ পূর্ব্ব হইতেই বুদ্ধিহীনের ন্যায় অনুমিত হয়, পরীর গল্পও যে অনেকটা সেইরূপ এ কথা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু মহামতি ফ্রয়েড অবশেষে প্রমাণ করিলেন যে আমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখি তাহার মূলে পরীর গল্প পাঠের বা শ্রবণের ক্রিয়া নিহিত রহিয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি স্বপ্ন ও স্বপ্নের বিশ্লেষণ দেওয়া হইল।

কোন ২৯ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা রমণী এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন :—"আমি এক বৃহৎ জনসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলাম। জন সমাগম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে একটা অতি বিশ্রী কদাকার লোক আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, সেও পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল, অবশেষে আমি ধৃত হইলাম। সে বলিল 'আমি তোকে গলা টিপিয়া মারিব' কিন্তু শেষে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার দ্বারা আমার মস্তক ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প করিল। আমি রক্ত প্রবাহ দেখিতে পাইলাম।" (বিষম আতঙ্ক)

বিশ্লেষণ :—এই রমণীর কতকটা পুরুষ সঙ্গ লিপ্সা ছিল। এই বয়সের অবিবাহিতা রমণীর ন্যায় স্বামী-লাভের জন্য সে'ও ব্যাকুলিতা ছিল। এই স্বপ্ন দর্শনের পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে এক জন পুরুষের সহিত রমণী নৃত্য করিয়াছিল। এই পুরুষ সম্বন্ধে সে অনেক হৃদয় রঞ্জন কল্পনা জল্পনা করিত। নৃত্য হইতে বাটী প্রত্যাগত হইয়া রমণী একজন কদাকার জঘন্য মাতালকে দেখিতে পাইল। রমণী প্রায়ই মাতালের স্বপ্ন দেখিত, কেননা মাতালের প্রতি তাহার একটা বিশেষ ঘৃণা ছিল। তাহার জীবনের ঘটনার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে প্রমাণ হইল যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন পুরুষ ঘোর মাতাল হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসিয়াছিল, এবং মাতালের ন্যায় তাহার বাক্যালাপেও পাশবিক ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তির পরে আর কেহ রমণীর সহিত প্রেমালাপ করে নাই।

শিরশ্ছেদ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ এই যে, রমণী অতি শৈশবে একটি পরীর গল্প শুনিয়াছিল সেই পরীর গল্পের নায়কের অবয়ব অতি বিশ্রী ছিল। এই অতি ভয়ঙ্কর গল্প তাহার সুকুমার চিত্তে এমন একটি গভীর রেখা পাত করিয়াছিল যে, তাহা কখনও অপসৃত হয় নাই। এই রমণীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রজনীতে এই নায়কের ভয় পাইত। কৈশোরে সে পূর্ব্বের ন্যায় স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল। স্বপ্নের মূলে পুরুষ সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল।

২৭ বৎসর বয়স্কা অন্য জনৈক রমণী এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিল ;—"আমি আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া পশুশালায় গমন করিলাম। তৎক্ষণাৎ যাবতীয় বন্য পশু তাহাদের পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম, কেননা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর যাবতীয় দায়িত্ব আমার স্কন্ধেই অর্পিত ছিল, কিন্তু আমি দেখিলাম তাহাকে রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ইত্যাদি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি সোপানাবলী দেখিতে পাইলাম, বহু কষ্টে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম, পশ্চাতে অসংখ্য হিংস্র জন্তু অনুধাবন করিতে লাগিল। অবশেষে উপরে উঠিয়া দেখিলাম কতকগুলি দ্বার রহিয়াছে। কিন্তু সমস্তগুলিই চাবি বন্ধ, দ্বার উদ্ঘাটন উদ্দেশে চাবি অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধান করিতে করিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

বিশ্লেষণ:—এই রমণীর হিস্টিরিয়া ছিল। অধিকন্তু পুরুষকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। বিবাহের অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক পাণী-প্রার্থীকেই সে বিদায় দিয়াছিল। এমন কি কোন সময়ে সে বাকদত্তা হইয়াও, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছিল। পুরুষের প্রতি তাহার যে স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল তাহা নানা উপায়ে বিদূরিত ও বিনষ্ট হইলে রমণী পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বপ্নের প্রত্যেক অংশের অর্থ এইরূপ :—তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী তাহার নিকট সরলতা, নিরীহতা, পবিত্রতা, ও কৌমার্য্যের

আদর্শ-স্বরূপ ছিল। এই সমস্ত গুণাবলীর বীজ সে স্বয়ং তাহার ভ্রাতুপুত্রীর অন্তরে নিহিত করিয়াছে বলিয়া সে মনে করিত। বন্য জন্তুগুলি কামানুরক্তি। এই কামানুরক্তি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। কেননা যদিও সে জ্ঞানতঃ পুরুষকে ঘৃণা করিত, তথাপি তাহার হৃদয়ের কোন এক নিভৃত অজ্ঞাত স্থানে পুরুষ সঙ্গ লিপ্সা প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই তাহার অত্যন্ত পুরুষ সঙ্গ লিপ্সা হইত, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিত না বিবাহের সম্বন্ধে তাহার মনে তুমুল আন্দোলন হইত তাহাই সোপান আরোহণে উপরে গমন দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। আবদ্ধ প্রবেশ দ্বার সমূহের অর্থ এই যে, সে বহুবার বিবাহের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যে সমস্ত পুরুষ তাহার পাণী প্রার্থী হইয়াছিল, এখন তাহারা বিবাহিত। স্বপ্নে রমণী চাবি অনুসন্ধান করিতে লাগিল এই অংশের অনুরূপ সে একটি পরীর রূপ কথা পড়িয়াছিল। তাহা এইরূপ:—

এক দরিদ্র সৈনিক কোন ইন্দ্রজাল মুগ্ধ রাজকন্যার প্রাসাদদ্বারে তিন রাত্রি পাহারা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। এই দুর্গে এক মায়াবী ঐ রাজকন্যাকে ভল্লুকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কিছুদিন বসবাস করিয়া সৈনিক নিজ দেশের জন্য যাত্রা করিল। তাহার অনুপস্থিতি কালে সমস্ত তরুলতা বিশুষ্ক হইল। পথে সে অনেক বিপদ জাল নষ্ট করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে দক্ষিণ পবন তাহাকে জোর করিয়া পুনরায় রাজকন্যার প্রাসাদ দ্বারে আনয়ন করিল। সেখানে বহুসংখ্যক রাজা, রাজপুত্র, রাজপুত্রীকে অর্থাৎ তাহার পত্নীকে বিবাহ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। তাহার পুনরাগমন মাত্র তরু-লতা মঞ্জুরিত হইল। সৈনিক দক্ষিণ পবনের অনুগ্রহে লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিল, কিন্তু রাজকুমারী তরুলতার পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। তখন কুমারী আগন্তুকগণকে একটি প্রহেলিকা মীমাংসা করিতে বলিল —"আমার একটি সিন্দুক রহিয়াছে, তাহার চাবী সুবর্ণ নির্ম্মিত। চাবিটি হারাইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া পাইবার আশা ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ চাবটি স্বয়ং দেখা দিয়াছে। যে কেহ আমার এই প্রহেলিকা বুঝিতে পারিবে, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব।" সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রগণ ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজকুমারী বলিল—"প্রিয়তম, বাহির হইয়া আইস এবং তোমাকে প্রকাশিত কর।" সৈনিক তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ পবন প্রদত্ত শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিল, অমনই সে লোক লোচন পথে পতিত হইল, সৈনিক রাজকুমারীর হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার ওষ্ঠ চুম্বন করিল। তখন রাজকন্যা বলিল—এইবার সকলে আমার হেঁয়ালির অর্থ শ্রবণ করুন—"সিন্দুক আমি স্বয়ং এবং সুবর্ণ চাবি আমার স্বামী।" তখন সমস্ত পাণী প্রার্থী রাজা ও রাজতনয়গণ শূন্যমনে বিদায় গ্রহণ করিল। রাজ কন্যা ও সৈনিক মনের সুখে বহুদিন রাজত্ব করিতে লাগিল।

এই পরীর উপাখ্যানে দুইটি বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম বিষয় দ্বারা রমণীর মনের অবস্থা কিরূপ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সে যাবতীয় বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতি-রুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাণী প্রার্থী পুনরায় পাণী প্রার্থনা করে ইহা এই রমণীর নিকট স্পৃহণীয় হইয়াছিল। সেই জন্যই সে চাবী অনুসন্ধান করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ চাবী এবং সিন্দুক পুরুষ এবং রমণীর জননেন্দ্রিয়ের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া মান-সিক অবস্থার এইরূপ বিপর্য্যয়ে অনেকে ইহার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

এইরূপ অনেক স্বপ্ন উল্লিখিত হইতে পাবে, এবং প্রত্যেকের মূলে পরীর উপাখ্যান, ভুতুড়ে কাণ্ডের গল্প ইত্যাদির ক্রিয়া নিহিত রহিয়াছে বলিয়া বেশ প্রমাণ করা যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইল না। এক্ষণে এই সমস্ত আজগুবী অনর্থক গল্প দ্বারা মানসিক ও স্নায়বিক বিপর্য্যয় কতটুকু হইতে পারে দেখা যাউক।

কোন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক নানাবিধ স্নায়বিক পীড়ায় কষ্ট পাইত। চিত্ত-চাঞ্চ-ল্যের—কারণ প্রাধান্য শোণিতাতঙ্ক। প্রথমে সে রক্ত দেখিতে পারিত না, দেখিলে মূর্চ্ছাগত-প্রায় হইত। ক্রমে ক্রমে শোণিতের চিন্তা উদিত হইলেই তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইত। এমন কি যে সমস্ত লোকের কথোপকথনে কোন দুর্ঘটনা, রক্তপাত ইত্যাদি বর্ণিত হইত, তাহাদের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। অবশেষে কোন লোক দেখিতে অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় মনে হইলেই, অস্ত্রোপচার, আনুসঙ্গিক আর্ত্তনাদ, যন্ত্রণা ইত্যাদির ছবি তাহার মানস পটে অঙ্কিত হইয়া উঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব বিষয়েই সে শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইত বা অনুমান করিত এমন কি তাহার শারীরিক শোণিত চাপ মাপিবার সময়েও তাহার মূর্চ্ছা হইত। এখন দেখা যাউক এই আতঙ্কের কারণ কি উপায়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অতি অল্প বয়সে এই লোকটির ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে অত্যদ্ভূত কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়া-ছিল। ৭ বৎসর বয়ক্রম কালে সে কোন বালিকাকে স্নানাগারে লইয়া গিয়াছিল। পিতামাতা তাহার দুষ্প্রবৃত্তি জানিতে পারিয়া তাহাকে অত্যন্ত দণ্ড প্রদান করিয়াছিল। সে ক্রমে ক্রমে অকাল পক্ক গৃহ বিতাড়িত বালকগণ হইতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে নানা গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। সে তাহাদের নিকটে নানাবিধ অশ্লীল বাক্য শিক্ষা করিল। এই বয়সে তাহাকে মুষ্কচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইল, এইজন্য তাহার পিতা ও ডাক্তার এক দিন অপরাহ্নে তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইয়া অজ্ঞান করতঃ অস্ত্রোপচার করিল। সে ইহার কিছুই জানিলনা। যখন তাহার জ্ঞান হইল সে দেখিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহি-য়াছে এবং ব্যথা হইয়াছে। আরও অল্প বয়সে তাহার কোন কুসঙ্গী তাহাকে শিখাইয়া-ছিল যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় মধ্যস্থল কর্ত্তিত একটা কাঁচা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। সে যখনই মাংস

ভক্ষণ করিত, তখনই তাহার সেই কথা মনে পড়িত। পরবর্ত্তী জীবনে তাহার স্নায়বিক বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে বাল্যাবস্থায় অনেক পরীর উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠে তাহার মনে যে সমস্ত রেখা পতিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত রেখাই যে এইরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ তাহা বিশদরূপে প্রকটিত হইতে লাগিল। বাল্যাবস্থায় তাহার ধাত্রী তাহাকে অদ্ভূত পরীর গল্প শুনাইত। পরে সে যখন পড়িতে শিখিল তখন সে নিজেই এই সমস্ত পড়িতে লাগিল। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ও রক্তপাতের গল্প তাহার মনে এক নিদারুণ রেখা পাত করিল। সে রজনীতে শুইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত গল্পের কল্পনা করিত এবং নিজেকে সেই সমস্ত গল্পের নায়ক স্থলে বসাইতে প্রয়াস পাইত। এইরূপ কল্পনায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৈথুন ইচ্ছা প্রবল হইলে অনৈসর্গিক উপায়ে প্রবৃত্তি পূর্ণ করিতে লাগিল। সে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখিত তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত থাকিত। এই লোকটির ইতিহাস অনুধাবন করিতে করিতে দেখা গেল যে, এইরূপ ত্রিধা বিভক্ত হইবার কারণ এই যে, সে যে সমস্ত রূপ কথা শুনিত তাহাদেরও তিনটি অংশ থাকিত। রূপ কথায় যে সমস্ত রাজপুত্র থাকিত তাহাদিগকেও প্রায়ই তিনটি বিপদে পতিত হইতে হইত। এবং তৃতীয়বারে তাহার অভীষ্ট ফল লাভ করিত। বয়ঃক্রম আরও বৃদ্ধি পাইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা কালে তাহার প্রার্থনাকেও তিন ভাগে ভাগ করিত এবং প্রত্যেক ভাগে এক একটি বাসনা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা থাকিত। এই ত্রিত্বের প্রভাব রূপ কথা হইতেই তাহার জীবনে বিস্তারিত হইয়াছিল। তাহার স্বপ্ন গুলিও তিন ভাগে বিভক্ত থাকিত। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি স্বপ্ন বিবরণ তাহার নিজের কথায় উদ্ধৃত হইল।

"আমি কতকগুলি দূরবীক্ষণ দেখিতেছিলাম, মোট তিন জোড়া দূরবীক্ষণ ছিল সমস্ত গুলিই দেখিতে একরূপ, কিন্তু প্রত্যেকের মূল্য স্বতন্ত্র। অতঃপর আমি একটি গৃহে প্রবেশ করিলাম। আমার মনে হইল সেখানে একজন রমণী রহিয়াছে; সে কতকগুলি কুকুরকে একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা উভয়ে অতি কষ্টে তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহারা পরস্পরের পুচ্ছ দংশন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে আমি সেই অজানিত স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গত হইলাম এবং তাহাকে দর্শন করিলাম।"

নিম্নে স্বপ্নটির বিশ্লেষণ দেওয়া হইল। এই দূরবীক্ষণ মৈথুন-কৌতূহলের প্রতিরূপক। এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই লোকটি ৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার পিতার অনুপস্থিত কালে তাঁহার দূরবীক্ষণ চুরি করিত এবং নগ্নকায় স্ত্রীলোক দেখিবার প্রত্যাশায় চারিদিকে লক্ষ্য করিত। কোন সময়ে তাহার পিতার ডেস্কের ভিতর হইতে কয়েকটি উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবি দেখিতে পাইয়া, সেইগুলি হইতে মৈথুন

সম্বন্ধে মনে নানারূপ অভিনব কল্পনা পোষণ করিতে লাগিল। বাল্যাবস্থায় জননী এবং ভগিনীকে নগ্নাবস্থায় দেখিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিত। বিবাহের পরে স্ত্রীকেও ঐরূপে দেখিবার জন্য তাহার অস্বাভাবিক কৌতুহল উদ্দীপিত হইত। পত্নীর মলমূত্র ত্যাগ দেখিবার ইচ্ছা করিত, এবং তাহাকে দেখিতে দিবার সুযোগ দিতে স্ত্রীকে বারংবার অনুরোধ করিত। এই সমস্ত ইচ্ছার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল—"ইহার অভ্যন্তর ভাগ কিরূপ!" যখন তাহার জননী বা ভগিনী স্নানাগারে প্রবেশ করিত, তখন দ্বারের ছিদ্র দিয়া তাহাদিগকে প্রায়ই নগ্নাবস্থায় দেখিত। এই সমস্ত ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইবার প্রধান কারণ রূপ কথার কল্পনা। এই কল্পিত রূপ কথায় অনেক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ছিল। সে এইরূপ একটি গল্প কল্পনা করিত "কোন অপ্সরের তিনটি পত্নী ছিল, যে যে দুর্গে বাস করিত, তাহার শিখর দেশে কেহই আরোহণ করিতে পারিত না। অপ্সরের নিকট একটি চাবি ছিল তাহাতে রক্তের দাগ, এমন কি চাবি প্রবেশের ছিদ্রও রক্তাক্ত ইত্যাদি।" এই তিনটি পত্নী অবশেষে তাহার জননী, ভগিনী এবং পত্নীতে পরিণত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহার ভগিনী এবং পত্নী দেখিতে একবারে অভিন্ন ছিল, এমন কি বহুবার একজন অন্য জন বলিয়া ভুল হইত। তা ছাড়া ভগিনী আবার জননীর প্রতিকৃতি ছিল। অর্থাৎ তিন জনেই দেখিতে সম্পূর্ণরূপে একরূপ ছিল, কোনওরূপ বিভিন্নতা ছিল না।

রক্তাক্ত চাবি অন্য একটী স্বপ্ন হইতে সংগৃহীত। এই চাবি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতিরূপক ছিল। সে যে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত, তথায় বালকগণ জননেন্দ্রিকে "nookie"—(new key-অভিনব চাবি) বলিত। রক্তাক্ত চাবি এবং চাবি প্রবেশ পথ তাহার শৈশব কল্পনায় পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অনুরূপ। সে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়কে মধ্যস্থলে কর্ত্তিত এক টুকরা মাংস মনে করিত এবং নিজ জননেন্দ্রিয়ের মুন্ড ছিন্ন হইয়াছিল, কাজেই উভয়কেই রক্তাক্ত মনে করিত।

এইরূপ পরীর রূপ কথা ব্যতীত সে আরও নানাবিধ বিষয় কল্পনা করিত। সে এক সময়ে পাঠ করিয়াছিল যে, কোন রাজকন্যা একটা পিপের ভিতর পতিত হইয়াছিল, এই পিপায় অনেক তীক্ষ্মমুখ খোচা ছিল। সে এই গল্পের উপর নানারূপ কল্পনা করিত। সে বয়স্ক হইলে স্থানীয় যাদুঘরে যাইয়া একটি লৌহময় স্ত্রী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, সেই স্ত্রী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সে নানারূপ অভিনব কল্পনা করিত। মৈথুনপ্রবণতার সহিত এইরূপ রক্তপাত দর্শন আকাঙ্ক্ষা, নানারূপ ভীষণ শোণিত-পাত মূলক রূপ কথা পাঠ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এবং প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে, শোণিত, নিষ্ঠুরতা এবং স্ত্রী-সংসর্গে পরিণত হইয়াছিল।

স্বপ্নের অন্য অংশ—কুকুরগুলি পরস্পরের পুচ্ছে আবদ্ধ। তাহার জীবনে কোনও সময়ে সমজাতি মৈথুন ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, সেই সময়ের সহিত এই অংশ সম্পৃক্ত রহিয়াছে।

প্রত্যেক কর্ম্ম তিনবার করা এবং তৃতীয় বারে কৃতকার্য্য হওয়া একরূপ কুসংস্কার। নানাবিধ পরীর রূপ কথা পাঠই ইহার মূল কারণ। কেননা এইরূপ অধিকাংশ রূপ কথাই তিন অংশে বিভক্ত। নিম্নে একটি স্ত্রীলোকের স্বপ্ন উল্লিখিত হইল :—

"আমি তিনটি দীর্ঘ বোতল দেখিতে পাইলাম। একটি সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টি ফাটিয়া গিয়াছে এবং তৃতীয়টি ঢল ঢল সুরা পূর্ণ।" এই রমণী বিধবা, বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর। তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা তিনটির দ্বারা পূর্ণ। বিবাহের পূর্ব্বে সে তিনটি দ্বারা সমস্ত বিচার করিত। সে প্রথম পাণী-প্রার্থীর নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে নাই, দ্বিতীয়কে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল; এবং তৃতীয়টিকেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। যে ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহাকে তিনবার প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। এই ত্রিত্বের প্রভাব পরীর রূপ কথার দ্বারা তাহার জীবনে বিস্তারিত হইয়াছিল। সে বালিকা অবস্থা হইতেই নানাবিধ রূপ কথা পড়িত ও শুনিত। এই নিম্নলিখিত গল্পটিকে সে জ্ঞানতঃ জীবনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। কোন রাজা তাহার কন্যাকে অতি উচ্চ কাচের পাহাড়ের শীর্ষদেশে রক্ষা করিয়াছিল। যে অশ্বারূঢ় যোদ্ধা তথায় গমন করিতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। কোনও তিন সহোদরের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠই নিতান্ত নির্ব্বোধ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ বুদ্ধিমান বলিয়া তিনবার চেষ্টার পর পাহাড়ে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং রাজকন্যাকে পত্নীস্বরূপ লাভ করিয়াছিল।

এই তিন সংখ্যা বাস্তবিক তাহার একটা বদ্ধ কু-সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। সে বহু বৎসর ধরিয়া তিনের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। যদি সে হঠাৎ একটা ডিশ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আর দুইখানা না ভাঙ্গিলে নিরস্ত হইতে পারিত না। যদি ডিশ না পাইত, অগত্যা অপ্রয়োজনীয় দুইটা বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিত। এইরূপ কোন জিনিষ ভাঙ্গিলেই সে তৎক্ষণাৎ দুইটা বোতল ভাঙ্গিত।

এক্ষণে এই রমণীর স্বপ্ন অনেকটা বোধগম্য হইতে পারে। তিনটি দীর্ঘ বোতল তিনটি পুরুষের প্রতিরূপক। তাহার মৃত স্বামী চূর্ণ বোতল। যে পুরুষ তাহার স্বামীর মৃত্যুর পরে বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, সে দ্বিতীয় ফাটা বোতল। এবং যে পুরুষ তাহার স্বপ্ন দর্শনের সমসময়ে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, সেই তৃতীয় বোতল এবং সুমিষ্ট সুরায় পূর্ণ। এই মতেরও একটা অর্থ রহিয়াছে। এই রমণী ও তৃতীয় পুরুষ উভয়েই অত্যধিক সুরানুরক্ত। (ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের ভগবদ্ জ্ঞান কিরূপ হওয়া উচিত বা সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রধানতঃ অন্য কোন্ কোন্ গুণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিনয়ী ও নম্র। অবশ্য মানবমাত্রেরই নম্রতাগুণ রহিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি বলিয়া জানি, তাহারও বিনয় নম্রতা রহিয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই কেবল মাত্র পরিমাণের বিভিন্নতা। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক স্বীয় সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অহঙ্কারী, তিনিও কোন সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতম অহঙ্কারী রাজনীতিক অপেক্ষা অল্পতর গর্ব্বিত। এই সমস্ত রাজনীতিক, রাজকীয় কর্ম্মচারী বা জন সাধারণের গর্ব্ব না থাকিলে তাহাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা পার্থিব কার্য্যে এত ব্যস্ত, যে তাঁহারা অন্য মহান সত্ত্বা উপলব্ধি করিবার অবসর পান না। তাঁহারা জ্ঞানের অসীমতা বুঝিবার সুযোগ পান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁহার কর্ম্মে মন দিয়াই সৃষ্টির অসীমত্ব বুঝিতে পারেন; অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পাইয়া বিস্ময় চকিত হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহার অহঙ্কার করিবার ক্ষমতাই থাকে না। তাই নিউটন বলিয়াছিলেন—"আমি অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র-বেলায় উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" কিন্তু ক্যান্যুট (Canute) সমুদ্রের জলস্ফীতির উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন। বিনয় নম্রতা উৎকৃষ্ট গুণ বটে, কিন্তু অত্যধিক হইলে ইহার ন্যায় অনিষ্টকারী গুণ আর নাই। অত্যধিক বিনয়ী বা নম্র নিজের শক্তি বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরের কথায় আস্থা স্থাপন তাহার প্রকৃতিগত হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে জীবনে কোনরূপ উন্নতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক্ষণে যদি বৈজ্ঞানিকগণ অত্যধিক বিনয়ী বা নম্র হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রকৃত নম্র ও বিনয়ী হইলেও তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, সেই প্রণালী যে কৃতকার্য্যতার দ্বারস্বরূপ তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কাজেই বিনয়ী বলিয়া, নিজ ক্ষমতায় তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু অবলম্বিত প্রণালীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। আবার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই নিজ ক্ষমতাকে একবারে অবিশ্বাস করেন না এবং নিজ ক্ষমতায় যতটুকু পাওয়া উচিত তদপেক্ষা তাঁহারা অধিক প্রত্যাশা করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ নিজ ক্ষমতাকে বা নিজকে

কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত যন্ত্র স্বরূপ মাত্র মনে করেন। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে সৎপ্রকৃতির অভাব হয় না। তাঁহারা নিজের ক্ষমতা প্রচার করিয়া বেড়াইতে জানেন না, কাজেই কাহারও ক্ষমতা থাকিলে সে যেমন অন্য অক্ষম ব্যক্তিগণের নিকট নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া সম্ভ্রম আদায় করিয়া লইতে প্রয়াস পায়, বৈজ্ঞানিক তাহা অবগতই নহেন। সেই জন্যই তাঁহাদের সুরসিক মন বেশ আনন্দে উৎফুল্ল থাকে। তাঁহারা দুঃখবাদ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা চিরআনন্দময়, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ মনের আনন্দপ্রদ, কাজেই তাঁহারা সর্ব্ববিষয়কেই মধুবৎ মনে করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ক্রমাগত সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের কখনই আনন্দের অভাব হয় না।

তাঁহাদের আর একটি স্বভাবিক গুণ এই যে, তাঁহাদের অন্তর শিশুর ন্যায় সরল থাকে। অতি বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ও শিশুর ন্যায় সারল্যপূর্ণ। ১০০ বৎসর বয়সের সময়েও শোভরুলের হৃদয়ে যুবকের ন্যায় কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের সারল্য যে কোনও লোক বুঝিতে পারেন। এক্ষণে দেখা যাউক বৈজ্ঞানিকের কেন এরূপ শৈশব-সারল্য বা যৌবন-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন যে প্রকৃত বার্দ্ধক্য কেবল শরীরেই যে প্রকটিত হয় তাহা নহে, মনের কার্য্যেও বার্দ্ধক্য প্রকাশিত হয়। কাজেই যদি কাহারও মন ক্রমাগত দুঃখ পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার যৌবনেও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সদা আনন্দময়, দুঃখের কঠিন কশাঘাত কিরূপ তিনি জানিতেই পারেন না। দুঃখ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা ভাবেন না। তিনি চির আনন্দময়। দারিদ্র্য তাঁহার নিকট ভীষণ নহে। লোকলজ্জায় তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিশ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিবার প্রণালী স্থির করিতে পারায় আনন্দে এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে সাইরাকিউজ নগরীর জনসমাকুল রাজপথ ধরিয়া "Eureka" "Eureka" চীৎকার করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই দুঃখের অভাবে তাঁহার হৃদয় শিশুজনোচিত সরল, এবং কর্ম্মে তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ।

নিস্পৃহতা বৈজ্ঞানিকগণের সাধারণ গুণ। লোভ বা অর্থ লালসা তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। মাঝে মাঝে লোভী বৈজ্ঞানিকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার অধিকাংশই রূপ কথার ন্যায় বাহুল্য পীড়িত। একজন রাসায়নিক সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া একটা উৎকৃষ্ট জিনিষ আবিষ্কার করিলেন; আবিষ্কার করিয়াই তাঁহার আনন্দ। কিন্তু বণিকগণ তাঁহারই সাহায্যে ক্রোড়পতি হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা সালফিউরিক দ্রাবক, এসিটিলিন, ইত্যাদি প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জগতে অদ্বিতীয় ধনী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ ছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সেইরূপ তাঁহারা গৌরব আকাঙ্ক্ষা

করেন না। কোন মহান সত্য আবিষ্কৃত হইলে তাঁহার মনে যে ভূমা আনন্দ আবির্ভূত হয়, তাহার সহিত লোক কথিত গৌরব অতি নিকৃষ্ট। লোকে গৌরব করুক, তিনি সে গৌরবের কোন অপেক্ষা করেন না। যে মহামতি প্রথম চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অথবা যিনি প্রথমে অগ্নি উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আধুনিক জগৎ তাঁহার নামই জানে না। প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিকের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হউক বর্ত্তমানে কয়জন শিক্ষিত লোক আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নাম অবগত আছেন। বৈজ্ঞানিক নাম বা গৌরব ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা সৈনিকগণের ন্যায় স্বীয় গৌরবে আনন্দ লাভ করেন না, তাঁহাদের আনন্দ যুদ্ধজয়ে। শত শত অজানিত সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইলে, তবে যুদ্ধে জয় লাভ হয়। এই শত শত সৈনিক জীবন আহুতি দিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, প্রত্যেকেই গৌরবের অধিকারী। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত গৌরব চাহেন নাই। যুদ্ধ জয়ের আনন্দই তাঁহারা লাভ করেন বৈজ্ঞানিকগণও অনেকটা এইরূপ সৈনিকগণের ন্যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ কোন এক জাতির প্রাণ স্বরূপ। যে জাতিতে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির সংখ্যা যত অল্প, সেই জাতির দুর্গতি তত অধিক। আজ জার্ম্মানি আমেরিকা পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয়। সেখানে প্রতি গৃহস্থ বৈজ্ঞানিক। তাহাদের কাজ কর্ম্ম সমস্তই বৈজ্ঞানিক দ্বারা পরিচালিত। কাজেই তাঁহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন।

পরিপাক ও খাদ্যের পরিণতি।

জীবমাত্রেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য খাদ্য অপরিহার্য্য। আমাদের দৈহিক তাপ, কর্ম্ম করিবার শক্তি কোথা হইতে আইসে? আমরা যাহা দৈনিক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা হইতেই আমাদের দৈহিক তাপ উৎপন্ন হয়। আমাদের নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক কার্য্য করিবার শক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও নানা প্রকার পুষ্টি সবই খাদ্যের জন্য ঘটিয়া থাকে। একদিন উপবাসের পর, বহুক্ষণ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর, আমাদের যে অবসাদ আইসে খাদ্যের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

খাদ্যের আবশ্যকতা

একটি রেলের ইঞ্জিনের কল ঠিক অবস্থায় থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে কয়লা বা অন্য কোনও প্রকার তাপজনন দ্রব্য দিয়া জল ফুটাইয়া বাষ্প বা ষ্টীম না করিলে তাহার

চলিবার শক্তি আসিবে কোথা হইতে? এইরূপ আমাদের শরীর প্রথমে বেশ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে কিন্তু খাদ্যের অভাবে তাহা দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিবে শক্তির বিলোপ ঘটিবে এবং ক্রমে বিকল হইয়া পড়িবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

জল ও অন্য কোনও প্রকার শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানের অভাব ঘটিলেই কলের কার্য্যকারী শক্তির বিলোপ ঘটে কিন্তু জীবের তাহা ঘটে না। সকলেই জানেন যে জীব কয়েক দিন উপবাসে কাটাইয়া জীবিত থাকিতে পারে; দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোক অনাহারে ১০।১৫ দিন বাঁচিয়া থাকে। তখন দেহ রক্ষার জন্য তাপ ও শক্তি কি প্রকারে হয় তাহা আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। "বিজ্ঞানের" পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন "জীবদেহ কোষসমষ্টি মাত্র (cells)।" বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ যেমন স্তরে স্তরে ইষ্টক কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত, জীবদেহও সেইরূপ স্তরে স্তরে সজ্জিত কোষ মাত্র। আমাদের এই মানব দেহে যে কতকোটী কোষ আছে তাহার ইয়ত্তা করিবে কে? ইষ্টক কাষ্ঠাদির প্রাণ নাই কিন্তু এই কোষগুলির আছে এবং তাহাদের স্বীয় জীবনধারণের একটা ধারা আছে। সচরাচর আমরা যাহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তাহার নানা প্রকার আবর্ত্তন হইয়া শেষে রক্তের প্রবাহের সহিত মিলিয়া এই কোষগুলির নিকট উপস্থিত হয়। রক্ত হইতে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া এই জীবগুলি জীবিত থাকে। আমরা সকলেই জানি যে শরীরের সর্ব্বত্রই রক্ত চলাচল করিতেছে। রক্তের সহিত খাদ্য দ্রব্যাদি কোষে নীত হয়। কিন্তু খাদ্যের অভাব অর্থাৎ পুষ্টি ও শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানের অভাব ঘটিলে এই কোষগুলির ধ্বংস অনিবার্য্য। সাধারণতঃ বহুদিনের কোষগুলি চলিত কথা বৃদ্ধ কোষগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এবং তাহার স্থানে নূতন কোষের উদ্ভব হইতে থাকে। কিন্তু খাদ্যের অভাবে নূতন কোষ উৎপন্ন হয় না এবং অন্য অন্য কোষগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কোষের ধ্বংসের দ্বারা খাদ্যের অভাবকালে আমাদের দৈহিক তাপ, শক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। শীঘ্র শীঘ্র নূতন কোষ উৎপন্ন না হইলে অর্থাৎ যথা সময়ে ক্ষতিপূরণ না হইলে জীবকে শেষে ইহজগত হইতে বিদায় লইতে হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? নূতন কোষ আসিবে কোথা হইতে? "Out of nothing cometh nothing" কাজেই কোষের উৎপত্তির জন্য উপাদান চাই; এই উপাদান কি? ইহাই খাদ্যের শেষ পরিণতি; চলিত কথায় বলিতে গেলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে খাদ্যরূপে যাহা আমরা প্রত্যহ গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা শেষে কোষ গঠনের উপযোগী হইয়া দেহ মধ্যে রক্তপ্রবাহের সহিত সর্ব্বত্র নীত হয়; তখন দেহের অন্যান্য কোষগুলি এই উপাদান করিয়া এক অজ্ঞাত ও অদ্ভুত উপায়ে নূতন কোষ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মোটামুটি আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যাহা আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া

থাকি তাহার প্রধানতঃ দুইটি কার্য্য :—তাপ, শক্তি উৎপাদন আর দৈনিক ক্ষয় নিবারণ। আমরা বিজ্ঞানে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

এতক্ষণ আমরা খাদ্যের আবশ্যকতার বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে খাদ্য হইতে তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী ক্ষমতা ও দৈনিক ক্ষয় নিবারণ ঘটিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাদ্যের পরিণতি হইতেই এ সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। খাদ্য কি ভাবে রক্তের সহিত মিশিতে থাকে তাহা বুঝিতে পারিলে আমাদের যথেষ্ট হইবে। প্রথমেই আমরা খাদ্য লইয়া মুখের গহ্বরে দিয়া চিবাইয়া থাকি। অতি পেটুক লোক ব্যতীত সকলেই খাদ্য চিবাইয়া থাকেন।

খাদ্যের ঠিক নিয়মিত পরিপাকের জন্য চিবান অত্যন্ত অবশ্যকীয়। পরিপাক কি? খাদ্য দ্রবণীয় হওয়াই পরিপাকের চরম উদ্দেশ্য। দন্ত এ বিষয় কম সাহায্য করে না। বাঁতার দ্বারা যেমন আমরা অনেক জিনিস আবশ্যক মত "কুটিয়া" লই দন্ত দ্বারাও আমরা আবশ্যকমত খাদ্য "কুটিয়া" লই। খাদ্যের পরিপাক হইতে হইলে ইহার প্রত্যেক অংশই পরিপাক রসের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক।

চর্ব্বণের আবশ্যকতা

কিন্তু বেশ ভালরূপ না চিবাইলে আমাদের খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়; পাচক রসাদি খাদ্যের সহিত ঠিক মিলিতে পারে না কাজেই পরিপাকে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই রোগগ্রস্থ দেশে dyspepsia বোধ হয় শতকরা ৮০ জনের আছে। এই উদরাময় রোগের অন্যান্য কারণের মধ্যে চর্ব্বণ বিষয়ে অমনোযোগীতাও অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আহার যে ভোগের বস্তু তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যান। অনেকেই এত তাড়াতাড়ি আহার করেন যে দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! আমাদের দেশের অনেকে গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে ৫।৭ মিনিটের মধ্যে তাঁহারা প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা গর্ব্বের বিষয় ত আদৌ নহে তবে গভীর পরিতাপের বিষয় বটে! আমরা শরীরতত্ব বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে যাহা পরিতাপের বিষয় তাহা লইয়া আবার গর্ব্ব করিয়া থাকি। অনেক সময় অজীর্ণতা, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য একমাত্র চর্ব্বণ না করার জন্যই হইয়া থাকে।

চর্ব্বণের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে চর্ব্বণে খাদ্য লালার সহিত মিশ্রিত হয়। লালার সহিত খাদ্যের মিশ্রণের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমরা যথা সময়ে আলোচনা করিব। পরিপাক হিসাবে লালার সহিত সংমিশ্রণের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে যথেষ্ট চর্ব্বণ করিয়া না খাইলে বড় গলায় "লাগিয়া" বা "আটকাইয়া" যায়। অনেক সময় যে "বিষম লাগে" তাহা চর্ব্বণ না করিয়া গলাধঃকরণেরই দোষে। "বিষম লাগিয়া" অনেকেই অনেক কষ্ট পাইয়াছেন; অনেক সময় "বিষম" লাগিয়া মানুষ মারা গিয়াছে এ কথাও শুনা যায়।

জগদ্বিখ্যাত রুষদেশীয় শরীরতত্ত্ববিদ্ Pawlowর মত যে, মুখ গহ্বরে খাদ্য অধিকক্ষণ চর্ব্বিত হইলে পাকস্থলীতে পাচকরস নিঃসৃত হইতে থাকে। এই পাচকরস খাদ্যের পরিপাকে কি পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা নিম্নে আলোচিত হইবে। আমরা সকলেই জানি যে খাদ্যের দর্শনে, ঘ্রাণে মুখে "জল" আইসে। এই "জল" কিছুই নহে ইহা পাচকগুণসম্পন্ন "লালা"। এই "জল আসার" কথা স্বীকার করিলে পাঠককে কেহই পেটুক বলিয়া মনে করিবেন না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ; এইরূপ রস নিঃসৃত হওয়ার নাম "Psychical secretion" বা মানসিক রসনিঃসারণ। ইহার উপর কাহারও হাত নাই। মুখে "জল আসা" অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। সম্প্রতি Pawlow প্রমাণ করিয়াছেন যে খাদ্যের দর্শনে বা আহার করিতেছি এই স্পর্শনে অর্থাৎ চর্ব্বণে পাচকরস বেশ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা গুলি পাচকরস আলোচনার সময় উল্লিখিত হইবে। কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এক চর্ব্বণেই দুইটি পরিপাক রস (যথা লালা ও পাচকরস) নিঃসৃত হয়।

উত্তমরূপে চর্ব্বণে অল্পখাদ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। এ কথা অনেকেই বিসদৃশ্য মনে করিবেন। কিন্তু ইহা বাস্তবিক কথা, কারণ প্রথমতঃ পরিপাক বেশ উত্তম হয় দ্বিতীয় কথা এই যে ধীরে ধীরে খাইবার জন্য শীঘ্রই ক্ষুধা শান্তি হয় কিন্তু অতি শীঘ্র উদরসাৎ করিলে অল্প সময়ে অনেক পরিমাণ খাদ্য গৃহীত হয় পরে অজীর্ণতা উদরাময় প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ অতি শীঘ্রই সারিয়া যায় এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীর জীবন সংগ্রামের দিনে আমরা আহারের সময় অতি অল্পই পাইয়া থাকি। অনেকে তাড়াতাড়ি আহার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটা তরল দ্রব্য যেমন ডাল ঝোল ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহার করেন তাহাদের এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিবার জন্য ইংরাজি প্রবাদ "Chew as many times as you have teeth"* অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মচারিদের উপদেশ দেওয়া আছে "যে আহারের সময় বাক্যব্যয় করিবে না এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে আহার করিতেছি" এই উপদেশ কি সুন্দর "বিজ্ঞানের" পাঠক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে শাস্ত্রের উপদেশ যতই ভাল হউক না কেন কেহই মানিতে চাহেন না। আজকাল কোনও কথা বলিতে গেলে পাশ্চাত্য দেশের অমুক পণ্ডিত বলিয়াছেন আমেরিকায় প্রকাশিত অমুক নথিতে আছে ইত্যাদি না বলিলে আর তিষ্ঠাইবার স্থান হওয়া কঠিন নয় কি?

---

* The Action of Medicine, Lauder Brunton.

দ্রুত আহার সম্বন্ধে চরক কি বলিয়াছেন দেখুন।—

"নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুতং হি ভুঞ্জানস্য উৎস্নেহনমবসদনং ভোজনস্য অপ্রতিষ্ঠানং ভোজ্যদোষাদ্গুণ্যোপলব্ধিশ্চ ন নিয়তা তস্মাৎ নাতিদ্রুতং অশ্নীয়াৎ"।—

অতি দ্রুত ভোজন করিবে না; অতি দ্রুত ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, কোষ্ঠে (পাকস্থলীতে) পতিত হয় না। উহাতে শারীরিক অবসন্নতা জন্মে। এতদ্ভিন্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের সুস্বাদ ও কেশ লোমাদি দোষ লক্ষিত হয় না এবং স্বাদুতাও অনুভূত হয় না। সুতরাং আহার জনিত সুখ জন্মে না। আহার করিয়া সুখোদয় না হইলে সে আহার হইতে যথোচিত রূপে শরীর পোষণও হইতে পারে না। এসব কারণে অতি দ্রুত ভোজন করিবে না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখুন প্রত্যেক শাস্ত্রেই এক কথা বলা হইয়াছে। ইহা কি কম গৌরবের কথা যে চরক এই সমস্ত জানিতেন? ভারত তখন চিকিৎসা শাস্ত্রের কত ঊর্দ্ধে ছিল দেখুন। Pawlow যাহা সম্প্রতি বাহির করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন সেই Psychical effect বা Secretionএর কথা চরক কবে বলিয়াছেন একবার ভাবুন। আহার করিয়া স্বাদ অনুভব করুন এবং ইহাতে যে সুখোদয় হয় তাহা শরীরের পোষণের অনেক সাহায্য করে।

আমরা আহারের সময় প্রায়ই হাস্য তামাসা গল্প গুজব করিয়া থাকি ইহাতে প্রায়ই চর্ব্বণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আহারের সময় কোনও কারণেই গল্প গুজব করা উচিত নহে। আমরা যে পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করিতে ভালবাসি তাঁহারাও গল্পগুজব করেন না। আহারের সময় তাহাদের অতি অল্পই গোলমাল কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। যাঁহারা কোন বড় Dinner party দেখিয়াছেন তাঁহারা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। ৩০০ লোক একত্র বসিয়া আহার করিতেছেন কিন্তু কয়েক হাত দূরে কোনও সাড়া নাই। আহারের সময় গল্প করিলে খাদ্য বিষয়ে মনোনিবেশ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। স্বাদও অল্পই পাওয়া যায় আর সে কারণে সুখোদয় হয় না কাজেই পুষ্টিও অল্প হয়। এ বিষয়ে চরকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"অজল্পন্ অহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। জল্পতঃ হসতঃ অন্যমনসঃ বা ভুঞ্জানস্য তে এব হি দোষা ভবন্তি যে এব অতি দ্রুতমশ্নতঃ। তস্মাৎ অজল্পন্ অহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত"।

নিবিষ্টচিত্তে ভোজন করিবে, পরন্তু ভোজনকালে কথা বলা হাস্য করা উচিত নহে। হাস্য করিতে করিতে কথা বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ভোজন করিলে অতি দ্রুত ভোজন জনিত দোষ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত হাস্যাদি না করিয়া একান্ত মনে ভোজন করাই শ্রেয়ঃ।

"আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। ইদং মম উপশেতে ইদং ন উপশেতে ইতি বিদিতং যভাত্মনঃ আত্মসাত্ম্যং ভবতি। তস্মাৎ আত্মানং অভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগিতি।"

"ভোক্তা নিজের অবস্থা সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে আহার করিবে। ইহা আমার পক্ষে হিতকর ইহা অপকারী এইরূপ বিচার করিয়াই আহার করা উচিত।" ব্রহ্মচারীর আহার কালে বাক্যব্যয় নিষিদ্ধ। এই নিয়মের বিরুদ্ধাচার করিলে আর তাহাকে আহার করিতে দেওয়া হয় না। আজকাল সভ্য সমাজের অনেকেই এই নিয়ম গুলিকে বুজরুকি বলিয়া থাকেন। পাঠক এখন কি বুঝিলেন ঋষিগণ এই নিয়ম কেন প্রণয়ন করিয়াছিলেন ?

অনেক সময় আবার অনেকে অত্যধিক চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীলোকে অনেক সময় অত্যাধিক চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। ছোট ছেলেদের অনিচ্ছা থাকিলে অতি চর্ব্বণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই অতি চর্ব্বণও ঋষির চক্ষে দূষণীয় :—

"নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ। অতি বিলম্বিতং হি ভুঞ্জানঃ ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি, বহুভুঙ্কে শীতীভবতি চাহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি। তস্মাৎ-নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ।"

অতি ধীরে ধীরে ভোজন করিলে আহার শীতল হইয়া যায় একারণ আহারে তৃপ্তি জন্মে না। তাহার উপর অতি ভোজন হইয়া যায় উহাতে বিষমাগ্নি উৎপাদন করে। অতএব অতি ধীর আহার করাও কর্ত্তব্য নহে।

চর্ব্বণের প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে চর্ব্বণ কাল খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। লালা কি আর তাহার কার্য্যকারিতাই বা কি ? চলিত কথায় আমরা যাহাকে "থুথু" বলি তাহাই লালা, আমরা সকলেই জানি যে খাদ্য কিয়ৎক্ষণ চর্ব্বণ করিলে খাদ্য "আঠাল" হয়। লালার মিশ্রণই এরূপ ঘটিয়া থাকে। লালার

লালা ও তাহার কার্য্যকারিতা।

প্রধানতঃ কার্য্য দুই প্রকার প্রথমতঃ ইহা পাচকগুণ সম্পন্ন তাহা ছাড়া ইহা খাদ্যকে গলাধঃকরণের উপযোগী করিয়া দেয়। না চিবাইয়া আহার করিতে যাইলে অনেক সময় "বিষম" লাগে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। খাদ্য কঠিন থাকে বলিয়া গলনালীর (œsophngus) মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে নামিবার সময় গলনালীর মাংস পেশীকে উত্তেজিত করে এবং ইহাতে উক্তস্থানের স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হয় ফলে এক প্রকার শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত কষ্ট হয় ইহাকে "বিষম লাগা" বলা চলে। "বিষম" অন্য কারণেও লাগিতে পারে। শ্বাসনালীতে কোনও দ্রব্য আটকাইলেই "বিষম" লাগে।

• লালার পাচকগুণ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বারান্তরে বলা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতর জীবের বর্ণ পরিবর্ত্তন।

প্রজাপতি, ফড়িং, ব্যাঙ, কয়েক জাতীয় পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি কতকগুলি জীব আছে যাহাদের বাসভূমির বর্ণের সহিত তাহাদের বর্ণের এতই সাদৃশ্য থাকে যে হঠাৎ চাহিয়া দেখিলে তাহাদিগকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। অনেক সময়ে অনেকেই দেখিয়াছেন যে একটি ফড়িং ঘাসের উপর এমনই ভাবে মিশিয়া থাকে যে যদিও সেটি চোখের সম্মুখে থাকে তত্রাচ সেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; নড়িলে কি উড়িলে তবে তাহাদিগকে দেখা যায়। অনেক সময়ে পুকুরের কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্যাঙগুলিকে অদৃশ্য ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অদৃশ্য ভাবে বসিয়া থাকিতে আবার দেখা যাইবে কিরূপে? ইহার অর্থ এই যে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিত ব্যাঙগুলির নিকটবর্ত্তী হইলে যখন তাহারা লাফাইতে লাফাইতে পলায়ন করে তখনই কেবল তাহারা দৃষ্টিপথে আইসে। কত শত বার দুরন্ত ব্যাধকুল এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া পক্ষী বধ করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। নিজ বাসস্থানের বর্ণের সহিত এই জীবকুলের বর্ণের এতাদৃশ সাদৃশ্য থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া তাহারা শীঘ্র শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না।

এই সকল প্রাণী স্বভাবতঃই নিজ বর্ণের সহিত সুসাদৃশ্য আছে এইরূপ স্থানেই অবস্থান করে, অন্যত্র গমন করে না পাছে তাহারা রিপুকুল কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয়।

আবার কতকগুলি সরীসৃপ জাতীয় জীব আছে তাহারা ইচ্ছানুসারে শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইহারা যেখানে ইচ্ছা যাইয়া সেই স্থানের বর্ণের অনুরূপ বর্ণ ধারণ করে। ইহাদিগকে বহুরূপী (Chameleon) কহে। বহুরূপী গিরগিটী জাতীয় এক প্রকার জীব। ইহারা শত্রুর চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজন বুঝিয়া এবং ইচ্ছানুসারে নানা বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; এবং উপর্য্যুপরি নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করতঃ অনুসরণকারী প্রবল আততায়ীবর্গের হস্ত হইতে অনেক সময় পরিত্রাণ লাভ করে।

ডাক্তার R. F. Fuch কহেন যে বহুরূপী জাতীয় এই জীবগুলি কেবল মাত্র শত্রুবর্গের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই যে নিজ বর্ণ পরিবর্ত্তন করে তাহা নহে, এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহারা নিজ নিজ দেহের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারে।

তিনি বলেন যে শুধু এই সরীসৃপগুলির যে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার সরঞ্জাম [অর্থাৎ বর্ণ বিন্দু (pigments) বিশিষ্ট কোষপুঞ্জ (cells)] আছে তাহা নহে, স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষীদিগেরও নিজ বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার সরঞ্জাম আছে কিন্তু তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই। এই জীবগুলির বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার যন্ত্র ও উপায় থাকা সত্ত্বেয় যে তাহারা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না তাহার কারণ Fuch সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এই যে পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবগুলির ঘর্ম্মগ্রন্থি (Sweat glands) সমুদয় শরীরের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম; সুতরাং তাহাদিগকে আর কষ্ট করিয়া বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না এবং এই অভ্যাস বহুকাল হইতে থাকিয়া যাওয়ায় ইহাদিগের কার্য্য একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছে। ইহার একটি উদাহরণ স্বরূপ একটি কথা বলিব। আমরা জানি যে অধিকাংশ পশু নিজ নিজ কর্ণ এদিক ওদিক নাড়িতে চাড়িতে পারে; কিন্তু মানুষে তাহা পারে না। যে সকল মাংস পেশীর (muscles) দ্বারা কর্ণকে এদিক ওদিক নাড়া যায় তাহা পশুতেও বর্ত্তমান মানুষেও বর্ত্তমান কিন্তু মানুষের কর্ণ নাড়িবার বড় একটা প্রয়োজন* হয় না বলিয়া এই সকল মাংসপেশীর কার্য্য ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া গিয়াছে। স্তন্যপায়ী জীব মাত্রেরই এই মাংসপেশী আছে কেবল মাত্র মানুষে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না; অবশ্য কয়েক জনকে আবার কর্ণ নাড়িয়া অনেক সময়ে অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেও দেখা যায়।

প্রাণীমাত্রেরই শোণিতের একটা স্বাভাবিক ও অপরিবর্ত্তনশীল উত্তাপ আছে; কিন্তু সকল জীবের শোণিতের এই উত্তাপ একই প্রকার নহে। এক এক জাতীয় জীবের শোণিতের উত্তাপ এক এক প্রকার; অর্থাৎ বিড়াল জাতীর শোণিতের উত্তাপ এক প্রকার, কুকুর জাতীর শোণিতের উত্তাপ অন্য প্রকার, অশ্ব জাতীর আবার ভিন্ন প্রকার। কিন্তু একজাতীয় সকল জীবের শোণিতের উত্তাপ একই প্রকার; অর্থাৎ যত বিড়াল আছে তাহাদের সকলের শোণিতের উত্তাপ প্রায় একই প্রকার; তেমনই সকল কুকুরের কি সকল শৃগালের কি সকল মানুষের শোণিতের উত্তাপ প্রায় একই প্রকার। যখন কোন জীবের শরীরের উত্তাপ কোন কারণ বশতঃ স্বাভাবিক উষ্ণতা অপেক্ষা হ্রাস কি বৃদ্ধি হয় তখন সেই জীব কোনও না কোনওরূপ অসচ্ছন্দতা বোধ করে এবং যতক্ষণ না তাহাদিগের শোণিত স্বাভাবিক উষ্ণতা লাভ করে ততক্ষণ তাহারা কিছু-

* মানুষের কর্ণ নাড়িবার প্রয়োজন হয় না এ কথার অর্থ এই যে মানুষের কর্ণের গঠন এইরূপ যে পশ্চাৎ, পার্শ্ব কি সম্মুখ যে দিক দিয়াই শব্দ আসুক না কেন তাহারা সমভাবে শুনিতে পায়। কিন্তু পশুদিগের কর্ণের গঠন এইরূপ নহে বলিয়া কর্ণকে নিশ্চল রাখিয়া তাহারা সকল দিকের শব্দ সমভাবে শুনিতে পায় না। এই জন্যই ইহাদিগের কর্ণ নাড়িবার প্রয়োজন হয় কিন্তু মানুষের তাহা হয় না।

তেই সচ্ছন্দ হইতে পারে না। মানুষের মধ্যেও ইহা দেখা যায় যে কাহারও দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতার কোনও প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার কিরূপ অসুস্থতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যতক্ষণ তাহার দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা না ফিরিয়া আইসে ততক্ষণ সে সচ্ছন্দ বোধ করে না। এইরূপ সকল প্রাণীরই ঘটিয়া থাকে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্ট।

Rubner বলেন যে সকল প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে যে কোন প্রকারে হউক না কেন তাহারা শোণিতের উত্তাপ অধিক হইতে দেয় না। আমরা প্রায় দেখিয়া থাকি যে যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া শরীরের মধ্যে গরম হইয়া কাহারও শোণিত গরম হয় তখন তাহার ঘর্ম্ম হয়; ঘর্ম্ম যতই শুখাইতে থাকে ততই শরীর শীতল হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত শোণিতও অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বহুরূপী প্রভৃতি যে সকল জীব ইচ্ছানুসারে দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম তাহাদের ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি সুচারুরূপে পরিপুষ্ট নহে বলিয়া তাহারা স্বীয় বর্ণ পরিবর্ত্তন করতঃ দেহের স্বাভাবিক ঔষ্ণ্য বজায় রাখে। ক্রোমাটোফোর (Chromatophores) নামক ত্বকস্থিত নানা বর্ণের বিন্দু (Pigment) সঙ্কুল কতকগুলি কোষ পুঞ্জ (cells) আছে; ইহাদের দ্বারাই বহুরূপী জাতীয় জীবকুল নিজ নিজ দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে বর্ণ পরিবর্ত্তন কালে এই বর্ণ-বিন্দু-সঙ্কুল কোষপুঞ্জ কখনও স্ফীত কখনও বা কুঞ্চিত হয়।

এই জীবকুল দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপে দেহের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করে তাহা বলা হয় নাই। আমরা জানি যে মোটামুটী সাতটি বর্ণ—অর্থাৎ বেগুনিয়া (Violet), ঘোর নীল (Indigo), ফিকে নীল (Blue), সবুজ (Green), পীত (Yellow), কমলা (Orange), ও লোহিত (Red)—একত্রিত হইয়া শ্বেতবর্ণ হয়। এই সাতটি বর্ণের মধ্যে সকল বর্ণ একই প্রকার উত্তাপ গ্রহণ (absorb) বা পরিত্যাগ (reflect) করে না; কোন বর্ণটি অন্যের তুলনায় অধিকতর কোনটি বা অন্যের তুলনায় অল্পতর উত্তাপ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আমরা জানি যে কৃষ্ণবর্ণের কোন পদার্থ অধিক উত্তাপ গ্রহণ ও অল্প উত্তাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; এবং শ্বেতবর্ণের কোন পদার্থ অল্প উত্তাপ গ্রহণ ও অধিক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা প্রায় অনেকেরই জ্ঞাত আছে যে দারুণ রৌদ্রতাপে শাদা জামার পরিবর্ত্তে কাল জামা পরিলে অধিক গরম বোধ হয় কিন্তু শাদা জামা পরিলে ততটা গরম বোধ হয় না। এইরূপ অন্যান্য বর্ণগুলিরও উত্তাপ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবার এক একটি নির্দ্ধারিত ও অপরিবর্ত্তনশীল শক্তি আছে। এই জীবগুলির যখন অধিক উত্তাপ আবশ্যক হয় তখন তাহারা যে বর্ণ অধিক উত্তাপ গ্রহণ করে সেই বর্ণ ধারণ করে, অপরন্তু যখন তাহাদের অল্প উত্তাপ প্রয়োজন

হয় তখন যে বর্ণ অধিক উত্তাপ পরিত্যাগ বা অল্প উত্তাপ গ্রহণ করে সেই বর্ণ ধারণ করে।

Rubnerএর মত গ্রহণ করিয়া Fuch সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেন যে শীতল-শোণিত-বিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেরই* ক্রোম্যাটোফোরগুলি স্বধর্ম্ম পালনক্ষম হয় কিন্তু তপ্ত-শোণিত-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের† যদিও ক্রোম্যাটোফোর থাকে তত্রাচ তাহারা স্বধর্ম্ম পালনক্ষম হয় না। সুতরাং তপ্ত-শোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী নিজ দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে তপ্ত-শোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ যাহাদের ত্বক্ বায়ুর সংস্পর্শে আইসে তাহারাই কেবল ঘর্ম্ম-গ্রন্থির সাহায্যে শরীরের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারে; তাহাদিগের বর্ণবিন্দুসঙ্কুল কোষগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা থাকে না। তিনি বলেন যে ত্বক্ হইতে ঘর্ম্ম বাষ্পীভূত হইয়াই পশুদিগের শোণিতের শৈত্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জলচর জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে, সেই জন্য অনুমান করিয়া তিনি স্থির করেন যে এই সকল জীব বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াই স্বীয় দৈহিক তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাঁহার অনুমিত সিদ্ধান্ত যদি সত্যই হয় তাহা হইলে অবশ্যই এরূপ দৃষ্টান্ত জলচরদিগের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সত্য সত্যই গোবি (Goby), স্কুয়িড (Squid) নামক জলচর জীবে শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। অধ্যাপক Fuch সাহেবের সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইবার কারণ এই যে, আরথ্রোপোডা (Arthropoda) নামক চিংড়িমাছ, মাকড়সা প্রভৃতি এক জাতীয় জীব আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা জলচর (যথা চিংড়িমাছ প্রভৃতি) তাহাদিগের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু যাহারা স্থলচর (যথা মাকড়সা প্রভৃতি) তাহাদিগের সে ক্ষমতা নাই। বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা স্বীয় শারীরিক উত্তাপ প্রয়োজনমত হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারে।

বহুরূপী (chameleon) যদিও স্থলচর প্রাণী তত্রাচ বর্ণ পরিবর্ত্তন পরায়ণ বলিয়া তাহারা Fuch সাহেবের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রকৃতই তাহা নহে। স্থলচর অন্য প্রাণীদিগের মত ইহাদিগের ত্বক্ বায়ুর সংস্পর্শে আইসে না যেহেতু তাহাদের ত্বকের উপরিস্থিত কঠিন আবরণ (scale) তাহাদিগের ত্বক্‌কে সম্যক প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া রাখে; এবং এই কারণবশতঃ ইহাদের ঘর্ম্ম সহজে বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পাকার ধারণ করিতে সক্ষম হয় না এবং সেইজন্য ঘর্ম্মগ্রন্থির সাহায্যে ইহারা শরীরের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে

* মৎস্য, সরীসৃপ ও কতকগুলি কীট প্রভৃতি।

† পশু, পক্ষী প্রভৃতি।

পারে না। কাজে কাজেই ইহারা শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া শোণিতের উত্তাপ কম বেশী করিয়া থাকে।

Amphibia (ভেক প্রভৃতি) জাতীয় জীবগুলিকেও শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য। ইহার কারণ এই যে এই জীবগুলি জন্মিয়াই জলে বিচরণ করে; যতদিন জল মধ্যে larva অবস্থায় থাকে ততদিন তাহারা শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াই দেহের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করে; বড় হইয়া যখন "জলীয় জীবন" পরিত্যাগ করতঃ তাহারা স্থলে উঠে প্রথম প্রথম তখন তাহারা "স্যাঁতসেতে" স্থানে বিচরণ করে; এই সকল স্থানে ঘর্ম্ম ভালরূপে বাষ্পীভূত হয় না বলিয়া তাহারা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেহের উত্তাপ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্থলে চারি দিকে বিচরণ করিয়া থাকে তখন তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তখন তাহাদিগের ঘর্ম্ম বাষ্পীভূত হইয়া শোণিতকে অত্যুত্তপ্ত হইতে দেয় না।

আরও কতকগুলি জীব দেখা যায় যাহাদের দেহের বর্ণ কেবল মাত্র তাহাদিগের গর্ভাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে অন্য সময়ে নয়; ইহার কারণ বুঝাইবার কালে Fuch সাহেব বলেন যে এই সময়ে জীবগুলির অধিকতর দৈহিক উত্তাপ প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য বর্ণ পরিবর্ত্তন করতঃ তাহারা সেই সময়ে প্রয়োজন মত দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া লয়।

যদিও Fuch সাহেবের এই মত ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় তত্রচ অনেকে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদীবর্গ বলেন যে শরীরের উত্তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবার জন্য এই প্রাণীগুলি দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে ইহাই যদি হইবে তাহা হইলে সকল সময়েই তাহারা নিজ বাসস্থানের বর্ণের অনুযায়ী বর্ণ ধারণ করে কেন? কেন তাহারা মাঝে মাঝে নিজ বাসস্থানের বর্ণানুযায়ী বর্ণ ধারণ না করিয়া অপর কোন বর্ণ ধারণ করে না? ইহার উত্তরে Fuch সাহেব এক কথা বলিয়া সকল গোলযোগ মিটাইতে চাহেন যে ইহাদিগের দেহের বর্ণ যে সকল সময়েই ইহাদিগের বাসস্থানের বর্ণানুযায়ী হয় তাহার কারণ এই যে ইহাদিগের বাসস্থানের বর্ণ ইহাদিগের গাত্রে প্রতিফলিত হয়; সেই জন্যই সকল সময়ে ইহাদিগের বর্ণ ইহাদিগের বাসস্থানের বর্ণের অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অবশ্য Fuch সাহেবের এই উত্তর ততটা সন্তোষ জনক নহে; তাঁহার কাছে ইহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে অপরের কাছে নহে। যাহা হউক সহস্র প্রতিবাদ থাকা সত্বেও আমাদের অনুমান এই যে Fuch সাহেবের অনুমিত সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক বা জীবের প্রাকৃতিক-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার মত যে একেবারে অভ্রান্ত তাহাও সাহস করিয়া আমরা বলিতে পারি না যেহেতু কতকগুলি

দৃষ্টান্ত দেখা যায় যাহাতে Fuch সাহেবের প্রবর্ত্তিত এই অভিমত ঠিক মিলেনা। শীত-প্রধান দেশে এক প্রকার শৃগাল আছে (Arctic fox) তাহাদের বর্ণ গ্রীষ্মকালে পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রীষ্মকালে যাহাতে অল্প আতপ অঙ্গে লাগে তাহা করিতে হইলে তাহাদের দেহের বর্ণ শুভ্র হওয়া উচিত যেহেতু শ্বেতবর্ণের ধর্ম্মই হইতেছে এই যে ইহা উত্তাপ গ্রহণ (absorb) অপেক্ষা পরিত্যাগ (reflect) অধিক করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল শৃগাল গ্রীষ্মকালে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে না সুতরাং Fuch সাহেবের সিদ্ধান্ত এরূপ স্থলে খাটিল না; তবে একটা কথা হইতেছে এই যে Fuch সাহেব পশমের বর্ণের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। গ্রীষ্মকালে উপর্য্যুক্ত শৃগালের বর্ণ পরিবর্ত্তনের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা লোম সংক্রান্ত ত্বক সংক্রান্ত নহে; কিন্তু Fuch সাহেব যে বর্ণ পরি বর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ত্বক্ সম্বন্ধীয় লোম সম্বন্ধীয় নহে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে Fuch সাহেবের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। Fuch সাহেবের এই অনুমান যদি সত্যই হয় তাহা হইলে তিনি যে বর্ণপরিবর্ত্তনশীল জীবদিগের ইতিবৃত্তে এক অভিনব এবং অভাবনীয় ব্যাপার প্রচার করিয়াছেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার, বিএ,।

বাঙ্গালায় বিজ্ঞান চর্চ্চা।

আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে "শিক্ষা জাতীয় ভাষায় হওয়া উচিত"। মাতৃভাষার সাহায্যে অতি সহজেই শিক্ষালাভ হইতে পারে। সমস্ত দেশে সমস্ত জাতিরই শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইয়া থাকে কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার সীমা নাই। ইহাদের শিক্ষাও বিদেশীয় ভাষায় হয়। "শিক্ষিত" বলিলে আমরা কি বুঝি? যিনি ইংরাজি ভাষা জানেন তিনিই আজকাল শিক্ষিত। সংস্কৃতজ্ঞ টোলের পণ্ডিতকে আমরা আজ "শিক্ষিত" বলিয়া মনে করি না। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে আমরা "পণ্ডিতই" বলিয়া থাকি; শিক্ষিত মনে করা দূরে থাকুক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি। অনেকে হয়ত রাগ করিবেন কিন্তু অন্যরূপ বলিলে বাস্তবিকই সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি যখন নিজে ভারতবাসী বাঙ্গালী তখন কাহাকেও গালি দিলে আমাকে সেই গালি লাগিবে; এরূপ ক্ষেত্রে আমি সত্য ছাড়া কিছু বলিতে সাহস পাইব না। আর যেখানে আমরা বাস্তবিকই গালি খাইবার উপযুক্ত তখন গালি খাইতে মিথ্যা লজ্জা বা রাগ করিয়া লাভ কি? অত-

স্থানে যথাসময়ে প্রলেপ না দিলে ক্ষত যে বাড়িয়া চলিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? প্রলেপ প্রদান প্রথমে কষ্টদায়ক হইতে পারে কিন্তু এই প্রলেপই ক্ষতশোধনের মূল। আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে, এতদূর মজ্জাগত হইয়াছে যে কোন ব্যক্তিকে সংস্কৃতজ্ঞ শুনিলেই হাসিয়া উঠি। আমাদের বালকগণ "পণ্ডিত" এক ঠাট্টার লোক জানিয়া রাখিয়াছে. স্কুলে এমন কি কালেজে পণ্ডিতের সময়ই যত গোলমাল উপস্থিত হয়। সংস্কৃত জানা অনেকের চক্ষে যেন পাপের মত মনে হয়।

সংস্কৃতজ্ঞের ত এই অবস্থা; বাঙ্গালার অবস্থা কি? যিনি বাঙ্গালা জানেন (অর্থাৎ ইংরাজি বুকনি Thank you, yes sir জানেন না) তাঁহার অবস্থা কি? বাঙ্গালা স্কুলের গুরু মহাশয়দের স্থান কোথায়? যিনি শুভঙ্করীতে মাস মাহিনা কশিয়া থাকেন, যাঁহাকে মণের দাম হইতে সেরের দাম কশিতে Rule of threeর সাহায্য লইতে হয় না, যিনি মাইল, স্কোয়ার মাইল না জানিয়া কাঠা বিঘা জানেন আমাদের "শিক্ষিত" সমাজে তাঁহার স্থান কোথায়? তাঁহাকে দেখিলে কে না হাসিয়া থাকে? তিনি টাকার শুদ কশিবার সময়, চাকরের মাহিনা দিবার সময় Ready Reckoner, Table of Income wages খুলেন না ইহাই তাঁহার অপরাধ! তিনি পয়সার হিসাব লিখিবার সময় তিন পাই না লিখিয়া ৫ লিখিয়া থাকেন ইহা কি মূর্খতার পরিচায়ক নহে?

তবে কি বাঙলার আদর নাই? হাঁ অবশ্য আছে। তুমি যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রকার সংস্পর্শে আসিয়া থাক, যদ্যপি তুমি My dear বলিয়া চিঠি লিখিতে পার, যদি নামের পূর্ব্বে I have the honour to be, Sir, Your most obedient servant লিখিতে পার তাহা হইলে তোমার বাঙ্গালা জানার কদর আছে। যদি তোমার নামের পর তুমি B. A. লিখিতে পার তাহা হইলে তোমার বাঙ্গালার সম্পাদকগণের কাছে খাতির আছে। তুমি তখন ছাই ভস্ম যাহা লেখ না কেন, দুইটি অক্ষর B. A. তোমায় রক্ষা করিবে। তোমার বর্ণাশুদ্ধি Printerএর ঘাড়ে যাইবে; তোমার অমিল ছন্দ Blank verse বলিয়া পরিচিত হইবে। তুমি তখন অনেক কষ্টে সংস্কৃত পুস্তক খুলিয়া দুই চারিটা সংস্কৃতের শ্লোক বসাইতে পারিলে "শিক্ষিত" সমাজে ধন্য হইবে।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা কেন? যে ভাষা আজ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছে সে ভাষা এত ঘৃণ্য কেন? আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঙ্গালীর নিকটই বাঙ্গালা ঘৃণ্য! ইহা কি ঘোর পরিতাপের বিষয় নহে! বাঙ্গালায় সাহিত্য-সম্পদ আজকাল যথেষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালায় উচ্চদরের সাহিত্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আর বাঙ্গালার কিছু নাই। বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের পুস্তক এক খানিও নাই। সাধারণে

বুঝিতে পারে, শিখিতে পারে এরূপ ভাষার লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকের কয়খানা নাম কয়জন করিতে পারেন? সাহিত্যই আছে আর কিছুই নাই। ইতিহাস, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান বাঙ্গালায় নাই। কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ হইতেছে আমাদের "শিক্ষিত" সমাজ বাঙ্গালায় তাঁহাদের চিন্তা, ভাবুকতা, গবেষণা, মৌলিকত্ব প্রকাশ করিতে চান না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ যে বাঙ্গালায় এ কোন সম্বন্ধে পুস্তিকা রচিত হইলে অনেকেই পাঠ করেন না; দ্বিতীয় কথা যাঁহার মৌলিকত্ব আছে তিনি জগতকে দেখাইবার জন্য অন্ততঃ ইংরাজি জানা লোকদের দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। তাহার উপর অন্য অন্য কারণও আছে; তাহা উল্লেখ করিয়া লাভ কি? কিন্তু জগতের অন্য দেশের লোক কোন নূতন তথ্য নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন ইংরাজ প্রথমেই জার্ম্মন্ ভাষায় নিজের গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন শুনা যায় না। নিজের ভাষায় প্রথমে প্রকাশিত করা হয় পরে আবশ্যক মত অন্য ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়। অনেক সময়ে বিদেশীরা নিজেদের উপকারের জন্য তর্জ্জমা করিয়া লইয়া থাকেন। রবি বাবু সমস্ত কবিতাই বাঙ্গালায় প্রথমে লিখিয়াছেন পরে ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে ভাবের প্রবাহটা মাতৃভাষায় প্রকাশ করাই সহজ। অনেকে বলেন সাহিত্য জগতে ভাবের প্রবাহ মাতৃভাষায় চলে অন্য কোনও বিষয়ে চলে না। কেন চলে না একথা কি আমায় কেহ বুঝাইবেন? ধরিয়া লইলাম বিজ্ঞানে অনেক technical terms আছে তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা সহজ নহে কিন্তু ইতিহাসেও কি তাই? বাঙ্গালায় কয়খানা ইতিহাস আছে? শিশুপাঠ্য ইতিহাসের কথা বলিতেছি না; যাহাকে "ইতিহাস" বলা চলে সেরূপ ইতিহাস কয়খানার নাম কয় জনের জানা আছে?

"গৃহস্থের" উপর লেখা আছে—"মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক অনুবাদকে সাহিত্য সেবায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করাইতে হইবে। এই সাহিত্যসেবিগণের অন্ন চিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্য ক্ষেত্রে "সংরক্ষণ নীতি" (Policy of Protection) প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।"

এই উদ্দেশ্য মহৎ; বাস্তবিক সংরক্ষণ নীতি অনুষ্ঠিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি সুদূরপরাহত। যতদিন আমরা এইরূপে নিজেদের ভাষা পুষ্ট না করিব ততদিন উন্নতি কোথায়? অনুবাদ করাইতে হইবে—আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে—কিন্তু সব ফাঁকা আওয়াজ—করাইবে কে? অর্থ দিবে কে? বিশেষজ্ঞ জুটিবে

পারে কিন্তু গোড়ায় গলদ। সাহিত্য পরিষৎ মৌলিক গবেষণা চান। তাঁহারা কি অনুবাদ লইবেন?

বিজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলে অনুবাদ ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও বাঙ্গালায় নাই। বিজ্ঞানের সেই নিম্নস্তর হইতে অনুবাদ করিতে হইবে। কিন্তু এই অনুবাদের কত অসুবিধা কেহ কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা একটা মস্ত জিনিস। বিজ্ঞানের ভাষা কিরূপ হইবে? বৈজ্ঞানিক শব্দগুলা কতদূর অনুদিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বিবেচ্য। ভাষা সরল না হইলে অনুবাদ করিয়া ফল নাই। যাহা লোকে বুঝিতে পারিবে না সেরূপ লিখিয়া, অনুবাদ করিয়া কি কিছু ফল আছে? আজকাল অনেকের মত যে বৈজ্ঞানিক শব্দ গুলাও অনুবাদ করা হউক, ইহাতে ফলে কতকগুলা উদ্ভট শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এই শব্দ গুলি ব্যবহার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলে অনেক সময় বিশেষজ্ঞদেরও বুঝিতে বেগ পাইতে হয়। তাহা ছাড়া প্রধান কথা এই যে সমস্তই বিশেষজ্ঞদের জন্য নহে। ভারতের অধিকাংশ লোকই মূর্খ; ভাষার পুষ্টি কবে সম্ভবপর? যখন অধিকাংশ লোকই কিছু লিখিতে বা পড়িতে জানিবে তবেই উন্নতি হইবে। কাজেই উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করা কোনও রূপেই বিধেয় নহে। এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে যাইলে প্রথমে যিনি শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাকেও অনেকদিন এ সমস্ত শব্দ ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহা কি বাঞ্ছনীয়? কাজেই সমস্ত শব্দকে অনুবাদ না করিয়া কতকটা "মলায়েম" করিয়া লইলেই চলিতে পারে। ইহাতে সময় অতি অল্পই লাগিবে তাহা ছাড়া যাঁহারা শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাদেরও অনেক সুবিধা হইবে। শিক্ষিত মহলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লইয়া মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে; সাহিত্য পরিষৎ মধ্যে মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এক এক তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের ও দশের কতদূর উপকার হয় বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া উক্ত পরিষদের সভ্যগণও কষ্ট করিয়া ঐ সকল শব্দ পাঠ করেন না তখন সাধারণের উপকার কত হয় তাহা অনুমেয়। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই পরিভাষা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আর একটা বিশেষ ভাবিবার কথা এই যে আমরা সভা সমিতি করিয়া পরিভাষা বাঁধিয়া দিলেও কার্য্যতঃ সেই পরিভাষা কিরূপ ফলদায়ক হইবে তাহা বলা দুরূহ। ঐ সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া পুস্তক লিখিলে তবেই উহার দোষগুণ ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় বহুপরিমাণে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত না হইলে পরিভাষার দোষগুণ সম্যকরূপ বিচার করা যাইতে

পারে না। গ্রন্থকারগণ কতক শব্দ গ্রহণ করিবেন কতক বাদ দিবেন কতক বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন। এক কথায় বাঙ্গালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার না করিলে কখনই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টি হইবে না।"

অনেকদিন পুর্ব্বে যে সমস্ত শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহার কতকগুলি বেশ চলিয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ অনেকগুলি শব্দ চালাইয়া দিয়াছিলেন। এই পারিভাষিক শব্দ "চলিয়া" যাইবার কারণ এই যে উঁহারা স্বয়ং এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া অতি সহজ ও সরল ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু যদি সরল ও মনজ্ঞভাবে প্রবন্ধাদি না লিখিতেন তাহা হইলে আজও তাঁহার প্রচলিত শব্দাদি আমাদের নিকট "উদ্ভট্" বলিয়া মনে হইত। তিনি সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমারা "দূরবীক্ষণ," "অণুবীক্ষণের" সহিত পরিচিত, তাই আজ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকরাও "দূরবীন" যন্ত্র বলিয়া একটা যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায় জানেন। সাধারণের উপযোগী করিয়া না লিখিলে শব্দ গুলাকে নিজের ভাষাগত করা বড়ই দুরূহ। "তাপমান যন্ত্র" অপেক্ষা "থারমমিটার" আমাদের দেশে বেশী চলিত, তাই আজ "ট্রাম," "ট্রেণ," "মটোর-কার" "টেলিগ্রাফ" "পোষ্ট আফিস" "বোতল," "গেলাসের" সহিত বেশী রকম পরিচিত। শব্দগুলা সবই ইংরাজি তবু আমরা নিজেদের মত করিয়া লইয়াছি। অনেক সময় একটু আধটু অর্থও বদলাইয়া লইয়াছি—কাচ না হইলে ইংরাজি অনু-সারে গেলাস হইতে পারে না সেটা tumbler ,কিন্তু আমরা আকৃতির জন্য নাম দিয়াছি—আমরা মাটির গেলাস পিত্তলের গেলাস প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে যদি ব্যবহারে ইংরাজি শব্দ এত কটমট হইয়াও, আমাদের ভাষায় বেশ খাপ খাইয়াছে, তখন নূতন পরিভাষা করিয়া ব্যবহার করিলে খাপ খাইবে না কেন? কথাটা সত্য; অনেক ব্যবহারে ইহা বেশ ভাষাগত হইতে পারে, কিন্তু অনুবাদটা কিরূপ হইবে সকল ক্ষেত্রে নির্ণয় করা কঠিন। এজন্যই একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। ফলে কোনটা কি বুঝিবার অসুবিধা আসিয়া জুটিবে। সকলেই নিজের ইচ্ছানুযায়ী অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিবেন। সংস্কৃতে Sulphuric acid তুবরীসত্ব, দাহজল, কাসীসসত্ব, সৌরাষ্ট্রী-সত্ব, এতগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানে একই জিনিসের বহু নামের বা অর্থের আবশ্যকতা নাই। সেদিন কিসে আবার Suphuric acidএর গন্ধকায় নাম দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া শিক্ষকতার ও অনেক অসুবিধা হইবে। আর একটা কথা সকল দেশের বৈজ্ঞানিক ভাষার সামঞ্জস্য রাখা দরকার। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সম্বন্ধে

গত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কি বলিয়াছেন দেখুন—ইংরাজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই তাহারা রসায়ন বিদ্যার রসাস্বাদনে যে একেবারে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদ বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা বিবিধ উদ্ভিদ জাতির নামকরণে লাটিন ভাষার আশ্রয় লন; সেই উৎকট নামগুলি কোন কালে বাঙ্গালা ভাষার ধাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কিনা তাহা বলিতে পারি না কিন্তু যেমনই হউক লাটিন নামগুলি বজায় রাখিয়াই হউক অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক উদ্ভিদতত্ত্বকে ও প্রাণিতত্ত্বকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করেন বাঙ্গালীর কোমল বাগ যন্ত্র তাহার উচ্চারণে ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। যাঁহারা করাত ও হাতুড়ী হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়ান তাঁহাদের দেহ ও মন অ্যাগেটের ও কোরণ্ডমের কাঠিন্য পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বাগ যন্ত্রের এই কোমলতা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইবে আশা করা যায় না। কিন্তু ঐ নামগুলাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটুকু মোলায়াম করিয়া লইলেই যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণ একটু করুণরসার্দ্র করিতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

আমরা সমস্ত শব্দগুলি যদি নিজের মত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমরা অনেক পুস্তকাদি লিখিতে পারি। তখনই বাঙ্গালার উন্নতি হইবে। তখন গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ও বিজ্ঞানের সহজ ও সরল তত্ত্বের সহিত অতি সহজে পরিচিত হইতে পারিবেন। তখন আর তাহাকে দেখিয়া হাসিবার কারণ অতি অল্পই থাকিবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা জগতের উন্নতির সোপানে অনেকটা উঠিতে পারিব। আর একটা কথা এই যে আমরা যদি সমস্ত শব্দগুলা অনুবাদ করি তাহা সবই অতি শ্রুতিমধুর হইবে না। সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত পরিভাষা একবার উল্টাইয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে। এমন অনেক শব্দ আছে যাহা সংস্কৃতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাও মোলায়েম নহে। তাহাদেরও ছাঁটিয়া কাটিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ থাকিতেও বিদেশী শব্দ আমাদের ভিতর বেশ চলিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ যে, শ্রুতিকটু হইলে সে শব্দ সংস্কৃত হইতেই গৃহীত হউক, আর অন্য যে কোন ভাষা হইতে গৃহীত হউক, সাধারণে তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এই কারণে যোগবর্ত্তিকা না বলিয়া দীপশলাকা বা দিয়াশালাই ব্যবহৃত হয় আবার matches বা "ম্যাচিস্" শব্দটা ভারতের অধিকাংশ

স্থলে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে পত্রসন্দংশ বলিয়া বুঝান অপেক্ষা কাঁচি বলিলেই হইবে।

অনেকস্থলে ইংরাজি শব্দ এত চলিত হইয়াছে যে সে স্থলে আমরা পরিভাষা ব্যবহার করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকি। Football না বলিয়া "পদগোলক" শব্দ শুনিয়াই কয়জন প্রথমে বুঝিতে পারেন? "Goal" কথাটার বাঙ্গালা কি হইবে? আবার অনেক স্থানে পরিভাষা ব্যবহার করিয়া পার্শ্বে ব্র্যাকেটে ইংরাজি না দিলে অর্থ স্পষ্ট হয় না। অণু কথাটা ব্যবহার করিলে molecule বা atom তাহা বুঝা দুষ্কর; কেহ কেহ atom কে পরমাণু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইলে ion কি হইবে? Etherই কি বুঝিব? এরূপ অসংখ্য অসুবিধা আসিতে পারে।

এইবার সাঙ্কেতিক চিহ্নর কথা একটু বলা যাউক। রসায়ন শাস্ত্রে যে সমস্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে বড় বড় প্রক্রিয়া বুঝান হয় তাহা বাঙ্গালায় কিরূপ হইবে? আমরা আজ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই যে Hydrogen এর পরিবর্ত্তে জলজান ব্যবহার করিব বা উদজান ব্যবহার করিব। সে দিন কিসে আবার "অমৃতজান" দেখিলাম। এরূপ ক্ষেত্রে ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্নটা উ, জ, বা অ বা অন্য একটা কিছু হইবে বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে Hydrogen বলিয়াই একটা জিনিস থাকা উচিত। একটু আধটু বদল করা চলিতে পারে; পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে বা কার্য্যক্ষেত্রে যাহাতে বুঝিতে পারা যায় তাহাই বাঞ্ছনীয়। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক ও যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাহাদের গঠন বিজ্ঞাপক চিহ্ন গুলা ইংরাজি রাখিব কি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করিব তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ এই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই তাহারা রসায়ন বিদ্যার রসাস্বাদনে যে একবারে বঞ্চিত থাকিবে তাহা হইতে পারে না।"

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের ইংরাজি সকলকেই একটু আধটু শিখিতে হইবে। বাঙ্গালাকে প্রথম স্থান দিয়া ইংরাজিকে দ্বিতীয় স্থান দিতেই হইবে। তখন ইংরেজি Symbol বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন গুলা অতি সহজেই রাখা চলিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে যাঁহারা একেবারে ইংরাজি জানেন না; ইহা অতি কঠিন সমস্যা; যাহারা ইংরেজি জানেন না তাঁহারা যদি মাতৃভাষার সাহায্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চান তাহা হইলে যত গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা গুলা বিনা সাঙ্কেতিক চিহ্নে চলিতে পারে। পরিভাষা লইয়া এক্ষণে নানা প্রকার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদের এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা একেবারে একান্ত কর্ত্তব্য

হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী বলিয়া মনে হয় না। সময়ে সময়ে এক এক তালিকা বাহির করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা "বিজ্ঞান সভা" করিয়া কয়েকজন বিজ্ঞের আলোচনার উপযোগী করিয়াছেন। তাঁহারাই পরিভাষা লইয়া বাগবিতণ্ডা করিতেছেন আর সাধারণ লোক তাহা হইতে বাদ পড়িয়াছে। এরূপ করিলে বিজ্ঞানের উন্নতি সুদূরপরাহত। দেশের মধ্যে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠিত সভা আছে। তাঁহাদের দ্বারাই এসব প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। সাহিত্য পরিষদ এবিষয় মনোযোগী হইবেন কি?

বিজ্ঞানের ভাষা।—সাহিত্যে ভাষার মাধুর্য্য থাকা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষা অতি সরল, সুখপাঠ্য হওয়া চাই। বিজ্ঞানে কথার মারপেঁচ, বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য্য দেখাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে—বাক্য পড়িয়া যাহাতে বুঝিতে কোনও কষ্ট না হয় বিজ্ঞানের ভাষা সেইরূপ হওয়া দরকার। সাহিত্যেই কলা দেখাইবার, রং ফলাইবার স্থান। বিজ্ঞানের কার্য্য স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে যাহাতে অতি সহজে বুঝিতে পারে এমন কি গ্রাম্য পাঠশালার গুরু-মহাশয় ও তাঁহার ছাত্রেরা যাহাতে সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন বিজ্ঞানের ভাষা সেইরূপ হওয়া উচিত। "বিজ্ঞান মন্দিরের যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনা মন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট আত্ম প্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন। অথচ তাঁহাদের সাধনা-লব্ধ ফলের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্দ্ধমুখে ও শুষ্ক হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞা-নিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী ও ফল-ভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বাস্তবিকই নিষ্কাম ধর্ম্ম; কর্ম্মেই তাঁহাদের অধি-কার ফলে তাঁহাদের অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন মুক্তহস্তে তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকার নির্ব্বাচন চলিবে না। এই জন্যই দেখিতে পাই যে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত ঋষি যাঁহাদের দিব্য চক্ষু সত্য নিরীক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাণের তৃষ্ণায় বাহিরে আসিয়া আপনার সাধারণকে সেই সত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন।"

আমরা যদি সাধারণকে জ্ঞানের যথার্থ অংশ বাদ দিয়া যাই তাহা হইলে ফল কি হইবে? যাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতি হয় তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে আমাদের কতকগুলি লোক একবার জ্ঞানাকাশে প্রকাশিত হইয়া চির-দিনের মত নির্ব্বাপিত হইবেন। যাহাতে সাধারণের জ্ঞানের পিপাসা বাড়ে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (ক্রমশঃ) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানব ও ইতর প্রাণী

মানব সৃষ্টিকর্তার চরম সৃষ্টি। প্রাণী জগতে মানব সকল প্রাণীর শীর্ষ স্থানীয়। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি? যেমন আবহমানকাল ধরিয়া এই পৃথিবী,—শুধু পৃথিবী বলি কেন সমগ্র জগত—চলিয়া আসিতেছে তেমনি চলিবে, যেমন চিরকাল প্রাণী জন্ম জরা ও মৃত্যু ভোগ করিয়া আসিয়াছে তেমনি ভোগ করিয়া যাইবে, যেমন সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি চিরকাল উদিত ও অস্তমিত হইয়া আসিয়াছে তেমনিই হইতে থাকিবে, মানুষ বরাবর যেমন এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছে তেমনি দেখিয়া যাইবে। সে ত জীবমাত্রই দেখে মানুষ ত একেলা নয়। এই ভূমণ্ডলে যে যাহার আপন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। কেহ উদর লইয়া, কেহ সন্তান সন্ততি লইয়া, কেহ বিলাসিতা লইয়া, কেহ সুখ সচ্ছন্দতা লইয়া, কেহ স্বাস্থ্য লইয়া একটা না একটা কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত। কি কীট পতঙ্গ, কি পশু পক্ষী, কি সভ্য অসভ্য সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সম্পাদন করিবার জন্য তৎপর। ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি মানুষের যত প্রবল অন্য জীবে কি এতটা? তবে মানবকে সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলি কেন?

পুস্তকে ইতর প্রাণীদিগের কত শত বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় আপন চক্ষেও কত শত দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে ইতর প্রাণীতেও শোক, দুঃখ, স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, প্রভৃতি মানবোচিত ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান। সারসেরা তাহাদিগের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য পিতা মাতাকে এক স্থান হইতে স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া অপর স্থানে লইয়া যায়, ইহাও শুনা যায়। বৎস মৃত্যু মুখে পড়িলে তাহাদের মাতার চক্ষে জল পড়িতে ও আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেও দেখা যায়। যতদিন বৎস কার্য্যক্ষম না হয় কি যত্নের সহিত তাহাদের মাতা তাহাদিগকে লালন পালন করে যাঁহারা পক্ষী চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদের ইহা অবিদিত নহে; শুধু পক্ষীকুলে কেন সকল জীবকুলে ইহা লক্ষিত হয়। পুস্তকে অনেকে পাঠ করিয়াছেন যে আমেরিকার কোন এক প্রদেশ মূষিক সমাকুল। এই মূষিকগুলি বৎসরের কোন এক নির্দ্ধারিত সময়ে সদলবলে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সময়ে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে খঞ্জ, অন্ধ বা রুগ্ন মূষিক গুলিকেও তাহাদিগের সহচরবৃন্দ নিঃসহায় অবস্থায় না ফেলিয়া গিয়া অতি যত্ন সহকারে তাহাদের লইয়া যায়। কোন একটি জীবকে মারিলে অপরাপর কত জীব আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন। ইংলণ্ড দেশীয় কোন এক ব্যক্তি পশুদের স্নেহ আছে কি না দেখিবার

জন্য এক ভল্লুক ও তাহার শিশুকে একটি লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন; পিঞ্জরের তলাটি একখানি লৌহ পাতের নির্ম্মিত। তাহার পরে তিনি সেই পিঞ্জরের নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে পিঞ্জরের তলাটি যেমন উষ্ণ হইতে লাগিল ভল্লুকও চঞ্চল হইতে লাগিল। ক্রমে যখন আরও উষ্ণ হইল তখন সেই ভল্লুক তাহার শিশুকে দুই হস্তে ধরিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল, যখন অসহ্য হইল তখন তাহার শিশুকে ফেলিয়া দিয়া ভল্লুকটি তাহার উপর উঠিয়া দাড়াইল; সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জল ঢালিয়া পিঞ্জর শীতল করিলেন বটে কিন্তু ভল্লুক-শিশুটি আর বাঁচিল না। নিজ সামান্য কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া মাতৃক্রোড় হইতে জীবন্ত শিশুকে টানিয়া মৃত্যু মুখে তুলিয়া দিয়া সেই ব্যক্তি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানিনা তবে সেই ভল্লুক শিশু মানবের নিদারুণ নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিতে করিতে যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। হিংস্রক জন্তুদিগকে আমরা হিংস্রক বলি যেহেতু তাহারা অপর প্রাণী বধ করিয়া আহার করে। কিন্তু হে বিচক্ষণ মানব! তুমি কি হিংস্রক নও? তাহারা জীবন ধারণ করিবার জন্য অনন্যো-পায় হইয়াই জীব হিংসা করে; কিন্তু তুমি? তোমার খাদ্যের অভাব নাই; তবে তুমি নিরুপায় দুর্ব্বল প্রাণীবধ কর কি নিমিত্ত? তুমি বুদ্ধি সম্পন্ন, সদসৎবিচারক্ষম, তত্রাচ তুমি যত পাপানুরত, ইতর প্রাণী কি তত পাপ করে? তুমি কি না করিয়াছ? পিতৃ-বধ, মাতৃবধ, ভ্রাতৃবধ, ভার্য্যাবধ, বন্ধুবধ, পুত্রবধ, সবই তুমি করিয়াছ; কিন্তু ইতর প্রাণীতে তুমি এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গুলি খুঁজিয়া পাইবে না। গৃহে অগ্নি লাগিলে তুমি আপন জীবন বাঁচাইবার জন্য তৎপর হও, বৃদ্ধ পিতা মাতা বা অসহায় শিশু সন্তান বা অন্য কাহারও কথা ভাব না। এখন বোঝ দেখি ভল্লুক পশু হইয়াও তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না। ক্ষুদ্র বিড়াল কি কুক্কুর তাহাদের সন্তানের অনিষ্ট করিবার জন্য যাইলে তাহারাও যথাসাধ্য সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। সামান্য পক্ষী তাহাদের ডিম্ব বা শাবক অপহরণ করিলে তাহারাও তোমার সম্মুখীন হয়, কিন্তু মানব তুমি কি এতটা সাহস কর? করিবে না কেন? কর; কিন্তু যাহা কর এই ইতর প্রাণীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। এখন বল দেখি মানব কোন গুণে তুমি সর্ব্ব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ? বুদ্ধিমত্তা, শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, শিল্পচাতুরী, যদি মানবের শ্রেষ্ঠতার কারণ হয় তাহা হইলে অনেক ইতর প্রাণীও মানবের সমতুল্য—সমতুল্য কেন মানব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কর দেখি মানব, ক্ষুদ্র পিপীলিকার মত শ্রমহীন হইয়া দিবানিশি কার্য্য কর দেখি, বুঝি তোমার শ্রমশীলতা; কর দেখি মানব ক্ষুদ্র পক্ষী বাবুইয়ের মত একটি বাসা নির্ম্মাণ কর দেখি, বুঝি তোমার শিল্পচাতুরী; ক্ষুদ্র মাকড়সার মত তোমার অধ্যবসায় দেখাইতে পার কি? ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকা—যাহার মস্তিষ্ক তোমার মস্তিষ্কের কোটী অংশের এক অংশ হইবে না সেই মধু মক্ষিকার

বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা তোমার আছে কি? তবে মানব কিসের জন্য তুমি সৃষ্টি-কর্ত্তার সকল সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা?

পার্থিব অসার বস্তু লইয়া তুমি আপন পর বিবেচনা না করিয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, লোকলজ্জা, ভয়, অপবাদ ভুলিয়া যাদৃশ পাপ কার্য্যে রত হও তাহা অপর কোন্ জীবে সম্ভব? তবে মানবে আর ইতর প্রাণীতে প্রভেদ রইল কোথায়? কোন গুণের অধিকারী হইয়া তবে মানব ইতর প্রাণী হইতে এত শ্রেষ্ঠ? এমন কোন দ্রব্য, এমন কোন গুণ মানবে বর্ত্তমান যাহা সৃষ্টিকর্ত্তা মানবে প্রদান করিয়া তাহাকে সকল সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা করিয়াছেন? শরীর গঠন সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা যে উপাদান দিয়া মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সকল উপাদান দিয়া আবার ইতর প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নেহ, ভালবাসা সহানুভূতি, দয়া, প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম মানবে বর্ত্তমান প্রায় তৎসমুদয়ই ইতর জীবে বর্ত্তমান; কার্য্যপটুতা, শিল্পচাতুরী, অধ্যবসায় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবে বর্ত্তমান নিকৃষ্ট জীবেও সেই সকল গুণ বর্ত্তমান। তবে কি গুণ থাকাতে মানব মানব বলিয়া গর্ব্ব করে? বুদ্ধি? সে ত মানবেরও আছে, নিকৃষ্ট জীবেরও আছে। তবে কোন সামগ্রীর অধিকারী হইয়া মানব জীবের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ? সে সামগ্রী আর কিছুই নহে "বিবেক" অর্থাৎ সদসৎ বিচারের ক্ষমতা বা "জ্ঞান"। সৃষ্টিকর্ত্তা এই অমূল্য রত্ন মানবকে প্রদান করতঃ মানবকে সকল জীবের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন; যাঁহারা এইটি বোঝেন, যাঁহারা বিধাতা প্রদত্ত এই রত্নের সুব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ মানব, প্রাতঃস্মরণীয় এবং সকলেরই প্রণম্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথলাল সরকার, বিএ।

সুকণ্ঠ পতঙ্গ।

জাপানীগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অনুরাগী। সুকণ্ঠ পক্ষিসমূহ তাহাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু। জাপান দেশে দুই এক প্রকার পতঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাদের স্বর বেশ সুললিত। জাপানীগণ পক্ষিসমূহকে যেরূপ যত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে, এই সমস্ত কীট সমূহকেও সেইরূপ যত্নে প্রতিপালন করে।

জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে দুই জন ব্যবসাদার পাইকারী দরে এই সমস্ত কীট পতঙ্গ বিক্রয় করে। গ্রীষ্মের শেষভাগে ও শরতের প্রারম্ভে প্রায় ৬০জন

ফেরীওয়ালা কীট পতঙ্গ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। এক একটি পতঙ্গের মূল্য ৵১০ হইতে ।৵১০ পর্য্যন্ত হয়। অন্য একদল ফেরিওয়ালা এই সমস্ত পতঙ্গের পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করে। এই সমস্ত খাঁচা ক্ষুদ্র এবং সাধারণতঃ বাঁশের সূক্ষ্ম কাঠি দ্বারা নির্ম্মিত। সময়ে সময়ে পিঞ্জর গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম হয়। এই দুই জাতীয় ফেরিওয়ালাই যখন বিক্রয়ের আধিক্য হয় তখন প্রতিদিন প্রায় ২৷৹ টাকা উপার্জ্জন করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পতঙ্গ গুলি মরিয়া যায় বলিয়া তাহাদের বেশী লাভ হয় না।

যে কয়বিধ পতঙ্গ বিক্রীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সাধারণ ঝিল্লি, গ্রাসহপার, কুশ-হিবারী নামক অন্য এক প্রকার ঝিল্লিই প্রধান। গ্রাসহপার এবং কুশ-হিবারী বেশ সুস্থ থাকিলে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গুটী পোকাকে যেরূপ যত্নে পালন করা আবশ্যক, ইহাদিগকেও সেইরূপ যত্নে পালন করিতে হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে গ্রাসহপার জাতীয় পতঙ্গের স্ত্রী পতঙ্গ গুলিকে মাঠ হইতে ধরিয়া আনা হয়। এই সময়েই পতঙ্গ গুলি ডিম্ব প্রসব করে। এই পতঙ্গ গুলিকে কাচের আধারে রক্ষা করা হয়। আধারের ভিতর কতকটা লাল মাটি থাকে। এই লাল মাটীতে ডিম্ব প্রসব করিয়া স্ত্রী পতঙ্গ গতায়ুঃ হয়। এই ডিম্ব গুলিকে যে পাত্রে রাখা হয় তাহার অভ্যন্তর ভাগের তাপ মাত্রা ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা অল্পতর হইলে ডিম্বগুলি নষ্ট হইতে পারে। যতদিন ডিম্ব হইতে শাবক উৎপন্ন না হয়, ততদিন এইরূপ উত্তাপে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি ডিম্ব হইতে শাবক নির্গত হয়। প্রত্যেক স্ত্রী পতঙ্গ প্রায় ১০০ ডিম্ব প্রসব করে। ইহার অর্দ্ধেক স্ত্রী জাতীয় তাহাদের মধ্যে শতকরা দশটা নষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত শিশু পতঙ্গ শাক সবজী, গম এবং নদীর মৎস্য এই তিনের সূক্ষ্ম চূর্ণ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

হোমিওগ্রাইলাস্ জাপানিকাস্ নামক আর এক জাতীয় পতঙ্গ এইরূপে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রাসহপারের ন্যায় ইহাদের কেবল স্ত্রী পতঙ্গ ধরিয়া আনিলে চলে না। স্ত্রী ও পুং উভয় জাতীয় পতঙ্গ ধরিয়া আনিয়া এক এক জোড়া এক একটি বোতলে রক্ষা করিতে হয়। এই সমস্ত বোতলে সামান্য সাধারণ শর্করা থাকে। ডিম্ব প্রসূত হইলে জনক জননী উভয়েই মরিয়া যায়। ডিম্ব গুলি অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত স্থানে রাখা আবশ্যক। বসন্তের প্রারম্ভে ডিম্ব গুলি স্ফুটিত হইয়া শাবক নির্গত হয়। শাবক বোতলস্থ চিনি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। তাহাদের সাধারণ খাদ্য মধু; কিন্তু ব্যবসাদারগণ চিনি দিয়াই কাজ সারিয়া লয়। ইহারা অধিক কাল জীবিত থাকে না। ৪।৫ সপ্তাহ মধ্যেই মরিয়া যায়। এই জাতীয় পতঙ্গ গুলিকে অন্ধকারে রাখা আবশ্যক। সেইজন্য ইহাদের ফিরিওয়ালাগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহাদিগকে বিক্রয় করে।

এই সমস্ত পতঙ্গগণের ধ্বনি কিরূপ তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। কাহারও স্বর তীক্ষ্ণ, কাহারও কর্কশ আবার কাহারও বা মধুর। এইরূপ পতঙ্গাদির স্বর প্রতি দেশের লোকেই শুনিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগকে একমাত্র জাপানীগণই আদর করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে।

পঙ্গপাল জাতীয় পতঙ্গও একরূপ কর্কশ শব্দ করে। তাহা সর্ব্ব সাধারণের পরিচিত। ইহারা সমগ্র দিবাভাগ তীক্ষ্ণ রবে মাঠ শব্দায়মান করিয়া রাখে। জাপানী বালকগণ এই সমস্ত পতঙ্গ ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে।

পুং জাতীয় পতঙ্গগুলিই গান গাহিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের বহির্ভাগে একরূপ যন্ত্র থাকে; সেই যন্ত্র পাতলা চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত, এই চর্ম্ম বিস্তারিত করা থাকে; পতঙ্গের সুদৃঢ় পেশীসমূহ এই চর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তদ্দ্বারাই ধ্বনি উৎপাদিত হয়।

বিবিধ।

সুরা-হলাহল।—ডাক্তার চার্ল'স্ আর ষ্টকার্ড, গত তিন বৎসর ধরিয়া মদ্যের নেশায় নিকৃষ্ট জীবের কি কি ফল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। প্রত্যহ জীব গুলিকে মদ্যের আঘ্রাণ লওয়াইয়া তিনি উত্তেজিত করিতেন, পরে নিজ প্রয়োজন মত পরীক্ষা করিতেন।

সম্প্রতি তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরুষ জাতীয় জীবগুলিকে যদি প্রত্যহ এইরূপ মদ্যের নেশা করান যায় তাহা হইলে (স্ত্রী জাতীয় জীবগুলি খুব স্বাস্থ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও) তাহাদের সন্তান সন্ততি হীনবল ও অঙ্গহীন হইয়া থাকে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই অঙ্গহীন বৎসগণেরও যে সন্ততিবর্গ হয় তাহারাও আবার অঙ্গহীন হইয়া থাকে। ষ্টকার্ড সাহেব ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই যে মদ্য আঘ্রাণ করিলে ইহাদিগের শরীরের সকল কোষ (cells) এমন কি বীজ কোষগুলিও (germ cells) নষ্ট হয় এবং এই নষ্ট বীজ কোষ হইতে জাত সন্তান সন্ততির শরীরের যাবতীয় কোষপুঞ্জও বিকৃত হইয়া যায়।

গলিত অঙ্গার।—এই কথা শুনিলে হয় ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন। আজ পর্য্যন্ত কয়লাকে দ্রবীভূত কেহই করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু Berlin Universityর অধ্যাপক ডাক্তার O. Lummer রাসায়নিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি যে কেবল মাত্র কয়লাকে গলাইতে পারিয়াছেন তাহা নহে উপরন্তু

জলের মত সেই গলিত অঙ্গারকে ফুটাইতেও পারিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ২২০ ভোল্টের এক আর্ক ল্যাম্পের (Flame arc) শিখার মধ্যে সেই অঙ্গার খণ্ডটিকে স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুর চাপ (atmospheric pressure) কম করিতে থাকেন; ৫০ কি ৬০ সেন্টিমিটার চাপে অঙ্গার খণ্ডটি ফুটিতে আরম্ভ করে তাহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ ৫০ সেন্টিমিটার চাপের নিম্নে) কেবল গাঢ় তরল পদার্থ মত হয়। ৪০ সেন্টিমিটার চাপে ইহা একেবারে তরল হয়। ফুটিবার কালে বেশ ধবধবে মুক্তার মত বুদ্ বুদ্ উঠে। ইহার মজা এই যে বায়ুর চাপ কমাইতে কমাইতে অবশেষে একটা সময় আইসে যখন এই তরল অঙ্গার ফুটিতে নিরস্ত হয়, এবং পরিশেষে ইহা পুনরায় কঠিন অঙ্গারে পরিণত হয়।

অঙ্গারকে ফুটাইলে পর যাহা হয় তাহা সাধারণ কয়লা নয়; তাহা এই সাধারণ কয়লার রূপান্তর বিশেষ তাহাকে গ্র্যাফাইট (Graphite) কহে, এই পদার্থ black lead বলিয়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Lummer সাহেব নানা প্রকার স্বাভাবিক কয়লা পরীক্ষা করিয়া এই নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন; এক্ষণে রাসায়নিক প্রণালীতে বিশুদ্ধীকৃত কয়লা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতেছেন; তাহার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই; পরে হইবে।

যদি বাস্তবিকই অঙ্গারকে এত অল্প আয়াসে দ্রবীভূত করা সহজ হয় তাহা হইলে হীরকও প্রস্তুত করা সহজ হইবে। এতাবৎকাল অঙ্গারকে দ্রবীভূত করা যায় নাই বলিয়াই ত হীরক প্রস্তুত করা যাইত না, এবং এই কারণেই ত হীরকের এত মূল্য; না হইলে ইহার আর মূল্য কি? হীরক অঙ্গারের এক রূপান্তর বিশেষ আর ত কিছুই নহে।

হীরক তৈয়ার করিলে ইহা সকল মূল্যবান রত্ন অপেক্ষা অল্প মূল্যের হইবে যেহেতু কয়লাও সস্তা এবং Lummer সাহেবের প্রণালীও তত ব্যয় বা কষ্ট সাধ্য নহে।

অদ্ভুত সন্তানোৎপাদন শক্তি।—তারামৎস্য (Star fish) নামক সপ্তপদ-বিশিষ্ট সামুদ্রিক এক প্রকার জীব আছে, ইহাদিগকে মৎস্য কহে বটে কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা মৎস্য জাতীয় ত নহেই অপরন্তু ইহারা মেরুদণ্ড বিহীন জন্তু। ঠিক এই প্রকার আর এক জীব আছে তাহারাও ইহাদের মত মৎস্য জাতীয় ত নহেই বরং মেরুদণ্ড বিহীন, তাহাদেরও আমরা সচরাচর মৎস্য কহিয়া থাকি। ইহাদিগকে সকলেই জানেন; ইহারা "চিংড়ি মাছ"। তা যাহা হউক এই তারা মৎস্যের সন্তানোৎপাদন শক্তির কথা Thomas Mortensem যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন যে একটি বড় তারামৎস্য এক কালে বিশ কোটী ডিম দিয়া থাকে। প্রত্যেক পদে দুইটি সারি করিয়া স্ত্রী-ডিম্বাণুকোষ (ovary) আছে। প্রত্যেক সারিতে ১৫০ স্ত্রী-ডিম্বাণুকোষ থাকে; তাহা হইলে সপ্ত পদে প্রায় ২১০০ স্ত্রী ডিম্বাণুকোষ থাকে।

এক্ষণে প্রত্যেক ডিম্বাণুকোষে গড়ে এক লক্ষ করিয়া ডিম্ব হয়। তাহা হইলে সমস্ত ডিম্ব একত্রিত করিলে ২১ কোটী হয়। ইহা বড় সামান্ত কথা নয়।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে এত ডিম্ব যায় কোথা? ছোট ছোট "ঝাচ্চা" ত দূরের কথা বড় বড় তারামৎস্যই যে এমন বেশী কই তা ত নয়। তাহা হইলে এত ডিম্ব কিরূপে নষ্ট হয়?

ইতর জাতীর পরমায়ুর পরিমাণ।—

Day fly	২৪ ঘণ্টা
ছারপোকা	৬ সপ্তাহ
প্রজাপতি	২ মাস
মশা, ডাঁশ ইত্যাদি	২ মাস
মক্ষিকা	৩ হইতে ৪ মাস
পিপীলিকা, ঝিল্লি, মধুমক্ষিকা	১ বৎসর
খরগোস, মেষ	৬ হইতে ১০ বৎসর
শ্যামা, দোয়েল	১২ বৎসর
ব্যাঘ্র	১২ হইতে ১৫ বৎসর
ক্যানারী পক্ষী	১৫ হইতে ২০ বৎসর
কুকুর	১৫ হইতে ২৫ বৎসর
গবাদি পশু	২৫ বৎসর
অশ্ব	২৫ হইতে ৩০ বৎসর
ইগল্ পক্ষী	৩০ বৎসর
হরিণ	৩৫ হইতে ৪০ বৎসর
শকুনী, গৃধিনী, সিংহ, ভল্লুক	৫০ বৎসর
দাঁড়কাক	৮০ বৎসর
হস্তী, কচ্ছপ, তোতা পক্ষী, pike এবং carp ...	১০০ বৎসর
আইভি লতা	২০০ বৎসরের অধিকতর কাল
এলম	৩০০ হইতে ৩৫০ বৎসর
লোকাষ্ট বৃক্ষ, ওক বৃক্ষ	৪০০ বৎসর
লিণ্ডেন বৃক্ষ	৫০০ হইতে ১০০০ বৎসর
দেবদারু (Fir tree)	৭০০ হইতে ১২০০ বৎসর
তাল জাতীয় গাছ	৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর
অশ্বথ, বট, পাকুড়	৫০০০ বৎসরের অধিকতর কাল

৩য় বর্ষ।) এপ্রেল, ১৯১৪। (৪র্থ সংখ্যা।

তামাক।

গত জানুয়ারী মাসের "বিজ্ঞানে" আমার "তাম্বুলচর্ব্বণ" শীর্ষক প্রবন্ধে "তামাক" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই। আজ আমরা "বিজ্ঞানে" তামাক সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে কাহাকেও আদরে অভ্যর্থনা করিতে হইলে "পান তামাক দিতে হয়"। ভারতের সর্ব্বত্রই পানের প্রচলন নাই কিন্তু তামাক প্রবেশ করে নাই এমন স্থান ভারতে আছে কিনা জানি না। পান অনেক-স্থলে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু তামাক, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে চলিয়া থাকে। তামাক একটু উচ্চ, কাজেই তাহার কাছে কিছুরই ভেদ নাই।

পানটা কেবল ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সায়াম প্রভৃতি দেশেই প্রচলন ; ইহা এসিয়া দেশের বাহিরে যাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, পারিবে কিনা ভবিষ্যতই তাহা জানেন। "কালা আদমির" নেশা বলিয়াই বোধ হয় পৃথিবীতে ইহার প্রতিপত্তি হয় নাই কিন্তু তামাক পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যাহা সকল দেশের লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে—শুধু ব্যবহার করিয়া থাকে কেন—ব্যবহার করিয়া জীবনকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করে এ হেন তামাক আলোচনায় যদি আমরা "বিজ্ঞানে" কিছু স্থান দিই তাহা হইলে বোধ হয় পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না।

পানের চাষ প্রথম বর্ষের "বিজ্ঞানে" প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর ইহার গুণাগুণ আলোচিত হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধেও আমরা প্রথমে চাষ পরে গুণা-

গুণের বিষয় বলিব। Nicotina বংশের পাতাই তামাক; এই Nicotina বংশের অন্য (Nat. ord. Solanacaæ) অনেক উদ্ভিদ মারাত্মক বিষ সম্পন্ন। আমরা যাহাকে সচরাচর দোক্তা বা দোক্তার পাতা বলিয়া থাকি তাহাকেই আমরা তামাক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। এই পাতা হইতে চুরুট, সিগারেট, নস্য, দোক্তা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তামাকের পাতা হইতে Nicotine নামক এক প্রকার বিষ পাওয়া যায় এই বিষই সমস্ত "নেশার" মূল।

তামাকের ইতিহাস।

এই নেশা আমেরিকা হইতে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে। কবে কি ভাবে ইহা জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। জগৎ বিখ্যাত নাবিক কলম্বস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি লোককে "কিউবা" (Cuba) দ্বীপ সম্বন্ধে নানা তথ্য গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে তিনি এই সংবাদও পাইলেন যে তথায় লোকের সহিত 'অগ্নি উৎপাদনার্থ একটি অগ্নিশিখা লইয়া বেড়ায় আর তাহাদের সঙ্গে একপ্রকার শুষ্ক গাছ থাকে; ইচ্ছামত এই পাতা পুড়াইয়া ধূমপান করিয়া তাহারা চারিদিকে একপ্রকার গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া থাকে। কলম্বসের দ্বিতীয় বার অভিযানের সময় (১৪৯২—১৪৯৬) রোমান পেন (Roman Pane) নামক তাঁহার এক সহযাত্রী সেই দেশে নস্যের ব্যবহার দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তামাকের পাতা চিবাইয়া ব্যবহার করিতে স্প্যানিয়ার্ডস বা স্পেনবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে সর্ব্বপ্রথম ১৫০২ খৃঃ অব্দ লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু ইহা আমেরিকায় কবে কি ভাবে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলা কঠিন। আমাদের দেশে পান যেরূপ নানা প্রকার ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় আমেরিকার আদিম নিবাসিদের মধ্যেও তামাকের সেইরূপ প্রচলন আছে।

আমেরিকায় প্রথমে তামাক পুড়াইয়া তাহার ধোঁয়ার আঘ্রাণ লওয়া হইত। একটি যন্ত্রের দুইটা নল থাকিত এবং সেই দুইটি নল নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উপরের একটি পাত্রে তামাকের পাতা পুড়ান হইত। ইংরাজি অক্ষর Y উল্টা করিয়া দিলে যেরূপ দেখায় যন্ত্রটা অনেকটা সেইরূপ। আমেরিকার লোকে এই যন্ত্রকে "টোবাকো" বলিত। ইউরোপে যখন তামাক নীত হয় তখন এই যন্ত্রের পরিবর্ত্তে পাতার নাম "টোবাকো" হইল। আর আমাদের দেশে আসিয়া "তামাকু" শেষে বাঙ্গালায় তামাক বলিয়া পরিচিত হইল। Benzoni তাহার বিখ্যাত Travels in America নামক পুস্তকে গাছের নামই টোবাকো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে তামাকের নামকরণ হইয়াছে।

স্পেনের রাজা Philip II মেক্সিকো প্রদেশের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একজন Fransisco Fernandes নামক ডাক্তার পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে এই তামাক গাছ সঙ্গে আনিয়াছিলেন (১৫৫৮)। "নিকো" (Nicot) নামক এক ব্যক্তি এই গুণের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ইহা নিকোটিন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে ইহার অদ্ভুত শক্তির জন্য Spencer ইহাকে "Divine tobacco", William Lilly "Our holy herb nicotin" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে স্পেনে থাকিলেও ধূমপান প্রথা ইংরাজেরাই প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। Virginaর Governor বা শাসনকর্ত্তা Ralph Lane প্রথমে ইহাতে আসক্ত হন। পরে Sir Francis Drake আমেরিকা হইতে ধূমপানের সরঞ্জম আনিলে Sir Walter Raleigh ইংলণ্ডে প্রথমে ধূমপান আরম্ভ করেন। Raleigh একদিন ধূমপান কালে বড়ই বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য যখন দেখিল যে তাহার প্রভুর মুখ হইতে ধূম বাহির হইতেছে তখন সে দৌড়িয়া জল আনিয়া প্রভুর মুখের অগ্নি নির্ব্বাপনে সচেষ্ট হইল। কিন্তু হায় তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। Raleighর রোজই "মুখ অগ্নি" হইতে লাগিল। তিনি ধূম পানে বিরত হইলে এ বিষ বোধ হয় পৃথিবীর সভ্য সমাজে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া এলিজাবেথ সভ্যদিগের মধ্যে ইহা নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া শেষে পৃথিবী জয় করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকেই এই প্রথা দমনে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। সে সময় মৃত্যুদণ্ড, নাসিকা ছেদন প্রভৃতি প্রথা অবলম্বন করিয়া এই প্রথা রদ করা যায় নাই। ভারতে কবে কি প্রকারে এই বিষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সেকথা অন্য কোথাও বর্ণিত আছে কি না আমার জানা নাই। "বিজ্ঞানের" পাঠক আমাকে এ বিষয় জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। যে দেশে রাজা মহারাজার ইতিহাস নাই, যে দেশের অবতারদিগের ইতিহাস নাই সে দেশের লতা গুল্মের ইতিহাস কে লিখিবে? আর লিখিলে পড়িবেই বা কে?

ইয়ুরোপীয়গণের মতে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ আকবরের সময়ই ইহা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। Indian Museumএ পুরাতন প্রতিকৃতির মধ্যে আকবার বাদশাহের মূর্ত্তির সঙ্গে গড়গড়া দেওয়া আছে। তামাক তখন বোধ হয় মহামূল্য ছিল। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এসিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণ কারীরাও এসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই এবং এসিয়া ও ভারতের সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে ইহা এদেশে

কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্ত সারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জ সংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়াই অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইযুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের ইতিহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।*

আসাদ বেগ লিখিতেছেন—"বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং বহুমূল্য একটি জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। আকবর বাদসাহ আমার উপহারগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম ? এই সময় বারকসের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।"

"নবাব খাঁ আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষ-রূপে ব্যবহৃত হয়; হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তাহার পর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসা আরম্ভ করিলেন কিন্তু সম্রাট ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।"†

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আকবরের সময়ে ধূমপান প্রথা প্রচলিত হয় কিন্তু কবে কিরূপে এবিষ ভারতে প্রবেশ করিল তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ইয়োরোপীয়গণই ইহার বীজ এদেশে আনয়ন করেন। নবাব খাঁ আজামের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে ভারতে ব্যবহারের পূর্ব্বে মক্কা মদিনা অঞ্চলে ইহার বেশ আদর ছিল। তাহা ছাড়া "বোগদাদী" তামাকের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। সম্ভবতঃ বোগদাদ হইতে সর্ব্বপ্রথমে ইহার বীজ এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম বোগদাদী হইয়াছে।

ভারতেও ইউরোপের ন্যায় ধূমপান প্রথা দলন চলে। আকবার তামাকু প্রথা প্রচলিত করিলেও জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রদ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন—"তামাকু সেবনে যুবকগণের মনের ও স্বাস্থ্যের নানা দোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যবহার করিবে না। ইরাণ দেশে আমার ভ্রাতা

* বিশ্বকোষ।
† Asad Beg in Elliot VI., 165—167.

শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার করিয়াছেন।” জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য “তশীর” (উল্টা গাধার আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন। ইয়োরোপে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যে প্রথা রদ করা যায় নাই সামান্য “তশীর” দণ্ডে তাহার কি হইবে? *

শিখ, ওহাবী এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। কিন্তু আজকাল শিখদের মধ্যে এ প্রথা বেশ ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। মুসলমানেরা প্রথমে এই প্রথাকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু এক্ষণে ধূমপায়ী মুসলমানের সংখ্যা কোনও রূপেই অল্প নহে। আজকাল সকল দেশেই এ প্রথা বেশ চলিয়াছে।

পঞ্জাবের বনবিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে উত্তর ভারতে যে তামাকুর চাষ আছে তাহা আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হুসিয়ারপুর দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকুর ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াট বলেন, কলিকাতার নিকটস্থ স্থানে ও গ্রামের মধ্যে পথ পার্শ্বে বাঁশের ঝোপের মধ্যে রৌদ্র শূন্য স্থানে ও সঁ্যাতসঁ্যাতে স্থানে তামাকের গাছ আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে। ভাঙ্গা বাড়ীর দেয়ালে গঙ্গার চড়ায়ও দেখা যায়।

N. Tabacum has become an abundant weed in many parts of India; around Calcutta—for example in every dark and damp lane through the villages and neighbouring bamboo jungles on every wall and road side a stunted form of N. Tabacum is found to be one of the commonest weeds, and indeed in Sandy islands of the Hooghly and the Ganges, this plant has practically exterminated the indegenous vegitation and may be seen covering miles of these newly formed tracts of the country. The plants spring up at the close of the rains and flower in early summer. Mr. C. B. Clarke is of opinion that the above mentioned plant is not N. Tabacum but N. Plumbaginifolia a native of Mexico and west Indies. It is described in the flora of British India Vol. IV., p. 246, and is mentioned as being the only species of Nicotina which has established itself in India.†

ক্লার্ক সাহেবের আপত্তি সত্বেও Watt সাহেবের মত যে এ গুল্মগুলি N. Tabacum ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি বলেন যে গঙ্গার চড়ায় যে সমস্ত গুল্ম জন্মাইয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই N. Tabacum।

---

* Elliot in Ind. Antiq., VI., 851.

† Dictionary of Economic Products of India by George Watt M.B., CM., C.I.E., etc.

তামাকের চাষ।

যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সকলেই বুঝিয়াছেন যে তামাকের আদি স্থল আমেরিকা; কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির মধ্যে যত স্থল আছে (Temparate Zone) আজ কাল সকল দেশেই তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ দু পয়সা আঁইসে। ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন রাজা অবধি ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন তখন এই ব্যবসা যে অতি লাভ জনক তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে?

তামাকের গাছ বাৎসরিক অর্থাৎ বৎসরে একবার হইয়া থাকে। এই গুল্মের শাখা প্রশাখা নাই। ইহার "ডাটি" গোল বাঁশের মত। কোন কোন স্থলে ইহা প্রায় ৪ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত দেড় হইতে আড়াই হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। "মতিহারীতে" যে সমস্ত গাছ হয় তাহা প্রায় দুই হাত বা কিছু কম হইবে। গাছের উপরে বেশ রঙ্গিন গোলাপী আভাযুক্ত ফুল হয়। পাতাগুলিতে এক একটা বোঁটা আছে। অনেক সময় পাতা এক ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সচরাচর কিন্তু ১০ ইঞ্চি হইতে এক ফুট লম্বাই হইয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ পাতার আকৃতিকে oblong lanceolate বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তামাকের পাতার অভাব নাই। এক পয়সার আস্ত পাতা কিনিয়া ভাল করিয়া দেখিলেই আকৃতি বেশ প্রতীয়মান হইবে। পাতাগুলা অনেকটা "চালতা" পাতার আকৃতির ন্যায়। দোক্তা গাছের বীজ অতি ক্ষুদ্র এবং বেশ মসৃণ নহে। আমেরিকার এক একটা গাছে প্রায় ১০,০০,০০০, পর্য্যন্ত বীজ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রতি গাছে ৬,০০,০০০ হইতে ৮,০০,০০০ বীজ হইয়া থাকে। চালতার পাতায় যেমন "চুল" বা "শুয়া" (Hairs) থাকে দোক্তা গাছেও অনেকটা সেইরূপ থাকে। এই "শুয়া" হইতে একপ্রকার আটাল রস বাহির হইয়া গাছকে পিচ্ছিল বা আটাল করিয়া রাখে। এই জাতীয় গাছ হইতে কিউবা, 'আমেরিকার যুক্তরাজ্য', পারস্ত দেশের বিখ্যাত সিরাজ তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তামাকের চাষ ভারতেও প্রচুর পরিমাণে করা হয়।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ রেখায় অর্থাৎ বিষুব রেখার ৫০° ডিগ্রি উত্তরে এবং দক্ষিণে কেপ অব গুড্ হোপ এবং ঐ রেখার উপর যত দেশ অর্থাৎ বিষুব রেখার ৫০° ডিগ্রি দক্ষিণে যত দেশ আছে সব দেশেই তামাকের চাষ হইতে পারে। কিন্তু সকল দেশের গুল্মের গুণ একই প্রকারের হয় না। জল, আবহাওয়া ভিন্নতার গুণের

তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মাটির বা জমির গুণাগুণের জন্য সুগন্ধের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কোথায় চাষ করিলে সুগন্ধযুক্ত উত্তম ফসল হইবে এ কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। ইহা একমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। জল বায়ু আব-হাওয়ার সামান্য পার্থক্যে গুণের আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। এক কথায় গ্রীষ্ম প্রধান ও নাত্যুষ্ণ প্রধান দেশে শুষ্ক আবহাওয়াতেই এই চাষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

জমির উপর এবং বপন ও রোপণ প্রণালীর উপর ফল অধিকাংশ নির্ভর করিয়া থাকে। এঁটালা মাটিতে অর্থাৎ যাহাতে জল বেশ অনেক দিন থাকিতে পারে এমন জমিতেই দোক্তার চাষ ভাল হয়। বেলে মাটিতে চাষ করিলে পাতা বড়ই পাতলা হয়। "দোক্তা খোরের" নিকট বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন "পাতলা নেতনেতে পাতা," "মোটা মোটা রসাল পাতা"। ইহা হইতেই পাতার গুণাগুণ সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। জমির পার্থক্যে একই স্থানে দুই প্রকার দোক্তা জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা দোক্তার ব্যবসা করেন তাঁহারা কেবল স্থানের নাম শুনিয়াই ক্রয় করেন না। সময়ে সময়ে "মতিহারী দোক্তা" অতি খারাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে শুনা যায়। Whitneyর Tobacco Soilএ লেখা আছে যে "এক ফুট আন্দাজ বেলে মাটির নিচে যদি এঁটেলা মাটি থাকে তবে গুল্ম সর্ব্বাধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এঁটেলা মাটিতে চাষ করিলে পাতা বেশ মোটা মোটা হয়, এবং ১২ ইঞ্চ হইতে ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বেলে মাটি থাকিলে উজ্জল দোক্তা উৎপন্ন হয়। দোক্তার জমিতে বেশ জল থাকা দরকার।

যদি তামাকের পাতায় Nicotine থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জমির যথেষ্ট দোষ আছে। এরূপ তামাক আদৌ আদৃত হয় না। তামাকে যাহাতে Nicotineএর মাত্রা যত কম থাকে আর সুগন্ধ যত বেশী থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যকীয়। বেশী Nicotine থাকিলে বুঝিতে হইবে যে হয় জমির জল চলাচলের দোষ আছে না হয় Nitrogenous সার অতি অধিক মাত্রায় হইয়াছে। আবার কোন তামাকের পাতার চুরুট যদি সমভাবে পুড়িতে না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জমিতে Potassium carbonate নামক ক্ষার অল্প আছে। যে জমিতে Potassiumএর অল্পতা ঘটিয়াছে সে জমিতে উৎকৃষ্ট তামাক কোন কারণেই আশা করা যায় না। কোনও জমিতে আপনা হইতেই এই সকল গুণ থাকে সেখানে চাষের জন্য বিশেষ সারের আবশ্যকতা নাই কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত সার দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। গুল্মের উপর জমির প্রধানতঃ দুইটি প্রভাব :—প্রথমতঃ জমিতে সার অর্থাৎ রাসায়নিক লবণাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে কাজেই তাহা হইতে গাছ স্বীয় আবশ্যক মত আহার টানিয়া

লইয়া নিজের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ জলের পরিমাণ, তাপ রক্ষণের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত করিয়া গাছের পুষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। তামাকের জমিতে যত অধিক মাত্রায় ক্ষার বা ছাই এবং ammonia থাকিবে ফসলও তত বেশী হইবে। পাতা পচার সার দিলে জমিতে দ্রবনীয় ক্ষার বেশ অধিক মাত্রায় থাকে।

সুগন্ধ যুক্ত তামাকের চাষের জন্য মাটিতে যাহাতে জল না দাঁড়ায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এজন্য বেলে মাটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেন না এই মাটি সহজে চাপ বাঁধিয়া যায় না, কাজেই সূর্য্যের তাপ বেশ শিকড় অবধি পৌছিতে পারে। তাহা ছাড়া ইহা বেশ আবশ্যকমত জল শুষিয়া রাখে। একটু যত্ন করিলেই ভারতে ইউরোপ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে জল বায়ুর অবস্থা তামাকের চাষের যথার্থই উপযোগী। তামাকের চাষ লাভজনক করিতে হইলে এই চারিটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার (১) বীজমনন :—যাহা তাহা বীজের সাহায্যে গাছ করিলে ফসল ভাল হয় না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ হইতে গাছ না করিলে গাছ তেজস্বী হয় না, পাতা লম্বা হয় না, সুগন্ধ থাকে না আর নিকোটিন বেশী জন্মিয়া থাকে। ফরাসী দেশে গভর্ণমেণ্ট এবিষয় হস্তক্ষেপ করেন। (২) জমির সার ও সময়ে সময়ে জমিতে অন্য চাষের বন্দোবস্ত করণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তামাকের চাষের জন্য জমিতে ক্ষার থাকা দরকার—potash lime, magnesia; কিন্তু Phosphoric, Sulphuric, Salicylic acids তামাকের জন্য আবশ্যকীয় নহে ঠিক আবার এই গুলিই শস্যাদির জন্য আবশ্যকীয় কাজেই একবার তামাক পরে কোন শস্যের চাষ করিলে জমিতে কোনও প্রকার সার জমিতে পায় না। কাজেই দুই প্রকার ফসলই অতি উত্তম হইতে থাকে। যে জমিতে ক্ষার কম সেখানে চুণ পোড়াইয়া দিলে বা gypsum দিলে যথেষ্ট ফল লাভ হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ গোবরের সার দেওয়া হয়। পাতা পচার সার ও যথেষ্ট হিতকারী। (৩) পত্রচয়ণ, এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। (৪) ব্যবসা, চালান প্রভৃতি ইহাও পরে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘৃত সমস্যা।

ঘৃত ও দুগ্ধ এদেশের লোকের একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও, পূর্ব্বে উহা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগেরই উপভোগ্য ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে এই অমৃতোপম সামগ্রীর আস্বাদন গ্রহণ বহু ভাগ্যের কথা বলিয়া বিবেচিত হইত। দেবী অন্নপূর্ণা ভবানন্দ মজুমদার গৃহে গমন কালীন যে পাটনীর নৌকায় পার হইয়াছিলেন, তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, সে দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" ঘৃত দুগ্ধ ভোজন যে সাধারণ লোকে সুখের চরমাবস্থা বলিয়া মনে করিত, ঈশ্বরী পাটনীর এই বর প্রার্থনায় তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে ঘৃত দুগ্ধ সুলভ ছিল কেননা দেশে যে পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ উৎপন্ন হইত তাহার ভোক্তা ও ক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের তুলনায় যদি তাহার ক্রেতার সংখ্যা অল্প হয় অর্থাৎ যোগান অপেক্ষা যদি চাহিদা অল্প হয়, তাহা হইলে কাজে কাজেই তাহা সুলভ হয়। এক্ষণে এই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখন দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু লোক ঘৃত দুগ্ধ ব্যবহার করিতেছে। ঘৃতের ব্যবহার যে অনেক বাড়িয়াছে তাহার একমাত্র প্রমাণ মিষ্টান্নের দোকানের অভুতপূর্ব্ব বৃদ্ধি। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ ময়রার দোকান ছিল এখন তাহার চতুর্গুণ যে বাড়িয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামেও এই শ্রেণীর দোকান বাড়িয়াছে। একখানি ময়রার দোকান নাই এরূপ পল্লীগ্রাম অতি বিরল। যে সকল গ্রামে পূর্ব্বে গুড় মুড়ী জলযোগের একমাত্র উপাদেয় সামগ্রী ছিল, সে সকল গ্রামে এখন কচুরী, জিলাপী, গজা, ছানাবড়া অধিবাসীদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। ময়রার দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে ঘৃত ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রতিপন্ন করে ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা। ইহার উপর আমাদের বাঙ্গালী জাতি এখন আর নিছক ভেতো বাঙ্গালী নহে। এখন কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে, রুটী লুচির চলন বাড়িয়াছে। এখন অধিকাংশ গৃহস্থই ম্যালেরিয়ার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, রাত্রিকালে ভাত খান না। ইহাতেও ঘৃত ব্যবহারের পারমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ঘৃত ব্যবহার যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে দেশে যে উহার উৎপন্ন হইতেছে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও আমাদের দেশে কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা সঠিক রূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই, তবুও বিদেশ হইতে যে পরিমাণে ঘৃত এ দেশে আমদানী হয় তাহার কতকটা হিসাব পাওয়া যায়।

সরকারী শুল্ক বিভাগের প্রকাশিত আমদানী ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা যাঁহারা নিয়মিত রূপে দেখিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে, বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। ভারত সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহুকাল ধরিয়া এদেশে ঘৃত আমদানী হইয়া আসিতেছে। ইদানীং আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকুল হইতেও এদেশে ঘৃত আমদানী হইতেছে। এই আমদানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পক্ষান্তরে এদেশ-জাত ঘৃতও বিদেশে বড় কম রপ্তানি হয় না বরং আমদানী অপেক্ষা রপ্তানিটা যে অধিক হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘৃতের রপ্তানি বাঙ্গালা দেশ হইতেই অধিক হইয়া থাকে এবং অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে বিদেশ হইতে অতি অল্পই ঘৃত আমদানী হইয়া থাকে। রপ্তানি সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশ আজকাল এ বিষয়ে বাঙ্গালার সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে সিন্ধুদেশে ইহার রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীই অধিক। ইহাতে মোটের উপর বুঝা যায় যে এক্ষণে আমাদের দেশে ঘৃতের চাহিদা যেরূপ সরবরাহ সেরূপ হইতেছে না।

সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে এ দেশের অধিবাসিগণের এক চতুর্থাংশ মাত্র ঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকে বৎসরে চারি সেরের অধিক ঘৃত ভোজন করিতে পায় না, অর্থাৎ আমাদের দেশে এক্ষণে যে ঘৃত খরচ হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ৭৫ লক্ষ মণ। পল্টনে যে সিপাহীরা কাজ করে, সরকারী ভাণ্ডার হইতে তাহাদিগের প্রতিজনকে প্রতিদিন দুই আউন্স অর্থাৎ ১ ছটাক করিয়া ঘৃত দেওয়া হইয়া থাকে। এই সরকারী বরাদ্দের অর্দ্ধেক পরিমাণ ঘৃত যদি এদেশের সিকি অংশ অধিবাসীরা ভোজন করে তাহা হইলে বৎসরে ২২ কোটী মণের অধিক ঘৃতের প্রয়োজন। এক্ষণে সমগ্র দেশের লোক যদি নিত্য এরূপ সামান্য পরিমাণও ঘৃত ভোজন করে তাহা হইলে কি পরিমাণ ঘৃত উৎপাদন করা প্রয়োজন তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন। এতাধিক পরিমাণ ঘৃত কোনকালে এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যাঁহারা বলেন সেকালে লোকে এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ ভোজন করিতেন, তাঁহাদিগের সেই কথা যে সমগ্র দেশের লোক সম্বন্ধে সত্য নহে ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। দেশের অধিকাংশ লোকের ঘৃত দুগ্ধ ভোজনের সামর্থ্য ছিল না বলিয়া অল্প পরিমাণ সঙ্গতিপন্ন লোক তাহা সুলভে লাভ করিতেন। এখন সেই অবস্থায় ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া ঘৃত-দুগ্ধভোজীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং সেই অনুপাতে উহা উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া উহা দুর্লভ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ হইতেছে না বলিয়া অবিমিশ্র সামগ্রীর অভাব হইয়াছে। লোকের অভাব পূরণ করিবার জন্য দুগ্ধে জল, এবং ঘৃতে চর্ব্বি প্রভৃতি মিশ্রণোপযোগী সামগ্রী উহার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। রাসায়নিক

বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এক্ষণে ঘৃতের সহিত অনেক স্বাস্থ্য-নষ্টকারী দূষিত পদার্থ সকল ভেঁজাল দেওয়া হইয়া থাকে। দেশের সমস্ত লোকের প্রয়োজনের সংকুলান করিতে হইলে ঘৃতে এই ভেঁজাল নিবারণ যেমন সাধ্যায়ত্ত নহে তেমনি ইহার মূল্যের হ্রাস হওয়াও অসম্ভব। য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে কোন একটী বিশেষ খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বসাধারণের সামর্থ্যানুরূপ সুলভ না হইলে তদ্বৎ অন্য সামগ্রী সুলভে উৎপাদন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্গারিনের (margarine) উল্লেখ করা যাইতে পারে। য়ুরোপে ঘৃতের ব্যবহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তথাকার লোক তৎপরিবর্ত্তে মাখন ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার দুর্মূল্যতাবশতঃ সাধারণ লোকে এই পুষ্টিকর খাদ্যে এক প্রকার বঞ্চিত। এজন্য অনেকে শূকর অথবা গো-মেষাদির চর্ব্বি (lard) ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেহেতু ইহা কতকটা মাখনেরই ন্যায় পুষ্টিকর। কিন্তু যাঁহারা মাখনের আস্বাদন-সুখ লাভ করিতে চাহেন, অথচ তাহার জন্য ব্যয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা মার্গারিন নামক নকল মাখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। জলপাইয়ের তৈলের (Olive oil) সহিত অন্যান্য উদ্ভিদ তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাকে এরূপ গাঢ় করা হয় যে তাহার কিয়দংশ নারিকেল তৈলের ন্যায় দানা বাঁধে। এই দানা-বাঁধা পদার্থই মার্গারিন। ইহা কেহ কেহ চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া, কেহ বা না মিশাইয়াই মাখনের মত রুটীতে মাখাইয়া ভোজন করিয়া থাকেন। ইহার পুষ্টিকারিতা মাখন অপেক্ষা কম নহে। আমাদের দেশে ঘৃতের পরিবর্ত্তে এইরূপ একটী সামগ্রী যদি ঘৃত অপেক্ষা সুলভে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান ঘৃত সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। সরকারী বাণিজ্য বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল (Director of Commercial Intelligence) Noel Paton সাহেব* অনেক অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কার্পাস বীজের তৈল গাঢ় করিয়া তাহার কিয়দংশ নারিকেল তৈলের মত দানা-বাঁধান যাইতে পারে। এই দানা-বাঁধা অংশকে Stearine বলে। এই Stearine যে ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর তাহা রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে ৭৫· ৬৩ ভাগ অঙ্গার, ১১· ৮৭ ভাগ জলযান ও ১২· ৫০ ভাগ অম্লজান আছে। আর এই Stearineএ ৭৬· ৮৫ ভাগ অঙ্গার, ১২· ৩৬ ভাগ জলযান ও ১০· ৭৯ ভাগ অম্লজান আছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে মাখন ও Stearineএর গুণের প্রভেদ অতি অল্প। মাখন জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিলে ইহার ভার এক চতুর্থাংশ লঘু হয়। তাহা হইলে ঘৃত ও Stearineএর পরস্পরের গুণের যে বড় একটা তারতম্য নাই তাহা সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে. চর্ব্বির সহিত Stearine মিশ্রিত করা সম্ভব নহে, কিন্তু ইহা যদি ঘৃতের সহিত

* এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইবার অল্পদিন পরেই নোয়েল সাহেবের বিলাতে মৃত্যু হইয়াছে।

মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে ইহা অনেক পরিমাণে সুলভ হইতে পারে এবং আজ কালিকার ভেজাল ঘৃতে স্বাস্থ্যের যে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা নিবারিত হইতে পারে।

ঘৃতের সহিত কার্পাস-বীজ তৈল-জাত Stearineএর সংমিশ্রণের এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কেহ বা ইহাকে জাতি মারিবার উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু এক্ষনে ঘৃতের সহিত যে সকল অজ্ঞাত এবং ঘৃণিত স্বাস্থ্য-হানিকর পদার্থের সংমিশ্রণ হইতেছে বলিয়া শুনা যায় এবং সময়ে সময়ে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা এইরূপ একটা বিশুদ্ধ পুষ্টিকর সামগ্রীর সংমিশ্রণ কি বাঞ্ছনীয় নহে? অবশ্য যাঁহারা অবিমিশ্র গব্য বা মাহিষ ঘৃতের মূল্য প্রদান করিতে সমর্থ, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু আজকাল সাধারণ লোকে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ঘৃত নামে যে সামগ্রী ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে, যে সামগ্রী তাঁহারা ঘৃত বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন তন্মধ্যে কতটুকুই বা খাঁটি ঘৃত এবং কত অংশই বা নানা দূষিত স্বাস্থ্য-হানিকর পদার্থসমন্বিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কার্পাস-বীজ-তৈল-জাত Stearine-মিশ্রিত ঘৃত ব্যবহারে অস্বীকৃত হইবেন না। যেহেতু ইহাতে যেমন এদেশীয় হিন্দু বা মুসলমানের আপত্তি-জনক কোন পদার্থ নাই, তেমনি স্বাস্থ্যহানিরও কোন সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য দেশে যাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক তাঁহারা বিশুদ্ধ দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে, তাঁহারা মার্গারিন বা মার্গারিন্‌-মিশ্রিত মাখন ব্যবহারেই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সে দেশে যে মাখনে মার্গারিন্‌ মিশ্রিত করা হয় দোকানদারেরা তাহার উপর তাহা লিখিয়া রাখে। সুতরাং বিশুদ্ধ মাখনের দাম দিয়া কাহারও মার্গারিন-মিশ্রিত মাখন পাইবার সম্ভাবনা নাই। এদেশেও আইন দ্বারা সেইরূপ দোকানদারদিগকে বিশুদ্ধ ও Stearine-মিশ্রিত ঘৃত স্পষ্ট রূপে বলিয়া দিয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা হইতেছে এ দেশে ৩০ কোটি লোকের ব্যবহারোপযোগী ঘৃতের জন্য এ দেশ-জাত কার্পাস-বীজ হইতে Stearine উৎপন্ন হইতে পারে কি না? মোরেল পেটন সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন এদেশে যে পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার বীজ হইতে প্রতি বৎসর ১৭৫, ২৪০ টন তৈল বাহির হইতে পারে এবং এই তৈল হইতে ৩৯,৫০০ টন Stearine প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে প্রতি জন বৎসরে ২॥ ছটাক করিয়া এই সামগ্রী ঘৃতের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন; ইহা হইলে এখন দেশের এক চতুর্থাংশ লোক যে পরিমাণ ঘৃত ব্যবহার করিতে পায় তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ব্যবহার করিতে যে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কার্পাস-বীজ-তৈলের মূল্য যেরূপ সুলভ তাহাতে ইহা হইতে যে Stearine প্রস্তুত হইবে তাহা ঘৃতের মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। এদেশ-জাত কার্পাস-বীজ হইতে বিলাতে বা মার্কিনে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য পড়ে মণ প্রতি ১০ টাকা ১২ টাকার অধিক নহে। অতএব এদেশে যদি ঐ বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা হইলে তাহা আরও কত সুলভে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব আমাদের মনে হয় যদি Noel Paton সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্পাস তৈল-জাত Stearine মিশ্রিত গব্য ও মাহিষ ঘৃতের ব্যবহার প্রচলন হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান ঘৃত সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইতে পারে এবং এক্ষণে ভেঁজাল ঘৃত ব্যবহারে দেশে যে নানা রোগোৎপত্তি হইতেছে তাহা হইতে লোকে রক্ষা পাইতে পারে।

নোয়েল পেটন সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে এদেশে একটী নূতন ব্যবসায়ের পথও উন্মুক্ত হইতে পারে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং যাহা বিদেশে রপ্তানি হয় প্রায়শঃই তাহার বীজ এদেশে বাহির করিয়া লওয়া হয় না। ইহাতে বীজ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহার লাভ বিদেশীয়েরাই ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু এদেশীয় কার্পাস ব্যবসায়ীরা যদি বীজ বাহির করিয়া লইয়া তূলা বিক্রয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যেমন সেই তূলা অধিক দরে বিক্রয় করিতে পারেন, সেইরূপ বীজ বিক্রয় দ্বারা অথবা বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া তৈল ও খৈল বিক্রয় করিয়া তাঁহারা আরও অধিক লাভবান হইতে পারেন। কার্পাস তৈলের খৈল ভূমির একটী উৎকৃষ্ট সার। বীজ সমেত তূলা বিদেশে প্রেরিত হওয়াতে দেশের ভূমি একটী উৎকৃষ্ট সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন তাঁহারা যদি দেশের এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিজ্ঞান চর্চ্চার পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে। জানি না ভারতের বিজ্ঞানবিৎ যুবকগণ জর্ম্মাণ যুবকদিগের ন্যায় স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য উন্নতি কল্পে কত দিনে মনোনিবেশ করিবেন।

নোয়েল পেটন সাহেবের ঘৃত সমস্যা মীমাংসা বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা করিতে করিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে আমাদের আর একটী কথা মনে হইল। অনেকে জানেন দাক্ষিণাত্যবাসীগণ নারিকেল তৈল দ্বারা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেন। এই নারিকেল তৈলও ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর। নারিকেলের শাঁস কুরিয়া লইয়া তাহা হইতে দুধ বাহির করা যায় ইহাও অনেকে জানেন। এই দুধ হইতে মাখন তোলা যায় এবং সেই মাখন গলাইলে বেশ সুগন্ধি ঘৃত বাহির হইয়া থাকে ইহা আমরা দেখিয়াছি। আমাদের দেশে ও মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ দেশস্থ স্থান সমূহে

প্রচুর নারিকেল জন্মিয়া থাকে। গব্য ও মাহিষ ঘৃত অপেক্ষা নারিকেলের ঘৃত অনেক সুলভে প্রস্তুত হইতে পারে। এই ঘৃতে লুচি, কচুরী ভাজিলে বা মিঠাই প্রস্তুত করিলে তাহা বেশ সুস্বাদু হয়, কেবল মাত্র কাঁচা ঘৃতে সুমিষ্ট নারিকেল লাড়ু বা রসকরার গন্ধ পাওয়া যায়। এই জন্য আমাদের মনে হয় যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত তাঁহারা এই নারিকেলের ঘৃত প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইলে বেশ লাভবান হইতে পারেন। কিছু দিবস হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এদেশের নারিকেল হইতে কোকোটিন Cocotine নাম দিয়া ঘৃতের ন্যায় একটী সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন। ফরাসী ভারতের পণ্ডিচারী নগরে ইহার কারখানা। আমরা জানি কলিকাতায় Jambon & Co., এই Cocotine বার আনা সের দরে বিক্রয় করিতেন। যাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ঘৃতের আস্বাদনের সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই। যিনি এই Cocotine প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী কাহাকেও বলেন না। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞান অনুশীলন করেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারেন। চীনাবাদাম হইতেও কেহ কেহ মাখন প্রস্তুত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের এক নিরামিষ ভোজী-দিগের ভোজে দুগ্ধজাত মাখনের পরিবর্ত্তে চীনাবাদামের মাখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে ততই মানবের নানা অভাব মোচনের উপায় দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহারা কি সেইরূপ দেশের অভাব মোচনে যত্ন করিবেন না? বিজ্ঞান চর্চ্চায় যদি দেশের দুঃখ দূর না হয়, শ্রী সম্পদ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুশীলন বৃথা।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান নীতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নৈসর্গিক নিয়ম ও নিসর্গ।

নৈসর্গিক নিয়ম অবভাষিত নৈসর্গিক সত্য সমূহের একটা সাধারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয় মাত্র। আমাদের অবভাষণের মূলে যদি কিছু সত্য থাকে, অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতির স্বরূপ যদি আমাদের জ্ঞানানুরূপ হয়, বা আমাদের উপলব্ধি যদি বাহ্য প্রকৃতির ছায়া মাত্র হয় তাহা হইলে নৈসর্গিক নিয়ম নৈসর্গিক সত্য সমূহের মধ্যে একটা প্রাথমিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সম্বন্ধ তখন একটা নৈসর্গিক আবশ্যকতায় (Physical necessity) পরিণত হয়। প্রকৃতি বা নিসর্গ বলিলে যদি কেবল অচেতন কর্ত্তা বুঝি, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক নিয়ম কতকগুলি নৈসর্গিক সত্য সমূহের মধ্যে নির্দ্ধারিত উচ্চতম সাধারণত্ব (highest generalization); এবং এই সকল নৈসর্গিক সত্য সম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে তাহারা কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় সংঘটিত হয়; অপর কোনও পথ যে তাহারা অনুবর্ত্তন করিতে পারিত না, তাহা বলিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। যে সকল দৃশ্বিষয় গণিতের সাধন-সঙ্কেত নির্দ্দিষ্ট (exhibited by mathematical formulæ), তাহাদের সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা প্রযুজ্য। কারণ আমাদের যুক্তির মধ্যে গণিতের অংশটুকু যদিও প্রাথমিক আবশ্যকতারূপে গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চিন্তার বিষয়ীভূত নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক সত্য সমূহে ইহার প্রয়োগ পরীক্ষা সাপেক্ষ।

কোনও নির্দ্দিষ্ট দৃশ্বিষয়, কোনও একটা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবার যে সকল নিয়ম যথাযোগ্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহাদিগকেই আমরা প্রাকৃতিক সত্য নামে অভিহিত করি। প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত প্রকৃতির অপেক্ষা আমাদের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্টতর। আমাদের অবভাষণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, আমরা যে প্রথায় চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমরা আপনাকে বাদ দিয়া প্রকৃতিকে যে ভাবে দেখিতে পাইয়াছি, অথবা, বাহিরের নিসর্গ আমাদের মধ্যে যে বেদনা জাগাইয়া দিয়াছে, প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক নিয়ম তাহারই একটা ভাষা নিবদ্ধ বর্ণনা। অবভাষিত সত্যের পৌনর্পুনিকত্ব তাহার অপরিবর্ত্তনীয়তায় আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং এই অপরিবর্ত্তনীয় অবভাষিত সত্যের কারণ স্বরূপ আমরা একটা মৌলিক নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই। একটা উদাহরণ এই কথাটা

একটু পরিষ্কার করিয়া দিবে। আমরা জানি যে দিনের পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিন ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতেছে। এই ঘটনাস্রোতের অপরিবর্ত্তনীয়তায় আমাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই বিশ্বাস আমাদের চিন্তার একটা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অজ্ঞ প্রাথমিক যুগের মানবের নিকট ইহাই প্রাকৃতিক নিয়মরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; আমাদের নিকট ইহা হইতেও আরও একটি মৌলিকতর নিয়মের কথা জানি—সেটা পৃথিবীর আবর্ত্তন। প্রবহমাণ নিসর্গ সমূহের ধারাবাহিকত্বে ও তাহাদের অপরিবর্ত্ত-নীয়তায় বিশ্বাস অনেকটা চিন্তার প্রণালী ও নিয়মের উপরেও নির্ভর করে। আমার জ্ঞান ও উপলব্ধি, বেদনা ও অবভাষণ বাহ্য প্রকৃতির ঘাতের প্রতিঘাত মাত্র। অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ম তেমনই ইহা বাহ্য প্রকৃতিরও নিয়ম। আমাদের অন্তর্নিহিত অবভাষিত সত্য, আমাদের বেদনা ও উপলব্ধি অনেকটা আমাদের নিজস্ব, অতএব নৈসর্গিক নিয়ম অনেকটা আমাদের মনস্প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু তাহা বলিয়া বাহ্য প্রকৃতিকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলে না।

আমাদের অন্তর্জগতের সকল পরিবর্ত্তন বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তন হইতে সংসাধিত হয়। জ্ঞানের যে সকল অবস্থাকে আমরা বেদনা (sensation), ভাব (emotion), কিংবা চিন্তা (thought) নামে অভিহিত করি, তাহাদের অস্তিত্ব, একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে আমাদের জ্ঞানের অপর একটা অবস্থা হইতে উদ্ভূত। এই শেষোক্ত অবস্থা "জড় ও তাহার গতি" নামে অভিহিত হয়। জড় জগতের সকল পরিবর্ত্তন এই এক গতির প্রকার ভেদ মাত্র। এবং আমাদের গতির জ্ঞান, গতিশীল জড়ের স্থান পরিবর্ত্তন বেদনা সমূহের শৃঙ্খলা জনিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞান জড়োৎপাদিত অনুভূতির মধ্যে সংনিবদ্ধ।

মানবের মন লাইবনিট্‌স্ নির্দ্দিষ্ট অদ্বয় প্রকৃতি (monad) হওয়া অসম্ভব নহে, অথবা ফিক্‌টে (Fichte) কথিত জগৎ স্রষ্টা অহং (ego) ও যৌক্তিক হইতে পারে, এবং সমগ্র প্রত্যক্ষীভূত জগৎ আমাদিগের সংস্কার অভিব্যক্তি প্রসূত চিত্র মাত্র, একথাও মানিয়া লইতে পারা যায়; আমাদিগের যে সকল উপলব্ধি সমষ্টি লইয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা কি কেবল একটা মহাশূন্য বক্ষে আমা-দিগের অহং নিক্ষিপ্ত ছায়া চিত্র? যেমন আতসবাজী, একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হইতে সমস্ত আকাশকে উল্কাপাতে প্লাবিত করিয়া দেয়, এবং এই উল্কা প্লাবন যেমন মহাশূন্যে কত সুন্দর অগ্নিময় চিত্র রচনা করিয়া নিশার অন্ধ তমসায় বিলীন হইয়া যায়—জগৎটা কি সেইরূপ?

অপর দিকে, ভিন্ন মতবাদীরা বলিবে যে আমাদিগের উপলব্ধির একটা বাস্তব কারণ আছে। আমাদিগের বেদনা তাহার বাস্তব কারণের প্রতিকৃতি না হইলেও ইহার নিদর্শন বটে। আমাদিগের স্নায়বিক যন্ত্র এই সকল নিদর্শন হইতে ধারাবাহিকরূপে নৈসর্গিক সত্য সমূহের একটি বীজগণিত রচনা করিতেছে। অতএব নৈসর্গিক নিয়ম অন্তরে ও বাহিরে; ইহা বাহিরের দৃশ্বিষয়ের ধারাবাহিকত্ব ও আমাদের বেদনাসমূহের পারম্পর্য্য উভয়ই সূচনা করে। মানবের মনও এই প্রকৃতির অংশ মাত্র, যাহা প্রকৃতির নিয়ম তাহা যে মানবের মনকে স্পর্শ করিবে না—একথা কে বলিবে?

নৈসর্গিক নিয়ম সমূহ যেমন নিসর্গ অথবা তাহার অবভাষণ হইতে আমরা গ্রথিত করিয়া লই, তেমনই নৈসর্গিক ঘটনা সমূহ আমাদের গ্রথিত নিয়ম গুলিকে সপ্রমাণিত করে; এবং যদি কখনও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে যে আমাদের গ্রথিত নিয়ম অভ্রান্ত নহে, এবং তাহার যে সংস্কার আবশ্যক সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা নিউটনের গতি-নিয়ম জানি এবং পৃথিবীর আকর্ষণের নিয়মও আমাদের জানা আছে। অতএব এই নিয়মগুলি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে কোনও বস্তুকে ছুড়িয়া ফেলিলে, উহা একটা বিশিষ্ট নিয়মানুযায়ী একটা ক্ষেপণী (parabola) রচনা করিয়া ভূপতিত হইবে।

v_0 যদি ইহার ক্ষেপণের বেগ হয়,
তাহা হইলে ইহা ছুড়িবার সময়ের বেগ বিশ্লেষণ করিলে
আমরা পাই :—

$$OX\text{এর দিকে } \frac{dx}{dt} = v_0 \text{ কো-জ্যা } \theta,$$

$$OZ\text{এর দিকে } \frac{dz}{dt} = v_0 \text{ জ্যা } \theta\, gt;$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v_0 \text{ কো-জ্যা } \theta \\ &= \text{নিত্য স্থির (constant)}; \\ \frac{dz}{dt} &= v_0 \text{ জ্যা } \theta - \tfrac{1}{2}\, gt \text{।} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

বিশ্লেষণ-জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে t সময়ের পরে

$$\left.\begin{aligned} x &= v_0 \text{ কো-জ্যা } \theta.\ t; \\ z &= v_0 \text{ জ্যা } \theta.\ t - \tfrac{1}{2}\, g.\ t^2 \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

$$\because t = \frac{x}{v_0 \text{ কো-জ্যা } \theta},$$

$$= x \text{ ত্রি-জ্যা } \theta = \frac{g}{2v_0^2 \text{ কো-জ্যা }^2 \theta}\, x^2 \quad (3)$$

এই শেষ সমীকরণ এই ক্ষিপ্ত বস্তুটির পথ যে একটি ক্ষেপণী ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার আর একবার সপ্রমাণিত করিয়াছিল যে নিউটনের গতি-নিয়ম ও মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত।

নৈসর্গিক নিয়মসমূহ যদি প্রমাণিত সত্য হয়, নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। কথাটা আমরা উপরের উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আবার নৈসর্গিক নিয়মগুলিকে অনুশীলন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কৃতির নিয়মগুলি না বুঝিলে প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যায় না। প্রকৃতিকে না বুঝিলে বিজ্ঞান ব্যর্থ।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কুমার।

পরিপাক ও খাদ্যের পরিণতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এনজাইমের কার্য্য-কারিতা।

গতমাসে বলিয়াছি যে আমরা এবার লালার কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু সম্যকরূপে লালার আলোচনা করিতে হইলে এন্জাইম্ (enzyme) কি ও তাহার কার্য্য-কারিতা কি তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। তাই আমরা এক্ষণে একটু enzyme সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিক জগতে fermentation বা গাঁজান কথাটার মর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে কোন একটা জিনিস গাঁজিয়া তাহা হইতে গ্যাস হওয়ার নামই ছিল fermentation। এই হিসাবেই আম। চিনি হইতে মদ্য পরিণতিকে alcoholic fermentation, দুগ্ধের টকিয়া যাওয়াকে acid fermentation, কোন জান্তব পদার্থ পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হওয়াকে putrifactive fermentation বলিয়া আসিয়াছি। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে fermentationএর আলোচনার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, যাহার দ্বারা দ্রব্যটি বিকৃত হয় তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। রসায়ন শাস্ত্রে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে ; তাহাতে যে দুইটি দ্রব্যের সংঘটন হয়, তাহাদের প্রত্যেকটির

স্বধর্মের লোপ পায়,—দুইটির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু fermentationএ তাহা ঘটে না। কাজেই ইহাকে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে পৃথক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। আমরা সকলেই জানি যে, দুই ভাগ Hydrogen ও এক ভাগ Oxygen মিলিয়া জল হয়। এখানে জলের স্বধর্ম্মের সহিত Hydrogen বা Oxygenএর নিজ নিজ ধর্ম্মের কোনও সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু fermentationএ তাহা হয় না। ইহা অনেকটা কবিরাজ মহাশয়দের "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের" ন্যায়; অর্থাৎ ইঁহারা স্বর্ণ দিয়া মকরধ্বজ করেন এবং বলেন ইহাতে মকরধ্বজের যথেষ্ট গুণ বাড়ে; কিন্তু আসল কথা যতটা স্বর্ণ দেওয়া হয় সমস্তটাই ফিরাইয়া পাওয়া যায়। ইহার সহিত মকরধ্বজের কোনও প্রক্রিয়াই হয় না। সেইরূপ fermentationএও যাহার জন্য কোন একটি দ্রব্য গাঁজিয়া উঠে বা fermented হয় সেটার কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না; ইহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ferment* নাম দিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় যেমন একটু সোণা লইয়া যত ইচ্ছা স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ করিয়া থাকেন সেইরূপ একটু ferment দ্বারা অনেকটা জিনিস গাঁজান যাইতে পারে। তাহাতে fermentএর গুণের কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে না।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Kirchhoff প্রথমে ferment সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি দেখিলেন যে অঙ্কুরোদ্ভব যবে এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় যাহা শ্বেতসারকে (starch) চিনিতে পরিণত করে। তিনি এইরূপ যব লইয়া পিশিয়া জলের সাহায্যে এই ferment বাহির করিয়া পরে নানা উপায়ে ছাঁকিয়া লন। তিনি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে এই দ্রব্যটিকে শ্বেতসারের সহিত মিশাইলে চিনির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই তথ্য তিনি ১৮১৪ খৃঃ অব্দে জগতে প্রচার করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Payen & Persoz সুরাসারের সাহায্যে এই দ্রব্যকে পৃথক করিয়া ইহার diastase নাম করণ করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Schwann পাচকরসে এরূপ আর একটি দ্রব্য বাহির করিলেন। ইহার গুণ এই যে ইহা albuminous দ্রব্যের নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। ইহাকে তিনি pepsin নাম দিলেন। ক্রমে trypsin, amygdalin, invertin, ptyalin প্রভৃতি অনেকগুলি ferment আবিষ্কৃত হইল।

এই সময় fermentationএর নানা প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হইল। অবশেষে জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Pasteur প্রচার করিলেন যে সুরা গাঁজন (alcoholic fermentation) ও জৈবিক পচন (putrifactive fermentation) কতকগুলি জীবাণুর জন্যই ঘটিয়া থাকে। তিনি আরও

* Ferment শব্দের আভিধানিক অর্থ কিণ্ব কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ লোকের বুঝিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া fermentই বলা হইল।

প্রমাণ করিলেন যে কতকগুলি রোগও জীবাণুর জন্যই ঘটিয়া থাকে; এই রোগ গুলির সহিত fermentationএর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। এখন আমরা জানি যে কতক-গুলি fermentation processএ জীব অধিক মাত্রায় কার্য্য করিয়া থাকে। এগুলিতে কতকগুলি জীবের প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আর অপর কতকগুলি জীব সংশ্লিষ্ট নহে। সেই কারণে আজকাল আমরা fermentকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। যাহাদের কার্য্যকারিতার মধ্যে জীব বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে organised বা জৈবীক ferment আর যাহার সহিত জীবের সম্পর্ক অতি সামান্য তাহাদিগকে unorganised ferment বলিয়া থাকি। Yeast cell বা bacteriaর দ্বারা যে গুলির কার্য্য ঘটিয়া থাকে তাহাকেই organised ferment বলে কিন্তু pepsin, trypsin প্রভৃতিকে unorganised ferment বলে কারণ ইহা জীব সংশ্লিষ্ট নহে। আবার Kuhne এই শেষোক্ত গুলিকে enzyme বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এইগুলি সাধারণতঃ Kuhneএর পরিবর্ত্তিত নামেই বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত। Buchner ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে yeast হইতে unorganised ferment বা enzyme বাহির করিয়া এই পার্থক্যের চরমে উপস্থিত হন। তিনি yeast হইতে যে enzyme বাহির করিয়াছেন তাহার দ্বারা চিনিকে সুরাসারে পরিণত করা যায়। সম্প্রতি ১৯০৩ সালে তিনি lactic acid bacteria ও acetic acid bacteria হইতেও enzyme বাহির করিয়াছেন। এ সমস্ত আবিষ্কারের ফল এই হইয়াছে যে, organised বা unorganised fermentএর পার্থক্যের একটা বাঁধাধরা সীমা নাই বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদের মত যে organised fermentগুলি নিজের জীবনের বিশেষ কোনও পরিণতির দ্বারা কার্য্য করে না। তাহাদের মধ্যে বিশেষ enzyme উৎপাদন দ্বারাই তাহারা নিজের কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে। "The so-called organised ferments probably produce their effects not by virtue of their specific life metabolism but by the manufacture within their substance of specific enzyme." *

তবে কি organised ferment ও enzymeএ কোনও পার্থক্য নাই? অবশ্যই আছে। ইহাদের কার্য্যকারিতা এক বটে। Moore এ সম্বন্ধে বলেন যে যেহেতু organised fermentএর সহিত জীব সংশ্লিষ্ট, জীবের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে এমন কোনও দ্রব্যের সংযোগে আসিলেই ইহার কার্য্য নষ্ট হয়; কিন্তু unorganised ferment যদি কোন কারণে অধঃনিক্ষিপ্ত (precipitated) না হয় তাহা হইলে ইহার কার্য্য বেশ চলিতে থাকে। †

* Howell's "A Physiology."
† "Schafer's Physiology."

আসল কথা এই যে আপাততঃ দৃষ্টিতে এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য যতই থাকুক না কেন ইহাদের কার্য্যপ্রণালী এক।

সম্প্রতি এই en yme লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে খুব আন্দোলন চলিতেছে। আজ Ostwaldএর মতই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার মত এই যে fermentএর কার্য্য catalysisএর দ্বারা হইয়া থাকে। এই catalysisটা আমাদের দেশের পরীর গল্পের "সোণার কাটি রূপার কাটির" ন্যায়। কতকগুলি দ্রব্যের এমন গুণ আছে যে তাহাদের সংস্পর্শে দুই বা ততোধিক বস্তুর যথেষ্ট রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তাহাদের নিজেদের স্বধর্ম্মের কোনও তারতম্য ঘটে না। এই সকল দ্রব্যকে রসায়ন শাস্ত্রে catalyzers বলা হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক ঃ— আমরা জানি Hydrogen ও Oxygen এই দুইএর প্রতিক্রিয়ায় জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু সাধারণ উত্তাপে এইরূপ সংযোগ ঘটে না। আমরা যদি এই দুইটি গ্যাসকে spongy platinumএর মধ্য দিয়া যাইতে দিই, তাহা হইলে সাধারণ তাপমাত্রাতেই দুইটি মিলিয়া জল হইবে। এখানে প্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিস এই যে, এই প্রক্রিয়ায় spongy platinumএর কোনও কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। এরূপ ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক জগতে catalysis বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে বোধ হয় স্বর্ণ catalyzerএর কার্য্য করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক জগতে এইরূপ অনেক প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। রাসায়নিকগণের মত এই যে ইহার দ্বারা প্রক্রিয়া অতি শীঘ্র সম্পন্ন হয়। A catalyzer is a substance that alters the velocity of a re-action but does not initiate it। আমরা সকলেই জানি যে Hydrogen peroxide (H_2O_2) আপনা হইতে জলে ও Hydrogen গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু যদি একভাগ colloid platinum ৩৫০ কোটী ভাগের সহিত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে এই প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত ঘটিয়া থাকে। রক্ত বা কোন জান্তব তন্তুর জলীয় সার Hydrogen peroxideকে অতি অল্পকালে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়।

এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে enzymeএর কার্য্য প্রণালী অনেকটা catalyzerএর মত। যদি কখনও এই catalysis সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয় তখন আমরা fermentation সম্বন্ধেও বেশ ভাল করিয়া বুঝিব। আমরা এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে আমরা যে peptic বা tryptic ও পরিপাকের সহিত catalysis এর তুলনা করিয়া থাকি তাহা কেবল বুঝাইবার জন্ত। প্রকৃত পক্ষে কি ঘটে এখনও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। সত্য কথা বলিতে কি আমরা যতদূর জানি তাহাতে albumin দৈহিক উত্তাপে কোনও কালে আপনা হইতে বিশ্লিষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে pepsin বিশ্লেষণকে সহায়তা করে তাহা হইলে আমাদের এইটুকু ধরিয়া লইতে হইবে যে albumin অতি ধীরে ধীরে আপনাআপনিই

বিশ্লিষ্ট হয়—কিন্তু ইহা এত দেরীতে হয় যে প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ হয় না বলাই বিধেয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে fermentএর কার্য্য ঠিক প্রকৃত প্রস্তাবে catalysis এর স্থায় নহে। ইহার একটা পার্থক্য আছে কিন্তু এ পার্থক্য কি তাহা আমরা জানি না। হয় ত ভবিষ্যতে "বিজ্ঞানের" কোন পাঠক এ জ্ঞান বিস্তার করিয়া জগতকে উদ্ভাসিত করিবেন! Albumin সাধারণ উত্তাপে বিশ্লিষ্ট না হইলেও একটু অধিক উত্তাপে pepsinএর সাহায্য ব্যতিরেকেই বিশ্লিষ্ট হয়।

বিপরীত প্রতিক্রিয়া বা Reversible Reaction :—রসায়ন শাস্ত্র আলোচনা কালে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি প্রতিক্রিয়া ঠিক উল্টাইয়া যায়; কথাটা একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা জানি যে ethyl alcohol ও acetic acid হইতে ethyl acetate ও জল উৎপন্ন হয়। আবার যখন আমরা ethyl acetate-এর সহিত জল মিশাই তখন alcohol ও acetic acid প্রাপ্ত হই। এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াতে চারিটা জিনিস যখন একটা সাম্য অবস্থায় থাকে তখন প্রতিক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কোনও কারণে সাম্যাবস্থা যদি নষ্ট হয় তখন আবার কার্য্য চলিতে থাকে। আমাদের এই কথা এখানে তুলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পরিপাক ও পরিণতিতেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। Kastle ও Lovenhart প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, lipase নামক দৈহিক fermentএর দ্বারা এইরূপ বিপরীত প্রতিক্রিয়া চলিয়া থাকে। Lipaseএর কার্য্য এই যে ইহা স্নেহকে অর্থাৎ চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্যকে fatty acid ও গ্লিসারিণে পরিবর্ত্তিত করে। আবার দৈহিক তাপ উৎপাদনের জন্য যখন স্নেহ বা চর্ব্বির ক্ষয় হয়, তখন এই lipaseই সাহায্য করিয়া থাকে। আবশ্যক মত এই lipaseই রক্ষক ও ভক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে,—একবার পুষ্টি বিষয়ে সাহায্য করে আবার ক্ষয় বিষয়েও সাহায্য করে। "In the subcutaneous tissue much fat may be stored to a certain point or if the conditions are altered the fat that is there may be changed over to the fatty acids and glycerine and may be oxidised in the body as food."*

Enzymeএর কার্য্য :—

Enzyme এর কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে একটি enzymeএর অপরটির উপর কোন কার্য্য নাই। যে সকল enzyme শ্বেতসারের উপর কার্য্য করিয়া থাকে অর্থাৎ ইহাকে দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত করে তাহাদের স্নেহ ও প্রোটিনের বা অন্নসার জাতীয় দ্রব্যের উপর কোনও কার্য্যই নাই। আবার প্রোটিন ও স্নেহের enzymeগুলির শ্বেতসারকে কোনওরূপ বিকৃত করিতে অসমর্থ। আবার সমস্ত শ্বেতসারের enzyme একপ্রকার কার্য্য করে না, কতকগুলির সাহায্যে maltose, আবার কতকগুলির সাহায্যে lactose

* Howell's Physiology.

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও lactose উৎপাদনকারী enzyme কোন কালে maltose উৎপাদনে সমর্থ নহে। আজ পর্য্যন্ত কেহই এরূপ দেখাইতে পারেন নাই যে একই enzymeএর দ্বারা দুই প্রকার কার্য্য হইয়াছে। "In fact there is no clear proof that any enzyme can produce more than one kind of ferment action." আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে যদি কিছু দ্বারা দুই বা ততোধিক কার্য্য পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে দুই বা ততোধিক enzyme আছে বুঝিতে হইবে। এক pancreatic রসে শ্বেতসার, অন্নসার, স্নেহ ও দুগ্ধ বিশ্লিষ্ট হয়। এবং ইহাতে diastase, trypsin, lipase ও renin যথাক্রমে এই চারিটি enzymeও আছে। Fischer বলেন যে দ্রব্যের জ্যামিতিক আকৃতির জন্য (geometrical structure) enzymeএর কার্য্য নির্ভর করে। যেমন চাবি ও তালা সংযুক্ত হইলে তবেই তালা খোলা ও বন্ধ করা যায় ঠিক সেইরূপ enzymeও ঠিক না হইলে কিছুতেই বিশ্লিষ্ট হইবে না। এখানে বলিয়া রাখি যে অম্ল ও ক্ষার দ্বারা অনেক জিনিসেই hydrolysis ঘটে কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন specific নহে অর্থাৎ সেই দ্রব্যকে hydrochloric, sulphuric বা nitric অম্ল বা অন্য কোনও ক্ষার দিয়া hydrolysis করা যাইতে পারে কিন্তু কোন carbohydrateকে যে কোনও একটা ferment দিয়া hydrolysis করা যায় না।

যখন কিছুর উপর কোন enzyme নিজের কার্য্য করিয়া থাকে তখন সেই দ্রব্যকে substrate বলা হয়। ধরুন ptyalin starchকে দ্রবনীয় চিনিতে পরিণত করিতেছে এক্ষেত্রে starchই substrate।

সাধারণতঃ সাতটি enzymes আছে :—

১। যাহা দ্বারা শ্বেতসার বিশ্লিষ্ট হয় তাহাকে শ্বেতসারঘ্ন বা amylolytic বা starch splitting বলে।

২। যাহা দ্বারা অন্নসারের বিশ্লেষণ ঘটে তাহার নাম অন্নসারঘ্ন বা proteolytic বা protein splitting বলে।

৩। স্নেহের বিশ্লেষকের নাম স্নেহঘ্ন বা lipolytic বা fat splitting।

৪। শর্করা বিশ্লেষক বা sugar splitting।

৫। অধঃনিক্ষেপক বা coagulating।

৬। দাহক বা oxidising।

৭। Deamidizing।

পরিপাকে প্রথম চারিটাই অত্যাবশ্যক।

Enzymeএর সাধারণ ধর্ম্ম :—

দ্রবণীয়তা :—

অধিকাংশ enzymeই জলে বা লবণজলে দ্রবণীয়। কতকগুলি glycerineএ দ্রবণীয়। দ্রাবকের সাহায্যেই enzymeকে পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি enzyme এত সহজে পাওয়া যায় না ; এগুলির নাম endo-enzyme ; তাহারা কোষ মধ্যে থাকে এবং সেইখানে জীবিত কোষের নানা প্রকার আবর্ত্তন ঘটায়। ইহাদের বেশ করিয়া মাড়িয়া ও নিংড়াইয়া না লইলে পাওয়া যায় না।

তাপ :—

সাধারণতঃ enzyme গুলি ৬০°-৮০° F উত্তাপেই নষ্ট হয়। আবার 0°তে তাহারা নষ্ট হয় না বটে তবে তাহাদের স্বধর্ম্মের লোপ হয়। দৈহিক উত্তাপে অর্থাৎ ৩৯° Fএ ইহাদের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া optimum activity বলা হয়।

অধঃনিক্ষেপণ :—

অধিকাংশ enzymeই সুরাসারের সংযোগে অধঃনিক্ষিপ্ত (precipitated) হয় : এই প্রথা অবলম্বন করিয়া enzymeকে বিশুদ্ধ করা হইয়া থাকে।

এই enzymeএর অধ্যায় পাঠকগণের অতি শ্রুতি কটু ও নীরস লাগিয়াছে স্বীকার করি। ইহা নীরস হইলেও অত্যন্ত আবশ্যকীয় ; সেই কারণে পাঠক সমক্ষে আনয়ন করিয়াছি। এই enzymeগুলির কার্য্য প্রণালী বিচার করিবার সময় ইহাকে যথাসাধ্য সরস করিবার চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমলালেবুর চাষ।

বাঙ্গালীর আজকাল অন্ন জুঠা দায় হইয়া পড়িয়াছে আজকাল চারিদিকেই হা অন্ন, হা অন্ন শব্দ শুনা যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বাঙ্গালীর ধনাগমের পন্থা বড়ই অল্প। ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য জগতে ধনাগমের যথেষ্ট পন্থা আছে। সেখানে এক রাজকার্য্যেই কত লোক প্রবেশ লাভ করিয়া দিনাতিপাত করে! তাহাদের সৈন্য বিভাগ আছে, নৌবিভাগ আছে; ভারতবর্ষেরও আছে বটে কিন্তু বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে পৌরোহিত্য করিয়া বহু লোক স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে কিন্তু বাঙ্গালী পুরোহিত কিরূপে দিন যাপন করেন তাহা সকলেরই জানা আছে। রাজ কার্য্য ছাড়া সেখানে স্বাধীন ব্যবসা করিয়া অন্ন জুঠাইবার অসংখ্য পন্থা আছে; তাহাতে ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ বাধা দেয় না; কিন্তু আমাদের দেশের অনেক স্থলে হয় ধর্ম্ম না হয় সমাজ বাধা দেয়। ধর্ম্মের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু সমাজ যখন আহারের অন্য পন্থা না দেখাইয়া মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় তখন সে কি ধর্ম্ম সঙ্গত কাজ করে? আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা যে মসিজীবি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অর্থ লাভ করা ঘৃণ্য। দোকানদার শুনিলেই আমরা তাহাকে একটু নীচু মনে করি। কেন তাহা বলা যায় না। তবে সত্য কথা; ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্র নাই।

লেখা পড়া শিখিয়া পরের পদলেহন না করিতে পারিলে যেন বাঙ্গালীর জীবন স্বার্থক হয় না! লেখা পড়া শিখিয়া স্বাধীন ব্যবসা অতি অল্পই আছে; শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতী, ইঞ্জিনীয়ারিং; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা কয় জন? লেখা পড়া শিখিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করা ইউরোপ আমেরিকা জাপান প্রভৃতিতে অবাধে চলিতেছে। ভারতবর্ষে এ প্রথায় যে কি অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে তাহা জানি না! সম্প্রতি কয়েক জন যুবক ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিন জন যুবক পুস্তকের দোকান করিতেছেন, একজন গাড়ীর কারবার করিতেছেন। ইহা বাস্তবিকই উন্নতির পরিচায়ক। দুই চারি জন বি এ পাস করিয়াও ব্যবসা করিতেছেন। আমার একজন বন্ধু আমার প্ররোচনায় ফুলের ব্যবসা করিতেছেন; তাঁহার মাসিক আয় ১৫০ হইতে ২০০ শত টাকা। লেখা পড়া শিখিয়া অনেকে ব্যবসা করিতেছেন শুনিয়াছি, কিন্তু চাষ করিতেছেন এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল; অনেকেই বলিয়া থাকেন ভারতে সোণা ফলে কিন্তু ফলাইবার চেষ্টা কয়জন করিয়াছেন?

ভারতের ধনাগমের প্রধান উপায় কৃষি। পৃথিবীর যত প্রকার শস্য ফসল আছে চেষ্টা করিলে ভারতের এক স্থানে না হয় অন্য স্থানে জন্মাইতে পারা যায়। বাঙ্গালার বর্ণনার সময় আমরা শস্য শ্যামলা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। বাঙ্গালার জল বায়ু উত্তাপের তারতম্যের জন্য যাহা ইচ্ছা ফসল উৎপাদন করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে আমরা বেশ লাভবান হইতে পারি এ কথা সকলেই বুঝেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহই নামিতে চান না। মাসিক পত্রিকায় বক্তৃতায় সবের শেষ হয়। কত প্রকার চাষ আছে যাহা সুবিধা করিয়া চালাইতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। আজ একটি চাষের কথা বলিব ; ইহা কমলা লেবুর।

ভারতের নানা স্থানে শীতকালে যথেষ্ট পরিমাণে কমলা লেবু জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষই এই কমলা লেবুর আদিস্থান। সিলেট, কোমায়ন, সিকিম, নীলগিরি ও ভারতের স্থানে স্থানে জঙ্গলেও এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ভারতে এই কমলালেবুর চাষ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে আরবীয়েরা এই গাছ এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে লইয়া যায়। ১০ম শতাব্দীতে মেসোপটিমিয়া সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে চাষ হয়। ক্রমে মুসলমান সভ্যতা ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার গাছ ইউরোপে গিয়া পহুঁছে। সংস্কৃতে কমলালেবুকে নারঙ্গ বলা হয়। আরবীয়গণ ইহাকে নরাঞ্জ বলিত ক্রমে ইহা ইউরোপে গিয়া orangeএ পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে চীন, জাপান, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি নাত্যুষ্ণ স্থানে কমলালেবুর যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকার কত লোক এই চাষ করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছে আর আমাদের দেশ এই লেবুর আদি জন্মস্থান বলিয়াই ইহার চাষ দুই চারি জনের হাতে ও বিদেশীর হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি !

কমলালেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার ঃ—সন্তর বা মোগলাই কমলা ; কেওনলা বা নারিঙ্গী ; লাল কমলা এবং মান্দারিণ। এই চারি প্রকার কমলালেবু ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাবে চাষ করিলে ইহা হইতে শত শত লোকের অন্ন জুটিতে পারে। এই লেবুর চাষ করিয়া যদি বিদেশে চালান দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহাতে আশাতীত অর্থাগম হইয়া থাকে এক সিলেটের কমলালেবু হইতে প্রতি বৎসর ৫।৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে একথা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? বাঙ্গালী যুবকগণ যাঁহারা B. A, B. SC, পাস দিয়া হা অন্ন হা অন্ন করিতেছেন তাঁহারা কি সিলেটের আয়ের তালিকা খুলিয়া দেখিবেন ? কালিফরনিয়ায় বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই চাষ আরম্ভ হইয়াছে—১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা জুনের মধ্যে এই দেশ হইতে ৩০ হাজার গাড়ী অর্থাৎ ৮৮,৬০,০০০ বাক্স কমলালেবু পৃথিবীর

সর্ব্বত্র চালান দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ২২৫,০০,০০০ টাকা আয় হইয়াছে! ইংলণ্ডে স্পেন, পর্ত্তুগ্যাল, ফ্লোরিড়া এমন কি অষ্ট্রেলিয়া হইতেও চালান যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের লেবুর তুল্য সুস্বাদু লেবু আর কোথাও জন্মে না। এদেশ হইতে কি চালান দেওয়া চলে না?

জমি ঃ—

উর্ব্বরা জমি মাত্রেই কমলালেবু জন্মিয়া থাকে। জমিতে জল যাহাতে না দাঁড়ায় কমলালেবুর চাষের প্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিস। তবে জমিতে যাহাতে বেশ রস থাকে সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এ কারণে কতকটা বেলে মাটি বা calcareous marl মাটিতেই বেশ ভাল জন্মিয়া থাকে। গাছের শিকড় যাহাতে জল পায় সে বিষয়ে নজর রাখিতে হয়। তবে জল দাঁড়াইলে চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সিলেট ও খাসিয়া পাহাড়ে যে জমিতে চাষ হয় তাহা বেশ অল্প ঢালু কাজেই জল জমিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে grafting প্রণালীতে চাষ করা হয়। কোন "জাতাল" গাছের বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের সহিত ইচ্ছানুযায়ী অন্য গাছের সহিত graft করা হয়। প্রথমে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ "আরজাইয়া" গাছ করা হয়। চারি বৎসর পরে nurseryতে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রোপিত হয়। কিছু দিন পরে আবার স্থানান্তরে রোপিত হয়। গাছের বয়স ৮ বৎসর হইলে graft করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই grafting প্রথায় চাষ করা হয় না। কেন না অধিকাংশ স্থানেই নিরক্ষর স্থানীয় লোকেই ইহার চাষ করিয়া থাকে। Graft তেজস্বী হইলে কমলা-লেবুর বাগানে বা orangeryতে বসান হয়। বসাইবামাত্রই "কলম" হইতে শিকড় বাহির হয় না। ইহা কিছু সময় সাপেক্ষ।

আমাদের দেশে প্রায় ৬ ইঞ্চ আন্দাজ পুরু মাটিতে বাক্সের মধ্যে বীজ বপন করা হয়। নানা প্রকার জন্তুতে—ইন্দুর কাঠ বিড়াল প্রভৃতি—ইহার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এই সমস্ত জন্তুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। বীজগুলি জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে বপন করা হয়। পরে বর্ষার প্রারম্ভে বাক্স ভাঙ্গিয়া, মাটি ঝাড়িয়া চারাগুলিকে আট-চালায় বা nurseryতে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করিবার সময় প্রধান লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে "tap root" বা সূক্ষ্ম প্রধান শিকড়টি যাহাতে কোনও রূপে নষ্ট না হয়। চারাগুলি বড় ও তেজস্বী হইলে তবে বাগানে রোপিত হয়। আমাদের দেশে যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা হয় তাহা হইলে অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল লেবু উৎপন্ন করা যাইতে পারে। Nurseryতে যাহাতে না আগাছা জন্মে সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হয়। অন্ততঃ তিন মাস অন্তর নিড়ান দিলেই

চলে। কিন্তু সাধারণতঃ কেবল একবার মাত্র নিড়ান দেওয়া হয়। কাজেই আগাছা পূর্ণ মাত্রায় জন্মাইয়া থাকে আর তাহারা জমির রস শুষিয়া জমিকে অন্তসার শূন্য করে; ফলে গাছে তেজ থাকে না এবং ফসলও অল্প হয়।

লেবুর বাগানে দুইটি গাছের মধ্যে ১০ হইতে ১২ হাত ব্যবধান রাখা হয়। আরও অধিক ব্যবধান রাখিলে ফসল আরও ভাল হয় কেন না প্রত্যেক গাছের উপর রৌদ্র পড়িতে পায় আর সূর্য্যের কিরণও জমি পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে। ফ্রান্সে ১২ হইতে ১৪ হাত পর্য্যন্ত ব্যবধান রাখা হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া বেশ করিয়া খুঁড়িয়া পচা গোবর বা অন্য কোন nitrogenous সার দেওয়া হয়। প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কতকটা আল দেওয়া থাকে এবং এই গর্ত্তের মধ্যে জল বা জলীয় সার ঢালিয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির অনাটন হইলে গাছে অন্য উপায়ে জল দেওয়া দরকার। গাছগুলি সময়ে সময়ে বেশ করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে ইহাতে গাছগুলির মাথা অনেকটা গোল বা Spherical হয়।

দুইটি গাছের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহাতে অনায়াসেই কোন বাৎসরিক ফসলের চাষ চলিতে পারে। তবে যাহাতে রৌদ্রের কিরণ বেশী আবশ্যক সেরূপ ফসল ভাল জন্মে না। বাঁধা কপি, তরমুজ, লাউ, কুমড়া, মূলার চাষ অবাধে করা যাইতে পারে; এরূপ চাষে বৎসরের অন্য সময়ে যথেষ্ট অর্থাগম হয়, কাজেই কেবল কমলা লেবুর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। প্রত্যেক গাছে চারিশত হইতে হাজার পর্য্যন্ত লেবু হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা অপেক্ষাও আরও অধিক ফসল লাভ করা যাইতে পারে। আট বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ ষাট বৎসর পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়; এক একটি গাছের বয়স প্রায় দুই তিন শত বৎসরেরও অধিক; তাহাতেও যথেষ্ট ফল ফলিয়া থাকে। তবে এই সকল গাছের ফল একটু তিত হয়।

গাছের অনেক সময় কতকগুলি রোগ হয়, এইগুলি অধিকাংশ ছাতার জন্য (fungus)। Foot rot নামক এক প্রকার রোগ এই গাছের পক্ষে মারাত্মক। ইহাতে শিকড় পচিয়া যাইতে থাকে। তখন গাছের গা দিয়া গঁদের ন্যায় এক প্রকার রস পড়ে এবং স্থানে স্থানে পচিয়া যায় তাহাতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। তখন গাছ হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে এবং পাতা ও ডাল খসিয়া পড়িতে থাকে। গাছের গোড়ায় জল জমিলে এবং মাটিতে রৌদ্র না নামিলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তখন গাছের গোড়া হইতে কিছু মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন সারযুক্ত মাটি দিতে হয়।

লেবু পাকিলে পর সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক সংগ্রহকারীর নিকট একখানি করিয়া মই থাকে; মইয়ের সাহায্যে আস্তে আস্তে গাছে উঠা হয়। যে সমস্ত লেবু বিদেশে চালান দেওয়া যায় তাহাদিগকে পূরা মাত্রায় পাকিবার পূর্ব্বে

পাড়া হয়, কিন্তু তাহাতে লেবু খুব বেশী সুস্বাদু হয় না। প্রত্যেক সংগ্রহকারীর নিকট এক খানি চটের থলিয়া থাকে। এই থলিয়ার মুখ বেতের বেষ্টনী দিয়া খোলা থাকে এবং দড়ি বা চামড়ার সাহায্যে পিঠে ঝোলে। প্রত্যেক লেবুটি ছুরি দিয়া বোঁটা হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। তাহা না হইলে অনেক সময়ে লেবুর ছাল খুলিয়া যায়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক সংগ্রহকারীর হাতে মোটা রবারের দস্তানা পরিয়া ফল সংগ্রহ করে তাহাতে হাতে কোন প্রকার আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

এইবার চালানের জন্য বন্দোবস্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে কোন প্রকার তত্ত্বাবধান না করিয়াই ফল বিদেশে চালান দেওয়া হয় কিন্তু ইহাতে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক। পচন নিবারণ করিতে হইলে ফলগুলিকে তিন চারি দিন শুষ্ক বাতাসে রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে খোলার oil cells কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক হয় এবং খোলারও অনেক জল নষ্ট হয়; ইহার নাম sweating of the fruit। এইরূপ শুষ্ক হইলে ফলগুলি বেশ করিয়া জলে ধোওয়া উচিত; তাহাতে ধুলা, কাদা ও অন্য প্রকার ময়লা ধুইয়া যায়। তখন লেবুগুলিকে সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায়। এই প্রথার নাম the order of the bath।

জল হইতে উঠাইয়া লেবুগুলি সূর্য্যের তাপে রাখা হয় ইহার নাম sun bath; পরে পুনরায় শুষ্ক কাপড় দিয়া মোছা উচিত। এই সময় লেবুগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হয়; পরে ছোট বড় আলাদা করিয়া স্তুপাকারে রাখা হয়।

প্রত্যেক লেবু চালান দিবার পূর্ব্বে tissue paperএ মোড়া হয়। এইরূপে চালান দিলে ফল এক মাস হইতে দুই মাস পর্য্যন্ত বেশ ভাল থাকে।

ব্রজকিশোর শীল।

———

মানব ও ইতর প্রাণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"বিবেক"—অর্থাৎ কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ইষ্ট এবং কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে অনিষ্ট হইবে বা কোন্ কার্য্য সৎ এবং কোন কার্য্য অসৎ এই সকল বুঝিবার ক্ষমতা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেবল মাত্র এক মানবেই বর্ত্তমান; এবং এই গুণ অধিগত হইয়াই মানব সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ।

Paul Carus "Rise of man" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে এই কথা লিখিয়াছেন :—

"The distinguishing characteristics between man and brute is *Reason;* and reason, the faculty that sees the general rule in a special example, enables man to foresee the possible or probable course of events, to make plans, to avoid danger, and to sow the seed in summer with the expectation of reaping the harvest in the fall. All other creatures must adapt themselves to surroundings; man alone can adapt the surroundings as well as all other conditions to his wants."

তিনি বলেন যে Reason অর্থাৎ সদসৎ বিচারের ক্ষমতা যাহাকে এক কথায় "বিবেক" বলে তাহা কেবল মানবেরই আছে। কিন্তু এই যে "বিবেক,"—ইহা আইসে কোথা হইতে? কোন্ গুণ লাভ করিয়া মানব সদসৎবিচারক্ষম হয়?—জ্ঞান। কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা মানবই বর্ত্তমানের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া অতীতের তথ্য অনুমান বা ভবিষ্যতের তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ। এই ক্ষমতা অপর কোন্ প্রাণীর আছে?

মানবের বর্ণনা অনেক মহোদয় অনেক প্রকারে করিয়াছেন। কেহ বলেন "man is a talking animal" অর্থাৎ মানব বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণী বিশেষ। কেহ বলেন "man is a laughing animal" অর্থাৎ মানব হাস্যকারী প্রাণী। কেহ বলেন "man is a cooking animal" অর্থাৎ মানব রন্ধনকারী প্রাণী। আবার কেহ বলেন "man is an animal with reasoning" অর্থাৎ মানব সদসৎবিচারশক্তি-সম্পন্ন প্রাণী। এই শেষ বর্ণনাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

যেহেতু বিবেক-সম্পন্ন বলিয়াই মানব কথা কহিয়া, হাসিয়া বা পাক করিয়া থাকে। সেইজন্য "বিবেক"ই প্রধান ধর্ম্ম এবং ইহা লাভ করিয়া মানব সৃষ্টিকর্ত্তার সকল সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা

কিন্তু কয়জন বিবেকী হইয়া এ জগতে কার্য্য করেন? বিবেকী হইতে হইলে "জ্ঞান" উপার্জ্জন প্রয়োজন। কিন্তু কয়জন জ্ঞান উপার্জ্জনে রত? আজ কাল প্রায় সকলেই অর্থোপার্জ্জন লইয়া ব্যস্ত থাকেন, জ্ঞান উপার্জ্জনের অবসর পান না। যাঁহারা লোক দেখান জ্ঞান অর্জ্জনে রত তাঁহারা বাস্তবিকই প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনে রত নহেন পরন্তু নিজ স্বার্থ সম্পাদনের জন্য তৎপর। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না।

যদি সকল মানব জ্ঞান উপার্জ্জনে যত্নবান হইত তাহা হইলে না জানি মানবজাতির কতই না উন্নতি হইত। স্বার্থ অনুসন্ধিৎসু বা অর্থোপপাসু হইয়া যাঁহারা জ্ঞান উপার্জ্জন করেন তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন হয় না। এবং জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া সেই সকল মানব নাম মাত্রই মানব হইয়া থাকে; তাঁহারা প্রকৃত মানব-পদবাচ্য হয় না। এবং প্রকৃত মানবপদবাচ্য না হইলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব কোন অংশে উত্তম হইতে পারে না।

ভগবান যখন আমাদিগের মানব গড়িয়া পাঠাইয়াছেন তখন আমাদের মানবোচিত কার্য্য করা এবং যে অনুষ্ঠানে রত হইলে আমরা মানব বলিয়া পরিচিত এবং নিকৃষ্ট জীব হইতে সমুন্নত বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে পারি তাহা করা উচিত। সে কার্য্য, সে সকল অনুষ্ঠান কি? সে সকল আর কিছুই নহে জ্ঞানচর্চ্চা। জ্ঞান বলিয়া জিনিসটি শুধু মানবেরই লভ্য সেই জন্য মানবমাত্রেরই জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "জীবন ক্ষণভঙ্গুর—অল্পকাল স্থায়ী। যখন নিকৃষ্ট জীবের মত মানবকেও সেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সেই যখন মানবকে রোগ, শোক, জরা ভোগ করিতে হইবে তখন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লাভ কি? জ্ঞান অর্জ্জন করিলে কি উপকার হইবে? তুমি সমস্ত জীবন ধরিয়া সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিলে তাহার পর "জোর তলপ্" আসিল; সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমায় যাইতে হইবে; মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব চলিবে না; কোন আপত্তি বা দরখাস্ত খাটিবে না; তোমায় যাইতেই হইবে। তাহার পর? তোমার এত কালের অর্জ্জিত জ্ঞান লইয়া তুমি কি করিবে? দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া যদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া এবং সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া "ছার" জ্ঞান অর্জ্জন করিতে করিতে এমন দুর্লভ মানব-জীবন অতিবাহিত কর তাহা হইলে হে মানব! তুমি কি বিচারমূঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না?

হইতে পারে—কোন কোন মহাপুরুষ ঈদৃশ মতাবলম্বী হইতে পারেন। সে সকল মহাপুরুষদিগকে আমি সুদূরপ্রদেশ হইতে উদ্দেশে প্রণাম করি। ইঁহারা মানবের মধ্যে দেবতা; ইঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা কহি সে ক্ষমতা আমার নাই—আমার কেন বোধ হয় কাহারও নাই। এই সকল মহোদয়দিগের আর অপর কোন্ সংজ্ঞা দিতে পারা যায় জানি না তবে ইঁহাদের অকৃতজ্ঞ ও বুদ্ধি হীন বলা যাইতে পারে। "জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে উপকার কি হইবে" যদি তাঁহাদের বুদ্ধি বলিয়া জিনিসটি থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ইহা বলিতেন না এবং যদি তাঁহারা ইহা জানিয়াও স্বীকার না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মত অকৃতজ্ঞ বোধ হয় জগতে আর কেহ নাই। জ্ঞানচর্চ্চায় জীবের কত শত উপকার সাধিত হয় তাহা কে নির্ণয় করিতে সক্ষম? জ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞান সর্ব্বোত্তম। বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্টরূপে যে জ্ঞান। বিজ্ঞানচর্চ্চা সকল প্রকার জ্ঞানচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ। এই বিজ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা মানবের যে কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে তাহা কে ইয়ত্তা করিতে পারে? আমাদের যাবতীয় দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল কোথা হইতে আসিত? আমাদের বিলাসিতার জন্য যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন তাহা কিরূপে আসিত? রেলগাড়ী মোটরকার, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম যে আমাদের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া সেলাইএর কল, মোজার কল, কলের তাঁত প্রভৃতি যন্ত্রও আমাদের কত কার্য্য করিতেছে। সামান্য একটি চিরুণী বা ব্রুস যাহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা কি সামান্য বস্তু হইতে এবং কিরূপ সুচারুরূপে প্রস্তুত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গরু, মহিষ, মেষ বা ছাগলের খুর, নখ প্রভৃতি জঘন্য দ্রব্য হইতে যখন চিরুণী তৈয়ার হয় তখন তাহা আদর করিয়া আমরা আলমারায় বা গ্লাস কেসে তুলিয়া রাখি। জন্তুর হাড়, যাহা অস্পৃশ্য, তাহা হইতে যখন কৌটা বা কোনরূপ আসবাব তৈয়ারি হয় তখন তাহা কি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখা হয় তাহা সকলেই জানেন। অধিকাংশ দ্রব্যই যাহা আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজন হয়, কি সামান্য বস্তু হইতে বুদ্ধি বলে প্রস্তুত করা হয় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহা যে বিজ্ঞানচর্চ্চার ফল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে কিরূপে বলি যে "জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া উপকার কি?" Radiumএর আবিষ্কারের পর ইহা চিকিৎসকমণ্ডলীর নিকট কিরূপ আদৃত হইতেছে? X-rayর দ্বারা আজ কাল কত রোগ নির্ণয় করিবার যে কি সুবিধা হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? তবে কিরূপে বলি যে "জ্ঞানচর্চ্চার কোন উপকারিতা নাই"? সুদূর প্রবাসে বসিয়া অতি প্রয়োজনীয় গৃহ-সংবাদ দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে পাইয়া থাকি; ইহা কি কম সুবিধা? আজকাল তার বিহীন টেলিগ্রাফ আরও যে কত সুবিধার হইয়াছে তাহা যাহারা "Titanic" নামক অর্ণবপোতের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছেন তাঁহাদের

বিদিত আছে। এইরূপে জ্ঞানচর্চ্চার ফলে দিন দিন মানুষের শ্রীবৃদ্ধি সূচক কত যে নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা কে সংখ্যা করিতে পারে? মানব নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, নিজ সুবিধার জন্য, স্বাস্থ্য ও শরীরের জন্যই যে কেবল জ্ঞানচর্চ্চা করিবে তাহা নহে। জ্ঞানচর্চ্চা করিলে যে বিমল আনন্দ লাভ করা যায় সেই আনন্দের প্রত্যাশী হইয়া মানবের জ্ঞানচর্চ্চা করা উচিত। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, নিজের সুখের কথা না ভাবিয়া, মানবের প্রধান কর্ত্তব্য ইহা ভাবিয়া মানবের জ্ঞান-চর্চ্চা করা উচিত। তাহা না হইলে মানব আর ইতর জীবে প্রভেদ রহিল কি? নিজ সুখ সচ্ছন্দতার কথা ভাবিতে গেলে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চা হইবে না। যে পুরুষ (generation) তাল বা নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করে সে পুরুষ সেই সকল বৃক্ষের ফল ভাল রূপে ভোগ করে না; ভোগ করে তাহার পর পুরুষ। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া, না ভাল খাইয়া না ভাল পরিয়া সম্পত্তি করিয়া যাইবে, ভোগ করিবে কে? তুমি? কতদিনের জন্য? ভোগ করা—যাহাকে যথার্থ ভোগ করা বলে,* করিবে তোমার বংশধর। এ নিয়ম সর্ব্বত্র। Stevenson রেলগাড়ী আবিষ্কার করিলেন কিন্তু ভোগ করিলেন কি? Galvani, Volta প্রভৃতি মহোদয়গণ তড়িৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তড়িৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপকারিতা তাহা তাঁহারা লাভ করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম যে এ নিয়ম সর্ব্বত্র। মানবের প্রধান কার্য্যই জ্ঞান অর্জ্জন করা যাহাতে ভবিষ্যতে মানবের জীবন আরও সুখময় হইতে পারে। তাহা না হইলে কেবল আহার করিয়া ও নিদ্রা দিয়া জীবন যাপন করিলে মানবের মানবত্ব রহিল কোথায়?

পাশ্চাত্যেরা এই জ্ঞানরূপ সুরার আস্বাদন পাইয়াছেন তাই তাহাদের উন্নতির পন্থা দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। বিলাসিতা সম্বন্ধীয়ই হউক বা বাণিজ্য ব্যবসা সম্বন্ধীয়ই হউক বা আমাদের আধুনিক নিত্য প্রয়োজনীয়তা সম্পাদন সম্বন্ধীয় যে সকল সুবিধা হইয়াছে তাহা কেবল পাশ্চাত্যদিগের জ্ঞানচর্চ্চার ফলে। ভারত-বাসীদের আর আমার বলিবার কিছু নাই। ভারতবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত। ইহার কারণ দুইটি—প্রথমতঃ ইচ্ছার অভাব দ্বিতীয়তঃ অর্থের অভাব। ইহা বড় কম পরিতাপের বিষয় নয়। যে ভারত "জ্ঞান ভূমি" বলিয়া বিদেশীয়দিগের নিকটও পরিলক্ষিত হইত সেই ভারতের কয়জন অধিবাসী "জ্ঞানচর্চ্চা" করিতেছেন? যে ভারতের মনীষিগণ জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে ভারতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থরত্ন লিখিত হইয়াছে, যে ভারতে শঙ্করাচার্য্য, বেদব্যাস, মনু প্রভৃতি বুধবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে ভারতের বিজ্ঞ বর্গ সকল বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন সেই ভারতের অধিবাসীদিগকে অধুনা বিদেশীয় কর্ত্তৃক কিনা মূর্খ বলা হয়? ইহা বড়ই দুঃখের কথা। ভারতে কয়জনকে যথার্থ জ্ঞান

অর্জ্জন করিতে দেখা যায়? যে দেশে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশে এখনও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, তারক নাথ পালিত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বসু প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের এত অবনতি কেন? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে এ দেশে জ্ঞান চর্চ্চা বড়ই অল্প। ভারতে লোক সংখ্যা প্রচুর হইলে কি হয় অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। মানব হইয়াও ভারতবাসীদের অবস্থা পশুর অপেক্ষা শোচনীয়। আজ কাল ভারতবাসী এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। কেন? যে ভারতে "সোনা ফলে" সে ভারতের লোকদিগের এত দুরবস্থা কেন? "শস্য শ্যামলা," "সুজলা সুফলা" ভারতের অধিবাসীগণ আজ কাল কিসে "দুই পয়সা" হইবে সেইজন্য হাঁ করিয়া থাকে কেন? যে ভারতে 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা" সেই ভারতের আজ এত অধঃপতন কেন? কেন তাহা অনেকেই বোঝেন কিন্তু বুঝিয়াও বোঝেন না। ইহা বুঝিয়া যদি ভারতবাসী কার্য্য করিত তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? ভগবান আমাদিগের যে রত্নের অধিকারী করিয়া সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন সেই রত্নে অবহেলা করিয়া আজ ভারতবাসীর এই দুর্দ্দশা। জ্ঞান চর্চ্চা বিশেষতঃ বিজ্ঞান-চর্চ্চা মানব মাত্রেরই করা উচিত—শুধু ভারতবাসীকে যে বলিতেছি তাহা নহে। তবে ভারতবাসী যদি উন্নত হইতে চাহে, যদি বিদেশীয় কর্ত্তৃক পদমৃষ্ট হইতে না চাহে, যদি জাতীয় ও সামাজিক উন্নতি কল্পে উদ্যোগী হইতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের সকলেরই জ্ঞান চর্চ্চা করা উচিত। লোক দেখান করা নহে, প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করা উচিত। যাহাদের জ্ঞান চর্চ্চা করিবার অর্থ নাই অথচ ইচ্ছা পূর্ণ মাত্রায় আছে, ধনী ভারতবাসী সকল অগ্রসর হইয়া ধন দানে সেই সকল জ্ঞান পিপাসু ভারতবাসীর পিপাসা নিবারণ করুন তাহাতে তাঁহাদের লাভ বই লোকসান নাই। যখন ভগবান আমাদের মানব গড়িয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন তখন কেননা আমরা মানব হইয়া থাকিব? ভগবানকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ দিই যে আমরা ইংলণ্ডাধিপতির প্রজা আমাদের সম্রাট আমাদের সম্যক প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য যেরূপ যত্নবান এরূপ আর কোন সম্রাট নহেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। ভারতবাসী এই তরুর ছায়ায় নিরাতঙ্কে বসিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করুক ভারতের গৌরব পতাকা পুনরায় ভারতগগনে উড্ডীয়মান হউক—ভারতবাসী পুনরায় উন্নত হউক। ভারতের দুর্নাম ঘুচিয়া যাক। মানব ও ইতর প্রাণীর বিশেষত্ব কি তাহা সকলেরই হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হউক।

মন্মথ লাল সরকার বি,এ।

মঙ্গলগ্রহ ভ্রমণ।

যে দিন প্রফেসর হাওয়েলের সহিত মঙ্গলগ্রহের বিষয়ে বিবিধ আলোচনা করিতে করিতে ঐ পাণ্ডিতশ্রেষ্ঠের সমক্ষে আমাদের চিরবাঞ্ছিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, সেইদিন আমার জীবনের এক অতি স্মরণীয় দিন। রমেশবাবু নিজে বড়ই লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন; যদিও Astronomy শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তথাপি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে বসিলে তাঁহার মুখ ফুটিত না; এই জন্য তাঁহাকে হাওয়েল সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে হাজার চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। অনিল চিরকাল মুখফোড়; হাওয়েল সাহেব রমেশবাবুর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিল, "রমেশবাবু বড়ই পর্দ্দানশীন"। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে আমার প্রায় এক কোয়ার্টার লাগিয়াছিল। অনিলটা এমনই নষ্ট।

হাওয়েল সাহেবের সহিত আমাদের কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এবং উক্ত মহাত্মাটির কিরূপ চেহারা এবং কিরূপ প্রকৃতি, এ সকল অপূর্ব্বতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের নিজেদের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া পাঠককে চরিতার্থ করিবার বাসনা রাখি। কেন না, আমরা এক প্রকার নূতন শ্রেণীর জীব বলিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, এবং এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞ মত সংগ্রহ করিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা অচিরেই প্রকাশ করিব; সুতরাং পাঠক! বেশী উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

যখন হাওয়েল সাহেব আমাদের দেখিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন না, তখন পাঠক নিশ্চিত বুঝিয়া থাকিবেন যে আমরা দ্বিপদ জীব ভিন্ন অন্য কিছুই নহি, আমাদের অন্যান্য পার্থিব মনুষ্যেরই ন্যায় দুই হাত দুই পা, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকা, পৃষ্ঠ, মস্তক এবং উদর (কিছু বৃহৎ) আছে। তবে এই সকল মানবোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও, আমরা যে ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নহি তাহা ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন। রমেশ, অনিল এ সকল বাঙ্গালীর নাম। সুতরাং আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী, কালা আদমী হইলেও আদমী, সুতরাং মনুষ্য। আমরা বাঙ্গালী; সুতরাং আমরা মনুষ্য; এইরূপ যুক্তি follow করিলে আমরাও মনুষ্য বলিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই রকম logical

reasoningএ কোন fallacy আছে কিনা তাহা পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে মঙ্গলগ্রহের লোকেরা এরূপ যুক্তি শুনিলে আমাদের মস্তিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবে। এই ধরণের প্রসঙ্গোত্থাপন করিয়া আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়া আমরা একবার ঐ গ্রহের শ্রেষ্ঠতর জীবসমূহের নিকট বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম; পাঠক, ক্রমে ক্রমে সে সব অপূর্ব্ব গ্রহের সহিত পরিচিত হইবেন। পাঠক আপাততঃ এই মূল্যবান উপদেশটুকু জানিয়া রাখুন যে আমরা যেমন মনে করি যে পার্থিব মনুষ্যই বিজ্ঞতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের চেয়ে বড় বঙ্গবাসিগণও সেইরূপ নিজেদের বড় দেখেন; এ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষপাতশূন্য মত এই যে আমরা ছোট, তাহারা বড়। আপনারা রাগ করিবেন না।

আমরা তিনজন রমেশ, অনিল ও শর্ম্মা স্বয়ং শৈশব হইতেই এক সঙ্গে পড়া শুনা করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কোন পড়াশুনা করিলেই যে সকল কাজ করা হইল এরূপ ধারণা আমাদের মোটেই ছিলনা। অনিল বলিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিস্ক্রিয়া দ্বারা ভারতবর্ষ ততটা উপকৃত হইতেছে না; কেন না, ভারতবাসীগণ কাজে পটু নহেন। রমেশ বলিত কথাটা তত মিথ্যা নহে, তবে কি না ভারতবাসী অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতিগণের অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্যবোধে ন্যূন নহে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনিল বলিত যে এরূপ বুদ্ধিমত্তায় কোন ফল হয় না; তাহার মতে অনুকরণ প্রিয়তা ডারুইন নির্দ্দিষ্ট মানবের পূর্ব্বপুরুষোচিত কার্য্য। এইরূপ তর্কবিতর্কের পরিণাম তত ভাল হইত না; ইহার কারণ অনিল বড় গোঁয়ার ও বক্তা আর রমেশ বেচারা নিরীহ অবাক্‌পটু ও সুদীর্ঘ শিখাধারী। আমাকে প্রায়ই মধ্যে পড়িয়া গোলযোগ থামাইতে হইত।

যাহা হউক, তর্কবিতর্কের সময়ে আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ হউক না কেন এক বিষয়ে আমরা তিনজনই একমত ছিলাম। সেটি এই যে, নবাবিষ্কৃত মঙ্গলগ্রহ লইয়া সারা বৈজ্ঞানিক জগতে যে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সেই মঙ্গলগ্রহের বিষয় আমরা তিনজন মিলিয়া এমন একটা কিছু নূতন অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিব, যে তাহার ফলে দুনিয়ায় একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, এবং মাদাম কুরীর যশঃসূর্য্যও নিস্প্রভ হইয়া পড়িবে। এরূপ অত্যাশ্চার্য্য আবিস্ক্রিয়ায় এক স্থায়ী সুফল এই হইবে যে, ভারতবর্ষের কালা আদমিরও যে অসাধারণ মৌলিক ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা সমগ্র প্রতীচ্যভূখণ্ডে স্বীকৃত হইবে।

এইরূপ উচ্চভাব সমূহে উদ্দীপিত হইতে হইতে আমাদের আর কিছু হউক বা না হউক পরীক্ষার সময়ে যে পড়াশুনার গতি অলৌকিক ভাবে মন্থর হইয়া পড়িল তাহা বোধ হয়, অভিজ্ঞ পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সুতরাং এম,এ, পরীক্ষার

ব্যূহভেদ করা অনিল ভায়ার ও আমার পক্ষে নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল; যাহা হউক, রমেশ ভায়ার নামটা সকল পরীক্ষাতেই খুব উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইয়াছিল; এবং রমেশের সুনামে আমাদের দুর্নামটা কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর প্রায় ছয় মাস কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমরা তিনটি প্রাণী যে কি অভিনব উপায়ে আত্মীয় স্বজনকে যুগপৎ চিন্তান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছিলাম তাহার দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করা আমাদের ইচ্ছা নয়। যদি আপনারা টাকাকড়ির বিষয়ে সন্দেহের চক্ষে আমাদের দেখেন, তবে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে ধনকুবের অনিল ভায়া রাজি আছে। অনিল বাস্তবিক ক্রোড়পতি এবং আইনের চক্ষে সাবালক। সুতরাং আমাদের পোয়া বারো।

এই স্থান হইতেই আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রোফেসর হাওয়েল একজন জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার সমূহের জন্য সভ্যজগত তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী।

আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে এই পণ্ডিতপ্রবরের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আমাদের বিশেষ কোন কষ্টকর আয়োজন করিতে হয় নাই, এবং কোন বিশ্ববিজয়ী কৃষ্ণকায় "পীর বক্স" চাপ রাশীর অনুগ্রহ লাভ করিতে হয় নাই। দেখিলাম, এ সকল বিষয়ে আমেরিকা ও ভারতবর্ষে প্রভেদ ঢের। হায় চাপরাশী-পুঙ্গব! তোমার কৃষ্ণ গুম্ফ শোভিত চাপদাড়িসমন্বিত আয়ত শ্রীমুখমণ্ডল হইতে নিঃসৃত দুইটি মধুরবাণী শুনিবার জন্য কত কত বড় বড় বাবু মহাশয়গণ যে তোমার সমক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা পঞ্চমুখ বিরিঞ্চির অসাধ্য। আমরা ত ক্ষুদ্র জীব।

যাহা হউক, প্রোফেসারের সহিত আমাদের যে সকল কথা হইয়াছিল সে সকলের দীর্ঘ বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। পাঠক জানেন, রমেশ ভায়াকে প্রথম দিন কিছুতেই সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে পারি নাই। ইহার এক প্রধান কারণ এই যে সে আমাদের প্লান্‌টাকে মস্তিষ্কের বিকৃতিজনিত বলিয়া মনে করিত, যদিও আমার ও অনিলের সম্মুখে সে প্রাণ থাকিতে এরূপ কথা মুখের বাহির করিতে সাহস করিত না। ধন্য অনিল! ধন্য রমেশের শিখার দৈর্ঘ্য!

যাহা হউক, প্রথম সাক্ষাতেই আমরা হাওয়েল সাহেবকে যেরূপ তুষ্ট করিয়া ফেলিলাম তাহা আশাতীত। ইহার জন্য অনিলের রসনাই সবিশেষ প্রশংসনীয়।

আমাদের প্ল্যানটি কি ধরণের তাহা বোধ হয়, পাঠকের বুঝিতে বড় বাকী নাই। রমেশ আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ; তাহার মতে, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য theoretically খুবই সম্ভব, কিন্তু practically অসাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরীক্ষায় পাস্‌ হইবার পর হইতেই তাহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখন সে অনেক

অঙ্ক করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যে কার্য্যতঃ এরূপ ব্যাপার নিতান্ত দুর্ঘট নয়। অনিলের মতটা কি রকমের তাহা বোধ হয় পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সে একদিন বলিয়া ফেলিল, যখন এত কষ্ট করিয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত আসিয়া হাওয়েলের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করা হইল, তখন ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেই হইবে। নচেৎ সে আমাদের উভয়কেই খুন করিবে ইহা নিশ্চিত। সত্য কথা বলিতে কি আমি ঐ গোঁয়ারটাকে বরাবরই মনে মনে ভয় করিতাম ; তাহার এই কথার পর হইতে আমিও সম্পূর্ণরূপে তাহার মতে মত দিলাম। কেন না, আমার অবস্থা মারীচের ন্যায়, এদিকে রাম, ওদিকে রাবণ। স্থির করিলাম মরিতে হয় ত রামের হাতেই মরিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন বি, এস্, সি।

বিবিধ।

কাগজের গুঁড়া।—উনুনে এক মুঠা ময়দা কি চালের গুঁড়া কি শ্বেতসার গুঁড়া ফেলিলে যেমন তাহা দপ করিয়া বারুদের মত জ্বলিয়া উঠে, কাগজের গুঁড়া বাতাসের সহিত আগুনের সংস্পর্শে আসিলেও সেইরূপ ভাবে জ্বলিয়া উঠে। ইহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। The Times Engineering Supplement নামক সংবাদ পত্রের ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় এইরূপ একটি বৃত্তান্ত ছিল। Lille দেশের একটি কাগজের কলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই কলে কাগজ তৈয়ারি হইয়া যাইলে, রোল করা কাগজের ধারগুলি ঘসিবার সময় অনেক গুঁড়া জমা হয়। মাঝে মাঝে এই গুঁড়া গুলিকে স্থানান্তরিত করা হইত কেননা এই গুঁড়ায় সেই ঘর প্রায় পূর্ণ হইয়া যাইত। গুঁড়াগুলিকে এইরূপ ভাবে স্থানান্তরিত করিবার সময়েই এই explosion হয়। তৎক্ষণাৎ কিছু গুঁড়া লইয়া Lievin পরীক্ষাগারে (laboratory) পরীক্ষা করা হয় ; তথায় ইহা দেখা হয় যে এই গুঁড়া গুলিকে একটি অল্প পরিসর স্থানে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করিলেই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠে। যাহা হউক ইহা এক মন্দ রহস্য জনক ব্যাপার নহে।

বর্ষাকালে পুস্তকের ছাতা নিবারণ।—বর্ষাকালে পুস্তকের শাদা শাদা এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে ; চলিত ভাষায় তাহাকে ছাতা বলে। এই ছাতা যাহাতে না জন্মায় তজ্জন্য নানা প্রকার দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে ; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্য গন্ধক দিয়া প্রস্তুত ; এই সকল দ্রব্য পুস্তকে ছাতা জন্মাইতে দেয় না বটে উপরন্তু চামড়ার মলাট নষ্ট করিয়া দেয়।

প্রত্যেক থাকের (shelf) পশ্চাৎ দিকের এক কোনে যদি ফোঁটা কতক ল্যাভেণ্ডার তৈল (lavender oil) ও ক্যানাডা ব্যালসাম (canada balsam) রাখা যায় তাহা হইলে পুস্তকে ছাতা ত ধরেই না উপরন্তু উপর্যুক্ত অন্য সকল দ্রব্যের ন্যায় চামড়ার মলাট বিশিষ্ট কোন পুস্তক থাকিলে তাহা নষ্ট করে না।

মোটরকার।—সম্প্রতি কোনও ফরাসী কোম্পানি নূতন প্রথায় মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিবার অভিনব উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে গাড়ী খানা (body of the car) হয় লৌহের পাত দিয়া না হয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। ইহা বড় সময় সাপেক্ষ তাহা ছাড়া ইহাতে গাড়ীখানি অযথা ভারী হয়। আজ কাল উক্ত কোম্পানি কাষ্ঠের ফ্রেমের মধ্যে তারের জাল মারিয়া তাহার উপর প্লাষ্টার (plaster) লাগাইয়া থাকেন। এই প্ল্যাষ্টার ধরিয়া বা বসিয়া যাইলে সিরিস কাগজ দিয়া চাঁচিয়া বেশ মসৃণ করা হয়। পরে তৈল ঘষিয়া পরে অতি সুন্দর ভাবে পালিস করা হয়। ইহাতে গাড়ী অতি হাল্কি ও মজবুত হয়। জগতে কত লোক কত উপায়ে ধন লাভ করিতেছে আর আমরা সব মামুলি জিনিস লইয়া বসিয়া আছি।

আলু।—আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা কোন স্থান পুড়িয়া গেলে আলু ছেঁচিয়া লাগান। বিলাতে একজন ডাক্তার এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ফুলা synovitis প্রভৃতি রোগও আলুর কাঁচা রসে সারিয়া যায়।

দুধে দাঁত।—দুধে দাঁত (milk tooth) অতি শীঘ্রই পড়িয়া যায় বলিয়া অনেকেই এই দাঁতের তত্ত্বাবধান করেন না কিন্তু যদি এই দাঁত carious হয় তাহা হইলে অনেক সময় বালক বালিকার স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তর মেরু যাত্রা।—আগামী গ্রীষ্মের সময় Knud Rasmussenএর অধিনায়কত্বে অনেক বৈজ্ঞানিক উত্তর মেরু যাত্রা করিবেন। Knud সাহেব পূর্ব্বে গ্রীনলাণ্ডের উত্তর সীমায় ১৯১২ সালে পৌঁছিলেন। এবার তিনি দুই বৎসর কাল থাকিবেন।

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—বেঙ্গল কেমিকালের বৈজ্ঞানিক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি উদ্বায়ী তৈল মাপিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম "প্রবোধ তৈল মিটার"। প্রবোধ রিফ্ল্যাক্স কনডেনসার' নামক আর একটি যন্ত্রও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই গৌরবের কথা।

পেশী।—অগ্নি সংযোগে যে সমস্ত ইঞ্জিন কার্য্য করিয়া থাকে, মানবের পেশী ঠিক সেরূপ ভাবে কার্য্য করে না। পেশীর দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবার কালে পেশীর যে সমস্ত বস্তু ব্যয়িত হয়, তাহাদের প্রক্রিয়াজাত রাসায়নিক শক্তিই পেশীর কার্য্য সম্পাদন শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পেশীর তন্তু সমূহ স্ফীত হইয়া উঠে বলিয়াও পেশীর শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যে সময়ে পেশী কোনরূপ কার্য্য করিতে

থাকে, সেই সময়ে ল্যাকটিক দ্রাবক নিসৃত হয়, এবং এই দ্রাবক দ্বারা পেশীর তন্তু সমূহ ফীত হইয়া উঠে। তন্তু সমূহ ফীত হইলে দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অতএব পেশীর কার্য্য সম্পাদন ইন্ধন প্রয়োগে এঞ্জিন পরিচালনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে অর্থাৎ পেশী সমূহ পুনরায় সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তখন অক্সিডেশন হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে পূর্ব্ব নিসৃত ল্যাকটিক দ্রাবক দগ্ধ হইয়া যায়, এবং ইহা পুনরায় যে সমস্ত পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই সেই পদার্থেই পর্য্যবসিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শক্তি জাত এই এঞ্জিন ইন্ধন প্রয়োগে পরিচালিত এঞ্জিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তার গতির অভিমুখ।—মহামতি মার্কনি তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তা প্রেরণের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিক হইতে সংবাদ আসিতেছে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। এই জন্য কুজ্ঝটিকা বা অন্ধকারে কোন জাহাজ অন্য জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া সংঘর্ষণের উপক্রম করিলেও বুঝিবার উপায় থাকিত না। সম্প্রতি আর একরূপ নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্র সাহায্যে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, তড়িৎবার্ত্তা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে। কাজেই কি অন্ধকারে কি কুজ্ঝটিকার সর্ব্ব অবস্থাতেই জাহাজ সমূহ পরস্পরের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে পারিবে।

তড়িৎ সাহায্যে দুগ্ধ হইতে ছানা নিষ্কাশন প্রণালী।—মাটা তোলা বা খাঁটি দুগ্ধ হইতে ছানা তুলিতে হইলে গোয়ালাগণ দুগ্ধে সাধারণতঃ অম্ল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাতে ছানা অধঃস্থ হয় বটে, কিন্তু ছানার সহিত এই অম্লের কিয়দংশ থাকিয়া যায় বলিয়া ইহা একবারে বিশুদ্ধ ছানা নহে। সম্প্রতি আমেরিকায় অন্য এক উপায়ে ছানা বাহির করা হইতেছে। ইহাতে দুগ্ধের সহিত অম্ল দ্রব্য মিশাইতে হয় না, এবং ইহাতে ব্যয়ও অল্প। কটাহে দুগ্ধ জ্বাল দিবার সময় দুগ্ধের তাপ মাত্রা ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হইলে, অর্থাৎ দুগ্ধ প্রায় ফুটিবার উপক্রম করিলে, কটাহের মধ্যস্থলে কষ্টিক সোডার (caustic soda) দ্রাবক পূর্ণ লোমকুপ সম ছিদ্র বহুল (porous) অন্য একটি পাত্রে রাখিতে হইবে। অতঃপর তড়িৎ কোষের (battery) নেগেটিভ পোলে একটি লৌহদণ্ড সংযুক্ত করিয়া এই কষ্টিক সোডার দ্রাবণে ডুবাইয়া দিতে হইবে। এবং পজিটিভ পোলে একখণ্ড অঙ্গার দণ্ড বাঁধিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া দিতে হইবে। তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইলে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ হইতে ছানা নিঃসৃত হইতে থাকিবে।

---

৫১ নং শাঁকারীটোলা, এংলো সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ।) মে, ১৯১৪। (৫ম সংখ্যা।

তামাক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উত্তম দোক্তা বা তামাক উৎপাদনের উপায়।

আমেরিকার প্রথা :—প্রথমে দোক্তার বীজ কোন আচ্ছাদিত স্থানে বপন করা হয়। পরে এই স্থান হইতে উঠাইয়া মাঠে রোপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বীজ অতি ক্ষুদ্র। প্রতি ঔন্সে প্রায় ৩০০,০০০ হইতে ৪০০,০০০ বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজ হইতেই যে গাছ হয় তাহা নহে; তাহা ছাড়া কতকগুলি গাছ রোপণ করিবার সময় নষ্ট হইতে থাকে। কতকগুলি গাছ তেজযুক্ত না হওয়ায় ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট করাও হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে শতকরা ৭৫টি গাছ সচরাচর নষ্ট হইয়া থাকে। এসব গাছ বাদ দিলেও প্রতি ঔন্সে প্রায় ৩৫,০০০ হইতে ৪০,০০০ গাছ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতে ইহা অপেক্ষা অনেক কম গাছ জন্মিয়া থাকে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় না। আমাদের দেশের সবই মামুলী ধরণের। সমাজ বা ধর্ম্মের কথা হইতেছে না, বিজ্ঞানে মামুলী প্রথায় উন্নতি হওয়া আর সম্ভবপর নহে। ভারতে নানা প্রকার জন্তুর প্রভাবেও অনেক গাছ অকালে নষ্ট হইয়া থাকে। এদেশে যে ভূমিতে চাষ হয় তাহার চতুর্দ্দিকে কোনরূপ বেড়া দেওয়া হয় না কিন্তু আমেরিকা ও তৎপ্রবর্ত্তিত অন্য দেশে প্রায়ই বেড়ার বন্দবস্ত আছে। আমাদের দেশে বাঁশ অতি সস্তা বলিতে হইবে; তবুও এ সব বিষয়ে আমরা নজর করি না। ফলে আমাদের ফসলও নানা প্রকারে নষ্ট হইয়া থাকে। আমি এখানে শুধু দোক্তার কথা বলিতেছি

না এ কথা সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। ভারতে প্রতি ঔন্সে ২৫,০০০ পর্য্যন্ত গাছ হইয়া থাকে। কিন্তু যে গুলি বিদেশীর তত্ত্বাবধানে থাকে তাহাতে গাছের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়া থাকে।

চাষের প্রধান অঙ্গ ঃ—বপন ক্ষেত্র, রোপণ ক্ষেত্র, বপন ক্ষেত্র হইতে রোপণ ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করণ, আগাছা উৎপাটন, জল সেচন, মস্তকচ্ছেদন, অতিরিক্ত ও ও অপ্রয়োজনীয় গুল্মের দমন। কীট পতঙ্গাদির হস্ত হইতে রক্ষণ।

বীজ বপন করিবার ক্ষেত্র তৈয়ারী করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। বীজের প্রকৃত উপযোগী করিতে মাটি অতি সুন্দররূপে "কোপান" দরকার। তাহার পর মাটিকে গুঁড়া করিয়া তাহাতে উপযুক্ত সার দিতে হয়। ছোট ঢিলি, কাঁকর প্রভৃতি থাকিলে চারা জন্মিবার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; চারা গুলি খুব সতেজ হয় না। জমির উপর বেশ রৌদ্রের কিরণ থাকা চাই, কিন্তু অধিক বাতাস লাগিলে সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবার সম্ভবনা অধিক। ৫০ স্কোয়ার গজ বা ১০ ছটাক জমিতে এক ঔন্স বা আন্দাজ আধ ছটাক বীজ বপন করা হয়। নানা প্রকার আগাছা যাহাতে জন্মিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। আগাছা জন্মিলে গাছ রস অল্পই পাইয়া থাকে—আর আগাছার জীবন কিছু কঠিন অর্থাৎ ইহা বেশ সহজেই জন্মিতে পারে। তখন চারাকে ছায়া দিয়া রসে বঞ্চিত করিয়া চারার যথেষ্টই ক্ষতি করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কৃষক "নিড়ান" দিয়া এই আগাছার ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকায় অনেক সময় জমির চতুঃপার্শ্বে অগ্নি জ্বালান হয়। ইহাতে চারার অন্য অন্য শত্রু ও কীট পতঙ্গাদিও নির্ম্মূল হইয়া যায়। অনেকে আবার জমির মধ্যে নল দিয়া ষ্টীম বা বাষ্প দিয়া জমিকে আগাছার বীজ শূন্য করিয়া থাকেন।

বীজবপনের উপযোগী হইলে জমির উপর পুনরায় দুই তিন ইঞ্চ পুরু বেশ মিহি গুঁড়া মাটি ও উপযুক্ত সার মিশাইয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। পরে বীজের সহিত ছাই মিশাইয়া জমির উপর ছড়ান হয়। ছাই মিশাইবার উদ্দেশ্য এই যে বীজগুলি বেশ ছড়াইয়া পড়ে আর চারা গুলি বড় ঘন ঘন না হয়। কেবল বীজ ছড়াইলে একস্থানে অনেকগুলি বীজ পড়িবে আবার অন্য স্থলে অতি অল্পই পড়িবে। বীজ ছড়াইবার পর ঝাঁটা দিয়া বীজের উপর যাহাতে মাটি পড়ে সেরূপ করিয়া দিতে হয়। এস্থলে একটি জিনিস বিশেষ রকম লক্ষ্য করিতে হইবে যে বীজের উপর যেন বেশী মাটি না পড়ে; তাহা হইলে চারা বাহির হইতে পারিবে না এবং বীজ বৃথাই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার পর জমির উপর একটা কাপড় বা মশলিন দিয়া চাপা দেওয়া হয়। পাছে ইহার ভারে চারাগুলি মরিয়া যায় সেই ভয়ে কাপড়টা চারিটা খোঁটার উপর বাঁধিয়া শূন্যে

রাখা হয়। এরূপ করিবার কারণ এই যে চারায় অত্যধিক উত্তাপ লাগিবে না আর পক্ষীরাও বীজ খাইবার সুবিধা পাইবে না। চারা গাছে জল সেচন করা কিছু শক্ত। জলের মাত্রা সামান্য অধিক হইলেই বীজ পচিয়া যায় এবং গাছ নষ্ট হয়, আবার জলের অভাব ঘটিলেও ঠিক এই অবস্থাই হয়। চারাগুলি জন্মিতে বেশ সময় লাগে। আমেরিকায়, জাভায় প্রায় ৫০।৬০ দিন হইলেই চারা গুলি রোপণের উপযোগী হইয়া উঠে; আবার স্থল বিশেষে দুই মাসেরও অধিক সময় লাগে। আসল কথা গাছে ডাঁটা গুলা বাতাসে যখন ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা কম তখনই রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর মধ্যে যাহা তীব্র বিষ তাহাকেও জন্মিতে ও বাড়িতে অনেক বেগ পাইতে হয়!

রোপণের ক্ষেত্র বেশ করিয়া লাঙ্গল দিয়া "জমি তৈয়ারী" করিতে হয়। যাহাতে আগাছা ঢিলি প্রভৃতি না থাকে সে কারণে বেশ করিয়া "চষিতে" হয়। তাহার পর উপযুক্ত সার দিয়া রোপণোপযোগী করিয়া চারা বসাইতে হয়। রোপণ বেশ সার বা লাইন দিয়া করিতে হয়, লাইনের মধ্যে প্রায় এক হাত জমি ফাঁক থাকে। দুইটি সারের মধ্যে যতটা ফাঁক থাকিবে গাছও তত সতেজ হইবে। আমাদের দেশে এক হাত অত্যূর্দ্ধ দেড় হাত ব্যবধান দেওয়া হয়। কিন্তু আমেরিকার প্রণালীতে সচরাচর ২ হইতে ৩ হাত পর্য্যন্ত ব্যবধান থাকে। বেশী কাছাকাছি হইলে তামাকের পাতা বড় খস্‌খসে হইয়া থাকে তাহাতে সিগার বা চুরুট বড় ভাল হয় না। পাতা মসৃণ হওয়া দরকার বিবেচনা করিলে দুইটি লাইন বা "থাকের" মধ্যে অন্ততঃ তিন ফিট ব্যবধান রাখা দরকার।

এক্ষণে দুইটি গাছের মধ্যে কতটা ব্যবধান থাকা দরকার দেখা যাউক। সাধারণতঃ এক ফুট ব্যবধান যথেষ্ট; অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষা কম ব্যবধান রাখা হয়। বৈজ্ঞানিক মতে ১৫ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা দরকার। এক "একার" বা আন্দাজ তিন বিঘা জমিতে দুইটি সারের মধ্যে ২ হাত ব্যবধান আর দুইটি গাছের মধ্যে ১৫ ইঞ্চ ব্যবধান রাখিলে ১১৬০০ গাছ হইতে পারে আর আড়াই হাত অন্তর লাইন বসাইয়া দুই গাছের মধ্যে ১৫ ইঞ্চ ব্যবধান থাকিলে ১০০০০ গাছ হইয়া থাকে। অল্প বৃষ্টির পর বা মেঘলা দিনেই রোপণ করা বিধেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তামাকের চারা পরে বিষ উদ্গিরণ করিলেও প্রথমে বড় মৃত্যুপ্রবণ থাকে—অর্থাৎ অযথা নাড়া চাড়া পাইলে, জল বায়ুর ও সূর্য্য কিরণের সামান্য তারতম্য ঘটিলে নষ্ট হইয়া যায়।

রোপণের প্রায় ২ মাস পরে গাছ বড় হয়; অনেক সময় আবার আড়াই মাস বা তাহার বেশীও লাগে। মোটের উপর বপণের পর হইতে প্রায় চার বা পাঁচ মাস লাগে। এই সময়ের মধ্যে জমিতে প্রায়ই আগাছা জন্মিতে থাকে। নিড়ান দিয়া এই সমস্ত আগাছাকে নির্ম্মূল না করিলে উত্তম পাতার আশা থাকে না। প্রায় এই

সময় অর্থাৎ পাঁচ মাসের সময় তামাক গাছ মুকুলিত হইবার উপক্রম করে। তখন বুঝা যায় যে গাছ ঠিক প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াছে অর্থাৎ পাতা পাকিবার উপযুক্ত হইয়াছে। মুকুলিত হইবার সূত্রপাত হইলেই কৃষকগণ এই মুকুল কাটিয়া দেয়। মুকুল নষ্ট করিবার অর্থ এই যে গাছে বীজ না হয়। অনেকে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিবেন বীজ হইলে ক্ষতি কি? সকলেই জানেন যে শিশু পালন করিতে অনেক মেহনত করিতে হয় অর্থাৎ অনেক শক্তির আবশ্যক। গাছের বীজই বংশধর। এই বীজ উৎপন্ন করিতে এবং বংশরক্ষার উপযোগী করিতে গাছের অনেক শক্তি লাগিয়া থাকে। কৃষকদের এ বিষয় লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাদের পাতার দরকার। বীজের জন্য দুই চারিটা গাছ রাখিলেই চলিতে পারে। বীজ হইতে না দিলে গাছ খুব সতেজ হয় অর্থাৎ nicotine নামক বিষ তামাকের পাতায় জমিতে থাকে। গাছের "মাথা" ছাঁটিয়া দিলে আর নূতন পাতাও জন্মিতে পারে না; কাজেই যে পাতাগুলি আছে তাহা বেশ পরিপুষ্ট হয়। মাথা ছাঁটিয়া মুকুল নষ্ট না করিলে সেই গাছের উৎপন্ন পাতার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। কখন এই মাথা ছাঁটিতে হইবে এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আছে; জমির গুণাগুণ, জল বায়ু, গাছের অবস্থা ইত্যাদি নানা সম্বন্ধে বিচার করিয়া তবেই মাথা ছাটা হয়। গাছে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র পাতা রাখা হয়। আমেরিকা ও Florida অঞ্চলে প্রত্যেক গাছে ১৫।২০টা পাতা থাকে কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৬।৮টা পাতাই যথেষ্ট।

আর কিছুদিন পরেই পাতা পাকিতে থাকে। তখন পাতার রং ঘন সবুজবর্ণ ধারণ করে; পরে এক একটি হলুদের রং এর দাগ ধরিতে থাকে। পাকিতে প্রায় ১ মাস হইতে দেড় মাস সময় লাগে; আমাদের দেশে কিন্তু আরও অল্প সময়ের মধ্যে পাকিয়া থাকে। পাতাগুলি যখন পাকে তখন "দুমড়াইলে" অতি সহজেই ফাটিয়া যায়। "বিজ্ঞানের" পাঠক সকলেই বোধ হয় জানেন যে পাতার বয়স কিরূপে বুঝিতে হয়। আমরা সকলেই জানি যে গাছ উপর দিকে বাড়িতে থাকে। প্রথমে যে পাতা হয় তাহা অন্য পাতা জন্মিলে নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ যে পাতা যত শিকড়ের নিকটবর্ত্তী সে পাতা ততই অধিক দিনের। কাজেই দোক্তার পাতা যাহা মাটির কাছে অর্থাৎ শিকড়ের কাছে থাকে তাহাই প্রথমে পাকে। উৎকৃষ্ট বা উচ্চদরের তামাকের পাতা যেমন এক একটি পাকিতে থাকে অমনি বৃক্ষচ্যুত করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সাধারণতঃ যখন মধ্যের পাকে তখন সমস্ত গাছটি কাটিয়া ফেলা হয়। তামাকের পাতা "চয়ন" করিবারও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। শিশিরে বা অন্য কারণে ভিজা পাতা তুলিবে না। সূর্য্যের প্রখর কিরণে তোলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈকালেই পাতা তুলিবার উপযুক্ত সময়; তাহার পর এই পাতা টুকরি করিয়া শুকাইবার জন্য "Drying shed" নামক ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এই drying shed এ

লইয়া যাইয়া কুলার ন্যায় সামান্য গহ্বরযুক্ত ঝুড়ি বা চুপড়িতে রাখিয়া দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। পাছে এক সঙ্গে অনেক পাতা রাখিলে পচিয়া যায় বা উপযুক্ত হাওয়ার অভাবে শুকাইতে না পারে সেই জন্য এই চুপড়িতে অনেক পাতা এক সঙ্গে রাখা হয় না। অনেক সময় যে সব গাছ কাটিয়া ফেলা হয় তাহার পাতা গুলা সেই গাছেই লাগান থাকে এবং এক স্থানে দাঁড় করাইয়া পুতিয়া দিলে যথা সময়ে শুষ্ক হয়। তখন এগুলি চয়ন করা হয়। আবার অনেক সময় "মাচায়" রাখিয়া শুষ্ক করা হয়।

পরিচর্য্যা।

এক্ষণে চাষের কথা শেষ হইল। তাহার পর কি হয় দেখা যাউক। প্রথমেই তামাকের পাতাকে শুষ্ক করা হয়। এইরূপ শুষ্ক করিবার প্রথাকে curing বলা হয়। এইcuring সাধারণতঃ চার প্রকার যথা Sun curing, Air curing, Fire curing এবং Flue curing.

Sun-curing বা সূর্য্য বা আতপ চর্য্যা:—আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব নাই তাহা ছাড়া ইহাতে পয়সা খরচও নাই কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আতপে শুষ্ক করা প্রশস্ত ও বিধেয়। একটা "চালায়" থাকা থাকা মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর দোক্তার পাতা গোছা গোছা করিয়া রাখিয়া দেওয়ার নামই sun-curng। বৃষ্টির জল যাহাতে না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। Virginia ও ভারতে এই প্রথা খুব বেশী প্রচলিত। এরূপ উৎপন্ন তামাক নাকি অতি সুমিষ্ট "দোক্তা" ও "শুকা" খাইবার উপযোগী হয়। ভারতে চুরুট অপেক্ষা শুকা দোক্তা ও তামাক খাওয়ার প্রচলন অতি অত্যাধিক কাজেই এই সুমিষ্ট তামাকের পাতার কাটতিও ভারতে বেশী।

Air-curing : পবন চর্য্যা; প্রথাটা প্রায় একই। আতপে শুষ্ক না করিয়া মুক্ত বায়ুতে ঝুলাইয়া রাখিয়া যে প্রকারে শুষ্ক হয় তাহাই পবন চর্য্যা নামে পরিচিত। যে দেশের বায়ুতে বাষ্পের পরিমান অধিক সে দেশে অনেক সময় অগ্নি সহযোগে বায়ু উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। চুরুট বা সিগারের জন্য যে তামাকের পাতা আবশ্যক তাহা এ প্রথায় অতি সহজে লব্ধ হওয়া যায়। এইরূপে শুষ্ক হইতে প্রায় দেড়মাস সময় লাগিয়া থাকে।

Fire curing বা অগ্নি চর্য্যা;—মাচায় পাতা রাখিয়া ঘরের মেঝে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়। প্রথমে অতি অল্প তাপ রাখা হয় পরে ইহা ১৫০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত তোলা হইয়া থাকে। তিন চারি দিন এই অবস্থায় তামাকের পাতা শুষ্ক হয়। এই প্রথায় শুষ্ক তামাক পুনরায় বায়ু সংযোগে আসিয়া বাষ্প লইয়া নেতাইয়া পড়ে কাজেই বাজারে বিক্রয়ার্থে পাঠাবার পূর্ব্বে এই প্রথায় দুই তিনবার শুকান হয়।

Flue curing;—উত্তাপ চর্য্যা:—পূর্ব্বে যেমন অগ্নি ঘরের মেঝে জ্বালান হয় ইহাতে কিন্তু তাহা হয় না। ঘরের বাহিরে অগ্নি প্রজ্জলিত রাখা হয় এবং লৌহ নলের flueএর ভিতর দিয়া উত্তাপ ঘরে প্রেরণ করা হয়। ঘরে চতুস্পার্শ্বে দোক্তা পাতা ঝুলাইয়া রাখা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় প্রায় পাঁচ দিন রাখিয়া ৯০°—১৪০° F পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হইয়া থাকে। এই প্রথা প্রাপ্ত তামাকের পাতা সিগারেট, pipe tobacco দোক্তার উপযোগী।

যে প্রকারেই হউক না কেন শুষ্ক করিলে পাতাগুলি বড়ই ভগ্ন প্রবণ হইয়া পড়ে। তখন এই অবস্থায় তাহাদের রাখিয়া দেওয়া হয়; পরে বায়ু-সংশ্লিষ্ট বাষ্প লাগিয়া তাহারা পুনরায় নরম হয়। তখন হাত দিলে আর গুঁড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। এ সময় তাহাদের বাছিয়া গুণানুসারে আঁটি বাঁধা হয়।

গাঁজান।

তামাক শুষ্ক করিয়া আঁটি বাঁধিবার পর "গাঁজান" হয়। একটি ঘরের মধ্যে প্রায় ৪ হাত আন্দাজ উচ্চ করিয়া গাদা করিয়া রাখা হয়। তখন তামাক বা দোক্তার পাতা আপনা আপনিই গাঁজিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে নানা প্রকার bacteriaর দরুণই পাতা গাঁজিতে থাকে; কিন্তু অনেকেই এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন যে পাতা শুষ্ক করিবার সময় কতকগুলি enzyme পাতার মধ্যে উৎপন্ন হয় তাহাদের জন্য পাতা গাঁজিয়া উঠে। গাঁজিবার সময় ঘরের উত্তাপ বেশ বাড়িতে থাকে সাধারণতঃ ১৩০°F পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিতে দেওয়া হয়। এরূপ প্রায় পাঁচ সপ্তাহ কাল গাঁজান হয়। গাঁজাইবার সময় মধ্যে মধ্যে স্তূপগুলা ভাঙ্গিয়া পুনরায় সাজান হয়। তখন যে পাতা নিচে ছিল তাহাকে উপরে, যে পাতা উপরে ছিল তাহাকে নীচে, এবং যাহার ধার বাহিরে ছিল তাহার ধার ভিতরে দেওয়া হয়। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে সব পাতা যাহাতে সমভাবে গাঁজিতে পারে। তাহা না হইলে তামাকের দাম কম হয়। প্রায় দেড়মাস পরে ইহার রং মেটে হইয়া উঠে তখন পাতা বাছিয়া চালান দেওয়া হয়। তামাক যতই পুরাতন হয় ততই নাকি সুস্বাদু হয়। ইহা তামাক খোরেরা বলিতে পারেন। শুষ্ক করিতে গাঁজাইতে প্রায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হয় অনেক সময় আবার চার পাঁচ বৎসর কাল লাগিয়া থাকে।

অনেক সময়ে চুরুটের জন্য যে তামাক ব্যবহৃত হয় তাহাতে এই সময়ে সুগন্ধাদি সংযোগ করা হয়। Rum Sour wineএর সহিত নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যাদি যথা oil of aniseed, tincture of velarian লবঙ্গের গুড়া, দারুচিনি, যষ্টীমধু, চিনি, লবণ, সোরা ইত্যাদি দিয়া দোক্তার পাতা ভিজান হয়। এই পাতাকে fillers বলা হয়; এগুলি গুড়া ভাঙ্গা পাতা ইহার পর আস্ত পাতা দিয়া মুড়া হয় তাহাকে cover বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই তামাকের চাষ হইয়া থাকে তবে মাদ্রাজ, বম্বে ও পাঞ্জাবে ইহার চাষ খুব বেশী ; ভারত হইতে খুব বেশী রপ্তানি হয় না। চেষ্টা করিলে অনেক দেশের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট তামাক এদেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে যথেষ্ট ধন ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশের কৃষককুলের অবস্থা কাহার না অবিদিত। তাহারা খাজনা দিয়া নিজেদের দুই বেলা অন্ন জুঠাইতে পারে না। তাহারা কি করিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে চাষ করিবে? তাহা বাস্তবিকই ব্যয় সাধ্য। ভারতে অনেক ইয়োরোপী ও আমেরিকার ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক হিসাবে চাষ করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা বসিয়া দেখিতেছি, না হয় আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানারূপ মিথ্যা জল্পনা কল্পনা করিতেছি। আমরা আজকাল বড় অলস প্রিয় হইয়াছি কাজেই কোনরূপ কাজের কথা বড় কানে তুলিতে চাহি না। আমাদের দেশের অনেক যুবক অন্নের চেষ্টায় বিনা বেতনে এখানে তিন মাস ওখানে দুই মাস চাকুরী করিতেছেন কিন্তু এ সব কার্য্যে হাত দিতে কেহ রাজি নহেন। অনেকেরই মত ইহাতে মানে ছোট হইতে হয়। মান কোথায়? পরপিণ্ডজীবি হইয়া পরের ও দেশের গলগ্রহ হইয়া থাকায় না স্বাধীন ভাবে চাষ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করায়? আমাদের দেশের এই হীনাবস্থা আরও হীনতর হইতে চলিল।

অনেকে বলেন ভদ্রলোকের ছেলে এত কষ্ট করিয়া চাষ করিব কি করিয়া? চাষ করা মানে তাহারা অনেকেই মনে করেন—আর মনে না করিলেও তর্কের খাতিরে সম্ভবতঃ বলেন বটে—যে লাঙ্গল না ধরিলে চাষ করা হয় না। কিন্তু এদেশে যে এত সাহেব, আমেরিকানেরা চাষ করিয়া খাইতেছে তাহারা কি লাঙ্গল ধরিতেছে? না তাহারা লোক দিয়া অর্থাৎ ভারতের কৃষককুলের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে? তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেয়, কাদা ঘাঁটে, মাটি কোপায়, জলে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে আর চাষের মালিক আবশ্যক মত বিজ্ঞান সম্মত নানা প্রকার মাল মশলা সাজ সরঞ্জম বীজ কিনিয়া দেন। নানারূপ পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে ঘর, বাড়ী, nursery, গুদাম, প্রভৃতি দরকার হয় তাহাই তাঁহারা অর্থের সাহায্যে তৈয়ারী করাইয়া লন। তাহার পর ফসল হইলে মালিক পাইয়া থাকে কাজেই "তোমরা কেবল গ্রাসের মালিক চাষের মালিক নও" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের ধনিগণ কৃষকগণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

Co-operative Society এ সম্বন্ধে বিশেষ ও বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র আরও বাড়াইতে হইবে। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব কোন নূতন কিছু অবলম্বন না করা। সেই জন্য আমাদের দেশের এই প্রবাদ আছে "পুরান চাল ভাতে বাড়ে"। কৃষককুল স্বপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও প্রকার পরীক্ষা করিতে

রাজি নহে। কাজেই Societyর কর্তৃপক্ষগণকে সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া দেখাইতে হইবে যে বাস্তবিকই এই প্রথায় লাভ অধিক। তবেই কৃষকগণ লাভ করিবে। এদেশে অনেককাল পূর্ব্বে গভর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। দুই চারি জন ইংরাজ ও আমেরিকান বণিক বলেন যে এই চাষ ভারতবাসীর হাতে না দিয়া আমাদের হাতে থাক, কেন না তাহারা বৈজ্ঞানিক ভাবে চাষ করে না তাহা ছাড়া ইহার পরিচর্য্যা করিতে যে সময় লাগে তাহা অনেকেই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করে। এরূপ করিবার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষকদের এমন সংস্থান নাই যে তাহারা বসিয়া খাইয়া তামাকের পরিচর্য্যা করিবে। কাজেই তামাক কাটা হইলেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া ডাল কলাই চাষ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। এটা অনেকটা তাহাদের অনভিজ্ঞতার কারণও বটে আবার অনেকটা পেটের দায়ও বটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ এ বিষয় নজর দিবেন কি?

তামাক হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

সিগার:—সভ্যদেশেই ইহার বিস্তার বেশী; আমাদের দেশে ইহার প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কতকগুলি তামাক অত্যন্ত কড়া আবার কতকগুলি বেশ সুমিষ্ট। ব্যবসাদারেরা নানা প্রকার সংমিশ্রণে ব্যবহারে উপযোগী করেন। এই প্রথাগুলি "Trade secret"।

সিগারেট:—তামাকের কুচা কাগজে মোড়া। আমাদের দেশে সিগার অপেক্ষা ইহার প্রচলন অধিক। ইহাতে অধিকাংশ সময় খারাপ দোক্তা ব্যবহার করা হয় কাজেই ইহার দামও অপেক্ষাকৃত কম।

"তামাক":—তামাকের পাতা গুঁড়াইয়া গুড় মাখিয়া "তাল" করা। স্থল বিশেষে সুগন্ধ যুক্ত। ভারতে ইহার প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রোড়পতি পর্য্যন্ত ইহাতে আসক্ত।

বিড়ি:—শালপাতা মুড়া তামাকের কুচা। কিছু দিন হইল ইহার ব্যবহার বেশ চলিতেছে। ইহাতে অনেক অন্নহীনের অন্ন জুটিয়াছে।

নস্য:—অন্য অন্য দ্রব্য প্রস্তুতের পর যে সমস্ত জঘন্য ছেঁড়া পাতা পড়িয়া থাকে সেইগুলি কুটিয়া ছাঁকিয়া নস্য তৈয়ারী করা হয়।

"দোক্তা":—বাঙ্গালায় সমধিক প্রচলিত তামাকের পাতার সহিত নানা প্রকার মশলা মিশাইয়া স্ত্রীলোকেরা তৈয়ারী করিয়া থাকে।

সুর্ত্তী জরদা ইত্যাদি সবেরই মূলে দোক্তা পাতা আছে।

প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ৬০০,০০০,০০০ টাকা তামাক ব্যবহৃত হয়।

১৯০৫ সালে পৃথিবীর কোনস্থলে কত তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল—

	মন	সের
উত্তর আমেরিকা	৯,০১৮,৬৫০	০
দক্ষিণ আমেরিকা	১,৩৫৭,১৮৭	২০
ইউরোপ	৭,৮৭৬,৬৬২	২০
এসিয়া	৮,৬২৭,০১২	২০
আফ্রিকা	২৯১,৮২৫	০
অষ্ট্রেলিয়া ও ফিজি দ্বীপ	১৮,৫৭৫	০
মোট	২৭,১৮৯,৯১২	২০

প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঘর্ষণ।

ঘর্ষণোৎপাদিত তড়িৎ।—অনেকেই অবগত আছেন যে, বল-চালিত কোনরূপ গতি—বিশেষতঃ ঘর্ষণ—তাপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। "শান পাথর"কে বিঘূর্ণিত করিতে হইলে কতকটা বল ব্যয়িত হয় এবং যে অক্ষ দণ্ডের উপর শান পাথর স্থাপিত, তৎপ্রদত্ত প্রতিবন্ধকতা, বায়ু ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করাইয়া পাথরকে ঘূর্ণায়মান রাখিবার জন্যও কতকটা বল আবশ্যক। তৎব্যতীত যদি কোন পদার্থকে চাপিয়া ধরা হয়—যেমন ছুরী কাঁচি ইত্যাদি—তাহা হইলে সেই চাপজাত প্রতিবন্ধকতা নষ্ট করিবার জন্যও বল প্রয়োজন। যে পদার্থকে ঘূর্ণায়মান প্রস্তরে চাপিয়া রাখা হয়, সেই চাপের অনুপাতে ঘর্ষিত পদার্থে উত্তাপ সঞ্জাত হইয়া থাকে। যদি এই প্রস্তরে এক খণ্ড ইস্পাত চাপিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে স্ফুলিঙ্গরাশি নির্গত হইতে থাকে, ইহার দ্বারাই বল পরিচালিত গতি তাপে পরিণত হইয়াছে প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে শান পাথরের পরিধি ব্যাপিয়া যদি এক খণ্ড ফ্ল্যানেল সংযুক্ত করা হয় এবং ইস্পাতের পরিবর্ত্তে একখানি ইবনাইট চিরুণী বা কাচদণ্ড চাপিয়া ধরা হয়,

তাহা হইলে তাপ ছাড়া চিরুণিতে বা কাচদণ্ডে আরও একটি ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়। এই ধর্ম্ম অনুসারে চিরুণী বা দণ্ড লঘু পদার্থ সমূহকে—যেমন খড়, তৃণ, পালক ইত্যাদিকে—আকর্ষণ করিতে পারে।

তৃণমণিতে ঘর্ষণজাত এই শক্তি উৎপাদন অতি প্রাচীন কালে মিলেটাস নগরীর পণ্ডিত থেলিস লক্ষ্য করিয়া তাহার বর্ণনা লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই তৃণমণির গ্রীক নাম ইলেক্‌ট্রণ Electron ; এবং গিলবার্ট কর্ত্তৃক এই শক্তির পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম ইলেক্‌ট্রিসিটি রক্ষিত হইয়াছে।

যাহা হউক তড়িৎ এক প্রকার অদৃশ্য কর্ম্ম-সম্পাদক শক্তি। ইহার নানাবিধ ক্রিয়া দ্বারা এবং ইহার নানা নিসর্গ দ্বারা আমরা ইহাকে উপলব্ধি করি। এই সমস্ত নিসর্গকে আমরা "তাড়িৎ" (electrical) বলিয়া থাকি। যে উপায়ে এই সমস্ত কাচ বা ইবনাইট এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত উপায়কে "তড়িন্ময়করণ" (electrification) বলে। যে সমস্ত পদার্থ এইরূপ উপায় দ্বারা এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে তড়িন্ময় (electrified) বলে। তড়িতের প্রহেলিকাপূর্ণ ধর্ম্ম প্রাচীনগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু অধুনাতনকালে এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা চলিয়াছে, কাজেই ইহার ধর্ম্মও কতকটা বোধগম্য হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন কিছুই নির্ভুল স্থিরীকৃত হয় নাই। বস্তু বা শক্তি উভয়ের কোনটি বলিয়াই ইহাকে স্থির করা যায় না। কিন্তু স্থূলতঃ বস্তুর সহিত ইহা ওতঃ প্রোতঃ ভাবে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাকে পরিচালিত করিতে শক্তি ব্যয়িত হয়। পদার্থের বা পদার্থ সমন্বয়ের কোন অংশে বল-সমুদ্ভূত শক্তি ব্যয়িত করিয়া সেই পদার্থের বা পদার্থ সমন্বয়ের অন্য অংশে সেই শক্তিকে তাড়িত-তাপ, তাড়িতালোক বা তাড়িত-ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত করা যাইতে পারে। এই রূপান্তরিত শক্তি অচিন্ত্য-পূর্ব্ব গতিতে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে পারে। শক্তির এই অবস্থা মানবের মহোপকার সাধন করিয়াছে। সার অলিভার লজ বলেন যে "তড়িৎ খুব সম্ভবতঃ এক প্রকার বস্তু হইতে পারে। কিন্তু ইহা কোন প্রকার শক্তি হইতে পারে না। ইহাতে চাপ প্রযুক্ত হইলে এবং গতিশীল তড়িৎ অনেকটা শক্তির ন্যায় উপলব্ধ হয় বটে কিন্তু জল, বায়ু ইত্যাদিও এরূপ অবস্থায় শক্তিরূপ ধারণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া জল বা বায়ুকে আমরা বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু বলি না।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমি যে অর্থে তড়িৎ বাক্য ব্যবহার করিতেছি, সেই অর্থ বোধগম্য করা আবশ্যক। তড়িন্ময়করণ (electrification), কোন সম্পাদনের কার্য্য ফল। ইহা তখন নিশ্চয়ই একটা শক্তি বিশেষ। ইহাকে কোন কার্য্য দ্বারা উৎপাদন এবং বিনাশ উভয়ই করা যাইতে পারে। কিন্তু তড়িৎ উৎপন্ন করা যায় না; বিনষ্টও করা যায় না। ইহাকে বস্তুর ন্যায় কেবল মাত্র পরিচালিত অথবা চাপ গ্রস্ত করা যায়। আজ পর্য্যন্ত কোন

ব্যক্তিই অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থানে অথবা অতি নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে সম পরিমাণ বিসম তড়িৎ (negative electricity) উৎপাদন না করিয়া কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সম তড়িৎ (positive electricity) উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়েন নাই।"

ইহাই তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি অতি প্রধান নিয়ম (Law), এবং ইহাকে নানা উপায়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ বলা যাইতে পারে—উৎপাদিত তড়িৎ সমষ্টি গণিত হিসাবে সর্ব্বদাই যতটুকু সম তড়িৎ (+ তড়িৎ) উৎপাদিত হইবে ততটুকু বিসম তড়িৎ (—তড়িৎ) উৎপাদিত হইবেই। যদি কোন পদার্থ তড়িৎ লাভ করে অন্য বস্তুর তড়িৎ অপচিত হইবেই।"

"এক্ষণে যদি এইরূপই হয় যে কোন কিছু যতটুকু উৎপাদিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীতও ততটুকু উৎপাদিত হইবে, অর্থাৎ কোন এক পদার্থ যতটুকু লাভ করে অন্য বস্তুর ঠিক ততটুকু অপচিত হয়, তাহা হইলে কোন পদার্থে কোন কিছু উৎপাদিত হয় নাই এবং অন্য পদার্থেও কোন কিছু নষ্ট হয় নাই, এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে পরিচালিত হইয়াছে এরূপ বলাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও জটীলতাশূন্য। এইরূপ ভাবে ধরিলে তড়িৎ ঠিক একটা পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে।

যাহা হউক তড়িৎ উৎপাদন করা যায় না এবং বিনাশও করা যায় না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ইহা প্রায় সমভাবে বিস্তারিত রহিয়াছে। ইহার গতি ঠিক আলোকের গতির সমতুল্য, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল।

এই উনবিংশ শতাব্দীর একটা মহত্তম আবিষ্কার এই যে—আলোক স্বয়ং তড়িতের নৈসর্গিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং আলোক-তরঙ্গ কেবল মাত্র তাড়িত বা তাড়িত-চুম্বক-তরঙ্গ। এই মহান সত্য মহামতি ম্যাক্স্ওয়েল আবিষ্কার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

সূর্য্য

সৌরজগতে নভশ্চরদিগের মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং রশ্মিশালী। সৌর-জগতে অপরাপর যে সকল জ্যোতিষ্মান পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সূর্য্যের জ্যোতিঃ অপহরণ করিয়াই জ্যোতিষ্মান হয়—অর্থাৎ তাহাদিগের আপনার কোন জ্যোতিঃ নাই, সূর্য্যের কিরণ তাহাদের উপর পতিত হয় বলিয়াই তাহাদিগকে জ্যোতি-ষ্মান বলিয়া মনে হয়। সৌরজগতে জ্যোতিঃ ও তেজ কেবল মাত্র সূর্য্যেরই বর্ত্তমান, আর কাহারও নাই। রাত্রে আমরা দেখিতে পাই বটে যে চন্দ্র এবং বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলি রশ্মি দান করে কিন্তু যদি এই মুহূর্ত্তেই সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাপিত হয় তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই চন্দ্র এবং গ্রহগুলি অদৃশ্য হইবে। চন্দ্র বা গ্রহ সমুদয়ের গাত্র হইতে সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হয় বলিয়াই সে গুলিকে উজ্জ্বল ও রশ্মিশালী বলিয়া মনে হয়; চন্দ্র যদি জ্যোতিষ্মান হইত তাহা হইলে ইহার কলার হ্রাস বৃদ্ধি হইত না বা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হইত না। প্রত্যহই পূর্ণ-চন্দ্র আকাশে উদিত হইত।

সূর্য্যের আলোক না থাকিলে সৌরজগত অন্ধকার হইত; জ্যোতিষ্মান তারকা-মণ্ডলী ব্যতিরেকে সমগ্র জগতে আর আলোক বলিয়া বোধ হয় কোন দ্রব্য দৃষ্টি গোচর হইত না; আলোক দেখিবার জন্য এ পৃথিবীতে কোন জীব জীবিত থাকিত কি না তাহাও সন্দেহ জনক; যেহেতু সূর্য্যের আলোক ও তাপ জীবের জীবন কারণ। অনেকের ইহা জ্ঞাত আছে যে সূর্য্যের আলোক গ্রহণ করিয়াই উদ্ভিদে chlorophyl নামক পদার্থ প্রস্তুতঃ হয়; সূর্য্যালোক ব্যতীত উক্ত দ্রব্য কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। Chlorophyl প্রস্তুত না হইলে উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে না; উপরন্তু উদ্ভিদ যখন সকল জীবেরই আহার তখন উদ্ভিদ ব্যতি-রেকে কোন জীবও জীবিত থাকিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, উত্তাপ অভাবে এ পৃথিবীর কোন জীব বাঁচিতে পারে না।

সূর্য্যের উত্তাপ যাইলে কি ভয়ানক শৈত্য আসিয়া সৌরজগৎকে বেষ্টন করিবে তাহা অনুমেয় নহে; ইহার কতকটা প্রমাণ আমরা শীতপ্রধান দেশে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পরিমাণে আসিয়া পড়িতে পায় না যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের কিরণমালা right angleএ আসিয়া ভূমিতে পতিত হয় না। সেই জন্য শীতপ্রধান দেশে অধিক স্থানে অল্প সৌর কিরণ পতিত হয় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে

অল্প স্থানে অধিক সৌর কিরণ পতিত হয় : এই কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশ অধিক শীতল। এই কারণেই আবার গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকাল অধিক শীতল। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের কিরণ প্রায় right angleএ আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয় ; এই কারণে অল্প স্থানে অধিক কিরণ পতিত হয়। কিন্তু শীতকালে সূর্য্যের কিরণ প্রায় ৭০°।৮০° angleএ পতিত হয়। এই জন্য যে জায়গায় গ্রীষ্মকালে যত কিরণ পড়ে সেই জায়গায় শীতকালে তদপেক্ষা অল্প কিরণ পড়িয়া থাকে অথবা যতটুকু কিরণ গ্রীষ্মকালে যতটুকু জায়গায় আসিয়া পড়ে ততটুকু কিরণ শীতকালে তদপেক্ষা অধিক জায়গায় আসিয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে ইহা আরও পরিস্কাররূপে বুঝা যাইবে। একটি ল্যাম্পের সম্মুখে একখণ্ড কাগজ যদি ঠিক সোজা ভাবে ধরা যায় যাহাতে ল্যাম্পের শিখার কিরণ ঠিক right angleএ কাগজের উপর পতিত হয় তাহা হইলে কাগজখানি যেরূপ শুভ্র ও উজ্জ্বল দেখায় কাগজখানিকে ঈষৎ বাঁকাইয়া ধরিলে তাহা আর তত শুভ্র বা উজ্জ্বল দেখায় না যেহেতু সেই কাগজ খানির উপর তখন অল্পতর কিরণ পতিত হয় ; এইরূপে কাগজখানিকে যতই বাঁকান যায় ততই তাহার শুভ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়। যাহাহউক সূর্য্যকিরণের পরিমাণের এতাদৃশ তারতম্য হইলে যখন পৃথিবীর উষ্ণতার এত তারতম্য হয় তখন সূর্য্যের উত্তাপ একেবারে চলিয়া যাইলে এ পৃথিবী যে কিরূপ শীতল হইবে তাহা কল্পনার অতীত এবং এইরূপ অত্যধিক শৈত্যে পার্থিব কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না। তাহা হইলে এই সূর্য্য আমাদের যে কেবল আলোক প্রদান করে তাহা নহে ইহা সকল জীবের ও উদ্ভিদের জীবন কারণ। এই সূর্য্য যেমন আমাদের এই পৃথিবীকে ও চন্দ্রকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করে তেমনই বুধ, মঙ্গল, শুক্র, প্রভৃতি অপরাপর গ্রহ ও তাহাদিগের উপগ্রহেও আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকে। যেমন এই পৃথিবীর যাবতীয় জীব সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ লাভ করিয়া জীবন ধারণ করে সেইরূপ অপর গ্রহবাসীও বোধ হয় এই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ লাভ করিয়া জীবিত থাকে।

সূর্য্য সৌরজগতের জীবন কারণ বলিয়া এখনও অনেকে সূর্য্য উপাসনা করিয়া থাকে, ইহাদিগকে সৌরী কহে। সৌরীগণ মনে করেন যে সূর্য্যই জগতে প্রধান দেবতা—যেহেতু সূর্য্য যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আলোক বা উত্তাপ বিতরণে কাতর হন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই এই সৌরজগত শ্মশানে পরিণত হইবে।

এমন যে সূর্য্য ইহা সংক্রান্ত কিছু জানিতে অনেকেই কৌতুহলাক্রান্ত হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি সচেষ্ট হইব।

সূর্য্যের আকৃতি।—সূর্য্যকে দেখিলেই মনে হয় যেন ইহা গোলাকার এবং থালার ন্যায় চ্যাপটা—কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অত্যধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে থালার

ন্যায় চ্যাপটা দেখায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বলের মত বর্ত্তুলাকার। সূর্য্যকে সকল সময়েই গোলাকার দেখায় না। উদয় বা অস্তকালে সূর্য্যের গোলাকৃতি নষ্ট হইয়া ডিম্বাকৃতি হয়। এই জন্য কেহ যেন মনে না ভাবেন যে সময় বিশেষে সূর্য্যের আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। উদয় বা অস্তকালে ইহা যে কেন ডিম্বাকার ধারণ করে তাহা বলিতে হইলে এক রাশি কথা। আমরা এ কথা লইয়া আন্দোলন করিব না তবে এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে আলোকের কিরণ যখন তরল হইতে গাঢ়, বা গাঢ় হইতে তরল mediumএ প্রবেশ করে তাহা ঋজু ভাবে বরাবর না যাইয়া বক্র ভাবে যায়; আলোক-কিরণের এই ধর্ম্মকে refraction বলে। উদয় বা অস্তকালে দিঙমণ্ডলের (Horizon) নিকটে সূর্য্যের যে গোলাকৃতি নষ্ট হইয়া ডিম্বাকৃতি হয় তাহাও এই refractionএর জন্য। বাস্তবিক সূর্য্য ডিম্বাকার ধারণ করে তাহা নহে; ইহা আমাদের চক্ষের ভ্রম (optical illusion)। একটি লাঠির কিয়দংশ জলে ডুবাইলে মনে হয় যেন লাঠিটা বাঁকিয়া গিয়াছে কিন্তু বাস্তবিকই লাঠিটা বাঁকিয়া যায় না। লাঠির যে অংশটুকু জলের মধ্যে থাকে তাহা refractionএর জন্য একটু উন্নত দেখায়; এই কারণে লাঠিটাকে বাঁকা বলিয়া মনে হয়। ঠিক এই কারণেই দিঙমণ্ডলের নিকটে উদয় বা অস্তকালে সূর্য্যকে ডিম্বাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহার অধিক আর কিছু আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই তবে এইস্থানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিব তাহাতে বোধ হয় পাঠক অসন্তুষ্ট হইবেন না। Refractionএর কথা বলিতে এই কথা মনে পড়িল। Refractionএর জন্য কিরূপে দ্রব্যমাত্রই স্থানান্তরিত হইতে দেখায় তাহা একটু কষ্ট করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একটি শূন্য পাত্রে (ছোট গামলী হইলে ভাল হয়) একটি টাকা কি কোন দ্রব্য রাখিয়া আস্তে আস্তে মস্তক নামাইলে যখন সেই টাকা বা দ্রব্যটি সেই পাত্রের প্রান্তভাগে অদৃশ্য হইবে সেই সময় মস্তক ঠিক সেই স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া যদি সেই পাত্রে আস্তে আস্তে জল ঢালা যায় যাহাতে টাকাটি বা দ্রব্যটি কোনরূপে নড়িয়া না যায় তাহা হইলে সেই টাকাটি বা দ্রব্যটি পুনরায় দৃষ্টি পথে আইসে। তাহা হইলে জল ঢালিবার পর সেই টাকাটি বা দ্রব্যটি একটু উত্তোলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; না হইলে তাহা দৃষ্টি পথে আসিল কিরূপে? Refractionএর জন্য কোন পদার্থ যে স্থানান্তরিত হইতে বোধ হয় তাহা হইলে তাহা বেশ বুঝা গেল। একটা কথা এই স্থানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে refractionএর জন্য কোন পদার্থ স্থানান্তরিত হয় বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বিকৃত হইতে যাইবে কেন? সত্য কথা। পূর্ব্ব কথিত লাঠিকে বক্র দেখায় কেন, এবং সেই লাঠি যদি সমস্তটাই জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেটা আবার ঋজু দেখায় কেন? ঠিক এই

কারণে সূর্য্যকে বিকৃত দেখায়। সূর্য্যের এক এক অংশ এক এক প্রকার mediumএর মধ্য হইতে দেখা যায় বলিয়াই সূর্য্যকে বিকৃত দেখায়। ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা এখানে নিস্প্রয়োজন। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইল যে উদয় ও অস্তকালে সূর্য্যের আকৃতির যে পরিবর্ত্তণ হয় তাহা সূর্য্যের প্রকৃতিগত ব্যাপার নহে—ইহা চক্ষের ভ্রম মাত্র। তবে ইহা যে বর্ত্তুলাকার তাহা বুঝা গেল কিরূপে? সূর্য্য যদি বর্ত্তুলাকার না হইত তাহা হইলে সকল দিক হইতে ইহাকে গোলাকার দেখাইত না। প্রতি বৎসরে পৃথিবী একবার সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে—কিন্তু কোন স্থান হইতে সূর্য্যকে গোলাকার ছাড়া আর কোনরূপ দেখায় না। একখানি থাল বা ডিম্বাকৃতি কোন বস্তুকে কেবল একস্থান হইতেই গোলাকার দেখায় কিন্তু অন্যস্থান হইতে দেখায় না; কিন্তু বর্ত্তুলাকার কোন দ্রব্যকে চারিদিক থেকেই গোলাকার দেখায়। তাহা হইলে সূর্য্যের আকার বর্ত্তুলের মত।

(ক্রমশঃ)

মন্মথ লাল সরকার বি,এ।

নভশ্চরণ।

মানুষ চিরকালই নিজেকে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া দম্ভ করিয়া আসিয়াছে। সমস্ত জীবের অপেক্ষা সে উন্নত প্রমাণ করিতে সে প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যস্ত। মানুষ সমস্ত জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? বিবেক। মানুষ নিজের বুদ্ধি বলে ভগবানের সৃষ্ট জীবের উপর অবাধে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপন্ন করিবার জন্য জল স্থলে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। স্থলে তাহার কর্ত্তৃত্বে বাধা দেয় এমন কিছুই নাই। সে আজ সমুদ্র বক্ষে শত শত তরণী ভাসাইয়া জলকে নিজের বশীভূত করিয়াছে; জলপোতের সাহায্যে আজ সে দেশ বিদেশে যাতায়াত করিতেছে, নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে। তাহাতেও মানুষ ক্ষান্ত নহে। সে সমুদ্রের গর্ভে লুকাইত ধন রত্ন তুলিয়া লইতেছে, জলের ভিতর দিয়া cable বা তারবার্ত্তা চালাইতেছে। জলের মধ্যে কোথাও এই "কেবল্" ছিঁড়িলে সে জলে নামিয়া তাহাকে সারিতেছে। জলের নীচে torpedo ও submarine জাহাজে বসবাস করিতেছে।

জল ও স্থলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াই মানুষ আজ ক্ষান্ত নহে। সে আজ বায়ুর উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিবে। সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিচয় দেয়। পাখী ইচ্ছামত এক দেশ হইতে অন্য দেশে উড়িয়া বেড়াইবে

আর মানুষ শ্রেষ্ঠ হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত থাকিবে? দাম্ভিক মানুষ এভাব সহ্য করিতে পারে না। তাহাকে আকাশে উড়িতেই হইবে। শুধু উড়িলে চলিবে না যখন সে জলে ও স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে নভমণ্ডল কি তাহার করায়ত্ত হইবে না? সে কি ইচ্ছামত এক দেশ হইতে অন্য দেশে যখন ইচ্ছা যাইতে পারিবে না? হাঁ সে নিশ্চয়ই উড়িবে। তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না! ছার মৃত্যুকে কি সে ভয় করে? সে উড়িবেই। ঐ শুন সে বলিতেছে,—

সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভোনক্ষত্র মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।

মানুষ উড়িবার আশা আজ কতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে তাহা প্রাচীন গ্রন্থ পরিচয় দিবে। সে যখন নিজে উড়িতে পারে নাই তখন নররূপী দেবতাকে সে আকাশে উড়াইয়াছে। সে তখন দশরথকে পুষ্পকরথে চড়াইয়া কোথায় না লইয়া গিয়াছে? সে তাঁহাকে স্বর্গ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছে। সে কি আজকার কথা। আবার ঐ দেখ স্বর্গীয় দূত ডানা লইয়া উড়িতেছে। যে বেশী সুখী সেই উড়িয়াছে ঐ পরীরা উড়িতেছে, Pegasus, Medeaর dragon, Daedalus সকলেই উড়িতেছে।

ইতিহাস ঃ—

মানুষের এত সাধের উড়িবার বাসনা পূর্ণ করিবার কত লোক কত চেষ্টা করিয়াছে কত প্রাণ দিয়াছে দিতেছে ও দিবে তাহার ইয়ত্তা নাই! John Wilkins তাঁহার বিখ্যাত Mathematical Magick নামক পুস্তকে ১৬৩০ খৃঃ লিখিয়াছেন যে মানুষ ইচ্ছা করিলে উড়িয়া চাঁদ ধরিতে পারে! Confessorএর রাজত্বকালে Elmers নামক এক ব্যক্তি নাকি এক furlong অবধি উড়িয়াছিল; Veniceএর সেণ্ট মার্ক হইতে এবং নিউরেমব্যার্গ হইতেও না কি কয়েক জন লোক উড়িয়াছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে নভশ্চরণ বাসনা প্রবল হয়। রজার বেকন্ (১২১৪—৯৪) প্রচার করিলেন যে একটা ফাঁপা গোলকে কোন বায়ু অপেক্ষা তরল পদার্থ দিয়া মুখ মুড়িয়া দিলে বেশ অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। বায়ু অপেক্ষা হাল্কা ethereal জিনিস তিনি কিছুই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যখন বায়ুতে সাহায্য হইল না তখন অগ্নির সাহায্য লইবার প্রস্তাবনা চলিতে লাগিল ঃ—সেক্সণীর এলবার্ট ফ্রান্সিস মেণ্ডেল, গ্যাস্পার স্কট প্রভৃতি তখন কার সকল মনীষিগণই এই মত প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। James IVএর প্ররোচনায় একজন পাদ্রী Stirling castle হইতে ফ্রান্স যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি নানা প্রকার কুকুট ও

গৃহ পালিত পাখীর পালক লইয়া দুইটি ডানা রচনা করিলেন। শেষে সত্য সত্যই উড়িতে যাইয়া পড়িয়া পা ভাঙ্গেন। এই সময় Leonardo da Vinci বৈজ্ঞানিক ভাবে হাতে ও পায়ে পাখা লাগাইয়া উড়িবার জন্য পরামর্শ দেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে Fleyder নামক এক জন শিক্ষক নভশ্চরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ফলে এক পাদ্রী উড়িতে গিয়া মারা পড়েন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে Avignon বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Joseph Galien বলিলেন যে যদি এক মাইল উচ্চে যাইয়া বাতাস পুরিয়া একটি গোলক ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সেটি নিশ্চয়ই উড়িবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? পৃথিবী হইতে এক মাইল উচ্চে উঠিয়া হাওয়া পুরিবে কে?

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে Francis Lana কতকটা বৈজ্ঞানিক হিসাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদি চারটি প্রকাণ্ড তামার গোলককে হাওয়া শূন্য করিয়া দেওয়া যায় আর গোলকগুলা এত হাল্কা হয় যে তাহারা সহজে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতে পারে তাহা হইলে বেশ উড়া চলিবে। তিনি বলিলেন এরূপ উড্ডীয়মান গোলা হইতে একটা হাল্কা নৌকা পাল সমেত ঝুলাইয়া দিলে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চলা যাইবে। কিন্তু হায় এত পাতলা ধাতুর গোলক করা অসম্ভব! কেন না আমরা সকলেই জানি যে বায়ুর একটা চাপ আছে *। সেকারণে গোলককে বায়ুশূন্য করিলেই একেবারে চুপসাইয়া যাইবে।

মানুষের এত দিনের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে চলিল! ফরাসী দেশে Annonay নামক স্থানে বিখ্যাত কাগজ নির্ম্মাতা Pierre Montgolfierএর দুই পুত্র Joseph Michel ও Jacques Etienne প্রথমে বেলুন আবিষ্কার করেন। দুই ভ্রাতায় লক্ষ্য করিলেন যে মেঘ বেশ সহজে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। যদি কোনও প্রকারে মেঘের ন্যায় একটা বাষ্প হাল্কা পাত্রে পুরিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সহজে আকাশে উড়িয়া বেড়ান যাইতে পারে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ধূম বা ধুঁয়া দিয়া দুইটি bag উড়াইলেন। পাঠকগণ হয়ত মনে মনে হাসিতেছেন যে দেয়ালীর সময় আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকগুলা সহজেই আকাশে বেলুন বা ফানুস ছাড়িয়া থাকে আর এতকাল ধরিয়া কেহ এই সামান্য কথা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছিল না। বাস্তবিক এখন আমরা ভাবিয়া পাই না কেন তাঁহারা এই সামান্য জিনিস আবিষ্কার করিতে এত কালক্ষেপ করিলেন! কিন্তু কয়জন আবিষ্কার করিতে পারেন? লোকে

* বায়ুর চাপকে atmospheric pressure বলা হয়। সমস্ত জিনিসেরই ওজন আছে; কাজেই বাতাসেরও ওজন আছে; এই চাপ বায়ুর ভার ছাড়া কিছুই নহে। প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চের উপর ১৫ পাউণ্ড বা ৭।৷০ সের বায়ুর চাপ পড়ে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই চাপ Barometer নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়।

চিরকালই দেখিতেছে যে, জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিলে মাটিতে পড়ে কিন্তু নিউটন ছাড়া কে মধ্যাকর্ষণের কথা প্রচার করিয়াছিলেন?

এই সত্যে উপনীত হইয়া তাঁহারা একটি বড় ভাবে বেলুন উড়াইবার কল্পনা করিলেন। শেষে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন ১০৫ ফুট বা ৭০ হাত পরিধি ব্যাপ্ত এক কাপড়ের ফানুস বা বেলুন তৈয়ারী করিয়া তাহাতে খড়ের ধুঁয়া পুরিয়া দেওয়া হইল। এই বেলুন Vivarais রাজ্যের নিমন্ত্রিত লোকের সামনে ছাড়া হইল। ইহা অনেক দূর উঠিল এবং প্রায় দেড় মাইল দূরে গিয়া পড়িল। Montgolfier ভ্রাতৃদ্বয় মনে করিলেন যে খড়ের ধুঁয়া অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলিয়াই বোধ হয় বেলুন আকাশে উঠিল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন না যে অগ্নি সংযোগে উত্তপ্ত বায়ু সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়াই বেলুন আকাশে উঠিল *। উত্তাপের বন্দবস্ত না থাকায় কিয়ৎদূর যাইবার পর বেলুন পুনরায় পৃথিবীতে নামিল। পাঠকগণ এখন বোধ হয় বুঝিলেন কি কারণে ফানুসে আমরা উত্তাপের বা অগ্নি জ্বালাইবার বন্দবস্ত করি?

Montgolfier ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতকার্য্যতায় সমস্ত ফ্রান্সে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্যারীস নগরের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক Barthelemi Fanjas চাঁদা তুলিয়া পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তাবনা করিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট ১৩ ফুট বা প্রায় ৯ হস্ত পরিমিত পরিধি বিশিষ্ট এক বেলুন ছাড়িবার বন্দবস্ত করা হইল। এই বেলুন এবার রবার্ট ও পদার্থবিদ্যাবিদ্ চর্লস্ নামক দুই ভ্রাতায় প্রস্তুত করিলেন। সিল্কের কাপড়ের উপর টান-সহ (elastic) আটা লাগাইয়া বেলুন করা হইল। এবার আর ধুঁয়া দিয়া ছাড়া হইল না। ইহা আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া ফুলান হইল। লৌহচূর্ণের উপর সালফিউরিক এসিড দিয়া হাইড্রোজেন করিয়া সীসার নলের সাহায্যে বেলুনে দেওয়া হইল। ইহাতে ৫০০ পাউণ্ড এসিড ও হাজার পাউণ্ড লৌহ চূর্ণ লাগিয়াছিল। চার দিন অনবরত এই বেলুনে হাইড্রোজেন দেওয়া চলিতে লাগিল। প্রত্যহই ইহার গতি (progress) সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে এত জন সমাগম হয় যে ২৬শে রাত্রে চুপিচুপি Place de Victories হইতে Camp de Marsএ লইয়া যাওয়া হয়। প্রাতঃকাল হইতেই এই স্থান জনাকীর্ণ হইল এবং বেলা ৫টার সময় তোপ ফেলিয়া লোককে জানান হইল যে এইবার ছাড়া হইবে। ছাড়িবা মাত্র ৩০০০ ফুট বা ২০০০ হাত উর্দ্ধে উড়িয়া গেল এবং প্রায় ৪৫ মিনিট কাল উড়িয়া ১৫ মাইল দূরে Genesse নামক এক গ্রামে গিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল; বেলুন ছাড়িবার পর এক পশলা খুব জোরে বৃষ্টি আইসে কিন্তু

---

* সমস্ত বস্তুই উত্তাপে বাড়িয়া থাকে ইহাই নিয়ম। কাজেই উত্তাপে বায়ুও বাড়ে। আর যখন বাড়ে তখন এক স্থানে ততটা বায়ু থাকিতে পারে না, ফলে পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক অল্প বায়ুতেই বেলুনটি পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন ওজনও অপেক্ষাকৃত কম হয় সেই কারণে বেলুন আকাশে উঠে।

এমন কি স্ত্রীলোকেরাও সে বিষয়ে গ্রাহ্য না করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইহার নাম air baloon রাখা হইল কেন না hydrogenকে সাধারণে inflammable air বলিত।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বরে Versailles হইতে Joseph Montgolfier পুনরায় এক চিত্র বিচিত্র বেলুন উড়াইলেন। এবার বেলুনে একটি ছাগল, মুরগী ও হংস দেওয়া হইল। এগার মিনিটকাল ধরিয়া হাওয়া ভরিয়া ছাড়িয়া দিলে ১৫,০০০ ফিট ১০,০০০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া দুই মাইল দূরে এক জঙ্গলে আরোহী সমেত বেলুন নিরাপদ পৌছিল।

মানুষের চির ঈপ্সিত নভশ্চরণের উপায় আজ এতদিনের পর যর্থার্থই আবিস্কৃত হইল। অষ্টাদশ লুইর কর্ম্মচারী Jean Francois Pilâtre de Rozier সর্ব্বপ্রথমে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৫ই অক্টোবর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক জন উপর্য্যুপরি উড়িতে লাগিলেন। এই বেলুনে একটা দড়ি বাঁধা থাকিত কাজেই ইহা বিপথে যাইতে পারিত না। তিনি প্রমাণ করিলেন যে বেলুনে চড়িয়া বেশ সহজেই অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া বায়ুকে উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। ২১শে নভেম্বর Pilater de Rozier ও Marquis de Arlandes প্রথমে অনাবদ্ধ বেলুনে অর্থাৎ বেলুনে দড়ি না বাঁধিয়া উড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই বেলুনের সাহায্যে তাঁহারা ৫০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া ২৫ মিনিটে ৯০০০ গজ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ মাইল গিয়াছিলেন।

পুনরায় ১০ দিন পরে অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যারীস নগরী হইতে রবার্ট ও চার্লস বেলুন উঠিয়া বেড়াইলেন। Champ de Mars হইতে যেরূপ আকৃতির বেলুন উঠিয়াছিল, এবারও সেই প্রথায় বেলুন রচিত হইল। ইহার পরিধি ২৭ ফুট বা ১৮ হাত। বেলুনে হাইড্রোজেন পুরিয়া মাঝখান হইতে একটি বসিবার জন্য ছোট আধার ঝুলান হইল। এবার Tuileries নামক স্থান হইতে বেলুন ছাড়া হইল। বেলুনটি ২০০০ ফুট উচ্চ উঠিল এবং প্রায় ২ ঘণ্টা কাল ভ্রমণ করিয়া প্যারীস হইতে ২৭ মাইল দূরে Nesle নামক স্থানে গিয়া পৌছিল। তখন চার্লস নামিয়া পড়িলেন আবার রবার্ট পুনরায় উপরে উড়িলেন এবার বেলুন অত্যন্ত হাল্কা হইয়া পড়ায় একেবারে ২ মাইল উচ্চে উঠিল এবং প্রায় বায়ুতে আধ ঘণ্টা কাল ৯ মাইল ঘুরিয়া নামিয়া পড়িল। বেলুন অতি শীঘ্র উঠার জন্য তিনি দক্ষিণ কর্ণে এবং চিবুকে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। এই দিন তিনি দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখেন। তিনি যখন উড়িলেন তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। কিন্তু উপরে উঠিয়া তিনি পুনরায় সূর্য্য দেখিতে পাইলেন এবং নামিবার সময় আবার অস্ত যাইতে দেখিলেন *।

* সূর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে অস্ত যান না। আমাদের চক্ষুর অন্তরালে যাইলে আমরা অস্ত গিয়াছে বলিয়া থাকি। পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্য্যকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যের বিপরীত দিকে যায় সেই স্থানে আর আলোক থাকে না।

মানুষের বড় সাধের উড়িবার ইচ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইল। চার্লসই প্রকৃত-প্রস্তাবে বেলুনের আবিষ্কার কর্ত্তা। তিনি উড়িবার জন্য বেলুনে বসিবার স্থান ঝুলাইয়া এবং একটি ছিদ্র সাহায্যে গ্যাসকে বাহির করিবার উপায় করিয়া বেলুনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিলেন। এই ছিদ্র দিয়া গ্যাস বাহির করিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা নামিবার পন্থা নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কেভেণ্ডিস প্রমাণ করেন যে হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা অন্ততঃ সাতগুণ হাল্কা। Joseph Black হাইড্রোজেনের সাহায্যে বেলুন উড়াইবার জন্য পরীক্ষা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। তিনি এ সম্বন্ধে আর কোনও পরীক্ষা করেন নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে Tiberius Cavallo এই গ্যাসের সাহায্যে সাবানের ফেনা (Soap bubbles) উড়ান।

আমেরিকায়ও Philadelphia নগরে এই সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছিল। Montgolfierদের কৃতকার্য্যতার সংবাদ আমেরিকায় পৌছিলে, ৪৭টি বেলুন একত্রিত করিয়া হাইড্রোজান দিয়া ফুলাইয়া একখানি বসিবার কাষ্ঠাধার ঝুলাইয়া জন্তু চড়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। লণ্ডনে James Wilcox নামক এক সূত্রধর অর্থলোভে প্রথমে বেলুন চড়িলেন। তিনি দশ মিনিট কাল বেলুনে উড়িয়া এক নদীর সম্মুখে আসিলেন এবং পাছে নদীগর্ভে পড়েন এই ভয়ে বেলুন ছিদ্র করিয়া নামিয়া পড়েন।

নভেম্বর মাসে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক ইটালিয়ান Francesco Zambeccari লণ্ডন নগরে প্রথমে বেলুন ছাড়িলেন। ১০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট oil silkএর বেলুনে হাইড্রোজেন দিয়া ১টার সময় Artillery Ground হইতে এই বেলুন ছাড়া হইল। দুই ঘণ্টাকাল পরে ইহা লণ্ডন হইতে ৪৮ মাইল দূরে Petworth নামক স্থানে গিয়া পড়িল। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পাঁচ ফুট পরিধি বিশিষ্ট বেলুন hydrogen গ্যাস পুরিয়া Sandwich হইতে যাত্রা করিয়া ৭৫ মাইল দূরে ফরাসী দেশে Warenton দেশে পৌছিল। ইহাই সর্ব্বপ্রথম এই English Channel পার হইল। (২৭শে আগষ্ট ১৭৮৪) J. Tyller নামক এক ব্যক্তি প্রথমে Edinburgh হইতে বেলুনে উঠিয়া প্রায় আধ মাইল উড়িয়াছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে Vincent Lunardi প্রথমে বিলাতে উড়িতে আরম্ভ করেন। Tytler নামমাত্র উড়িয়া ছিলেন। Napoleanএর ফরাসী রাজদূত Vincent Leonardo "Prince Caromanico"র সম্পাদক ছিলেন। তিনি একটি ৩৩ ফিট পরিধি বেলুন করিলেন। প্রথমে তিনি Chesla Hospital হইতে উড়িবার প্রস্তাব করেন কিন্তু দর্শকবৃন্দের অত্যাচারের ভয়ে শেষে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Artillery Ground হইতে তিনি উড়িবার জন্য অনুমতি পাইলেন ; এই বেলুনে হাইড্রোজেন পুরিয়া তিনি ছাড়িয়া দিলেন। এই বেলুন দেখিবার জন্য অসংখ্য জনতা হয়। ইহার মধ্যে তখনকার যুবরাজও উপস্থিত ছিলেন।

Biggan নামক এক ইংরাজ ভদ্রলোকেরও ইহাতে উঠিবার কথা ছিল কিন্তু জনসাধারণ এত অস্থির হইল, যে তিনি বাধ্য হইয়া একলাই উড়িলেন। এই সময় তিনি পায়রা কুকুর ও বিড়াল লইয়া ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে South Mimmsএ তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিড়ালকে নামাইয়া দেন। পুনরায় তিনি উড়িলেন এবং প্রায় ৪৫ মিনিট পরে Wareএর নিকট Standon নামক স্থানে পৌছিলেন। এখানে তিনি অনেক কষ্টে সাধারণ লোকেদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন প্রথমে কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে রাজি হয় নাই। এক যুবতী প্রথমে সাহায্যার্থে আসিলে তবে অন্য লোক সাহায্য করিবার জন্য আইসে।

এই ব্যাপারে Lunardi একেবারে ধন্য হইয়া পড়িল। সকলেই তাহার প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। এক ব্যক্তির বিচার হইতেছিল, এই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা অধিক ছিল। পাছে বিচার করিতে যাইলে বেলুন দেখা না হয় এই ভয়ে জুরীরা নাকি একবাক্যে এ ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বেলুন উড়া দেখিতে লাগিল। এমন কি রাজা সভা ত্যাগ করিয়া আসিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া বেলুনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৯শে জানুয়ারী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Crosbie প্রথমে আয়রলণ্ডে বেলুনে উঠেন। এই ব্যক্তি ১৯শে জুলাই St. George Channel পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবরে James Sadler নামক এক ব্যক্তি St. George Channel পার হইবার উপক্রম করেন। এ বিষয়ে তিনি প্রায় কৃতকার্য্য হন। Liverpoolএর নিকট তিনি জলে পড়িয়া যান এবং জেলে ডিঙ্গির সাহায্যে সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র Windham Sadler এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। তিনি Dublin হইতে Holyhead পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা ৩য় সংখ্যার "বিজ্ঞানে" বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, চিত্তের সংস্কার ও জড়তাই বিজ্ঞান-নীতি বুঝিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়; আমরা আরও দেখেইয়াছি যে অনুচিকীর্ষাতেই মৌলিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়। মনীষী বঙ্কিম ও হার্বার্ট স্পেন্সারেরও এই মত।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ভারতে সাধারণ-চিত্তের সংস্কার কিরূপে জ্ঞানাঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতেছে।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ভারতবাসীর চিত্ত ও পাশ্চাত্য চিত্তের—চিত্ত বলিতে আমরা সাধারণ চিত্ত বুঝাইতেছি—এক প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত চিত্তে ধর্ম্মগন্ধস্পৃষ্ট, ভাবপ্রবণ যুক্তিসমূহ সহজেই গৃহীত হয় কিন্তু শেষোক্ত চিত্তে ন্যায়ানুমোদিত, অভিজ্ঞতাসমর্থিত যুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই বড় একটা স্থান পায় না। এ উক্তির এমন তাৎপর্য্য নহে যে ভারতবাসী ন্যায়-যুক্তি বুঝিতে অক্ষম; বরং আমাদের একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ "ঢিপ করিয়া তাল পড়ে না তাল পড়িয়া ঢিপ্ করে?" এই বিচার করিতে করিতেই যখন তাঁহারা আত্ম-হারা হইয়া পড়েন, প্রকৃত চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিলে তাঁহারাই আবার বাঞ্ছিত পথে সমগ্র দেশবাসীকে চালাইতে পারেন। ভারতচিত্তের জড়তা ও সংস্কার-মোহের আশ্চর্য্য স্থিতিশীলতার এক কারণ সম্প্রদায়বিশেষ কর্ত্তৃক উহার অধিকাংশ বিষয়ের বিচার শক্তির বিলোপ সাধন। জলের সংস্পর্শে যেমন ভাল ধাতুতেও কলঙ্ক পড়ে সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তিত চিন্তাহীন স্বাতন্ত্র্য বিনাশী বিধিসমূহের অন্ধ অনুসরণেও তেমনই বিচার শক্তিতে মরিচা ধরিয়াছে। আমাদের এমন বলা উদ্দেশ্য নহে যে, আমাদের চিরন্তন প্রথাসমূহ বড়ই নিন্দনীয় এবং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য; আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অস্মদ্দেশীয় সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম্মমত অতি মহৎ এবং সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচায়ক; ফলতঃ ঐ সকল চিন্তাপ্রণালীসমূহে অসাধারণ বিচক্ষণতা ও ব্যাপকতার পরিচয় পাই; কিন্তু এরূপ অন্ধ অনুসরণের উপকারিতা বুঝিতে পারি না। বস্তুতঃ এরূপ অন্ধ অনুসরণ করিতে করিতে আমরা গোড়ার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি; তাই ভাবি "ঢিপ্ করিয়া তাল পড়ে, না, তাল পড়িয়া ঢিপ করে"।

কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি সুচারুশিল্প, সকল বিষয়েই শিক্ষা দিবার একটা নিয়ম আছে। এই নিয়ম সুচিন্তিত হইলে, শিক্ষার যেরূপ আশু সুফল ফলিবার সম্ভাবনা অন্যথায় তাহা হয় না। ইহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাদান প্রণালীর সাধারণ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, আমরা ভাল শিক্ষক নহি। Exposition একটা বড় Science সুতরাং বড় Artও বটে। এদেশে উহার বিকাশ হয় নাই। লোক-শিক্ষাদান কার্য্যে আমরা যে তেমন পটু নহি ইহা শুধু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধির অভিমত নহে। মনীষী বঙ্কিমই প্রথম এই কথা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য সংস্পর্শ আমাদের পক্ষে যে যে বিষয়ে লাভ হইয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষাদান প্রণালীর উৎকর্ষবিধান অন্যতম। ইউরোপীয়গণের নিকট এজন্য আমরা সবিশেষ ঋণী।

জাতি সংগঠনের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন, ব্যক্তিগত স্বার্থের ত্যাগ। আমাদের একটা প্রধান দোষ এই যে, জাতির উন্নতি বিধান কার্য্যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইলেও আমরা সে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। এ বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণতা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে কোন ব্যক্তি একটা সামান্য কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিলেই, তাহা অতিশয় যত্নে সংগোপন করিয়া রাখিতেন; এখনও যে সে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমি একটা কিছু নূতন আবিষ্কার করিলাম, সুতরাং সেটী আমার নিজস্ব হইয়া থাকুক, মানব সমাজের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাহা দান করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইল এরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী ব্যক্তি শুধু দেশের নয়, সমগ্র মানব সমাজের শত্রু।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আমাদের সঙ্গীতজ্ঞদের গ্রহণ করিব। ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা যে অতি উন্নত, গভীর ভাবুকতার পরিচায়ক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংগঠিত, তাহা ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তথাপি এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে এদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধিই ইহার মুখ্য কারণ; কথাটা একেবারে ফেলা যায় না। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কারণও আছে; যথা, শিক্ষাদান প্রথার ত্রুটি। সাধারণতঃ যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের নিকট বিদ্যালাভ করা অনেক ভাগ্যের কথা। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে যে, সাধারণ ওস্তাদ্‌গণ সাধারণ শিক্ষায় বঞ্চিত। কিন্তু এ কথায় বোধ করি কেহই প্রতিবাদ করিবেন না যে আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের শিক্ষাদান প্রণালীর অবস্থা তত উন্নত নহে। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য; কেন না, সঙ্গীত বিদ্যা, ভাস্কর্য্য-চিত্র, লিখন প্রভৃতি সুচারুশিল্প অনুন্নত অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে বিদেশীর নিকট দেশের দৈন্য ও অসভ্যতা সুচিত হইবে।

যে ইউরোপীয় পণ্ডিত সুচারু শিল্প সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ঐ শিল্পের উৎকর্ষেই জাতিগত উৎকর্ষের পরিচয়, তিনি সত্য বই বলেন না। ঐ মত ধরিয়া বিচার করিতে বলিলে জগতের সভ্যতার "স্কেলে" আমাদের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। আমাদের সভ্যতার মাত্রা যতটাই হউক না কেন, আমরা জগতের সভ্যজাতিগণের অগ্রণীই হই আর সর্ব্বনিম্নস্থানীয়ই হই, তাহাতে আমাদের আধুনিক অবস্থার কিছুমাত্র তারতম্য হইতেছে না। ঐ সকল পুরাতন কথার আলোচনায় এই একমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা যে, আমরা দুই পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে উৎসাহিত হইব। ইহা বড় খেলো কথা নয়। কিন্তু ইহা যেন আমাদের অনর্থক দাম্ভিকতায় না প্রশ্রয় দেয় এবং শুদ্ধ উন্নতির পথ কণ্টক শূন্য করে, এই প্রার্থনা।

কলাবিদ্যার উন্নতি ও দেশের দারিদ্র্য একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। আমাদের বোধ হয় হৃদয়বান ব্যক্তির সংখ্যা দেশে যদি অধিক থাকে, তবে সুচারুশিল্প দারিদ্র্য নিষ্পেষিত হইতে পারে না।

যখন দেশের দারিদ্র্যের কথা উঠিল, তখন এ কথার আলোচনা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বড় দোষের হইবে না। আমাদের দারিদ্র্যের বৃদ্ধি করিতে কি কি কারণ দায়ী তাহার বিস্তৃত আলোচনার এ স্থান নহে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মত এই যে চাষবাসের উন্নতি এবং সাধারণ দৃষ্টি ঐ দিকে নিয়োজিত হইলেই দেশের দারিদ্র্য তিমির দূর হইবে। ভারতবর্ষ কৃষকের দেশ; কৃষকের দেশে কৃষকের অবনতি ঘটিলে দেশ টিকিবে কেন? ইহা সত্য মত বলিয়া অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যেদিন আমাদের চাষীর উন্নতি হইবে, সেই দিনই আমরা উন্নত হইব। কেন না, আমাদের দেশে আমরা বলিতে চাষাদেরই বুঝায়। 'আমরা' কয়জন? দেশে কৃষক সংখ্যা বেশী; এবং আমাদের উচিত ঐ দিকে মন দেওয়া। চাকুরির মোহে দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে। চাকুরি আমাদের কাঙ্গাল করিবে।

কেন এরূপ হইল? ইহার কারণ জাত্যভিমান, বুদ্ধির পরিসরের ক্ষুদ্রতা, সমাজের মূর্খতা এবং সাহসের অভাব। সুখের বিষয় এই যে, এই সব কয়টি দোষই এখন ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। বুদ্ধি বাড়িয়াছে বলিয়া নহে, পেটের দায়ে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; এক্ষণে কৃষির উন্নতির সাপক্ষে কিছু ওকালতি করিলাম। বস্তুতঃ এই দুই কার্য্যই এ দেশে উঠিয়া পড়িয়া সুর করিতে হইবে। নহিলে সুফল নাই। কৃষিকার্য্যে গবেষণা না থাকিলে আধুনিক ইউরোপের সহিত বুঝিয়া ওঠা কতদূর সম্ভব তাহা চিন্তাশীল লোক সামান্য ভাবিলেই বুঝিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে পিছনে পড়িয়া থাকিলে, চাষবাসে কেন কোন কাযেই

উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মহাত্মা রাসবিহারী ঘোষ ও সার টি পালিত বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে অজস্র অর্থদান করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস উক্ত মহাত্মাদের সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে, এদেশে এক যুগান্তর আসিয়া পড়িবে। শিক্ষাকেন্দ্রের কর্ত্তাগণ যে আজিকালি দেশের অন্ন কষ্টের দিকে একটু নজর করিয়াছেন, ইহাতে দেশ চরিতার্থ হইতেছে। আশা করি, অচিরে ভারতবর্ষের সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রেই অন্ন চিন্তার দিকটা আর বাদ পড়িবে না। পূজনীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে দেশের জন্য কতটা কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জন সাধারণ সম্যক বুঝেন নাই। ঐ মহাত্মার নিকট বাঙ্গালা দেশ সবিশেষ ঋণী।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিলাম যে দেশের উন্নতির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন চাষের উন্নতি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তৃতি। এই উভয় কার্য্যের সহায়তা করিতে হইলে কি কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ ভাবুন। আমরা এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

অন্ন সংস্থানের পক্ষে এক প্রধান প্রয়োজন নূতন লাইনে সাহস করিয়া লাগিয়া যাওয়া। সকলের পক্ষেই চাষবাস প্রশস্ত নহে; সকলের পক্ষেই বি এ, এম এ, হওয়া সম্ভব নহে; সকলেই ডাক্তার, উকীল, হইলে চলে না। যাঁহার মাথা আছে তিনি মাথার কাজ করুন, কলমপেষা আসে ত, কলম পিষুন, হাতের কাজ আসে ত, তিনি হাতের কাজ করুণ। জাত্যভিমান সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করুণ। আমি ব্রাহ্মণ ছুতারের কাজ করিলে আমার অসম্মান হইবে. এ কেমন কথা? এ সব ভুল। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য আদর্শ সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। আমরা ইচ্ছা করিয়া না গ্রহণ করিলেও সময়ের ধর্ম্মে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। পেটের দায় বড় দায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিবার আছে। আমাদের দেশে পিতামাতা মনে করেন তাঁহার পুত্র বি এ, পাশ করিতে না পারিলে সে মানুষ হইল না। এই বিশ্বাসে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। একটা ছেলেকে বি এ, পাশ করাইতে কত টাকার শ্রাদ্ধ হয়, সেই টাকাটা একসঙ্গে লইয়া মূলধন করিলে, একটা প্রকাণ্ড কারবার খোলা যাইতে পারে। ব্যবসাবুদ্ধি দেশে কবে আসিবে? মাড়োয়ারিদের বিদ্যা কতদূর?

ভারতবর্ষ বিবিধ শ্রেণীর লোকের জন্মভূমি। এক এক শ্রেণীর লোক এক এক বিষয়ে কিছু উন্নত আবার অন্য বিষয়ে অনুন্নত। বাঙ্গালার মস্তিষ্ক, পঞ্জাবের বাহুবল মহারাষ্ট্রের কর্ম্মকুশলতা, রাজপুতানার হৃদয়, অন্য প্রদেশ সমূহের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং একপ্রাণতা মিলিত হইলে যে অষ্টবজ্রের সম্মিলন হইবে তাহার ফলে দৈন্যরূপা উর্ব্বশী শাপমুক্তা হইয়া ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন বি এস, সি।

শ্বাস প্রশ্বাস আতিশয্যের কারণ।

অনেক চিকিৎসক প্রমাণ করিয়াছেন যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে তাহার নানাবিধ অসুখকর লক্ষণ এমন কি বিপজ্জনক অবস্থাও উপস্থিত হইতে পারে। প্রধানতঃ দেখা যায় যে এইরূপ ইচ্ছাকৃত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ প্রতিগ্রহণের পর প্রায় শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যবন্ধ হইয়া যায় অথবা অতি মৃদু, তেজোহীন সম্পূর্ণ অকার্য্যকর শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। পদ এবং হস্ততালু অশাড় হইয়া যায় এবং ঝিন্‌ঝিনে ধরে। যদি দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বহুক্ষণ অর্থাৎ ২।৩ মিনিট ধরিয়া পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎপরে শারীরিক যন্ত্রের অক্সিজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ধারণ করে, পেশীর শক্তি অপচিত হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে, ঊর্দ্ধভাগ একবারে ভার হীন বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ নানাবিধ পীড়ায় শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হঠাৎ একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে শরীর যেরূপ হইয়া উঠে, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালনের ফলেও শরীর সেইরূপ হইতে পারে। আরও অধিকতর কাল—দশ বা পনের মিনিট কাল—এইরূপে জোরে জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইলে মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অবশ্য ইচ্ছা করিয়া যে কোন ব্যক্তি অতিশয় জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন করিতে পারে, কিন্তু কয়েকটি কারণ বশতঃ স্বভাবতঃই আমাদের অবস্থাও এরূপ হইয়া পড়ে যে আমরা জোরে শ্বাস প্রশ্বাস চালাইতে বাধ্য হই। দুঃখের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে দীর্ঘ এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। ভয়, ক্রোধ, লজ্জা, অপমান, বিনা কারণে উৎপীড়ণ ইত্যাদিতেও এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে পর শরীরের যে পরিবর্ত্তণ হয়, তাহাকে মানসিক বিক্ষোভের ফল বলে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে অত্যন্ত শারীরিক কষ্টের পর বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া শরীর যেরূপ অসুস্থ হয়, তাহার কারণ—শোণিতে কারবন ডাই অকসাইড গ্যাসের অল্পতা। আবার কেহ কেহ বলেন যে, স্নায়ু মণ্ডলী ও হৃদ যন্ত্রের অবসন্নতাই অসুস্থতার কারণ। যে কারণেই হউক শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয় এবং মানসিক তেজ একবারে নিষ্প্রভ হইয়া উঠে।

আজ পর্য্যন্ত চিকিৎসকগণ নানাবিধ জীব জন্তু লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা মানবের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা স্থিরীকৃত হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। কাজেই মানবের উপর পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। এক্ষণে সেইরূপই করা

হইতেছে। অনেক ডাক্তার কোন ব্যক্তির হস্তাঙ্গুলী সাঁড়াশী দ্বারা চাপ দিয়া তাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া যন্ত্রণা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস ও শরীরের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা স্থির করিয়াছেন। এ অবস্থায় কতটা বায়ু গৃহীত বা প্রতিগৃহীত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কি কি পদার্থ প্রবিষ্ট বা বহির্গত হয় এবং শীরায় ও বায়ুতে কারবন ডাই অক্সাইডের কতটা চাপ থাকে তাহারও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে আঙ্গুল হাড়া ব্যাধিতে অঙ্গুলী যেরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয় তাহাই সাধারণ বা গড় পড়তা যন্ত্রণার পরিমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যদি এই সাড়াশী দ্বারা গড় পড়তা যন্ত্রণা ২।৩ মিনিট কাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে শরীরের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরিমাণ করা যাইতে পারে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে সাধারণ অবস্থায় যে পরিমাণ বায়ু গৃহীত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ বায়ু গৃহীত হইয়া থাকে। স্নায়ু বা ধমণীর উপর কারবন ডাই অক্সাইডের চাপও অতিশয় অল্প হইয়া থাকে। কোন লোকের নিশ্বাস বায়ুতে শত করা ৩৩ ভাগ ইথার মিশ্রিত করিয়া দেওয়ায়, শত করা ৯২ ভাগ অধিক বায়ু গৃহীত ও প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। অন্য লোকের বায়ুতে ২৮ ভাগ ইথার থাকায় ৬২ ভাগ অধিক বায়ু গৃহীত ও প্রতিগৃহীত হয়। প্রত্যেক লোকের ফুসফুসে বায়ু চলাচল পথ বিভিন্ন। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যাইবে। যাহাহউক মানবকেও যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষার অধীন করতঃ যন্ত্রণায় তাহার শারীরিক ও মানসিক কি পরিবর্ত্তণ হয় এবং পরিবর্ত্তণের ফলে কিরূপ অসুখ উপস্থিত হয়, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। অনেকে শুভ সংবাদ কুসংবাদ শ্রবণে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। ইহার কারণ দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য পরিচালন। স্বাভাবিক অবস্থায় জোরে শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালিত হইলেই শরীরের ক্ষয় ও অসুস্থতা অনিবার্য্য।

শরৎ চন্দ্র রায়।

খাদ্যের হিসাবে শ্রমজীবির বর্ত্তন।

যদি মানবকে একটা যন্ত্র বিশেষ মনে করা হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে মানবের যন্ত্র পরিচালন জন্য খাদ্যরূপ ইন্ধন আবশ্যক। অবশ্য একটা নির্জ্জীব যন্ত্রকে যেরূপ ইন্ধন আহরণ করিয়া দিতে হয় মানবযন্ত্র নিজ স্বাভাবিক বুদ্ধি বা instinct দ্বারাই খাদ্য ইন্ধনের অভাব বুঝিতে পারে এবং অভাব স্বীয় চেষ্টায় পরিপূরণ করিয়া লয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে যন্ত্র—জড়ই হউক বা সজীবই হউক—পরিচালনে ইন্ধন আবশ্যক। এক্ষণে যদি জড় যন্ত্রের ইন্ধন অভাব হয় তাহা হইলে যন্ত্র পরিচালিত হয় না মাত্র, যন্ত্রের বাস্তবিক অন্য কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানব যন্ত্র ইন্ধন না পাইলে একবারে ধ্বংস হইয়া পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব একজন লোক যাহা উপার্জ্জন করে, যদি তদ্দ্বারা তাহার জীবন রক্ষণোপযোগী প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের আহরণ না হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষয় অর্থাৎ ক্রমশঃ আশু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা বলিয়া থাকি দরিদ্র শ্রমজীবির খাদ্য যথেষ্ট পুষ্টিকর নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেখা আবশ্যক পরিশ্রম হিসাবে কোন শ্রমিকের কত টুকু কিরূপ খাদ্য প্রয়োজনীয় এবং এইরূপ খাদ্যের মূল্য তাহার উপার্জ্জনের সমতুল্য কি না। এরূপ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্রমিকের পুষ্টির অভাব তাহার দারিদ্র্য জনিত বা দেশে খাদ্যের অভাব জনিত, বা কিরূপ খাদ্য তাহার ক্রয় করা কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা জনিত।

আমাদের দেশে না হউক ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বয়স, জাতি, স্ত্রী পুরুষ, পরিশ্রম, এবং শরীরের বিভিন্ন অবস্থা-ভেদে বিভিন্নরূপ খাদ্যের আদর্শ নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ নিরূপণ মূলে দুইটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—কোন্ শ্রেণীর লোক কিরূপ বা কত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ ও নিরাময় শরীরে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে তাহার নির্ণয়; দ্বিতীয়তঃ—নানারূপ বিশেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জীবন রক্ষার উপযোগী কতটুকু কি পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক তাহাই নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথম উপায়ে একটি দোষ আছে। সেটি ভোক্তার স্বাধীনতা। যদি লোককে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহার যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক সেরূপ খাদ্য না ভোজন করিয়া সে অন্যবিধ আরও মূল্যবান, মুখোরোচক, অপ্রয়োজনীয় খাদ্য খাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়

উপায়ে খাদ্য পরিমাণ নির্ণয় বড় সহজ সাধ্য নহে, কাজেই লোকে প্রথম উপায় দ্বারাই সাধারণতঃ কোন লোকের কিরূপ খাদ্য কত পরিমাণ আবশ্যক তাহাই স্থির করিয়াছেন।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান গঠন জন্য কোন কোন খাদ্য প্রয়োজনীয় তাহা দেখা আবশ্যক। মস্তিস্কের সজীবতা রক্ষা ও অপচয় পরিপূরণ জন্য যে খাদ্য আবশ্যক কেবল শারীরিক বল রক্ষার জন্য ঠিক সেরূপ খাদ্য নাও আবশ্যক হইতে পারে। অতএব মানব-শরীর-গঠনোপযোগী এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপচয় সংস্থান জন্য ফলতঃ তাপ এবং শক্তি প্রসূ খাদ্যই প্রয়োজনীয়। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ দৈহিক পরিমাণ অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। একটা শ্রমজীবী বালকের খাদ্য পূর্ণ বয়স্ক যুবক শ্রমজীবির খাদ্যের সমতুল্য হইতেই পারে না।

আবার শিশুর খাদ্য যুবকের খাদ্যেরও সমতুল্য নহে। শিশুর শরীর গঠিত হয়, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পায়, কাজেই তাহার যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য আবশ্যক পূর্ণবয়স্ক যুবক বা বৃদ্ধের সেরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ লোকের বৃত্তি অনুসারে খাদ্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। একজন কৃষকের যেরূপ খাদ্য প্রয়ো-জনীয় একজন সুবিচক্ষণ বিচারকের সেরূপ খাদ্যে কখনই সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। অফিসের চেয়ারে বসিয়া ক্রমাগত হিসাব ব্যস্ত কেরাণীর যে খাদ্য আবশ্যক একজন কাঠুরিয়ার তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, অথবা অসূর্য্যম্পশ্যা সীবন নিপুণা গৃহস্থ কন্যা যাহা খাইয়া বেশ সুখে কালাতিপাত করিতে পারে তাহা খাইয়া তপনদগ্ধা শ্রমভারনিপীড়িতা রজক কন্যা হয় ত জীবিতই থাকিতে পারে না। আবার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব কায়া রমণী অপেক্ষা সুদীর্ঘ দেহ পুরুষের অধিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত উভয়েরই পরিশ্রমেরও তারতম্য রহিয়াছে। বৈজ্ঞা-নিকগণ স্থির করিয়াছেন যে একই কার্য্যে যদি পুরুষ ও রমণী নিযুক্ত থাকে এবং উভয়েই যদি স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল হয়, তাহা হইলে পুরুষ সমান সময়ে যতটুকু কার্য্য করিতে পারে রমণী তত পারে না। ইহার কারণ রমণীর পেশীর কর্ম্ম ক্ষমতা মানবের সমান নহে। এইরূপ হিসাবে রমণীর বর্ত্তনও পুরুষের অপেক্ষা কম। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে একই কার্য্যে নিযুক্ত সুস্থ পুরুষ যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ থাকে সেইরূপ খাদ্যের মাত্র $\frac{৪}{৫}$ খাদ্যই সুস্থ রমণীর যথেষ্ট। আমা-দের দেশে অনেকের রমণী পুরুষ অপেক্ষা অধিক ভোজন করে। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিক শ্রমশীলা অথবা গৃহের যাবতীয় পুষ্টিকর খাদ্য পুরুষ উপভোগ করে কাজেই অল্প পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর না খাইলে রমণীর পুষ্টির অভাব হয় বলিয়া, স্বাভাবিকতা হইতেই রমণী প্রচুর খাদ্য

খায়। এইরূপ হিসাবে দেখা যায় যে গৃহের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ যেরূপ খাদ্য খায় তাহার $\frac{৩}{১০}$ হইতে $\frac{৮}{১০}$ পরিমাণ খাদ্য বিভিন্ন বয়সের বালক বালিকা খাইয়া থাকে।

এক্ষণে কি হিসাবে খাদ্যের শক্তি প্রসুতার পরিমাণ হয় তাহাই আলোচনা করা যাউক। সাধারণতঃ তাপের পরিমাণ অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ হইয়া থাকে। ১ পরিমাণ তাপ কতটুকু? যে পরিমাণ তাপে ১ গ্র্যাম জলের তাপ মাত্রা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় তাহাই ১ পরিমাণ তাপ। ইংরাজীতে ইহাকে ১ ক্যালরি বলে। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—

কঠিন শ্রমজীবী	... ...	৬,০০০ ক্যালরী
কৃষক, কর্ম্মকার সূত্রধর ইত্যাদি	...	৩,৪৩৫ ,,
সাধারণ ব্যবসাদার, ছাত্র	...	৩,২৮৫ ,,
কোন আশ্রমবাসী (সামান্য কার্য্য নিযুক্ত বা অন্যরূপ)		২,৬০০০ ,,
অতি দরিদ্র (সাধারণতঃ কার্য্যের অভাব গ্রস্ত)		২,১০০

তাপ আবশ্যক। অবশ্য এরূপ হিসাবের একটা প্রচুর মূল্য রহিয়াছে বটে কিন্তু হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন এরূপ হিসাব নিতান্তই ভ্রমসঙ্কুল। এই জন্য ইহাদের বহুবার সংশোধন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবার সংশোধনের সময় নিয়মিত রূপে প্রত্যেকটী লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে। একটী বিশেষ লোকে কতটুকু কারবন ডাই অক্সাইড পরিত্যাগ করে তৎ অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারবন ডাই অক্সাইড পরিশ্রমের সময় ও বিশ্রামের সময় বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্য পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা যে খাদ্য খাইয়া থাকি তাহার শতকরা ১০ ভাগ নানারূপে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ধরিয়া লইলে দেখা যায় নিম্নলিখিত জীবিকার লোকের নিম্নরূপ খাদ্য আবশ্যক :—

জাতি			ক্যালরি প্রতি দিন।
	পুরুষ।		
দরজী	...	...	২,৬০০,২,—৮০০
দপ্তরী	...	...	৩,০০০
মুচী	...	...	৩,১০০
সেকরা	...	...	৩,৪০০,—৩,৫০০
রং মিস্ত্রি	...	...	৩,৫০০—৩,৬০০
সূত্রধর	...	...	৩,৫০০—৩,৬০০
ভাস্কর	...	...	৪,১০০—৫,২০০
কাঠুরিয়া	...	...	৫,৫০০—৬,০০০

রমণী।

সীবন নিপুনা (হস্ত দ্বারা)	...	২,০০০
(যন্ত্র দ্বারা)	..	২,১০০—২,৩০০
গৃহ পরিচারিকা	...	২,৫০০—৩২০০
রজক পত্নী	...	২,৯০০—৩,৭০০

উপরের তালিকা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে বিভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত পুরুষ বা রমণীর বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক। এক্ষণে কোন জাতীয় খাদ্যে কত পরিমাণ ক্যালরী পাওয়া যায়।

১ গ্রাম প্রোটীন বা নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য	...	৪ ক্যালরী
১ গ্রাম আদার হাইড্রোজেক ঘটিত শর্করা জাতীয় খাদ্য	...	৪ ক্যালরী
১ গ্রাম মাখন জাতীয় উপাদান	...	৯ ক্যালরী

এক্ষণে কোন খাদ্যে কতটুকু প্রোটীন, কতটুকু শর্করা জাতীয় উপাদান ও কতটুকু মাখন জাতীয় উপাদান রহিয়াছে তাহা "বিজ্ঞানে" একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে একজন অতি পরিশ্রমী মজুরের

চাউল	...	...	/১
ডাউল	...	...	/l০
তৈল	...	...	৵০
আলু	...	...	/ll০
মৎস্য	...	...	৶০
দুগ্ধ	...	...	/ll০

নিতান্তই আবশ্যক। এক্ষণে এইরূপ খাদ্যের মূল্য কি অধিক হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। দুগ্ধ একবারে বাদ দিলেও চলে। কিন্তু অন্যান্য জিনিষ নিতান্তই দুর্ম্মূল্য। লোকে যাহা মজুরী পায় তাহাতে খাদ্যের সংস্থান হওয়া অসম্ভব। লোকের মজুরীও অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার খাদ্য সংস্থান হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের খাদ্যের অভাবেই লোকের শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দারিদ্র্যের জন্য ততটা নহে।

মঙ্গলগ্রহ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহাবল দশাননের ভয়ে রাক্ষস মারীচ শ্রীরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বাক্যবীর, লঘুহস্ত অনিলের ভয়ে আমিও পূর্ব্বসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলাম। নহিলে প্রাণ যায়।

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতিশয় উদ্ভট এবং বিকৃতবুদ্ধির পরিচায়ক; উদ্দেশ্য, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া। কিন্তু এক সময়ে যাহা বুদ্ধির বিকৃতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাহাই অলৌকিক প্রতিভা বলিয়া পরিগণিত হয়। পৃথিবীতে সহস্রবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। গালিলিও যখন ইতালিতে তাঁহার নূতন মত প্রচার করিয়া বলিলেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তখন সে দেশবাসীরা তাঁহাকে পাগল ঠাওরাইয়া গারদে পুরিয়াছিল। এদেশে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া বড়াই করেন, তাঁহারা, এয়ারশিপ হইবার পূর্ব্বে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ আকাশে উঠিয়া নাগপাশ দিয়া রাম লক্ষ্মণকে বাঁধিয়াছিল শুনিয়া, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, আমাদের পাগল ঠাওরাইলে, আমরা বিস্মিত হইব না।

যাহা হউক, হাওয়েল সাহেবের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাতে কাযের কথা কিছুই উঠিল না। বিদায় গ্রহণের সময়ে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওয়েল, বিমল বাবু, আপনাদের তিন জনের মধ্যে এক জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ না হওয়াতে, আমি বড়ই দুঃখিত রহিলাম, এবং আশা করি, আপনি আগামী সপ্তাহে, আপনাদের সুবিধামত আমার এই দুঃখের কারণ দূরীভূত করিবেন। রমেশ বাবুর ছাত্রজীবনের গণিত সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলি যে আমি না পড়িয়াছি এমন নহে। সেগুলির মৌলিকতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তাই তাঁহার দর্শন লাভের জন্য আমার এত ঔৎসুক্য। ভাল একটী কথা বলিতে পারি কি? আপনাদের আমেরিকায় আমার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য আছে কি?"

আমি, ইহার উত্তরে, তাঁহার হস্তে একটী কাগজের তাড়া দিয়া বলিলাম, "এইটি পড়িয়া দেখিবেন। আজ আসি।"

এই বলিয়া আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম।

দুইদিন পরে, আমাদের হোটেলে বসিয়া প্রাতে তিনজনে চা খাইতেছি, এমন সময়ে একজন ভৃত্য ট্রেতে করিয়া একটি পত্র লইয়া আসিল। অনিল তাড়াতাড়ী খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িয়া টেবিল চাপড়াইয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশ বলিল, "কি হে, ব্যাপার কি?" আমি অনিলের হাত হইতে পত্র কাড়িয়া পাঠ করিলাম:—

"প্রিয় ভদ্র মহোদয়গণ,

রমেশ বাবুর সুদীর্ঘ গবেষণা পড়িয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। ভারতবর্ষে এমন লোক আছেন, আমার জানা ছিল না। আমি আজি তিনদিন ধরিয়া কেবল নাওয়া খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়া অনবরত এই অসাধারণ কাগজগুলি "গিলিয়াছি।" রমেশ বাবুর বিস্তৃত আলোচনা এবং গণিতমূলক গবেষণা অনুধাবণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে আপনাদের মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে যাত্রার প্রস্তাব খুব সম্ভব এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। পত্রযোগে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আজ দুইটার সময়ে আপনারা রমেশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া অতি অবশ্য আসিবেন।

আমি টেলিস্কোপ সাহায্যে, ইত্যবসরে, মঙ্গলগ্রহ দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়া রাখিব।

ইতি

হাওয়েল।

পুনঃ—আপনাদের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে, বোধ করি, বলিতে হইবে না যে, এ সব কথা এখন যেন ঘুনাক্ষরেও না প্রকাশ হয়।"

চিঠি সমাপ্ত করিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে যেন হর্ষ ও বিষাদ এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনিল তখনও লাফাইতেছিল।

যথাসময়ে আমরা তিনটি প্রাণী বীরদর্পে হাওয়েল ভবনে উপনীত হইলাম। রমেশের হাত ধরিয়া প্রফেসরপুঙ্গব এরূপ সজোরে নাড়া দিলেন যে সেই গোবেচারা প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া হাত কচলাইয়াছিল। তারপর তাহাকে টানিয়া টেলিস্কোপের তলায় লইয়া গেলেন। আমি আর অনিল, সেই অবসরে, টেলিস্কোপের বাহিরটা দেখিয়া ঘুরিতে লাগিলাম।

তেমন হিমালয় সদৃশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র জীবনে আর কখনও দেখি নাই। যন্ত্রটি হাওয়েল সাহেবের নিজের তৈয়ারী। একটী বৃহদাকার কামানও ইহার তুলনায় অনেকটা ছোট মনে হয়। দেখিবার মুখটি (Eye-piece) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিধির একটী চাকা ঘুরাইয়া যন্ত্রের মুখটি নামাইতে উঠাইতে হয়। আর একটী বৃহৎ কব্জার সাহায্যে যন্ত্রটিকে ফোকাস্ করিতে হয়। বৃহৎ চোঙ্গটির গায়ে, আশে পাশে যে কত শত শত ছোট বড় কব্জা, চাকা, সাহায্যকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগান তাহার ইয়ত্তা নাই। পরীক্ষাগারের সমস্ত ছাদটা একটী মুসলমানদিগের মশজিদের গম্বুজের ন্যায় এবং কাচনির্ম্মিত। দেয়ালের গায়ে যে কত প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে তাহার দীর্ঘ বর্ণন করিতে গেলে একখানি বই লিখিতে হয়। একটী ক্রনোমিটার অতি অদ্ভুত ধরণের তৈয়ারী; পরে জানিলাম, সেটী সেকেণ্ডের হাজার অংশ পরিমাণেও স্লো কিম্বা ফাষ্ট যায় না। একটা ইকোয়েটোরিয়েলের পার্শ্বে দেয়ালের গায়ে আঁটা তক্তার উপর সারি সারি প্রায় ২৫টা ঘূর্ণায়মান ঝুলমাখান রেকর্ডিং ড্রাম

রহিয়াছে; সেগুলিতে আঁকাবাঁকা কত রকমের যে বিচিত্র দাগ পড়িতেছে তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। কোনটা ঢেউখেলান, কোনটা যেন কাগের ছানা বকের ছানা, কোনটা কেবল হিজিবিজি, কোনটা বাঁদরের মুখের মত; সব ক্লকওয়ার্কের সাহায্যে চলিয়াছে; কোন কার্য্যের বিরাম নাই; অবিরাম ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, চলিতেছে, যেন সকলেই কর্ত্তব্য বোঝে, কেহই অলস নহে। ঘরের প্রায় মাঝখানে একটা ডায়েলের ন্যায় কি ঘুরিতেছে; শুনিলাম সেটা সূর্য্যমুখীর ন্যায় দিবারাত্র তপনমুখী। ভাবিলাম, ইঁহার লক্ষ্যস্থির। ঘরে যত অসংখ্য ঘড়ি রহিয়াছে, তদনুরূপ টিক্‌টিক্ শব্দ নাই; বুঝিলাম, ইহাই প্রফেসরের গৃহ সজ্জা‹ আশ্চর্য্য কৌশল। বাঙ্গালীর ঘরে হইলে ম্যানেজ করা দায় হইত। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, সকলেই প্রফেসরের আজ্ঞাকারী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ; ভাবিলাম, আমরা কি?

ততক্ষণ রমেশের দেখা শেষ হইয়াছে; আজি রমেশের মুখ ফুটিয়া গিয়াছে; প্রফেসরের সহিত সে অনর্গল বকিয়া যাইতেছে; তাহাতে আমাদেরই সুবিধা হইল।

তারপর আমাদের পালা। প্রফেসর আমাকে আইপিসের তলায় লইয়া দেখাইলেন।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে এক অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখিলাম, সম্মুখে একটা সুবৃহৎ উজ্জ্বল গোলাকৃতি পদার্থ। প্রফেসর বলিলেন, "কি দেখিতেছেন?" আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক। শুনিলাম "ইহাই মঙ্গলগ্রহ"। অনিলটা গোপনে আমাকে চিম্‌টি কাটিতেছিল। উদ্দেশ্য আমার আগে দেখিবে। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা।

অকস্মাৎ বোধ হইল মঙ্গলগ্রহ আমার চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ সব স্থির গতি হীন হইল। আমি বলিলাম, "একি?" প্রফেসর একটা সাহায্যকারী নলের ভিতর দেখিয়া ফোকাস্ করিতেছিলেন।

তখন আমার চক্ষে যেন নূতন দৃষ্টি আসিয়া পড়িল। মঙ্গলগ্রহটাকে যে এত বড় দেখায় তাহা আমার ধারণায় আসে নাই; আমি প্রায় আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিলাম "উঃ! কি প্রকাণ্ড!"

প্রফেসর বলিলেন "বাস্তবিক! মঙ্গলটা আমাদের এত নিকটে বলিয়াই এত বড় আর এত স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুবিধা হয়। আপনি উহার উপরিভাগে কি কি দেখিতেছেন?"

"মাঝে মাঝে কালো কালো কতকগুলি দাগ আর একটি সরু চুলের ন্যায় দীর্ঘ রেখা আঁকা বাঁকাভাবে সমস্ত উপরিভাগটা জুড়িয়া আছে। ওগুলি কি?"

হাওয়েল সাহেব বলিলেন, "ওগুলি যে কি তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে আমার বোধ হয়, ওগুলি কোন প্রশস্ত নদী হইবে"। আমি বলিলাম "পাহাড় হইতে পারে না কি?" হাওয়েল সাহেব বলিলেন "পাহাড় নয়; তবে পাহাড়ের ছায়া হইতে পারে; কিন্তু ছায়া হইলে উহার প্রস্থের তারতম্য হওয়া উচিত।

আমি—কেন?

হাওয়েল—কারণ সূর্য্য কিছু সব সময়ে ঠিক মাথার উপর একভাবে থাকে না।

আমি—মহাশয়। এতদূর হইতে সেই ছায়ার একটু আধটু পার্থক্য দেখা নাও যাইতে পারে।

হাওয়েল—কিন্তু আমার দূরবীক্ষণ যেরূপ শক্তিশালী তাহাতে সেটুকু দেখিতে পাওয়া উচিত।

এই কথার উত্তরে আমি কি বলিতে যাইব এমন সময়ে অনিল আমাকে ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল।

সেই দিন প্রফেসর ভবনে সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা তিন জন মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। পথে নানা রকমের কল্পনা জল্পনা করিতে করিতে সময়টা বেশ এক রকম কাটিয়া গেল অনিল সারা পথটা কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর ন্যায় উল্লম্ফন করিতে করিতে আসিয়াছিল; রমেশ সারা পথটা নিশাচর পক্ষী বিশেষের ন্যায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার মনে এক রকম বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার করিতেছিল; আর আমার অবস্থা যে কি ধরণের তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল বুঝি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, মা, বাপকে দেখিবার আশা চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া আমি জীবন-সমুদ্রের পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তত হইতেছি; যেন ইহাই মৃত্যু। হাঁ ত! মৃত্যু বই আর কি? "পৃথিবীর সহিত চির-বিচ্ছেদ" ইহাই যদি মৃত্যুর সংজ্ঞা হয়, তবে ত আমার মৃত্যুই হইতেছে। শুধু একটী সুখের কথা এই যে, আমি একা মরিতেছি না সবান্ধবে মরিতেছি। তখন মনে হইল, বাঃ! এ কি রকম সুখের কথা? সবান্ধবে মরণ কি সুখের মরণ? এ ত সুখের কথা নয়; তবু ত সুখবোধ হইতেছে! মানুষ এমনই স্বার্থপর! দুঃখের সাথী পাইলে খুসী হয়!

সান্ধ্য ভোজনের সময় আমাদের মধ্যে যে সকল প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা হইল তাহার সারাংশ এই যে, মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা কার্য্যতঃ সম্ভব এবং অনিলের আর্থিক প্রতুলতায় যন্ত্রাদি নির্ম্মানের ব্যয় সংকুলান হওয়া সম্ভবপর। প্রফেসর হিসাব করিয়া বলিলেন যন্ত্র-নির্ম্মান-কার্য্য সম্পন্ন হইতে প্রায় তিন মাসের কম নয়! এবং এ কার্য্যের ভার একজন শ্রেষ্ঠ আমেরিকান এঞ্জীনিয়ারকে দিতে হইবে। সুতরাং

তাঁহার পরিচিত মিষ্টার এণ্ডুজকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হউক, এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। আমরা বলিলাম "খুব আহ্লাদের সহিত।"

প্রফেসর তখনই মিষ্টার এণ্ডুজকে পত্র লিখিতে বসিলেন। আমরা সে দিনকার মত বিদায় লইলাম।

তবে, সত্যই মঙ্গলে যাইতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন, বি এস্ সি।

সৌর-শক্তি।

সূর্য্যের তেজ লইয়া আমাদের উপকারার্থে কোন দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টাই চলিতেছে। সূর্য্যের তেজ (heat) কোনরূপ কার্য্যকরী যন্ত্র-ঘটিত শক্তিতে (mechanical power) পরিণত করিতে পারিলে অনেক কার্য্য সাধিত হইতে পারে এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া কয়েক জন বৈজ্ঞানিক নানা উপায় করিয়া নানারূপে পরীক্ষা করিতেছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত ক্যালিফরনিয়া নামক প্রদেশে সৌরতেজ একবার কার্য্যে লাগান হইয়াছিল। একটি প্রকাণ্ড জল গরম করিবার পাত্রে (boiler) সৌর কিরণ কেন্দ্রীভূত (concentrate) করিয়া জলকে ফুটাইয়া এত বাষ্প সৃষ্ট হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ৮ horse power তেজবিশিষ্ট একটি জল তোলা কল (pump) চালিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি ফিলাডেল্‌ফিয়াতে এবং তৎপরে মিয়াম্ভি এবং ইজিপ্ট্ প্রদেশেও এইরূপ সৌরতেজ-পরিচালিত কল বসান হইয়াছে। অত্র জল গরম করিবার পাত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং অতি অল্প চাপ-সহনকারী।

A. S. E. Ackermann, B. Sc, নামক কোন এক ব্যক্তি ইজিপ্ট্ প্রদেশের উক্ত কলটি বেশ করিয়া পরীক্ষা করতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদিও এই কলটি একটি অভিনব ব্যাপার এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিশেষ পরিচায়ক বটে, কিন্তু তবুও ব্যবসা সম্বন্ধে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, যেহেতু ইহার জন্য যাদৃশ শক্তি (energy) ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে সেই অনুপাতে ইহার দ্বারা কার্য্য হয় না।

এই পৃথিবীতে প্রতি একারে ৭,০০০ horse power সৌর শক্তি সন্নিবিষ্ট হয় কিন্তু সে (acre) শক্তির অধিকাংশই অপচিত হয়।

কিয়াডিতে Ackermann সম্প্রতি তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়া উক্ত কল সংক্রান্ত নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ২৬ horse powerএর অধিক শক্তি সৌরতেজ দ্বারা সৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ প্রায় ৬,০০০ horse power শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই শক্তি আরও অধিক পরিমানে সৃষ্ট হইত যদ্যপি জল গরম করিবার পাত্রগুলি অপেক্ষাকৃত আরও অধিক চাপ-সহনকারী হইত। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। যদিও ইহা সত্য কথ যে, অধিক চাপ-সহনকারী জল গরম করিবার পাত্রে অধিক শক্তি উপজিত হইতে পারে, কিন্তু এই পাত্রকে নিয়তই খোলা জায়গায় এবং হাওয়ার মাথায় রাখিতে হয় বলিয়া অনেকটা উষ্ণতা convectionএর দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়; ফলতঃ boiler গুলিকে অধিক চাপসহ করিয়াও কোন লাভ হয় না। অধিক চাপ-সহ boiler ব্যবহার করিয়া যেটুকু অধিক শক্তি horse power রূপে সৃষ্ট হইবে উষ্ণতার অপচয় হেতু তদধিক শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই এই সৌরতেজ-চালিত কল এখনও ব্যবসার পক্ষে উপযোগী হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক-বৃন্দ এই লইয়া যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা এ বিষয়ে শীঘ্রই যে কিছু একটা না করিয়া ছাড়িবেন তাহা বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

এই সৌরতেজ কাজে লাগাইবার জন্য যে বৈজ্ঞানিকেরা এত সচেষ্ট হইয়াছেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য কয়লার অপর্য্যাপ্ত ব্যয় নিবারণ করা।

আজ কাল প্রত্যহ জাহাজে, রেলের ইঞ্জিনে, কল কারখানায়, গার্হস্থ কার্য্যে পৃথিবীতে কত কোটী মন কয়লা পুড়িতেছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই ভাবে প্রত্যহ যদি কয়লা ব্যয়িত হইতে থাকে তাহা হইলে একদিন অবশ্যই আসিবে যখন পৃথিবী একেবারেই কয়লাশূন্য হইয়া পড়িবে। তখন মানবের বহুপ্রকার অপকার ঘটিবে ও অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে। কয়লা খনিজ পদার্থ—ইহা প্রায় সকলেরই জানা আছে। ইহা সুদূর অতীতে প্রস্তুত হইয়া ভূগর্ভে এতাবৎকাল অবস্থান করিয়া আসিতেছিল। ক্রমেক্রমে সেই সঞ্চিত কয়লা নিঃশেষ হইতেছে। এই সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়লা প্রস্তুত হইত তাহা হইলে ভাবিবার কিছুই থাকিত না। কিন্তু তাহা ত নহে; কয়লা স্বতঃ প্রস্তুত হয় না—সেইজন্য পরিমিত ভাবে কয়লা ব্যয় করা যুক্তি সিদ্ধ ইহা ভাবিয়া এবং যখন বিনা মূল্যে সূর্য্যের তেজ পাওয়া যাইতেছে তাহারও একটা সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় এই ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সৌর-শক্তিকে কার্য্যে লাগাইবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন; জানি না কত দিনে তাঁহাদের আশা ফলবতী হইবে।

মন্মথ লাল সরকার বি এ।

ফুলের বর্ণ এবং গন্ধ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ।

Schubler এবং Kochler নামক দুইজন উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ সম্প্রতি ফুলের গন্ধ ও বর্ণের সম্বন্ধ বিষয়ক কতকগুলি নূতন ব্যাপার অবলোকন করিয়াছেন। তাঁহারা চারি হাজার দুই শতর অধিক বৃক্ষ গুল্ম ও লতা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে (১) শ্বেতবর্ণের ফুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, (২) লোহিত, পীত ও নীল বর্ণের ফুল শ্বেতবর্ণের ফুল অপেক্ষা অল্প পরিমাণ বটে কিন্তু প্রায় সচরাচর শ্বেতবর্ণের ফুলের মত দৃষ্টি পথে পড়িয়া থাকে, এবং (৩) হরিত, কমলা ও বাদামি বর্ণের ফুল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং ইহারা সচরাচর দৃষ্টি পথে পড়ে না।

তা এ কথা বড় একটা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এদেশীয় ফুলের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে এদেশেও শ্বেতবর্ণের ফুলই অপেক্ষাকৃত অধিক, যথা:—চামেলী, বেল, মল্লিকা, যূঁই, কামিনী, ভুঁই চাঁপা, দুলাল চাঁপা, শ্বেত-করবি, আকন্দ, বক, নেবু, টগর, শ্বেত গোলাব, সিউলি, শ্বেত ধুতুরা, শ্বেত চন্দ্রমল্লিকা, শ্বেত পদ্ম, লাউফুল, চালতা ফুল, পোস্ত ফুল, মটর ফুল, সালুক, রজনীগন্ধা, মাধবি, কেশে, ঘেঁটু, শশাফুল, জাতি।

পীত, লোহিত ও নীল বর্ণের ফুলও সচরাচর দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহারা শ্বেতবর্ণের ন্যায় এত অধিক নহে। যথা:—

পীত—গাঁদা, কলিকা, সরিষা, সূর্য্যমুখী, স্বর্ণ চাঁপা, কনকচাঁপা, হলদে চন্দ্রমুখী, বাবলা, অড়ড় ফুল, ঝিঙেফুল ও পারুল ফুল।

লোহিত—জবা, লাল গোলাব, লাল করবি, লাল কৃষ্ণকলি, লাল চন্দ্রমুখী, লাল তরুলতা, রঙ্গন, সিমুল, অশোক, লালপদ্ম, লাল সালুক, লবঙ্গলতা।

নীল—অপরাজিতা, এক জাতীয় কলিকা, তিসি, মটর, পদ্ম।

সবুজ, কমলা ও বাদামি বর্ণের ফুল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং ইহারা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা:—

সবুজ—কাঁঠালি চাপা, হাস্তানোহানা।

কমলা—কুমড়া, পলাস, কৃষ্ণচূড়া।

বাদামি—

তাহা হইলে দেখিতেছি যে এদেশেও শ্বেতবর্ণের ফুল সর্ব্বাপেক্ষ অধিক ফুটিয়া থাকে; তদপেক্ষা অল্প পীত ও লোহিতবর্ণের ফুল; এবং নীল, সবুজ ও কমলা বর্ণের ফুলের সংখ্যা অতিশয় অল্প। এদেশে বাদামি বর্ণের ফুল ত প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না।

Schubler এবং Koehler যে ৪,২০০ বৃক্ষ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ১,১৯৪টিতে শাদা, ৯৩৩টিতে লাল, ৯৫০টিতে হলদে, ৫৯৪টিতে নীল, ৩০৮টিতে বেগুণি ১৫৩টিতে সবুজ, ৫০টিতে কমলা এবং ১৮টিতে বাদামি বর্ণের ফুল হইতে দেখা গিয়াছে।

তিনি আরও দেখিয়াছেন যে শ্বেতবর্ণের ফুলই গড়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গন্ধশালী হয়; তন্নিম্নে সবুজবর্ণের ফুল, তন্নিম্নে লোহিত বর্ণের ফুল, তন্নিম্নে পীতবর্ণের ফুল, তন্নিম্নে বাদামিবর্ণের ফুল, তন্নিম্নে নীলবর্ণের ফুল এবং সর্ব্ব নিম্নে বেগুনি বর্ণের ফুল গন্ধশালী হইয়া থাকে।

তাঁহারা যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ফুলের বর্ণ।	পরীক্ষিত বৃক্ষের সংখ্যা।	গন্ধময় ফুলযুক্ত বৃক্ষের সংখ্যা।
শ্বেত	... ১,১৯৪	... ... ১৮৭
লোহিত	... ৯৩৩	... ... ৮৪
পীত	... ৯৫০	... ... ৭৭
নীল	... ৫৯৪	... ... ৩১
বেগুনি	... ৩০৮	... ... ১৩
হরিত	... ১৫৩	... ... ২৪
কমলা	... ৫০	... ... ৩
বাদামি	... ১৮	... ... ১
সর্ব্বশুদ্ধ	৪,২০০	৪২০

উক্ত তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে শ্বেত, লোহিত ও পীতবর্ণের ফুলগুলি সংখ্যায়ও অধিক এবং ইহাদের মধ্যে প্রচুর গন্ধশালী ফুল পাওয়া যায়।

মন্মথলাল সরকার বিএ।

বিবিধ।

প্রতি বৎসরে গভর্মেণ্টের ছাপার জন্য যত কাগজ প্রয়োজন হয় তাহা তৈয়ারি করিবার জন্য পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মন ন্যাকড়া ও কানি এবং ষাঠি লক্ষ মনের উপর পচা কাঠ খরচ হইয়া থাকে। ম, ল, স।

জাভা দ্বীপে শেগুন বন।—অধুনা জাভা দ্বীপে প্রায় ১৪,৮০,০০০ একার (acre) ব্যাপিয়া শেগুন বন অবস্থিত। এই স্থানে যতখানি জমি হইতে শেগুন বৃক্ষ কৰ্ত্তিত করিয়া লওয়া হয় সেই সময় তাহার প্রায় দেড়গুণ জমিতে আবার শেগুন বৃক্ষ রোপিত হয় বলিয়া এই স্থানে শেগুন বনের আয়তন উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। শেগুন গাছ রোপিত হইলে Alang grass নামক এক প্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিয়া এই শেগুন বৃক্ষের চারা গুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। উৎপাটিত করিয়া এই তৃণগুলিকে নষ্ট করা ব্যয় সাধ্য বলিয়া শেগুন বীজ বপনের সময় Lucena Glauca নামক এক প্রকার শুঁটি গুল্ম (leguminous plant) রোপন করা হইয়া থাকে; ইহারা Alang grass নামক অপকারী তৃণ জন্মাইতে দেয় না উপরন্তু জমিকেও বেশ পরিষ্কার রাখে; তাহার পর যখন শেগুন বৃক্ষগুলি বড় হয় তখন এই Alang তৃণের ধ্বংসকারী শুঁটি গুল্মগুলি মরিয়া যায় এবং জমিতে অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে জল ও nitrogen রাখিয়া যায়। ইহারা শেগুন বৃক্ষের শরীর পোষণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কীট পতঙ্গ ও তড়িৎ।—আরজেণ্টাইন প্রদেশের মিষ্টার গ্রিগেরী একরূপ তড়িৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার দ্বারা কীট পতঙ্গ ইত্যাদি শস্যের ও খাদ্যের অনিষ্ট কারক জীব জন্তু সমূহ অনায়াসে ধ্বংস হইতে পারিবে।

শ্যাকলটনের অভিযানের জন্য দান।—আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে শ্যাকলটন সাহেবের নাম সুপরিচিত। তিনি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের জন্য গমন করিবেন এ জন্য যে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে, সেই চাঁদার তহবিলে ডাণ্ডী নগরের বিখ্যাত ধনপতি সার কামস্ কেয়ার্ড ২৪,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩,৬০,০০০ তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লৌহের কারখানার কৃত্রিম রবার উৎপাদন।—লণ্ডনের "আয়রণ এবং ষ্টীল সিটিটিষ্ট সভার সভাপতি সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে ইস্পাত প্রস্তুত কালে যে সমস্ত অন্যবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে রবার উৎপাদন অন্যতম। এ সম্বন্ধে রীতিমত পরীক্ষা চলিতেছে। শীঘ্রই ইস্পাতের কারখানায় কৃত্রিম রবার উৎপাদিত হইবে।

৩য় বর্ষ। । জুন, ১৯১৪। (৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোক।*

(ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার।)

আলোকের প্রকৃতি কিরূপ-- এতৎ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলেই, আলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপপত্তির সমাধান শেষ হয় না। ইহার সহিত কিরূপে এবং কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আলোক প্রবাহিত ও পরিচালিত হয়, এবং যে পথে পরিচালিত হয়, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ তৎসম্বন্ধেও সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক। অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত আলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপপত্তি প্রস্তাবিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে ঠিক ঐতিহাসিক পর্য্যায়ক্রমে সেই সমস্তই আলোচিত হইবে। তৎসমুদয় পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল বিষয়ে মানবের জ্ঞান অতীব সঙ্কীর্ণ।

অবশ্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা মৌলিক গবেষণা হিসাবে মানবের জ্ঞান এইরূপ সঙ্কীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যে সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার লইয়া আমাদিগকে আলোচনা করিতে হয়, তৎসমুদয় বেশ জটীলতা-শূন্য এবং সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও, এবং যে সমস্ত নিয়ম দ্বারা সেই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই নিয়মগুলিকে আমরা ভাল করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেও, যখনই আমরা তাহাদের নিগূঢ় তত্বসমূহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখনই নানাবিধ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিপত্তি আসিয়া আমাদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এই ব্যাপার

* ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) দশম পুস্তিকার (Bulletin No. 10) বঙ্গানুবাদ।

আলোক-বিজ্ঞানেও অপরিহার্য্য। এই সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব এত সূক্ষ্ম ও এত গভীর যে, তাহাদিগকে বোধগম্য করিতে হইলে আমাদিগকে প্রায়ই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে তাঁহাদের কার্য্যে অগ্রসর হয়েন? বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমে যাবতীয় বিষয়ের একটা আদর্শ অনুমান করিয়া লয়েন,—অবশ্য আদর্শ যতদূর সম্ভব বাস্তব ব্যাপারের প্রায় সমতুল্য হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য, এই আদর্শকে ক্রমাগত উন্নত করা; এইরূপ করিতে করিতে আদর্শ ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ আলোকের প্রবাহণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে এবং যে আশ্রয় অবলম্বনে ইহা প্রবাহিত হয় তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে, আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে আমরা কিছুতেই প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারি না; কাজেই আমরা উপমা অথবা তুলনা অথবা অন্যান্য ব্যাপারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আলোক সম্বন্ধীয় এরূপ উপপত্তিসমূহ বা আলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের একটা এরূপ আলেখ্য কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, সেই সমস্ত উপপত্তি বা ব্যাপার, বাস্তব উপপত্তি বা বাস্তব ব্যাপারকে অনেকটা প্রতিনিধান করিতে পারে। প্রথমে বাহ্য ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়; পরে ক্রমশঃ আনুপৌর্ব্বিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধির এরূপ প্রাখর্য্য ও তীক্ষ্ণতা না হয় যে, অতি সূক্ষ্ম (infinitesimal) বিষয়-সমূহও অতি সহজে ধারণা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে, ততদিন এই কাল্পনিক আলেখ্য কিছুতেই বাস্তবের অনুরূপ হইতে পারে না।

আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল হইতে নানারূপ ব্যাপার কল্পিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ইহার বাস্তব ও পরিস্ফুটরূপে বোধ্য উপপত্তি সমূহ অতি অল্প কাল পূর্ব্ব হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে।

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে আলোক সম্বন্ধে কোন কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দুদিগের গ্রন্থই প্রাচীনতম। ন্যায়ভাষ্যে ন্যায় দর্শন প্রণালী অনুসারে মৃগতৃষ্ণিকার উপপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিচার ও তর্ক সন্নিবিষ্ট আছে:—

"গ্রীষ্মে সূর্য্য রশ্মি মৃত্তিকা নিঃসৃত তাপের সংস্পর্শে আসিয়া অধঃ উর্দ্ধে কম্পিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ দূরস্থিত পথিকের নয়নে উপস্থিত হইয়া দৃক্‌শক্তি ও বস্তুর অপূর্ব্ব ও অযথার্থ সংযোগে জলের বিভ্রম আনয়ন করে।"

ন্যায়ভাষ্যের রচয়িতা এই বিষয়ের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাপার লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। কেননা এই বিচার লইয়া "বর্ত্তিকা" দেখাইতেছেন যে, সূর্য্য-রশ্মি ও কম্পন উভয়ই বর্ত্তমান বটে, কিন্তু জল-বিভ্রম উপস্থিত হওয়াই দূষণীয় ও ত্রুটিযুক্ত। যাহাই হউক, যে সময়ে ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে মৃগতৃষ্ণিকা সম্বন্ধে এইরূপ উপপত্তিই প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে এরূপও মীমাংসা করা যাইতে পারে যে,

এতৎ সম্বন্ধে তৎ কালিক "ভূত বিজ্ঞানে" (Physics) নিশ্চয়ই প্রচুর আলোচনা নিহিত ছিল কিন্তু সেই সমস্ত ভূতবিজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

উক্ত ন্যায়ভাষ্যেই প্রতিফলন জন্য প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে :—

"নয়ন-রশ্মি দর্পণে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং বদনে সংস্পৃষ্ট হয়। এই বদনেই চক্ষু সংস্থাপিত ; অর্থাৎ দর্শকের বদনে নয়ন রশ্মি প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সংস্পর্শ হইতেই বদনের জ্ঞান সঞ্জাত হয়। "রূপ," অর্থাৎ দর্পণের আকৃতি অথবা বর্ণ, এই জ্ঞান লাভে সহায়তা করে।"

'বর্ত্তিকা' ইহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছে :—

দর্পণ, জল, ইত্যাদি হইতে "নয়ন-রশ্মি' প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে প্রতিক্ষিপ্ত হইলে দর্শকের মুখের সংস্পর্শে আইসে। প্রতিক্ষিপ্ত নয়ন-রশ্মির পুরোবর্ত্তী প্রান্তভাগ মুখের সংস্পর্শে আসে বলিয়া প্রতিফলিত মুখ সম্মুখে থাকে। নয়ন দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয় তাহার নিয়ম ইহাই, অর্থাৎ নয়ন-রশ্মির পুরোবর্ত্তী প্রান্ত যে সমস্ত পদার্থে সংস্পৃষ্ট হয় সেই সেই পদার্থই দর্শকের পুরোভাগে অবস্থান করে। উদাহরণ স্বরূপ দর্শকের সম্মুখে দণ্ডায়মান কোন মানবের মুখমণ্ডল উল্লিখিত হইতে পারে।"

ন্যায়-ভাষ্যের পূর্ব্বে আলোক সম্বন্ধে এইরূপ উপপত্তি প্রচলিত ছিল যে, সমস্ত পদার্থ হইতেই আলোক প্রকাশিত হয়। "ন্যায়সূত্রের" রচয়িতা ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, এরূপ হইলে অন্ধকারে প্রস্তর ইত্যাদিও নয়ন-গোচর হইত। কিন্তু ন্যায়-ভাষ্যের রচয়িতা বিচার করিলেন যে, কেহই প্রস্তর প্রকাশিত আলোক কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু নয়নরশ্মি সহজেই অনুমিত হইতে পারে!

"ন্যায়-সূত্রে" পদার্থের স্বচ্ছতা সম্বন্ধে যে উপপত্তি বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, "নয়নরশ্মি" কাচ ইত্যাদ হইতে প্রতিক্ষিপ্ত না হইয়া বা প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তাহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। সেই জন্য কোন পদার্থ ও নয়নের মধ্যপথে কাচের ব্যবধান থাকিলেও সেই পদার্থ "নয়নরশ্মি" সংস্পর্শে আসিতে পারে, কাজেই পদার্থ নয়নগোচর হইয়া থাকে। অস্বচ্ছ পদার্থ, যেমন প্রাচীর ইত্যাদি "নয়নরশ্মিকে" প্রতিহত করে, কাজেই নয়ন-রশ্মি প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং আমরাও প্রাচীরের অন্য পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থগুলিকে নয়নগোচর করিতে পারি না।

বৈশেশিক দর্শনের অন্যতম গ্রন্থ "ন্যায়কুণ্ডলি"তে নয়নরশ্মি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—নয়নরশ্মির আকৃতি দর্শনীয় নহে অথবা নয়নরশ্মি স্পর্শনীয় নহে কিন্তু নয়ন-রশ্মি বহুদূর গমন করিতে পারে, এবং মধ্য পথে কোন কিছু বর্ত্তমান না থাকিলে দূরবর্ত্তী পদার্থের অবস্থিতির জ্ঞান সঞ্জাত করে। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহের

মধ্যে বেদান্ত-পরিভাষায় লিখিত আছে যে, "নয়নরশ্মি" সূর্য্যরশ্মির ন্যায় স্বচ্ছ, অতএব নয়ন-রশ্মিরও দ্রুত কম্পন আছে।

এই সমস্ত উদ্ধৃত বিষয়গুলি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রে আলোক সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি কিরূপে আলোচিত হইত। "ন্যায়সূত্রের" বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুগণের মধ্যে যে আলোক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রচলিত ছিল, তাহাই উপরোক্ত উদ্ধৃত বিষয়গুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়, এতদ্ব্যতীত ইহাতে আর অধিক কিছু জানিবার ঔৎসুক্য উদ্দীপিত হয় না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন কালে আলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত গ্রন্থ নিবদ্ধ রহিয়াছে—তাহাও হিন্দুগণের কল্পিত অভিমতের অনুরূপ। এই সমস্ত প্রাচ্য প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এম্পিডোক্লিসের মতে আলোক কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। এই সমস্ত আলোক-কণিকা পদার্থের গাত্র হইতে বিচ্ছুরিত হয়। নয়ন হইতেও এক প্রকার শক্তি বহির্গত হয়—তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব (visual influence) নামে অভিহিত। দৃষ্টি—আলোক-কণিকা ও দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব সঞ্জাত। কিন্তু পাইথাগোরাস্ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ এই নূতন অভিমতের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, বস্তুর উপরিভাগ হইতে ক্রমাগত কণিকা বিচ্ছুরিত হইয়া নয়নতারকায় পতিত হইলে তবে পদার্থ নয়নগোচর হয়। পণ্ডিতগণের মতে "ন্যায়-সূত্র" ৫০০ এবং ২০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণের আলোক সম্বন্ধে অভিমত উৎপত্তির কারণ অবিভিন্ন।

দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব বা visual influenceএর অযৌক্তিকতা ও অসারবত্তা সম্বন্ধে ৩৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মহামতি আরিষ্টোটল সবিশেষ বিচার করেন। তাঁহার তর্কের প্রধান কেন্দ্র এই যে, "যদি দর্শনেন্দ্রিয়ের" প্রভাব বলিয়া কোন একটা জিনিষ থাকিত, তাহা হইলে আমরা অন্ধকারেও দেখিতে পাইতাম। তিনি বিচার করিলেন যে, খুব সম্ভবতঃ আলোক একটা বেগ মাত্র, এই বেগ কোন নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়; আলোক কিছুতেই বাস্তব কণিকার বিচ্ছুরণ সঞ্জাত নহে। তাঁহার মতে কোন স্বচ্ছ পদার্থের ক্রিয়া হইতে আলোক উৎপন্ন হয়, এবং যদি চক্ষু এবং পদার্থের মধ্যস্থলে একবারে কোন পদার্থের অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে কোন বস্তুও দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার এই অভিমতের শেষাংশের অর্থ কি তাহাই দেখা যাউক। তাঁহার মতে যদি উজ্জ্বল কোন পদার্থ এবং এই পদার্থের প্রতিরূপ-প্রতি-গ্রাহী-চক্ষুর মধ্য স্থলে কোন কিছু না থাকিত এবং যদি উজ্জ্বল পদার্থ নিঃসৃত প্রভাব পরিবাহিত করিবার শক্তি এই মধ্যবর্ত্তী পদার্থে না থাকিত, তাহা হইলে এই উজ্জ্বল পদার্থ কিছুতেই আমাদের নয়নগোচর হইত না। বাস্তবিক আধুনিক আলোক বিজ্ঞানও এইরূপ একটা পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এই সময় হইতে ডেকার্টের সময় পর্য্যন্ত আলোক-বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার, আলোক-রশ্মির প্রতিফলন (reflection) ও দিক-পরিবর্ত্তন (refraction) এই দুইটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর্কিমিডিস্ দহন-প্রবণ (burning) দর্পণের বিষয় নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এতৎ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ গবেষণাও করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আল্‌হিয়েনা ভাইটিলিয়ো আলোকের গণিত-মূলক উপপত্তি প্রকাশিত করিলেন *। কথিত আছে যে, রজার বেকন ছায়াবাজীর লণ্ঠন উদ্ভাবন করেন, এমন কি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনিই দূরবীক্ষণযন্ত্রও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বস্তুতঃই প্রথমে দূরবীক্ষণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জ্যানসন্, তিনি একজন ওলন্দাজ। তাঁহার পুত্র দৈবাৎ চসমার একটি ন্যুব্জাকার (convex) কাচখণ্ড এবং অন্য একটি অবনত-মধ্য (concave) কাচখণ্ড পরস্পর হইতে অল্প দূরে রক্ষা করিলে, কাচখণ্ড-দ্বয়ের অপর পার্শ্বস্থ পদার্থের বাহ্যতঃ বর্দ্ধিতায়তনতা নয়নগোচর হইল। যাহাহউক সর্ব্বপ্রথম মহামতি গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণ করিবার জন্য এই যন্ত্র প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন। গ্যালিলিওই সর্ব্ব প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উপপত্তি সমূহ স্থিরীকৃত করেন। গ্যালিলিও তাঁহার নান্‌সিয়াস্ সাইডিরিয়াস্ (Nuncius Sidereus) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, † তিনি দৈবাৎ শুনিতে পাইলেন যে, একজন বেল্‌জিয়াম্ নিবাসী দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই যন্ত্র দ্বারা দূরস্থিত পদার্থ সমূহ নিকটস্থ ও বর্দ্ধিতায়তন পরিদৃষ্ট হয়; এই শুনিয়াই তিনি আলোক রশ্মির দিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়া অনুধাবন করিয়া এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী আবিষ্কার করেন। অবশেষে কেপ্‌লার বাস্তবিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত দূরবীক্ষণ যন্ত্র (ন্যুব্জাকার কাচ-খণ্ড সমূহের সমাবেশ) সম্বন্ধীয় যাবতীয় গণিত মূলক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন, বর্ণ রঞ্জিত দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা করিলেন এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, চক্ষুরভ্যন্তরস্থিত দর্শন-স্নায়ুর পর্দ্দাতে দৃষ্ট বস্তুর বিপর্য্যস্ত মূর্ত্তি প্রতিগৃহীত হয়।

মহামতি স্নেল সাহেবের আবিষ্কৃত আলোকের দিকপরিবর্ত্তন (refraction) সম্বন্ধীয় নিয়ম সমূহ ডেকার্টে প্রকাশিত করিলেন; এবং আলোক সম্বন্ধীয় যে সমস্ত উপপত্তি ছিল, তাহা হইতে এইরূপ নিয়ম সিদ্ধান্ত করিলেন—

কোন গোলক বা প্রস্তর খণ্ড অন্য পদার্থে আপতিত হইলে তাহার গতি যেরূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় অথবা পার্শ্বদিকে বা বক্র ভাবে অন্য পথে গমন করে, সেইরূপ— আলোক রশ্মিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহে আপতিত হইলে এই আলোক রশ্মি স্থিরতা প্রাপ্ত হয় অথবা বক্র পথে গমন করে।

* Lecture by Thomas Young.

† Encyclopaedia Britannica.

একটি গোলক ক বিন্দু হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া খগঘ বস্ত্রের গ বিন্দুতে আঘাত করিল। বস্ত্র এরূপ গলিত যে গোলক বস্ত্র ছিন্ন করিয়া দূরে গমন করিল। কিন্তু এই গোলকের নানা কারণ-মিলনোৎপন্ন বা রেজালট্যাণ্ট গতি আদি-ক্ষেপণের কালের গতি অপেক্ষা ১ : হ এই নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হ্রাস পাইতে লাগিল।

এক্ষণে গোলককে আলোক রশ্মি মনে করা হউক।

রশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থে (গোলকের পক্ষে বস্ত্র) পতিত হইয়া যতদূর গমন করিয়াছিল, তাহার একাংশের পরিমাণ = গল।

মনে করুন এই দূরত্ব = কগ

অর্থাৎ গল = কগ

তাহা হইলে গল পথ অতি বাহন করিবার সময় পরিমাণ

= হ × কগ পথ অতিবাহন করিবার সময়। কিন্তু রেজালন্ট্যাণ্ট গতিকে বিশ্লিষ্ট করিলে যে অংশ বস্ত্রের বা স্বচ্ছ পদার্থের সমান্তরাল ভাবে গমন করে, তাহার কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না।

অতএব গ ঘ = বস্ত্রের উপর গল'র প্রোজেক্‌সন্ (Projection)।

= হ × খগ, (খগ, কগ এর প্রোজেক্‌সন্)

∴ যদি ন = খকগ কোণ

ম = গলঘ কোণ

তাহা হইলে সাইন (Sine) $ম = \frac{গঘ}{গল} = হ \times \frac{খগ}{কগ}$

= হ × সাইন ন কোণ।

অর্থাৎ আলোক রশ্মির পতন কোণের (angle of incidence) ও দিক-পরিবর্ত্তন-কোণের সাইন নিরবচ্ছিন্ন-অপরিবর্ত্তনীয়-অনুপাত-বিশিষ্ট। আলোক রশ্মি পাতলা পদার্থ, যেমন বায়ু, ভেদ করিয়া ঘন পদার্থে অর্থাৎ কাচে পতিত হইলে, এবং পতন স্থান হইতে লম্ব অঙ্কন করিলে, এই লম্ব ও আলোক রশ্মি মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপাদন করে, তাহাকে আলোক রশ্মির পতন কোণ বলে। সেইরূপ কাচের ভিতর দিয়া রশ্মি পরিবাহিত হইবার সময় উক্ত লম্ব কাচের অভ্যন্তরভাগে টানিলে এই লম্ব ও রশ্মির মিলিত কোণকে আলোকের দিক-পরিবর্ত্তন-কোণ (angle of refraction) বলে। এই দুই কোণের সাইন (sine) অপরিবর্ত্তনীয়। অর্থাৎ কাচে যেরূপ ভাবেই আলোক পড়ুক না কেন, ইহার পতন কোণের ও দিক-পরিবর্ত্তন-কোণের অনুপাত সকল অবস্থাতেই সমান থাকে।

---

* Whittaker,—A History of Theories of Ether and Electricity.

ডেকার্টে আলোকের এক উপপত্তিও প্রস্তাবিত করেন। এই উপপত্তি অনুসারে আলোক একটা চাপ বিশেষ। এই চাপ একটা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবাহিত হয়। এই আশ্রয়ের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অসীম। ডেকার্টের অভিমতানুসারে বর্ণের কারণ এই যে, যে আশ্রয় বাহিয়া এই চাপ পরিবাহিত হয় সেই আশ্রয়ের কণিকারাশির বিঘূর্ণন। কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে বিঘূর্ণিত হইলে লোহিত ইত্যাদি বর্ণের অনুভূতি হয়। কিন্তু ডেকার্টে অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, আলোক পাতলা আশ্রয় অপেক্ষা ঘন আশ্রয় দিয়া শীঘ্রতর পরিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু ফারমা (Fermat) ইহার বিপরীত অভিমত কল্পনা করিয়া আলোকের অতি শীঘ্র পরিবাহন সম্বন্ধীয় অভিমত নির্দ্দেশ করিলেন।

ফারমার বিচার অনেকটা মনোবৈজ্ঞানিক :—"প্রকৃতি অদৗর্ঘতম পথে কার্য্য করে"। মনোবৈজ্ঞানিক হইলেও ফারমা নির্দ্দেশিত নিয়মের ফলই অতিশয় নির্ভুল। গণিত হিসাবে তাঁহার নিয়মকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার নিয়মের ফল $\delta/dt = 0$। এস্থলে δ গণনা-প্রণালীতে যে ভেদ থাকে তাহার কার্য্য-সাধক (operater of the calculus of variation)। কিন্তু $dt = \kappa . \mu\, ds$; এস্থলে κ অপরিবর্ত্তনীয় (cnstant), এবং μ আলোক রশ্মির দিক পরিবর্ত্তনের অভিবাচক (index of refraction)। এই অভিবাচক—তরঙ্গ উদ্ভাবিত হইয়া আলোক প্রবাহিত হয় এই উপপত্তি অনুসারে—প্রবাহের গতির সহিত বিপরীতানুপাতিক (inversely proportional)।

অতএব $\delta / \mu ds = O$। ইহাতে জ্যামিতি মূলক আলোক বিজ্ঞানের সমস্ত অংশ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে গতি-প্রবণ বস্তুসংঘের (dynamical system) গতিশক্তি (kenitic energy) = T, এবং এই সংঘের অপ্রকাশিত শক্তি (potential energy) = V অতএব এই বস্তু সংঘের আকার ও গতি $\delta / (T-V)\, dt = O$ এই সমীকরণ দ্বারা পাওয়া যাইবে।

ফারমা নির্দ্দেশিত নিয়মের ডাইনামিকাল অর্থ এইরূপ বলিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে কাইনেটিক। কেননা একটা তরঙ্গের ব্যাপ্তির সময়ে সম্পূর্ণ শক্তির সমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয়। *

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে হুক সাহেব তাঁহার মাইক্রোগ্র্যাফিয়া নামক পুস্তকে আলোকের এক উপপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে —আলোক দ্রুত নিষ্পন্ন দীর্ঘ কম্পনশীল গতি। ইহা সর্ব্বত্র সম নিবীড়তাবিশিষ্ট (homogenous), অতিশয় স্থিতি-স্থাপক (elastic) কোন এক আশ্রয়ের মধ্য দিয়া ঋজু রেখায়—একটি গোলকের মধ্য বিন্দু হইতে ব্যাসার্দ্ধ সমূহের ন্যায়—প্রবাহিত হয়। হুকসাহেব মনে করিতেন যে আলো-

* Bulletin No. 7, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta.

কের দিক-পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, অধিকতর ঘন পদার্থের মধ্য দিয়া পরিবাহিত হইবার কালে আলোক অল্পতর সময়ে পরিবাহিত হয়। ইহার প্রমাণ জন্য তিনি একটি জ্যামিতি মূলক চিত্র অঙ্কন করেন। এই চিত্রে আলোক রশ্মির পতন ও বক্রগমন তরঙ্গের অগ্র প্রান্তও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। চিত্র হাইগেনের (Huyghens) চিত্রের অনুরূপ। হুকের মতে বর্ণের কারণ এই যে, রশ্মির দিক পরিবর্ত্তন পথে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লবের বিকৃতি মাত্র।

নিউটন অবশ্যই এই উপপত্তি অবগত ছিলেন *। ইহার একটা অংশ—বর্ণ সংক্রান্ত অংশ—তিনি আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমভাগেই তিনি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। কিন্তু ইহাও নিতান্ত কাল্পনিক ; কোন নৈসর্গিক ঘটনা বা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ্য নহে, অধিকন্তু নানাবিধ দুর্লঙ্ঘ্য আপত্তি জনক। নিউটনের উক্তি উদ্ধৃত হইল :—

For, to me, the fundamental supposition itself seems impossible, *viz*., that waves or vibrations of any fluid can, like the rays of light, be propagated in strahgit lines without continued and very extravagant spreading and bending in to the quiscent medium, where they are terminated by it." কিন্তু আলোক বিজ্ঞানের কণিকা মূলক উপপত্তি অনুসারে—তৎকাল পর্য্যন্ত আলোকের যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার লোকে অবগত ছিল, তৎসমুদয়েরই ডাইনামিক্যাল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর ছিল। কাজেই নিউটন প্রতিফলন, দিক পরির্ত্তন, ডিফ্র্যাক্‌শন, পাতলা স্তরের বর্ণ প্রকরণ, এমন কি পোলারিজেশন ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই কণিকা মূলক উপপত্তিই ব্যবহার করিলেন। এই রূপ করিবার জন্য তাঁহাকে অভাবনীয় বিষয় সমূহ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। আগামী সংখ্যায় এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। ইহাদের আলোচনা নিতান্ত অমধুর নহে।

(ক্রমশঃ)

* Glazebrook, Address as President of the Physical Section of the British Association, 1893.

পৃথিবীর ইতিহাস

মানবজাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিবার তুলনায়, পৃথিবীর ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান অধিকতর কষ্টসাধ্য। মানবের ঐতিহাসিক, কোন প্রাচীন মন্দির গাত্র, কোন পর্ব্বত-কন্দর, অথবা প্রাচীন নগরের ভগ্নস্তূপ হইতে তাঁহার ইতিবৃত্তের উপাদান সঙ্কলন করিতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পূর্ণ অন্যবিধ বিষয়। কত কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবী প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ইহার ইতিহাস লিখিবার, বা তখন পৃথিবীতে কি হইতেছিল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই। প্রথমতঃ পৃথিবীর গঠনকার্য্যই বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তৎপরে অতি জটীল প্রণালী দ্বারা পৃথিবী ক্রমে ক্রমে অধুনাতন কালের ন্যায় হইয়াছে,—মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সে জটীলতার ধারণা করিতে পারে না, অথবা যে যে প্রণালী দ্বারা পৃথিবী এরূপ হইয়াছে, সেই সেই প্রণালী গুলিকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভাগ করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই; এমন কি ধাতু-উৎপত্তি এবং প্রস্তর-গঠনে, যে যে প্রাকৃতিক শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, সে গুলিকেও আমারা কোনওরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি নাই। অথবা যদিই আমরা পর্ব্বত গাত্রে প্রকৃতির কোন শক্তির চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলেও কি কর্ম্ম শক্তির দ্বারা পৃথিবীর প্রথম গঠন সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি না, কেননা সে কর্ম্মশক্তির চিহ্ন কুত্রাপি রক্ষিত নাই।

কাজেই যে মহামতি পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত, তিনি যে এই সমস্ত জটীল সমস্যায় এবং প্রকৃতিতে অনিয়ন্ত্রিত, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলিত তথ্যসমূহে ব্যতিব্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন—তাহার আশ্চর্য্য কি! কোন সুবৃহৎ কারখানায় যদি কোনও কালে কোনরূপ বিষম বিশৃঙ্খল বা গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কোনও এক ব্যক্তির প্রতি সেই গোলযোগ নিরাকৃত করিবার বা বিক্ষিপ্ত তথ্য গুলিকে গুছাইয়া কোনরূপ সত্য নিরূপণ করিবার ভার অর্পিত না হইয়া, যদি বহু জনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া অনুধাবন করিতে আরম্ভ করেন তবে সকলের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত ব্যাপার বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। এইরূপ সমবেত চেষ্টার ফলেই আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদিতে—এক কথা ধনে, মানে, সম্পদে, বিদ্যায়, লক্ষ্মীশ্রীতে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

ভূতত্ত্ব-বিদ্যার পণ্ডিতগণও এইরূপে সমবেত চেষ্টার দ্বারা নানাবিধ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাঁহাদের আবিষ্কারের ফলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছেন, এবং অনেক প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের মীমাংসার জন্য, বিশেষতঃ কোন জটীল বহু শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের মীমাংসার জন্য, সমবেত গবেষণার প্রতিষ্ঠা এই বিংশ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ অভিনব। এমন কি বিজ্ঞান এবং গবেষণা এই দুইটি কথা বলিলেই মনে হয় যেন অসাধারণ কোন একটা কিছু বলা হইতেছে, যেন ইহারা সাধারণের বিদ্যার সীমাতীত, যেন এই দুইটিকে কোন এক নিভৃত প্রদেশে লুকায়িত রাখা আবশ্যক, তথায় যেন এই দুইটি কোন প্রহেলিকাময় যবনিকার অন্তরালে পৃথিবীর অন্যবিধ যাবতীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন এক অদ্ভুত লোকের সাধনীয় বস্তু হইয়া থাকে। ইহার জন্যই বিজ্ঞান বা গবেষণার উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না। লোকে যেমন কারবার বা ব্যবসায় বা বাণিজ্যে সমবেত চেষ্টা করিয়া উন্নতি সাধন করে, অথবা অন্য কেহ এতৎসম্বন্ধে কোনওরূপ চেষ্টা না করিলেও ব্যবসায়ীর কার্য্যে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফলাফল সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চেষ্টা করে, বিজ্ঞানে বা বৈজ্ঞানিক কোন এক বিশেষ গবেষণায় যদি সাধারণ লোকে অর্থাৎ সর্ব্ব লোকেই এইরূপে বিশেষ সহানুভূতি করিত, যদি গবেষণাকে আতঙ্কের চক্ষে না দেখিত, তাহা হইলে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের মীমাংসা আরও অনেক অগ্রসর হইতে পারিত।

বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান ফল জ্ঞান লাভ। ইহার পারিপার্শ্বিক ফল—কোন শিল্প, কোন কারখানা বা কোন বাণিজ্য দ্রব্য উৎপাদন। এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিংও ইহার পারিপার্শ্বিক ফল। কাজেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিলে কেবলই লাভশূন্য অনর্থক পরিশ্রম বুঝায় না, ইহার অন্তস্তলে হয়ত এমন এক মহান উপায় নিহিত রহিয়াছে যে, তদ্দ্বারা পৃথিবীর বা মানবজাতির এক অভাবনীয় উপকার সাধিত হইতে পারে। অথবা গবেষণাই সমস্ত কার্য্যের বা সমস্ত শিল্পের প্রাথমিক অবস্থা। ইহার দ্বারাই মানব কোন কার্য্য সম্পাদনের বিশেষ উপায় এবং নূতন উপায়ের সহিত পুরাতন উপায়ের কি সম্পর্ক তাহাই আবিষ্কার করেন। কাজেই বৈজ্ঞানিক স্বয়ং কোন শিল্পে তাঁহার আবিষ্কৃত উপায় প্রযুক্ত করেন না বটে, কিন্তু তিনিই শিল্পের সূত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেন, এবং শিল্পী সেই সূত্র লইয়া অনন্যসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করেন। অতএব শিল্পের প্রতি দেশ বাসী জনসাধারণ রাজা প্রজা সকলেই যতটুকু লক্ষ্য করিয়া থাকেন, বৈজ্ঞানিকের গবেষণার পথ সুগম করিবার জন্য তাঁহাদের তদপেক্ষা আরও অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

এক্ষণে দেখা যাউক ভূতত্ত্ব বিদ্যার দিকে বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতেছেন কি না? আমাদের দেশে অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের ন্যায় ইহাও হতাদৃত হইয়া আছে, কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও সম্যক উন্নতি সাধিত হই-

তেছে। এই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় বিজ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হইতেছে। President van Hise of Wisconoin এতৎসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

So long as Geology remained a descriptive science, it had little need of Chemistry & Physics; but the time has now come when geologists are not satisfied with mere discriptions. They desire to interpret the phenomena they see in reference to their Causes—under the principles of Physics & Chemistry. This involves co-operation between Physics, Chemistry, and geologists.

পৃথিবীর বহির্দ্দেশ সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান এবং প্রাণ-বিজ্ঞান হইতে নানারূপে সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। এই ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উপরিভাগে জল ও স্থলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা পর্ব্বত মালার পরিব্যাপ্তি স্থির করিয়াছেন, স্থলের উপর জল ও তুষারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে আগ্নেয়গিরি সন্নিবিষ্ট আছে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, কোন্ স্থানের কোন্ আগ্নেয়গিরিতে কিরূপ পদার্থ উত্থিত হয় বা হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, অধিকন্তু ভূস্তরে প্রোথিত অতি প্রাচীন জীবজন্তু বা উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ভূস্তরযুগ-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারাই পৃথিবীর কোন্ স্থানে কিরূপ খনিজ দ্রব্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার অতি সূক্ষ্ম মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহারা যেখানে কোনও রূপ অনন্য-সাধারণ নিদর্শন বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহারই কারণ, যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া, নির্দ্ধারণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা পৃথিবীকে ওতপ্রোত ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা কালে তাঁহারা আরও এমন সমস্ত ব্যাপার বা সমস্যা লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন বা অভিনব কত কি ব্যাপার তাহাদের কার্য্য পথে উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত সমস্যা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে মীমাংসিত হইবে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অপেক্ষা রাসায়নিক বা পদার্থ-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণেরই সমধিক আলোচ্য।

এইরূপ গবেষণা করিতে করিতে পণ্ডিতগণ নানাবিধ কার্য্য ও কারণ দ্বারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পৃথিবী এক সময়ে বাষ্পময় ছিল। তখন ইহার অবস্থা আমাদের সূর্য্যের ন্যায় ছিল। বস্তুতঃ পৃথিবী সূর্য্যেরই একটা অংশ স্বরূপ ছিল, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বা সূর্য্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা বা শক্তির অসামঞ্জস্য বা বিপর্য্যয় হওয়ায় এই অংশ সূর্য্য হইতে মহাবেগে বিচ্যুত হইয়া আসিয়াছিল। বিচ্ছিন্ন হইবার সময়

ইহাও সূর্য্যের ন্যায় জলন্ত অগ্নি-পিণ্ড ও বাষ্পময় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া আমাদের পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জন্যই সূর্য্য সবিতা। সূর্য্য হইতে সূর্য্য-অংশ স্বরূপ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলে পৃথিবী অতি ত্বরিত গতিতে শীতল হইতে লাগিল। বহির্দ্দেশ যত শীঘ্র শীতল হইল অভ্যন্তর দেশ তত শীঘ্র শীতল হইল না। বহির্দ্দেশ ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিন হইয়া পড়িল। অভ্যন্তর দেশ অগ্নিবৎ হইয়া রহিল। তখন আর তত দ্রুত গতিতে পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল না, অতি ধীরে ধীরে শীতল হইতে লাগিল, অবশেষে পৃথিবী পৃথিবীর ন্যায় হইল। এখনও পৃথিবী হইতে উত্তাপ প্রতি নিয়ত বিকীরিত হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু পৃথিবী সূর্য্য হইতে যতটুকু তাপ শোষণ করিতেছে, পৃথিবী হইতে প্রায় ততটুকু তাপই বিকীরিত হইয়া যাইতেছে, কাজেই এখন উত্তাপ সর্ব্বদা সমভাবে রহিয়াছে। পৃথিবীর মৌলিক ইতিহাসের অর্থাৎ পৃথিবীর উপরি ভাগ কঠিন হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাসের কোন চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু আমরা নানাবিধ ব্যাপার হইতে পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি, এবং অন্যবিধ প্রমাণ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীর উৎপত্তির এই ইতিহাস সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও বাধ্য। পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হইবার পর হইতে ইহার ইতিহাস-চিহ্ন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এবং বিভিন্ন ধাতুর উৎপত্তির সহিত পৃথিবীর গঠনের যে সম্পর্ক রহিয়াছে, আমরা সেই সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পর্য্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই আমরা পৃথিবী অঙ্কে চিহ্নিত পৃথিবীর ঐতিহাসিক চিহ্ন রাশির অর্থ অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিব।

যখন বাষ্পীয় পৃথিবী শীতল হইয়া দ্রবীভূত হইল অর্থাৎ যখন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ গলিত হইয়া রহিল বা সমগ্র পৃথিবীই একটা প্রকাণ্ড তরলবৎ পিণ্ড ছিল, তখনও পৃথিবীর উত্তাপ কিরূপ অপ্রমেয় ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। লৌহ, প্রস্তর, অঙ্গার ইত্যাদিকে দ্রবীভূত করিতে হইলে কি প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তখন পৃথিবীর উত্তাপও এইরূপ, তবে বাষ্পীয় অবস্থার অপেক্ষা তাপ মাত্রা অনেক শীতল। তরল পিণ্ডাবস্থায় পৃথিবী একটা দুর্দ্ধর্ষ সমুদ্রবৎ ছিল। ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে পৃথিবীর উপরিভাগে স্থানে স্থানে কঠিন আবরণ পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত আদিম আবরণ, খুব সম্ভবতঃ অভ্যন্তরস্থ তরল পার্থিব পদার্থের ও তজ্জাত বাষ্প সমূহের প্রবল আলোড়নে, বহু শতবার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই আদিম কালের বজ্র কঠোর গর্জ্জনের ভীষণতার ভগ্নাবশেষ এখনও আগ্নেয় গিরীর অগ্ন্যুৎপাত কালে শ্রুত হইয়া থাকে। তাহার তুলনায় বর্ত্তমান আগ্নেয়-গিরি গর্জ্জন অতি মৃদু সুশ্রাব্য প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পৃথিবী প্রথমে

বাষ্পময় ছিল, পরে বহির্বারণ তরল হইল, কিন্তু অভ্যন্তর তখনও বাষ্পময় রহিল; তাহা হইলে সেই সময়ে এই তরল পদার্থ কিরূপ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ও বিঘূর্ণিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি এরূপ ভাবে মাত্র এক সহস্র বৎসর বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ বেশ রীতিমত ভাবে অনুমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। লবণের দ্রাবণ ও চিনির দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া দুইবার আন্দোলিত করিলেই পরস্পর মিশিয়া যায়। সে ক্ষেত্রে যদি ১,০০০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর তাবৎ তরল পদার্থ আন্দোলিত ও বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাবতীয় তরল পদার্থ পরস্পরের সহিত বেশ অনুমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এস্থলে এক সহস্র বৎসর মাত্র উল্লিখিত হইল কিন্তু পৃথিবীর উক্ত অবস্থায় বস্তুতঃ যে কত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার নির্ভুল সংখ্যা নিরূপণের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী তরল পিণ্ডবৎ ছিল এবং সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ রীতিমত ভাবে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কিরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রস্তর উৎপাদিত হইল? কোনও স্থানে কেবল লবণ-প্রস্তর, কোন স্থানে চূণ-প্রস্তর, কোন স্থানে খড়িমাটি-প্রস্তর,—মিশ্রিত পিণ্ড হইতে এরূপে এক একটি জিনিষ পৃথক কিরূপে হইল? পৃথিবীতে কত যে পদার্থ রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। আজ পর্য্যন্ত অশীতি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ (elements) আবিষ্কৃত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত পদার্থের সহস্র সহস্র যৌগিক (compound) পদার্থ রহিয়াছে। তরল পদার্থের তুলনা জল। যে প্রণালীতে জল শীতল হইয়া কঠিন তুষার হয়, ঠিক সেই প্রণালীতে যদি এই তরল পিণ্ড কঠিন হইত, তাহা হইলে কখনই পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক পদার্থ সন্নিবিষ্ট হইত না। কিন্তু লবণাক্ত জল শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময় দেখা যায় যে, এক অংশ কঠিন হইয়া গিয়াছে, অন্য অংশ তখনও তরল। স্বাদ গ্রহণে দেখা যায়, এই তরল অংশ অত্যন্ত অধিক লবণাক্ত এবং কঠিন অংশের স্বাদ আদৌ লবণাক্ত নহে, বা অত্যল্প লবণাক্ত। যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র সামান্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছেন। এক্ষণে তরল-পিণ্ডবৎ পৃথিবী ঠিক লবণাক্ত জলের ন্যায় নানাবিধ বস্তু মিশ্রিত। যখন সেই তরল পিণ্ড কঠিন হইতে লাগিল, তখনই লবণাক্ত জলের কঠিন হওয়ার ন্যায় কোন এক অভাবনীয় কারণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ পৃথকীকৃত হইয়া কঠিন হইতে লাগিল। কাজেই আমরা কোন এক প্রস্তর স্তূপে পার্থিব সমস্ত পদার্থ না পাইয়া এক এক জাতীয় প্রস্তরে এক এক রূপ পদার্থ—মৌলিক বা যৌগিক—প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বর্ত্তমানকালে রসায়ন বিজ্ঞানের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থের দ্রাবণ সম্বন্ধে রাসায়নিকগণ নানাবিধ নূতন নূতন অভিনব

তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সমস্ত তথ্যের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইতেছে। পূর্ব্বে লবণ দ্রাবণের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও এক শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু এই শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা সরলতম, ইহা অপেক্ষাও বহুবিধ জটীল শ্রেণী রহিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন যে, এই প্রণালীর দ্বারাই ভিন্ন জাতীয় প্রস্তর-উৎপত্তি-কারণের প্রহেলিকা দূরীভূত হইবে। যদি কোন দ্রাবণে নানাবিধ পদার্থ রীতিমত মিশ্রিত থাকে, এবং এই মিশ্রিত দ্রাবণ শীতল করিয়া বরফ অর্থাৎ কঠিন করিবার সময় যদি এই মিশ্রিত দ্রাবণের উপাদান সমূহ সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পৃথক হইয়া যায়—পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রায়ই সমস্ত মিশ্রিত দ্রাবণেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে,—তাহা হইলে এই প্রণালী দ্বারাই চির প্রহেলিকাময় বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর উৎপত্তির কারণ বোধগম্য হইবে। অবশ্য উত্তপ্ত গলিত প্রস্তর লইয়া পরীক্ষার বিপদ এবং তৎসঙ্গে মিশ্রিত অন্যান্য অসংখ্য পদার্থের মিশ্রণ জনিত জটীলতা যদি অত্যধিক না হয়, তাহা হইলে অচিরেই রাসায়নিকগণ প্রস্তর উৎপত্তির যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে এতৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

সঙ্গীত লহরী ও মশক।

ইংলণ্ডের নেজনদী তীরে ওয়ালটন নামক স্থানে দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে মশকের অত্যাচার এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, লোকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সময়মত জলাশয় ও অন্যান্য পূতিগন্ধ বিশিষ্ট স্থান এবং যে সমস্ত জলভূমি মশক সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুকুল সেই সমস্ত স্থানে প্রচুর প্যারাফিন ও অন্যান্য দ্রব্য ছড়াইয়া মশক বংশ নির্ম্মূল করিয়াছেন।

সম্প্রতি জনৈক তড়িৎ ইঞ্জিনিয়ার অন্য এক উপায়ে মশক ধ্বংস করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ইঞ্জিনিয়ার কোনও সময়ে হারমনিক টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে এই উপায় লক্ষ্য করেন। হারমানক টেলিগ্রাফি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় একরূপ শ্রুতি সুখকর গুঞ্জরণ উদ্ভূত হয়। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, এই গুঞ্জরণের কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে একটা নিয়মিত সংখ্যায় উপনীত হইলে মশক সমূহ যন্ত্র সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়া যন্ত্রের উপরে আপতিত হয়।

অতঃপর তিনি এই যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে অনেক স্থান ব্যাপিয়া আঠাল কাগজ বিস্তৃত করিয়া রাখিলেন। পরে ঐ যন্ত্র হইতে কতিপয় সেকেণ্ড মাত্র শব্দ বিনির্গত হইলেই গৃহ মধ্যস্থ প্রায় সমস্ত মশকই কাগজের আঠায় পতিত হইল।

তিনি এক্ষণে আঠাল কাগজের পরিবর্ত্তে তড়িৎ সাহায্যেই মশক ধ্বংশ করিতেছেন। কয়েকটি কাষ্ঠের তক্তার উপর লৌহের জাল পিন দিয়া মারিয়া দিলেন। এইরূপ তক্তাবদ্ধ জাল দ্বারা যন্ত্রটির চারিদিকে একটা বেষ্টনী দিলেন। এই জাল অধিক চাপ যুক্ত তড়িতের সহিত সংস্পৃষ্ট রহিল। মশক জালে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তড়িতের বিক্ষোভে মৃত হইতে লাগিল।

এক্ষণে দেখা যাউক কি কারণে মশক্ এইরূপে স্বর লহরী দ্বারা আকৃষ্ট হয়। স্ত্রী-মশকের কণ্ঠস্বর পুং-মশককে আকৃষ্ট করে। এখানেও এই একই কারণে মশক সমূহ সমাগত হয়। পুং-মশকের শিরোভাগে দুইটি কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম যন্ত্র আছে। এই কেশ দুইটি কোনও একরূপ বিশেষ শব্দের কম্পনে কম্পিত হইয়া উঠে। অর্থাৎ এই দুইটিই পুং মশকের কর্ণ স্বরূপ কার্য্য করে।

মানবের কর্ণ রহিয়াছে বটে এবং তৎসাহায্যে শব্দ শুনিতে পায় বটে, কিন্তু কোন্ স্থান হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা মানব নিশ্চয়রূপে ধরিতে পারে না। কিন্তু পুং-মশকের অবস্থা সেরূপ নহে। যদি পুং-মশকের ঠিক পুরোভাগে কোন স্ত্রী-মশক গুঞ্জন করে, তাহা হইলে পুং-মশকের পূর্ব্বোক্ত কেশ দুইটি সমভাবে কম্পিত হইয়া উঠে। এক্ষণে যদি স্ত্রী-মশক এক পার্শ্বে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে পুং-মশকের পূর্ব্বোক্ত কেশ দ্বয়ের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। এইরূপ হইলে পুং-মশক চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং অবশেষে এরূপ ভাবে অবস্থান করে যে, তাহার উক্ত কেশদ্বয় সমভাবে কম্পিত হইয়া উঠে; এরূপ হইলেই বুঝিতে পারে যে, ঠিকসম্মুখে স্ত্রী-মশকটি রহিয়াছে, এবং সোজা উড়িয়া যাইয়া তাহার সম্মুখীন হয়। এই সমস্ত তথ্য পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত তড়িৎ-যন্ত্র হইতে যে স্বর নির্গত হয়, তাহা স্ত্রী-মশকের স্বরের অনুরূপ। কাজেই পুং-মশক এই শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্র অভিমুখে ধাবিত হয়। পুং-মশকের গমনের কারণ অতি সহজেই মীমাংসিত হইতেছে বটে, কিন্তু স্ত্রী-মশকও কেন এইরূপে সমাকৃষ্ট হয়, তাহা আজিও মীমাংসিত হয় নাই। যাহা হউক এইরূপ গুঞ্জরণে রাশি রাশি মশক আকৃষ্ট হয় এবং আকৃষ্ট হইলে যাহাতে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে, তাহারই কোনও রূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইলেই চলে। যদি এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি মশক ধ্বংস হইতে পারে।

স্ত্রী মশকের গুঞ্জরণ অনেকটা বহুদূর হইতে শ্রুত ব্যাগ পাইপের শব্দের ন্যায়। এই শব্দ মশকের পক্ষ সঞ্চালনে উদ্ভূত হয় না। মশকের বক্ষে বায়ু গ্রহণের জন্য ছিদ্র রহিয়াছে। এই ছিদ্র মুখে দ্বার দেওয়া থাকে। এই দ্বার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করে। এই দ্বারের কম্পনেই মশকের গুঞ্জরণ শব্দ উত্থিত হয়। মক্ষিকা এবং মধু-মক্ষিকাও এই উপায়ে শব্দ করে।

দুইটি সুবৃহৎ জগৎ।

নভোমণ্ডলে যে সমস্ত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ম্যাগনিচিউড্ হিসাবে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ম্যাগনিচিউডের যে সমস্ত নক্ষত্র রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২০টি। ইহাদের মধ্যে রিগেল (Rigel) এবং ক্যানোপাস (Canopus) সর্ব্ব প্রধান। এই দুইটি নক্ষত্র অপেক্ষা আরও দুইটি এই জাতীয় নক্ষত্র দূরতর দেশে অবস্থিত, অবশিষ্ট ১৬টি নিকটবর্ত্তী। নক্ষত্রের দূরতা সাধারণতঃ মাইল হিসাবে করা হয় না। কেননা তাহা হইলে তাহা সংখ্যায় লিখিত হইলেও অনুমান করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বোধ সৌকর্য্যার্থে এক বৎসরে আলোক যতটা পথ গমন করে, সেই হিসাবে নক্ষত্রের দূরতার পরিমাণ করা হয়। আণ্টারিস (Antares) পৃথিবী হইতে ১১২ বৎসর আলোক গতিদূরবর্ত্তী। অর্থাৎ আলোক রশ্মি আণ্টারিস হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে ১১২ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। এইরূপ রিগেল এবং ক্যানোপাস ৪৬৬ বৎসর আলোক গতি দূরবর্ত্তী। এক্ষণে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। অতএব ৪৬৬ বৎসরে আলোক কত দূর গমন করিতে পারে তাহা হিসাবে ধরা যায় বটে কিন্তু এরূপ দূরতা হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। এত দূরতর দেশে অবস্থিত হইলেও সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে রিগেল সপ্তম এবং ক্যানোপাস দ্বিতীয় নক্ষত্র।

পূর্ব্বে রিগেলের জ্যোতিঃ শক্তি ৪,০০০ + আমাদের সূর্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আরও সূক্ষ্মতর হিসাবে দূরতা ২$\frac{১}{৩}$ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত নক্ষত্র হইতে যে আলোক বহির্গত হইতেছে, তাহা কিন্তু বৃদ্ধি পায় নাই বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অতএব নূতন হিসাবে তাহাদের আলোকের তীব্রতা পূর্ব্ব হিসাবের (২$\frac{১}{৩}$)^{২} বা প্রায় ৫ $\frac{১}{২}$ গুণ অধিক। * এই হিসাবে ন্যূন পক্ষেও রিগেল ২২,০০০ এবং ক্যানোপাস্ ৫৫,০০০ সূর্য্যের সমান।

---

* Intensity of light varies inversely as the square of the distance.

পৃথিবী হইতে যে সমস্ত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সিরিয়াস সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল *। ইহার দূরতা ৮·৭ আলোক-গতি বৎসর। এই নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী যাবতীয় নক্ষত্রের মধ্যে তৃতীয়। প্রথম ম্যাগনিচিউডের নক্ষত্র শ্রেণীর মধ্যে এই নক্ষত্র দ্বিতীয়। পৃথিবীর উত্তরাংশ হইতে যে সমস্ত প্রথম ম্যাগনিচিউডের নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। এক্ষণে দেখা যাউক, রিগেল এবং ক্যানোপাস্, সিরিয়াসের স্থানীয় হইলে, তাহাদের ঔজ্জ্বল্য কত বৃদ্ধি পাইত। সিরিয়াস অপেক্ষা উক্ত নক্ষত্রদ্বয়ের দূরতা ৫৩·৫ গুণ অধিকতর। কাজেই উক্ত নক্ষত্রদ্বয়কে সিরিয়াসের নিকট আনায়ন করিলে, তাহাদের ঔজ্জ্বল্যকে ৫৩·৫² অর্থাৎ ২৮৬২·২৫ দিয়া গুণ করিতে হইবে। উপসংহারে যে তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সিরিয়াস হইতে আমরা যে আলোক পাই, তাহার তুলনায় রিগেল হইতে শতকরা ১৮ ভাগ এবং ক্যানোপাস হইতে শতকরা ৫২ ভাগ আলোক পাইয়া থাকি; অর্থাৎ সিরিয়াসের ঔজ্জ্বল্য ১০০ হইলে রিগেলের ঔজ্জ্বল্য ১৮ এবং ক্যানোপাসের ৫২ মাত্র। অতএব উক্ত নক্ষত্রদ্বয় সিরিয়াস স্থানীয় হইলে তাহাদের ঔজ্জ্বল্য যথাক্রমে $\frac{১৮}{১০০} \times ২৮৬২·২৫$ এবং $\frac{৫২}{১০০} \times ২৮৬২·২৫$ হইত, অর্থাৎ রিগেল এবং ক্যানোপাস, সিরিয়াসের অপেক্ষা ৫১৫ গুণ ও ১৪৮৮ গুণ অধিকতর উজ্জ্বল হইত। প্রথম ম্যাগনিচিউডের অন্য কোনও নক্ষত্র সিরিয়াসের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের এত বিষম পার্থক্য হইত না। সিরিয়াস সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এবং রেগুলাস সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম প্রভাবিশিষ্ট। তথাপি সিরিয়াস এই রেগুলাস অপেক্ষা মাত্র ১৫ গুণ অধিকতর উজ্জ্বল। মানব সিরিয়াসের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। যদি রিগেল এবং ক্যানোপাস, সিরিয়াসের স্থানীয় হইত তাহা হইলে সিরিয়াস অপেক্ষা তাহাদের যথাক্রমে ৫১৫ ও ১৪৮৮ গুণ ঔজ্জ্বল্যে মানব নিশ্চয়ই অতিমাত্র মুগ্ধ ও বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িত।

শুক্র গ্রহ সিরিয়াস অপেক্ষা ১১ গুণ অকিধতর উজ্জ্বল। যে সময়ে শুক্রের দীপ্তি অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তখন ঔজ্জ্বল্যে ইহা সূর্য্য এবং চন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী। ৫১৫ এবং ১৪৮৮ এই দুই সংখ্যাকে ১১ দিয়া ভাগ করিলে উহাদের ভাগ ফল যথাক্রমে ৪৭ এবং ১৩৫ হয়। এক্ষণে যদি রিগেল এবং ক্যানোপাস সিরিয়াসের স্থানে সন্নিবিষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের ঔজ্জ্বল্য শুক্র অপেক্ষা যথাক্রমে ৪৭ এবং ১৩৫ গুণ অধিকতর হইত। আকাশ অতীব নির্ম্মল থাকিলে, এই শুক্র গ্রহ সময়ে সময়ে দিবা ভাগে (সূর্য্যের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ অস্তের পূর্ব্বাহ্নে বা প্রদোষের পরাহ্নে) পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি রিগেল এবং ক্যানোপাস, সিরিয়াসের

* নক্ষত্র এবং গ্রহের পার্থক্য সকলেই অবগত আছেন।

স্থানীয় হইত তাহা হইলে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড আলাময় অসহনীয় দীপ্তিতেও তাহারা ভাস্বর হইয়া থাকিত।

আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাউক। পূর্ণচন্দ্র শুক্র গ্রহ অপেক্ষা ১,৭২৭ গুণ অধিকতর উজ্জল। অতএব এই রাশি দিয়া ভাগ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, রিগেল এবং ক্যানোপাস, সিরিয়াসের নিকটবর্ত্তী হইলে, পূর্ণচন্দ্রের তুলনায় রিগেল শত করা ২·৭ এবং ক্যানোপাস শত করা ৭ ৮ ভাগ আলোক সমুজ্জল হইত। শেষোক্ত ৭·৮ এই সংখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এরূপ অবস্থায় পূর্ণচন্দ্রের উজ্জলতা ক্যানোপাস অপেক্ষা মাত্র ১৫ গুণ অধিক হইত। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সিরিয়াস এবং রেগুলাসের মধ্যে এইরূপ (১৫ গুণ) দীপ্তির অনুপাত স্থির করিয়াছেন। অর্থাৎ সিরিয়াস স্বাভাবিক অবস্থায় রেগুলাস অপেক্ষা মাত্র ১৫ গুণ অধিক দীপ্তি বিশিষ্ট। অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে নির্ম্মল আকাশে সহসা পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন মৃদু ঝলসিত হইয়া যায় এবং দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কল্পিত হউক যে, রিগেল এবং ক্যানোপাসের সন্নিধানে চন্দ্র উপস্থিত হইল। তাহা হইলে এই দুই নক্ষত্রে যখন চন্দ্রের ভোগ (occultation) হইত তখন অন্তরীক্ষে কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই উদ্ঘাটিত হইত। ভাস্বর চন্দ্র ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইত, ক্রমে নক্ষত্র স্পর্শ করিত, চন্দ্রের পশ্চাতে পড়িয়া নক্ষত্র অদৃশ্য হইত, ক্রমে এক ঘণ্টা পরে নক্ষত্রের দ্যুতি চন্দ্রের পাশ্চাত হইতে পরিস্ফুট হইত। যখন নক্ষত্র এবং চন্দ্র সমসূত্রপাতে অবস্থান (conjunction) করিত, তখনই তাহার প্রতিকলায় কি মহিমাময় চিত্র প্রকাশিত হইত।

সিরিয়াস পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী; তথাপি অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ প্রয়োগেও ইহার আলোকবিন্দুকে বর্দ্ধিতায়তন করা যায় না। (দূরবীক্ষণ প্রয়োগে বস্তু নিকটস্থ প্রতীয়মান হয়, কাজেই বর্দ্ধিতায়তন দেখায় কিন্তু সিরিয়াস এত দূরবর্ত্তী যে প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ দ্বারা যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী হইলেও ইহার আয়তন বিন্দুবৎই থাকিয়া যায়)। এই সিরিয়াসের স্থানীয় করিয়া রিগেল এবং ক্যানোপাসের ঔজ্জ্বল্য আলোচিত হইল। কিন্তু রিগেল এবং ক্যানোপাসকে আরও নিকটবর্ত্তী করা যাউক। এরূপ কল্পিত হউক যে, তাহারা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের আয়তন কিরূপ হইতে পারে দেখা যাউক। এই প্রবন্ধের উপসংহারে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সিরিয়াসের দীপ্তি পরিমাণ আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা ৪৮ গুণ অধিকতর। এক্ষণে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে সূর্য্য ও সিরিয়াসের বহির্গাত্র হইতে যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই দীপ্তির পরিমাণ অবিভিন্ন, তাহা হইলে সিরিয়াসের ব্যাস সূর্য্য অপেক্ষা ৪৮ অর্থাৎ ৭ গুণ অধিক। অতএব সূর্য্যের প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা সিরিয়াসের আয়তন ৭×৪৯ গুণ

অর্থাৎ ৩৪৩ গুণ অধিকতর। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন ১২,৫০,০০০ গুণ বৃহত্তর। তাহা হইলে সিরিয়াসের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১২,৫০,০০০ × ৩৪৩ অর্থাৎ ৪২,৮৭,৫০,০০০ গুণ অধিকতর। এক্ষণে সিরিয়াস কিরূপ সুবৃহৎ তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

আমাদের উপাখ্যান রিগেল এবং ক্যানোপাস লইয়া। ইহারা সিরিয়াস অপেক্ষা আরও বৃহত্তর। এক্ষণে রিগেল, ক্যানোপাস এবং সূর্য্যের বহির্গাত্রের দীপ্তি সমান ধরিয়া লওয়া হইল; রিগেল এবং ক্যানোপাস সূর্য্য অপেক্ষা যথাক্রমে ২২,০০০ এবং ৫৫,০০০ গুণ অধিকতর দীপ্তিশালী। এই দুই সংখ্যার বর্গ নিষ্কাশিত করিলে দেখা যায় যে, রিগেল এবং ক্যানোপাসের ব্যাস সূর্য্যের ব্যাস অপেক্ষা যথাক্রমে ১৫০ এবং ২৩৫ গুণ বৃহত্তর। উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের যতটুকু অংশ একবারে দেখিতে পাওয়া যায় সেই অংশকে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পথকে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ ১৮০° ডিগ্রিতে বিভাগ করিয়াছেন। সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণ মাত্র অর্দ্ধ ডিগ্রি। ক্যানোপাসের ব্যাস ঐ স্থানে ১১৭ $\frac{১}{২}$ ডিগ্রি অধিকার করিত। অতএব আমাদের সূর্য্যবৃত্ত আকাশের যতটুকু স্থান অধিকার করে ক্যানোপাস সূর্য্য নিকটবর্ত্তী হইলে ক্যানাপাসের বৃত্ত তাহার ৫৫,২২৫ গুণ অধিকতর স্থান অধিকার করিত। এরূপ হইলে ক্যানোপাসের পূর্ণ উদয় হইতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইত, এবং মস্তক লম্বিত নভোবিন্দুতে পূর্ণরূপে আগমন করিতে করিতেই ক্যানোপাসের এক অংশ অস্তশায়ী হইত। অর্থাৎ পূর্ণোদয়ে ক্যানোপাস বৃত্ত পূর্ব্বদিগন্ত বৃত্ত হইতে মধ্য নভোবিন্দু অতিক্রম করিয়া যাইত। আমাদের সুখ শান্তি বিধাতৃ সূর্য্যের পরিবর্ত্তে তৎস্থলে যদি ক্যানোপাস উদিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর জীবরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইত, সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পীভূত হইত, সৃষ্টি বিধ্বংশী প্রচণ্ড উত্তাপে শৈলমালা বিগলিত হইয়া জল স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত; এতদ্ব্যতীত এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী সেরূপ দুর্দ্দমনীয় জ্যোতিঃতে চির লুক্কায়িত থাকিয়া যাইত।

এই দুই প্রকাণ্ড জগৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম ম্যাগনিচিউডের ২০টি নক্ষত্রের মধ্যে দুইটি। অন্তরীক্ষে যে কোটী কোটী নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিই হয়ত ঐরূপ। ক্যানোপাসের ন্যায় এরূপ নক্ষত্র যে আর নাই অথবা ঐ ২০টি নক্ষত্র ভিন্ন যে আর প্রথম ম্যাগনিচিউডের নক্ষত্র নাই, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। যাহা হউক আমরা প্রথম ম্যাগনিচিউডের যে ২০টি নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিই ক্যানোপাসের প্রায় সমতুল্য। তাহাদের প্রত্যেকটি কত বৃহৎ, তাহাদের শক্তি কিরূপ ধারণার অতীত, তাহা আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীর নিকটে আনিয়া তুলনা করি নাই; কেবল সিরিয়াস নক্ষত্রের সহিত তাহাদের শক্তি,

তাহাদের আয়তন ইত্যাদি তুলিত হইয়াছে। কেননা সিরিয়াস নক্ষত্রই তাহাদের অগ্রণী। যদি এক মিনিটে এক মাইল অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে এই সিরিয়াসে উপস্থিত হইতে মোট ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটী বৎসর প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশস্থিত নক্ষত্রের সহিত তুলনায় যে সমস্ত নক্ষত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাদের শক্তি অনুমান করাও দুঃসাধ্য। আমাদের সূর্য্যের শক্তি আমরা কতকটা অবগত আছি। কিন্তু পূর্ব্বমত ১ মিনিটে ১ মাইল গমন করিতে পারিলে সূর্য্যে উপস্থিত হইতে আমাদের সর্ব্ব সমেত ১৭৭ বৎসর আবশ্যক হয়।

এই প্রবন্ধে যে ব্যাপার উল্লিখিত হইল, তাহা পাঠে চমৎকৃত ও বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের চিন্তা শক্তি কেবল ফলমাত্র দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চাহে না। কোন ফল নিশ্চয়ই কোনও এক কারণ হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞান বহু কষ্টে এই সকল বিশ্বপটের যতদূর সম্ভব কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে জানিতে চাহিলেই বিজ্ঞান কারণের কোন অনুসন্ধান বলিয়া দিতে পারে না, তখন বিজ্ঞানের অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার শীর্ণ হইয়া উঠে, বিজ্ঞান এই দৃশ্য পটের সম্মুখে নত নেত্রে নিরুত্তর হইয়া অবসর গ্রহণ করে। আর মানবের চিন্তাশক্তি এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার চরণ প্রান্তে ভক্তি বিহ্বলিত নেত্রে অবলোকন করিতে থাকে।

প্রথম ম্যাগ্নিচিউডের তিনটি নক্ষত্রের তালিকা।

(ক) তাহার স্বভাবতঃ যেরূপ রহিয়াছে।

ঔজ্জ্বল্য।	নাম।	ম্যাগ্নিচিউড।	যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায়।	দূরত্ব। (আলোক-গতি বৎসর হিসাবে।)	ঔজ্জ্বল্য। × সূর্য্য
১	সিরিয়াস	— ১.৬	১০০	৮·৭	৪৮
৭	রিগেল	০.৩	১৮	৪৬৬	২২,০০০ +
২	ক্যানোপাস	— ০.৯	৫২	৪৬৬	৫৫,০০০ +

(খ) যদি রিগেল এবং ক্যানোপাস্ সিরিয়াসের, নিকটবর্ত্তী হইত।

ক্রমিক।	নাম।	দূরত্ব। (আলোক-গতি বৎসর হিসাব।)	উজ্জ্বলতা। × সিরিয়াস্।	উজ্জ্বলতা। × সূর্য্য।	উজ্জ্বলতা। × পূর্ণচন্দ্র।
৩	সিরিয়াস	৮·৭	১	... ...	... ...
২	রিগেল	৮·৭	৫১৫	৪৭	.০২৭
১	ক্যানোপাস	৮·৭	১,৪৮৮	১৩৫	·০৭৮

পরমাণু

বা

ATOM.

পরমাণু বলিতে আমরা প্রায়ই একটা অসম্ভবপর মানবের ধারণার অগোচর ও অনুমান শক্তির অতীত একটা কিম্ভুতকিমাকার বস্তু বলিয়া বুঝি। যখন আমরা বলিয়া থাকি যে পার্থিব সকল দ্রব্যই ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য বস্তুর সমষ্টি মাত্র তখন আমরা আপনারাই বিকৃত মস্তিষ্ক ও হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বস্তু যে আবার অবিভাজ্য হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণাশক্তির বাহিরে। দ্রব্য মাত্রের মূলীভূত (component) ক্ষুদ্রতম আনুমানিক পদার্থবিন্দুগুলি (particles of matter) যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না তবু তাহাদের একটা আয়তন থাকে। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কেন সেগুলিকে তাহার পর আরও বিভাগ করা যাইবে না ইহা বেশ বুঝা যায় না। আমাদের একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া মনের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে যে, যে দ্রব্যের আকার বা আয়তন আছে তাহারাই বিভাজ্য। তাহা হইলে এ পৃথিবীতে বা এই জগতে অবিভাজ্য কোন দ্রব্য আছে ইহা বলিয়া আমাদের মনেই হয় না।

পরমাণু সম্বন্ধীয় এই মূলসূত্র (theory) কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানবিষয়ে কার্য্যকারী হইয়া থাকে বলিয়াই ইহা গৃহীত হয়, নতুবা কেবল মূলসূত্রটি

অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিতে হইলে ইহা একেবারে অবোধ্য। অর্থাৎ পরমাণু যে কি প্রকার বস্তু তাহা বুঝিতে হইলে ইহা কিরূপ কার্য্য করে, ও কিরূপে ইহা কার্য্য করে তাহা জানা উচিত এবং কিরূপে ইহা অবস্থান করে তাহাও জানা উচিত; না হইলে শুধু ইহার বর্ণনা পড়িয়া ইহা সম্বন্ধে একটি প্রকৃত ধারণা জন্মাইতে পারে না।

পরমাণুকে অবিভাজ্য এই কথা বলিবার অর্থ এই যে, এই পরমাণু দ্রব্যমাত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বিন্দু, এবং ইহা অনায়াসে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত হইতে পারে। যদি এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে পরমাণুকে আমরা অবিভাজ্য বলিয়া বড় অপরাধ করি নাই।

এককালে পরমাণুকে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা আর সে বর্ণনা খাটে না। পূর্ব্বে সকলেই জানিতেন বটে যে পরমাণু অবিভাজ্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকবর্গ আজকাল বলিতেছেন যে তাহা নহে—পরমাণু অবিভাজ্য নহে। ইহাকেও আবার অতি সূক্ষ্মতম বিন্দুতে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহা আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণের কেবলমাত্র আনুমানিক সিদ্ধান্ত নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণ (experiment) দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে পরমাণু এতাবৎকাল অবিভাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল তাহা বাস্তবিকই অতি অতি সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য মূলীভূত বিন্দুর দ্বারা সংগঠিত। এবং এই অতি অতি সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য মূলীভূত বিন্দুগুলি, যাহাদিগের সমষ্টির অপর নাম পরমাণু, তাহাদের প্রত্যেকে অবিভাজ্য—তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এইগুলি যে অবিভাজ্য তাহা তাহাদিগকে ভাগ করিতে গিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই গুলিকে ভাগ করিতে যাইলে ইহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না—কোন অজ্ঞাত নিয়মানুসারে ইহারা নষ্ট হইয়া যায়। এই অবিভাজ্য বিন্দুকে ইলেক্ট্রন্ (electron) বলা হইয়াছে। বায়ুশূন্য কাচের নলে তড়িৎ পরিচালন কালে, ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

ইহা অনেকেরই জ্ঞাত আছে যে যখন দুইটী তড়িৎপরিচালক (conductor) বায়ুর ব্যবধানে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ বহাইবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে খুব বেশী চাপে (high potential) যদি থাকে তবেই তাড়িত প্রবাহ স্ফুলিঙ্গরূপে (spark) একটি পরিচালক হইতে অপর পরিচালকে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু যদি এই তড়িৎ পরিচালক দুইটিকে কোন উপায়ে একটি বায়ুশূন্য স্থানে রাখা যায় অর্থাৎ তাহাদিগকে একটি কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া পাত্রের ভিতরের প্রায় সমস্ত বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া পাত্রটির মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করতঃ—যাহাতে তাহার মধ্যে কিছু মাত্র বায়ু কোনরূপে যাতায়াত করিতে না পারে—তাহার পর

তাহাদের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ বহিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন প্রকারে এক পরিচালক হইতে অপর পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। এই প্রকারে চালিত হইতে হইলে তাড়িত প্রবাহের আর অধিক চাপ (high potential) প্রয়োজন হয় না। শেষোক্ত প্রকারে তাড়িত প্রবাহ পরিচালনকালে নানা প্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকটিত হয়। একটি পরিচালকের কাছে নীলাভ এক প্রকার আলোকরশ্মি নির্গত হয়; তাহার পর খানিকটা অন্ধকার, তাহার পর আবার খানিকটা আলোকিত অংশ, তাহার পর আবার অন্ধকার অংশ পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত আর একটি নীলাভ আলোকরশ্মি অপরাপর আলোক মণ্ডলীকে ভেদ করিয়া ঋজুভাবে ওই পরিচালক হইতে অগ্রসর হইতে থাকে। এক্ষণে এই পরিচালকের উপরিভাগ সমতল না হইয়া যদি মধ্যনিম্ন (concave) হয় তাহা হইলে শেষোক্ত নীলাভ আলোক দণ্ড বরাবর ঋজু-ভাবে না যাইয়া তাহার মূলীভূত (component) আলোক রশ্মিগুলি কেন্দ্রীভূত (concentrated) হইয়া একটি বিন্দুতে (focus) আসিয়া একত্রিত হইয়া থাকে। এই focusএ যদি একখণ্ড প্ল্যাটিনম্ ধাতু ধরা যায় তাহা হইলে ইহা খররশ্মি দান করিয়া থাকে (becomes incandescent)।

এই নীলাভ রশ্মি যদ্যপি কোন কঠিন পদার্থ বা ঐ কাঁচ যন্ত্রের এক দেওয়ালে আসিয়া লাগে তাহা হইলে তাহা হইতে এক প্রকার বর্ণ-যুক্ত উত্তাপশূন্য আলোকের অল্প রশ্মি বাহির হইতে থাকে; ইহাকে ইংরাজীতে ফস্ফোরেসেণ্ট গ্লো (phosphorescent glow) বলা হয়, যেহেতু ফস্ফরাস (phosphorus) নামক মৌলিক পদার্থটি এইরূপ ঈষৎ, উত্তাপশূন্য, বর্ণযুক্ত কিরণ প্রদান করিয়া থাকে। পদার্থ বিশেষে এই আলোকের বর্ণের বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। এই আলোকেরও সাধারণ আলোকের ন্যায় কতকগুলি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। যদি কোন পদার্থ এই আলোকরশ্মির পথে থাকিয়া এই আলোকরশ্মির পথ অবরোধ করে তাহা হইলে পূর্ব্ব কথিত কাচযন্ত্রের দেওয়ালে আলোকপথরোধকারী উক্ত বস্তুর একটি সুস্পষ্ট ছায়া পতিত হয়।

চুম্বক বা তড়িন্ময়কৃত (electrified) কোন বস্তুর দ্বারা এই আলোকরশ্মি স্থানান্তরিত হইতে পারে। যে ভাবে ইহা স্বীয় পথ হইতে বিচলিত হয় তাহাতে মনে হয় যে, এই আলোকরশ্মিতে কতকগুলি অতিশয় ক্ষুদ্রাকার বিন্দু আছে যাহা বিসম (negative) তড়িৎ কর্ত্তৃক তরিন্ময়কৃত (electrified); এবং ইহাদের গতি এত অধিক যে ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইলের অধিক দূরে গমন করে। যখন দ্রুতগমনশীল এই বিন্দুগুলিকে হঠাৎ কাচ যন্ত্রের দেওয়ালে "ধাক্কা" লাগাইয়া গতিহীন করিয়া দেওয়া হয় তখন আশে পাশের

ইথারে (ether) একটি ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে ক্ষুদ্র-তরঙ্গ-বিশিষ্ট এক প্রকার আলোক রশ্মির সৃষ্টি হয়। এই আলোক রশ্মি এক্স্-রে (X-Ray) নামে বিখ্যাত। এই এক্স্-রে দ্বারা ভৈষজ্য ও অস্ত্র চিকিৎসাতে কত যে উপকার সাধিত হইতেছে তাহা অনেকেরই জানা আছে।

এই আলোকরশ্মির সকল বিন্দুগুলিই এক ধর্ম্মানুলম্বী; এবং ইহাদিগকে বিসম (negative) ইলেক্ট্রন কহে। প্রত্যেক বিসম ইলেক্ট্রনের আয়তন (mass) সর্ব্বাপেক্ষা লঘু বস্তুর (অর্থাৎ hydrogenএর) পরমাণুর ১৭০০ ভাগের এক ভাগ। কেবল এই দ্রুতগমনশীল বিন্দুগুলির সহিত কোন দ্রব্যের সংঘর্ষণ হইলেই যে ইহাদের বিশৃঙ্খলতা ঘটে তাহা নহে, যে দিকে ইলেক্ট্রনগুলি ছুটিতেছে সেই দিক হইতে ফিরাইয়া যদি অন্য দিকে ছুটিতে দেওয়া যায় তাহা হইলেও ইথারের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। এমন কি তাহাদের গতির তারতম্য ঘটিলেও ইথারের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে যখন ইথার বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন ইলেক্ট্রন হইতে "শক্তি" বিশ্লিষ্ট হইয়া বাহিরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। সুতরাং যখন একটি ইলেক্ট্রন ক্রমাগত বৃত্তাকার পথে ছুটিয়া বেড়ায় তখন তাহার অঙ্গ হইতে ক্রমাগত "শক্তি" বিশ্লিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হয়, যেহেতু প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার গতির দিক পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

যখন আমরা বিসম ইলেক্ট্রনের আয়তন (mass) এবং ইহার তড়িৎ সঞ্চার (electric charge) লইয়া আন্দোলন করিয়া তাহাদের পরস্পরের কি সম্বন্ধ তাহা অবগত হই তখন এই বিসম ইলেক্ট্রনের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, যাহা দ্বারা জড় পদার্থ (matter) সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় পুরাতন ধারনা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা সম্যক প্রকারে আমাদের উপলব্ধি হয়।

স্যার্ J. J. Thomson দেখাইয়াছেন যে যখন কোন বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চার করা হয়, তখন তাহার বাহ্য (apparent) আয়তন বর্দ্ধিত হয়। বাহ্য আয়তনের এইরূপ বৃদ্ধি শুধুই যে তড়িৎ সঞ্চারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, সেই বস্তুর বেগের (velocity) উপরও নির্ভর করে। ইলেক্ট্রনের তড়িত সঞ্চার পরিমান করা এবং ইহার বেগ নির্দ্ধারণ করা অনায়াস সাধ্য; সুতরাং ইলেক্ট্রনের বর্দ্ধিতাংশের কতটুকু তাড়িতসঞ্চারজনিত অনায়াসে তাহা পরিমান করা যাইতে পারে। এক্ষণে এই ইলেক্ট্রনের প্রকৃত (actual) আয়তনের সহিত যদ্যপি ইহার বৈদ্যুতিকসঞ্চার-জনিত বর্দ্ধিতাংশটুকু তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে ইহা দেখা যায় যে দুইটি ফলই সমান। তাহা হইলে এক একটা electronএর সমস্ত আয়তনটা (whole mass) ইহার বৈদ্যুতিক সঞ্চার জনিত অর্থাৎ প্রত্যেক electronএর আয়তন বৈদ্যুতিক সঞ্চারের জন্য গঠিত হইয়া থাকে।

এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, যে প্রত্যেক ইলেক্ট্রনের প্রকৃত আয়তন ইহার বৈদ্যুতিক সঞ্চারের জন্যই গঠিত হইয়া থাকে, জড় পদার্থ সম্বন্ধীয় আমাদের যাবতীয় ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আজকাল জড় পদার্থ মাত্রই ইলেক্ট্রন দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া সকলেই জানিয়াছেন; এবং এই যে ইলেক্ট্রন ইহাদিগকে জড় পদার্থ বলা যাইতে পারে না যেহেতু ইহারা কেবলমাত্র তাড়িত চুম্বক সম্বন্ধীয় কোনরূপ এক প্রাকৃতিক ধর্ম্মের ফল স্বরূপ।

এই স্থানে বাঙ্গলা ভাষাটা অত্যন্ত কঠোর হইল এবং অনেকের পক্ষে ইহা একেবারে অবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়াও যুক্তিসঙ্গত এবং সদ্বিবেচকের কার্য্য নহে। একে বিষয়টা কঠিন তাহার উপর বাঙ্গলা ভাষায় এই সকল বিষয় সুচারুরূপে বুঝাইতে হইলে যে সকল কথার আবশ্যক সে সকল আবশ্যকীয় কথার বিশেষ অভাব; তাহার পর "স্বল্পবাণী-পরিসর" হইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের একটি সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব ও চিত্তাকর্ষক ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করিতে বসিয়া যদি পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে অকৃতকার্য্য হই তাহা হইলে আমার সকল আশা বিফল ও যাবতীয় চেষ্টা ও যত্ন যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্য অন্য প্রকারে অন্য প্রকার বাক্যবিন্যাসে এই কথাই পুনরায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ—"তাড়িতচুম্বক" এই কথাটি আমাদের বুঝিবার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইতেছে। চুম্বক (magnet) এক প্রকার স্বতন্ত্র (peculiar) ধর্ম্মবিশিষ্ট লৌহ বিশেষ; এই ধর্ম্ম চুম্বকে বর্ত্তমান থাকায় ইহা লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে। সকল লৌহকেই চুম্বকে পরিণত করিতে পারা যায় কিন্তু সকল লৌহে এই ধর্ম্ম স্থায়ী হয় না। কঠিন লৌহ বা ষ্টীলে এই ধর্ম্ম বহুকাল স্থায়ী হয়, অর্থাৎ ইহা একবার চুম্বকের শক্তি বিশিষ্ট (magnetised) হইলে সে শক্তি ইহাতে মজ্জাগত হইয়া বসিয়া যায়, আর সহজে যাইতে চাহে না কিন্তু কোমল লৌহে (soft iron) এই শক্তি আদৌ স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ ইহা অন্য চুম্বকের সংস্পর্শে থাকে বা ইহার চতুর্দ্দিকে তাড়িত প্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণই কেবল ইহাতে চুম্বকের ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহার নিকট হইতে চুম্বকটি সরাইয়া দেওয়া হইবে কিংবা তাড়িত প্রবাহ বন্ধ করা হইবে সেই মুহূর্ত্তেই কোমল লৌহে চুম্বকের সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে।

এক্ষণে একটি লৌহদণ্ডকে চুম্বকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত করিতে হইলে দুইটি উপায়ে তাহা করা যায়:—(১) এই লৌহ দণ্ডকে অপর একটি চুম্বক দ্বারা ঘর্ষণ কিংবা (২) এই লৌহদণ্ডের চতুর্দ্দিকে তার জড়াইয়া তাহার মধ্য দিয়া তাড়িত প্রবাহ প্রচলন। দ্বিতীয় উপায়ে একটি লৌহকে চুম্বকে পরিণত করাকে তাড়িতচুম্বককরণ (electro-

magnetise) বলে ; এবং এইরূপে যে কোমল লৌহ চুম্বক হয় তাহাকে "তাড়িত চুম্বক" বা electromagnet বলে। এক্ষণে উপর্যুক্ত ইলেক্ট্রন বলিয়া যে বস্তুর উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা বস্তু বলিলে যে জড় পদার্থ (matter) বুঝি তাহা নহে। জড় পদার্থের বিনাশ নাই কিন্তু এই যে ইলেক্ট্রন ইহার বিনাশ আছে। কথা বাড়াইলেই বাড়ে। আবার এক কথা উঠিল। অনেকেই হয়ত বদ্ধপরিকর হইয়া আমায় তাড়না করিয়া আসিবেন যে জড় পদার্থের বিনাশ নাই ইহা আবার কিরূপ কথা ? একখণ্ড মোম বাতি পুড়াইলে বা কিয়ৎ পরিমাণ বারুদে অগ্নি সঞ্চার করিলে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায়। তাহারা যায় কোথায় ? নষ্ট হয় না ত তাহারা কি হয় ? সুতপ্ত লৌহ কটাহে ফোঁটা কতক জল দিলে চক্ষের নিমিষে তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহা হইলে জলটা গেল কোথায় ? নষ্ট হইল না ত তাহার কি হইল ?" এ কথার মীমাংসা করিতে হইলে ইহা সকলকে জ্ঞাত করা উচিত যে জগতে জড় পদার্থ তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে, যথা :—(১) কঠিন (২) তরল, ও (৩) বাষ্পীয় ; পূর্ব্বোক্ত মোমবাতি ও বারুদ অগ্নি সংযোগে একেবারে অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; কঠিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বায়ু হইতে অক্সিজেন নামক বাষ্পীয় পদার্থটির সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ প্রস্তুত হয় সেই জন্য মোমবাতি পুড়িয়া যাইলে তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি পাত্রে অক্সিজেন পুরিয়া ও একটি মোমবাতি রাখিয়া যদি তাহা ওজন করিয়া দেখা যায়, তাহার পর কোন উপায়ে সে মোমবাতিটিতে অগ্নি সংযোগ করতঃ পাত্রের মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া মোমবাতিটি একেবারে পুড়িয়া যাইলে পাত্রটিকে শীতল করতঃ পুনরায় ওজন করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দুইটি ওজনের কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মোমবাতিটি যদি বাস্তিবকই নষ্ট হইত তাহা হইলে কখনই দুইটি ওজন সমান হইত না।

সেইরূপ বারুদও নষ্ট হয় না ; তবে অগ্নিসংযোগে বাষ্পাকৃতির বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তপ্তকটাহে জল কণা অদৃশ্য হইয়া নষ্ট হয় না, তবে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই জন্য তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে জগতে জড় পদার্থের বিনাশ নাই ; অবস্থা ভেদে ইহা নানাপ্রকার অবস্থায় অবস্থান করে। জড়পদার্থ তাহা হইলে নষ্ট হয় না ; কিন্তু ইলেক্ট্রন নষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইলেক্ট্রন জড়পদার্থ নহে ইহা প্রতিপন্ন হইল, যেহেতু যদি ইহা জড়পদার্থ হইত তাহা হইলে ইহার বিনাশ ঘটিত না।

অনেকে দেখিয়াছেন যে কেহ কেহ চুরুট বা তামাক সেবন কালে ধূম পরিত্যাগ করিবার সময় চক্রাকারে ধূম ত্যাগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই ধূম চক্রের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে জড়পদার্থ যে কিরূপ প্রকারে গঠিত তাহার

কতকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা জানি যে বায়ুর এক অংশের কোন এক প্রকার গতির জন্য এই ধূম চক্র ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ ধূম পরিত্যাগ করিবার কালে ফুৎকার দ্বারা বায়ুতে এক প্রকার গতি প্রদান করা হয় যদ্দারা সেই টুকু বায়ু চক্রাকার হইয়া ধূমকে সমভিব্যহারে লইয়া আশে পাশের বায়ুর ভিতর দিয়া পৃথকভাবে ধাবিত হয়। আশে পাশের বায়ুর সহিত যেন ইহার কোনরূপ সম্পর্ক বা সংস্রবই নাই। এই টুকু বায়ুতে যেন কোন এক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় একটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তুর মত চক্রাকার বায়ু বায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ধাবিত হয়। যদি বায়ু অবিচ্ছিন্ন ও প্রতিবন্ধক শূন্য (continous and frictionless) হইত তাহা হইলে এই চক্রাকার বায়ু ধূম পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিত এবং এই প্রকার অন্যান্য ধূম চক্রকে লইয়া একটি শ্রেণী (system) প্রস্তুত করিত; এবং এই শ্রেণী জড়পদার্থের ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিত। অর্থাৎ সকল জড়পদার্থ যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্মানুলম্বী সেইরূপ ইহারাও সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ জড়পদার্থের মত পরিদৃশ্যমান হইত।

কিন্তু বাস্তবিকই একটা অবিচ্ছিন্ন ও প্রতিবন্ধক শূন্য (continuous and frictionless) মিডিয়াম্ ত (medium) আছে; ইহা ইথার (ether); ইথারের গতি সর্ব্বত্র। কি এক্স্-রে (X-Ray) রূপে, কি আলোকরূপে, কি তাপরূপে, কি তাড়িত রূপে ইহা সকল প্রকার শক্তি (energy) বহন করিয়া থাকে। তাহা হইলে ইলেক্ট্রন ইথারের একটা রূপান্তর বিশেষ এবং যেমন ধূমচক্রের বায়ুতে এবং সাধারণ বায়ুতে কোনও প্রভেদ নাই সেইরূপ ইলেক্ট্রন ও ইথারেও কোন প্রভেদ নাই। যদিও ইলেক্ট্রন ও ইথারে কোনরূপ পার্থক্য নাই তত্রাপি ইথারের মধ্য দিয়া ইলেক্ট্রন একটি পৃথক বস্তুর ন্যায় স্বাধীন ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে "atomic constitution or continuity of matter"—অর্থাৎ পরমাণুর গঠন বা জড়পদার্থের অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে যে একটা বিষম সমস্যা ছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। জড়পদার্থ যে অবিচ্ছিন্ন তাহারও প্রমাণ হইল এবং জড়পদার্থ যে পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহারও প্রমাণ হইল। জড়পদার্থ যে অবিচ্ছিন্ন তাহার প্রমাণ হইল এই জন্য যে ইহারা ইথার হইতেই উৎপন্ন, এবং যখন আমরা জড়পদার্থমাত্র ক্ষুদ্রতম পদার্থবিন্দুর দ্বারা গঠিত এবং এই সকল পদার্থবিন্দু পরস্পরের সহিত পৃথক অবস্থায় অবস্থান করে ইহা বুঝি তখন জড়পদার্থ যে পরমাণু দিয়া গঠিত তাহার প্রমাণ হয়।

তাহা হইলে পরমাণু ও ইলেক্ট্রনের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা প্রয়োজন। যেমন কতকগুলি গ্রহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৌর-জগত হইয়াছে সেইরূপ কতকগুলি ইলেক্ট্রন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হয়। সৌর-জগতে সূর্য্য যেমন কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে তেমনি

পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে পরিবর্ত্তি৩-সম-তড়িৎ (changing positive electricity) অবস্থান করে এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহদল যেমন ভ্রমণ করিয়া থাকে তেমনি এই মধ্যবর্ত্তী তাড়িত পরিবর্ত্তনের (central electric change) চতুর্দ্দিকে বিসম (negative) ইলেক্ট্রন ভ্রমণ করিয়া থাকে।

এইরূপে গঠিত অপরাপর শ্রেণী লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের (Chemical elements) অনেক ধর্ম্ম (properties) সুচারুরূপে বুঝা যায়—অর্থাৎ তাহারা কেন ঘটে এবং কিরূপে ঘটে তাহার একটা অর্থ পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার বি, এ।

শ্বেত-সার।

প্রায় যাবতীয় উদ্ভিদের বর্ণ হরিৎ। বিশেষতঃ পত্রের বর্ণ অধিকাংশ স্থলেই হরিৎ, ক্বচিৎ অন্য বর্ণ বিশিষ্ট পত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রের এই হরিৎ বর্ণ সৃষ্টি-রক্ষায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে. উদ্ভিদের হরিৎ-অংশ একরূপ কণিকার দ্বারা গঠিত। এই কণিকার বর্ণ সবুজ। এই কণিকাগুলিকে সাধারণতঃ পত্র-হরিৎ-কণিকা বলে। পত্র-হরিৎ-কণিকা-সমষ্টি পত্রের উপরিভাগে অর্থাৎ যে অংশে সূর্য্য-কিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, বা যে অংশ সূর্য্য-কিরণ স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয়, সেই অংশেই উৎপন্ন হয় ও সঞ্চিত থাকে। অনেকে দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত উদ্ভিদ "আওতায়" অর্থাৎ ছায়াময় স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত হইয়া উঠে, বৃক্ষের শক্তি অতিক্ষীণ বলিয়া মনে হয় এবং বৃক্ষও অযথা দীর্ঘ হইয়া উঠে। অন্ধকারে বৃক্ষ বর্দ্ধিত করিলে ইহা আরও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষের যে সমস্ত অংশ স্বভাবতঃ সূর্য্যালোক পায় না, যেমন বৃক্ষমূল ইত্যাদি—তাহাদের বর্ণ কিছুতেই হরিৎ হইতে পারে না। আবার যদি কোন বৃক্ষকে গৃহ মধ্যে উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বৃক্ষ আলোকের অভিমুখে ঝুকিয়া পড়ে। গৃহ প্রাচীর পার্শ্বে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে দেখা যায় যে, বৃক্ষ প্রাচীর হইতে দূরে হেলিয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ প্রাচীরের বিপরীত দিকে আলোকের প্রাচুর্য্য থাকে বলিয়া বৃক্ষ আলোক অভিমুখে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ নানা পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ সূর্য্য-কিরণের সহিত বৃক্ষের বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রহিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষের হরিৎ বর্ণের উৎপত্তির সহিতও সূর্য্য কিরণের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে, অথবা সূর্য্য-কিরণ ব্যতীত কিছুতেই বৃক্ষে হরিৎ বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারে না।

উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বৃক্ষ পত্র কারবন ডাইঅক্সাইড নামক এক প্রকার অঙ্গার ও অক্সিজেন ঘটিত গ্যাস গ্রহণ করে। অঙ্গারের ইংরাজী নাম কারবন (carbon) এই শব্দের আদ্য অক্ষর "C" দ্বারা অঙ্গার ও অক্সিজেনের (oxygen) ইংরাজীর শব্দের আদ্য অক্ষর "O" দ্বারা অক্সিজেন সূচিত হইলে কারবন ডাইঅক্সাইড এই গ্যাস, CO_2 এইরূপে সূচিত হয়, অর্থাৎ কারবন ডাইঅক্সাইড এই গ্যাসের প্রত্যেক অণু—১ পরমাণু অঙ্গার ও ২ পরমাণু অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। বৃক্ষপত্র কারবন ডাইঅকসাইড গ্রহণ করে বলিলে এই বুঝায় যে, বৃক্ষপত্র CO_2 গ্রহণ করে। বৃক্ষপত্রস্থ হরিৎকণিকা সূর্য্যালোক সাহায্যে এই CO_2 গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া C অর্থাৎ কারবন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই অঙ্গার নানাবিধ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে কারবোহাইড্রেট অর্থাৎ অঙ্গার-হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থে পরিণত হয়। শ্বেত-সার (starch), শর্করা, সেলুলোজ ইত্যাদি অঙ্গার-হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ, অর্থাৎ পত্রের দ্বারা গৃহিত অঙ্গার অবশেষে শ্বেত-সার, শর্করা, সেলুলোজ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পত্র হরিৎ কণিকা ও সূর্য্যালোক উভয়ে মিলিত হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত CO_2 গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া গৃহীত অঙ্গার হইতে অঙ্গার-হাইড্রোজেনঘটিত পদার্থ উৎপাদন করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই প্রক্রিয়া জীব ও উদ্ভিদ উভয়েরই পরম হিতকর। জীবমাত্রেই বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে এবং এই অক্সিজেন জীবদেহে নানা উপায়ে রূপান্তরিত হইয়া প্রশ্বাস দ্বারা কারবন ডাইঅক্সাইড রূপে বহির্গত হয়। সেই জন্য জীবের পক্ষে কারবন ডাইঅক্সাইড অপকারী। যদি এই অপকারী গ্যাস বিনষ্ট হইবার উপায় না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী এতদিনে জীবশূন্য হইত। কিন্তু বৃক্ষাদি, জীবের পক্ষে এই বিষম অপকারী গ্যাস গ্রহণ করিয়া সূর্য্যালোক সাহায্যে তাহার, জীবের পরম হিতকর উপাদান অক্সিজেন অংশ পরিত্যাগ করে। এইরূপে জগতে এই দুই গ্যাসের সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া আসিতেছে।

সূর্য্য মহাশক্তিময়, তাহার শক্তি কিরণ-বাহিত হইয়া পত্রে পতিত হইলে পত্র সেই শক্তি শোষণ করে। সেই শক্তি আবার পত্রোৎপাদিত পদার্থে অর্থাৎ শ্বেত-সার, শর্করা ইত্যাদিতে প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি-সম্পন্ন শ্বেত-সার ভক্ষণ করিয়া মানব বা জীবমণ্ডলি শক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব বৃক্ষাদি মানবের শক্তি অব্যাহত রাখিতে একান্ত প্রয়োজনীয়; অথবা আধুনিক সভ্যতা, মানবের কর্ম্মকুশলতা, শিল্প-চাতুর্য্য ইত্যাদির মূল—উদ্ভিদ। দেখা যাইতেছে যে, মানবের এই শক্তি, অর্থাৎ মানবত্ব—বৃক্ষপত্র সূর্য্য হইতে গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং সময় মত উপযুক্ত উপায়ে এবং উপযুক্তরূপে আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদিগের শক্তি

সঞ্চারিত করে। সূর্য্যের এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজে সঞ্চিত আছে। এই সেলুলোজ কেহই সহসা নষ্ট করে না। কাজেই বৃক্ষ মধ্যে বা পাথুরিয়া কয়লায় সেলুলোজ রাশি রাশি সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্বেত-সার বা ষ্টার্চ্চ (starch) উৎপাদিত হইবার পরে, হয় বৃক্ষ স্বয়ং অথবা অন্যান্য মানবাদি জীব খাইয়া ফেলে, সেই জন্য শ্বেত-সার প্রকৃতিতে সঞ্চিত হইতে পায় না।

এই শ্বেত-সার প্রাণ-বিজ্ঞানে (biology) বিশেষতঃ জীব বিজ্ঞানে (zoology) বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু, এবং ইহা লইয়া পণ্ডিতগণ গভীর গবেষণা করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রথায় শ্বেত-সার উৎপন্ন হয় বা যে সমস্ত কারখানায় মানবের ব্যবহারোপযোগী শ্বেত-সার প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত প্রথা বা কারখানা জগতের পরম হিতকর আমরা এ প্রবন্ধে এতৎ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিব না। ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব যতদূর সম্ভব সঙ্কলন করা যাইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পত্র-হরিৎ-কণিকা আলোক-সাহায্যে শ্বেত-সার উৎপাদন করে। এতৎ সম্বন্ধে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিকগণের কিরূপ ধারণা ছিল, তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ "আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ" (Photo-synthesis) ইহার অর্থ কি জানা আবশ্যক। এই কথাটি এই প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইবে। "আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ" এই কথায় ইহাই বুঝায় যে, যে সমস্ত পত্রে বা বৃক্ষে হরিৎ-কণিকা থাকে, তাহারা আলোকের শক্তির সাহায্যে শোষিত কারবন ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাসকে ও উদ্ভিদস্থিত স্বাভাবিক জলকে এরূপে রাসায়নিক সম্মিলিত করে যে জল ও গ্যাস মিলিত হইয়া শর্করা ও অক্সিজেন উৎপাদিত হয় অর্থাৎ

কারবন ডাইঅক্সাইড + জল + সূর্য্যালোক
= শর্করা + অক্সিজেন।
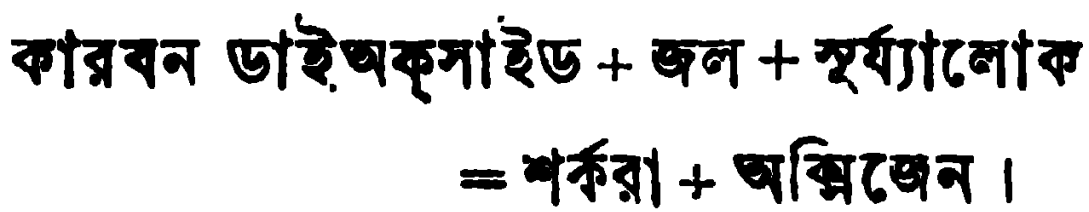
এই শর্করা পরে বৃক্ষের মধ্যে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্‌বোহাইড্রেট বা অঙ্গার-হাইড্রোজেন-ঘটিত পদার্থে অথবা মাখন-জাতীয় (fat) বা নাইট্রোজেন ঘটিত (proteins) পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। এই নৈসর্গিক ব্যাপারকে এখনও "অঙ্গারশোষণ" বা carbon assimilation বলে। অঙ্গার-শোষণ এই শব্দের দ্বারা বৃক্ষে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যে সমস্ত বৃক্ষের বর্ণ হরিৎ বা যে সমস্ত বৃক্ষে হরিৎ পত্র থাকে, অঙ্গারশোষণে তাহাদের ক্রিয়া বা তাহার সহিত আলোকের ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সমস্ত বৃক্ষেই অঙ্গার শোষণ করে। ছত্রক (ব্যাঙের ছাতা—mushroom) জাতীয় উদ্ভিদও অঙ্গার শোষণ না করিলে জীবিত থাকিতে পারে না। অনেক পরগাছা (parasite) আদৌ

হরিৎ নহে। এই সমস্ত অ-হরিৎ-উদ্ভিদ অন্যত্র উৎপাদিত শোষণ-উপযোগী অঙ্গার গ্রহণ করিয়া নিজেদের পুষ্টি সাধন করে। কাজেই "আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ" এই কথার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অঙ্গার শোষণ প্রথায় মূলতঃ আলোক প্রয়োজন।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ মাত্রেই মহামতি প্রিষ্টলের নাম অবগত আছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কোনও সময়ে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোন বদ্ধ বায়ুতে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিয়া লইবার পর সেই বদ্ধ-বায়ুতে বৃক্ষ স্থাপন করিলে বৃক্ষ বেশ জীবিত থাকে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মানবের শ্বাস-প্রশ্বাস-দূষিত বায়ুতেও বৃক্ষ বেশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্ত্তিকা দগ্ধ বায়ু বা শ্বাস-প্রশ্বাস দূষিত বায়ুতে মানব বা জীব কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, বদ্ধ বর্ত্তিকা-দগ্ধ-বায়ুতে বৃক্ষ কিয়ৎ দিন রাখিবার পরে, তাহাতে পুনরায় বর্ত্তিকা দগ্ধ করা যাইতে পারে। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"Accordingly on the 17th of August, 1771, I put a sprig of mint into a quantity of air in which a wax candle has burned out, and found out that on the 27th of the same month, another candle burnt perfectly well in it. This experiment I repeated without the least variation in the event, not less than eight or ten times in the remainder of the summer."

যাঁহারা সামান্য রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে অক্সিজেন গ্যাস ব্যতীত কোন পদার্থ জ্বলিতে পারে না। বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে, কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, কোন কিছু দগ্ধ হইতেছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উক্ত পদার্থের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইতেছে। পদার্থের দহন অর্থেই—অক্সিজেনের সহিত সম্মিলন বুঝায়। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন রহিয়াছে; সেই জন্যই বায়ুমণ্ডলে কোন দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হয় *।

---

* অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলেই দহন কার্য্য চলিতে থাকে। দহন হইলেই আলোক উদ্ভূত হয় না। এত মৃদু দহন কার্য্য চলিতে পারে যে তাহা আমরা কোনরূপেই বুঝিতে পারি না। আবার আলোক উৎপাদিত হইলেই দহন ক্রিয়া অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত সম্মিলন ক্রিয়া নাও হইতে পারে। কোন পদার্থ প্রচুর উত্তপ্ত হইলে আলোক বিতরণ করে। লৌহখণ্ড উত্তাপে শুভ্র হইয়া আলোক প্রদান করে। এস্থলে দহন ক্রিয়া নাও চলিতে পারে। তড়িৎ আলোকের কল্প হইতে বায়ু নিস্কাশিত করিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গার সূত্র বা ধাতব সূত্র প্রচণ্ড উত্তাপে শুভ্র আলোক প্রদান করে, এস্থলে সূত্র দগ্ধ হয় না।

অতএব প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে যে, অক্সিজেন, দহনের প্রধান সহায়। আমরা অক্সিজেন শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি,—ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে দহন কার্য্য চলিতেছে। এই দহন জন্যই শরীরের উত্তাপ পরিদৃষ্ট হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, দহন কার্য্যে যে দুইটি পদার্থ প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ অক্সিজেন এবং দাহ্য বস্তু, তাহাদের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় কিনা। যে পদার্থ দগ্ধ হয় ও অক্সিজেন উভয়েরই পরিবর্ত্তন হয়। দাহ্য বস্তু ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া একটা অক্সাইড্ উৎপাদন করে। যে পদার্থ দগ্ধ হয় তাহার নামানুসারে এই অক্সাইড নাম হইয়া থাকে। যদি লৌহ-অক্সিজেনে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে দহন কার্য্য সম্পন্ন হইবার পরে উৎপাদিত পদার্থের নাম লৌহ-অক্সাইড, সেইরূপ পারদ-অক্সাইড ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া পদার্থের অক্সাইড উৎপাদন করে।

আমাদের খাদ্য দ্রব্যের মূল উপাদান অঙ্গার-ঘটিত পদার্থ। খাদ্যই শোণিতের মূল, অর্থাৎ শোণিতের প্রধান উপাদান অঙ্গার। অক্সিজেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিতকে শোধিত করে, অর্থাৎ অঙ্গারের সহিত মিলিত হয়। এই অঙ্গার ও অক্সিজেনের মিলনে অঙ্গার অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহাকে রাসায়নিক কারণবশতঃ কারবন (অঙ্গার) ডাই-আক্সাইড বলে। অতএব মানব অর্থাৎ জীবাদি অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কারবন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। বর্ত্তিকার মূল এবং প্রধান উপাদান অঙ্গার-ঘটিত পদার্থ। বর্ত্তিকা দগ্ধ হইলে অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে কারবন ডাইঅক্সাইড উৎপাদিত হয়। কারবন ডাইঅক্সাইড একরূপ বায়বীয় পদার্থ।

অক্সিজেন যেরূপ দহনের অনুকূল, কারবন ডাইঅক্সাইড সেইরূপ দহনের প্রতিকূল। কারবন ডাইঅক্সাইডে কিছুতেই পদার্থ দগ্ধ হইতে পারে না। ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবসায়িগণ আজ কাল অনেক স্থলে অগ্নিকাণ্ড নিবারণ জন্য যে সমস্ত পদার্থ প্রযুক্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কারবন ডাইঅক্সাইড অন্যতম—কোন একটি যন্ত্র মধ্যে এরূপ ভাবে নানাবিধ পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়া রাখা হয় যে, এই যন্ত্র উপযুক্তরূপে অগ্নিকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই পদার্থগুলি মিশ্রিত হয় এবং কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হইতে থাকে, ফলে অগ্নিকাণ্ড নিবারিত হয়. এতৎব্যাপার "বিজ্ঞানে" পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যাহাহউক কারবন ডাইঅক্সাইড দহনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

কোন আধারস্থ বদ্ধ বায়ুতে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিলে, বদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন নিঃশেষ হইলেই বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হয়। বায়ুতে যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে

দহন সাধক উপাদান অর্থাৎ অক্সিজেন নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতেই বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে। বায়ুর অবশিষ্ট দহন-প্রতিকূল উপাদানের মধ্যে কারবন ডাইঅক্সাইড অন্যতম। এক্ষণে এই দহনপ্রতিকূল দশাবিশিষ্ট বায়ুতে হরিৎপত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ প্রবিষ্ট করাইলে এবং তাহাকে আলোক বা রৌদ্রে রক্ষা করিলে, বৃক্ষ কারবন ডাইঅক্সাইড শোষণ করিয়া পত্র হরিৎ কণা ও আলোক সাহায্যে এই গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করে এবং কারবন অর্থাৎ অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এক্ষণে যদি এই বদ্ধ বায়ু হইতে বৃক্ষ অপসারিত করিয়া জলন্ত বার্ত্তিকা প্রবিষ্ট করান হয়, তাহা হইলে বর্ত্তিকা জ্বলিতে থাকে, সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রিষ্টলি যাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সত্য এবং ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, বৃক্ষ হরিৎপত্র-সাহায্যে কারবন ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কারবন অর্থাৎ অঙ্গার গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।

১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ইঙ্গেনহাউস নামক আর একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে, দূষিত বায়ু বৃক্ষাদির দ্বারা বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সূর্য্যালোক অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে মহামতি সেনেবির দেখাইলেন যে, জল, মৃত্তিকা, সার, ইত্যাদিতে যে পরিমাণ কারবন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত থাকে তাহার কারবন অর্থাৎ অঙ্গার বৃক্ষের দেহ গঠনের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে। ইহা অপেক্ষা বহুপরিমাণ অঙ্গার বৃক্ষের প্রয়োজনীয়। এই অঙ্গার, বৃক্ষ বায়ুমণ্ডলস্থিত কারবন ডাইঅক্সাইড হইতে গ্রহণ করে। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে শাশুর প্রমাণ করিলেন যে, বৃক্ষের কারবন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন পরিত্যাগের মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অনুপাতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। "আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণের" ইহাই যৎ সমান্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

এক্ষণে কি উপায়ে শ্বেত-সার (starch) উৎপাদিত হয়, তাহাই দেখা যাউক। যদি কোন জলজ উদ্ভিদ আলোক রশ্মি প্রাপ্ত হয় এবং উদ্ভিদের বর্ণ হরিৎ হয়, তাহা হইলে "আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ" বশতঃ অক্সিজেন গ্যাসের বুদ্বুদ উঠা উচিত। বস্তুতঃ যে সমস্ত পুষ্করিণীতে জলজ হরিৎ উদ্ভিদ থাকে, সেই সমস্ত পুষ্করিণীতে প্রখর রৌদ্রের সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদের পত্র হইতে বুদ্বুদ স্রোত ভাসিয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় বড় বড় চৌবাচ্চায় "গাঁজ" ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ উৎপাদন করিয়া অনায়াসে এই নৈসর্গিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই বুদ্বুদে কি গ্যাস থাকে? রাসায়নিকগণ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা প্রায় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়টি বুদ্বুদ উত্থিত হয় তাহা গণনা করিয়া "আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণের" মাত্রা স্থির করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, বৃক্ষাদি যত

আয়তন কারবন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, ঠিক তত আয়তন অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। যদি এই সমস্ত জলীয় বৃক্ষাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণ মিশ্রিত জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে জলের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এই সমস্ত বর্ণকে অন্য প্রথায় অক্সিডাইজ্ করিলে তাহাদের যেরূপ পরির্ত্তন হয়, এক্ষেত্রেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এঙ্গলম্যান একরূপ ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা হরিৎ উদ্ভিদের অক্সিজেন উৎপাদন প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বায়ু-প্রবেশ-পথরুদ্ধ এরূপ কোন পাত্রে জীবিত শৈবাল রক্ষা করিলেন, পরে তাহাতে এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া প্রবিষ্ট করাইলেন। এই ব্যাক্‌টিরিয়া অক্সিজেন পাইলেই চঞ্চল হইয়া উঠে, অন্যথা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এক্ষণে ব্যাক্‌টিরিয়া ও শৈবাল বদ্ধ পাত্র আলোকে রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, ব্যাক্‌টিরিয়া গুলি চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং যে সমস্ত শৈবাল আলোক পাইতে থাকে তাহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হয়। আলোক পায় বলিয়া সেই সমস্ত শৈবাল অক্‌সিজেন পরিত্যাগ করিতে থাকে, কাজেই ব্যাক্‌টিরিয়া তৎসান্নিধ্যে আকৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে যে পত্রহরিৎ-কণিকার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কণিকার দ্বারাই কারবন ডাইঅক্‌সাইড গ্যাস বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয় এবং রক্ষিত অঙ্গার দ্বারা শর্করা উৎপাদিত হয়। এই হরিৎ-কণিকা সমষ্টি জীবিত হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে আলোক তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়। শুভ্র আলোক রশ্মি সাতবর্ণের ৭টি আলোক রশ্মির সম্মিলনে গঠিত এই বিভিন্ন বর্ণের ৭টি আলোকের প্রবাহ বা গতি বিভিন্ন অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের আলোকরশ্মির তরঙ্গ বিভিন্ন—কাহারও হ্রস্ব, কাহারও বা দীর্ঘ। কারবন ডাইঅক্সাইড হইতে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য শুভ্র আলোকের ৭টি বিভিন্ন বর্ণের আলোক-উপাদান আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ এই বিশ্লেষণে উপযুক্ত তরঙ্গযুক্ত আলোকের প্রয়োজন। অতএব "আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ" রীতিমত পরিচালিত হইবার জন্য—জীবিত পত্র হরিৎকণিকা সমষ্টি, প্রচুর কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, উপযুক্ত তরঙ্গযুক্ত আলোক রশ্মি উপযুক্ত তাপমাত্রা এবং উপযুক্ত পরিমাণে জল আবশ্যক। আলোক সূর্য্য বিতরণ করে, হরিৎকণিকা পত্রের নিজস্ব বস্তু, কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডল প্রদান করে, উপযুক্ত তাপমাত্রাও সূর্য্য হইতে বিতরিত হয় এক্ষণে পত্র কিরূপে জল পাইতে পারে দেখা যাউক। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বৃক্ষে জল চলাচলের নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণটি প্রধান। অতি শিশু-উদ্ভিদের পত্রমুকুল বিকশিত হইবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে জল প্রায় শিশুর আকণ্ঠ পূর্ণ থাকে। পত্রমুকুল বিকশিত হইয়া বিস্ফারিত হইবামাত্র পত্রের সহস্র ছিদ্র দিয়া জল বাষ্পীভূত হইতে থাকে। আমাদের শরীরে যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোমকূপ আছে, সেইরূপ বৃক্ষের পত্র সমষ্টিতেও লক্ষ লক্ষ

ছিদ্র আছে। আমাদের লোমকূপ হইতে যেরূপ ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া বাষ্পীভূত হয়, বৃক্ষেরও পত্রছিদ্র হইতে জল নিঃসৃত হইয়া বাষ্পীভূত হয়। পত্র ছিদ্র দিয়া জল বাষ্পীভূত হইলেই, ছিদ্রের অব্যবহিত নিম্নস্তরের জলে একটা "টান" পড়ে, সেই "টানে" জল পুনরায় ছিদ্র মুখে আগমন করে। এইরূপে একটা "টান" প্রকাণ্ড শাখা, প্রশাখা বাহিয়া পরিচালিত হয়। এই "টানের" শক্তিতে একটা ঊর্দ্ধগামী জল-স্রোত ক্রমাগত মূল হইতে পরিচালিত হইতে থাকে। মূল, মৃত্তিকা হইতে জল সংগ্রহ করে। মৃত্তিকায় জলের অভাব হইলে বৃক্ষ মরিয়া যায়। এই জল স্রোতকে "বাষ্পীভূত-জলোদ্গম-স্রোত" বা transpiration current বলে। এক্ষণে বৃক্ষের শীর্ষ-পত্রেও কিরূপে জল যাওয়া সম্ভব তাহা বোধগম্য হইল। বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সর্ব্বদা আছে। বর্ত্তমান প্রতি ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ৩৪ ভাগ মাত্র কারবন ডাইঅক্সাইড থাকে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, বৃক্ষের অতি প্রয়োজনীয় এই গ্যাস অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু বৃক্ষ শাখা ও প্রশাখা বিস্তার করিয়া অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান থাকে। তদ্ব্যতীত বৃক্ষের পত্র এরূপ ভাবে বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে যে, প্রত্যেক পত্রই আলোক সংস্পর্শে আসিতে পারে। প্রথমতঃ দেখিলে মনে হয়, বুঝি পত্র বিন্যাসে বুঝি কোন নিয়ম নাই। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পত্র নানাবিধ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এরূপে বিন্যস্ত আছে যে পত্রের ভার বৃক্ষের সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে, প্রতি পত্র আলোক রশ্মি সংস্পর্শে আগমন করিতে পারে, এবং পত্রের মধ্যে প্রচুর বায়ু চলাচল করিতে পারে। পত্র বিন্যাস সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কাজেই কারবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে অত্যল্প হইলেও বৃক্ষ অনেকটা স্থান শাখা প্রশাখা দ্বারা অধিকার করে বলিয়া, অনায়াসে অনেক পরিমাণ কারবন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিতে পারে। তদ্ব্যতীত এক একটি পত্রে সহস্র সহস্র রন্ধ্র রহিয়াছে, কাজেই অনেক পরিমাণ গ্যাস একবারে প্রবেশ করিতে পারে। তথাপি পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে যতটুকু কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বর্ত্তমান আছে, তদপেক্ষা আরও দশ গুণ বর্দ্ধিত হইলে বৃক্ষাদির পক্ষে কোনরূপ অনিষ্টকর হইত না। প্রতিদিন কোটী কোটী মণ কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জীবাদির শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা, জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থাদির দহন ও পচন দ্বারা বায়ুমণ্ডলে আসিয়া পড়িতেছে; এই যাবতীয় গ্যাস বৃক্ষাদি গ্রহণ করিয়া বায়ুমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত বিশোধিত করিতেছে—প্রাণ-সংস্থিতির হেতু অক্সিজেন-পরিমাণ অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিতেছে, এবং কারবন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে দিতেছে না। বায়ু-প্রবাহ এক স্থানের সঞ্চিত কারবন ডাইঅক্সাইড বা অক্সিজেন গ্যাসকে ছড়াইয়া ফেলিয়া প্রতি স্থানের অনুপাত সমান করিয়া দিতেছে। সেইরূপ

জলস্রোত ও দ্রবীভূত কারবন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া জলের সর্ব্বত্র গ্যাস পরিমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভূস্তরের বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। যে যুগে পাথুরিয়া কয়লা উৎপাদক বৃক্ষাদি পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল, সেই যুগকে অঙ্গার উৎপাদক বা কারবনিফেরাস (carboniſeous) যুগ বলে। এই সময়ে ভূপৃষ্ঠে প্রচুর জল ছিল, বায়ুমণ্ডলে অত্যধিক কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছিল, ফলে বৃক্ষাদিরও অতিশয় বাহুল্য ছিল, তখন বৃক্ষাদি অতিশয় দীর্ঘ হইত। আজকাল যে ফার্ণ বৃক্ষ ৫।৬ হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না, তখন সেই ফার্ণ গাছই শত শত ফিট দীর্ঘ হইত। তখন পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, তাহার চিহ্ন পৃথিবীর যাবতীয় কয়লার খনিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

খাদ্যের পরিপাক ও তাহার পরিণতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লালা।

চলিত ভাষায় যাহাকে আমরা থুথু বলিয়া থাকি বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহার নাম লালা। মুখ গহ্বরের কতকগুলি গ্রন্থি (gland) হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহাই লালা। Moore সাহেব বলেন, The saliva is a mixture in varying proportions of the diferent salivary glands.

মুখগহ্বরে প্রধানতঃ তিনটি লালা গ্রন্থি আছে; প্রত্যেক গ্রন্থিরই একটি করিয়া প্রণালী বা নল আছে; এই প্রণালী দিয়া গ্রন্থি নিসৃত রস মুখ গহ্বরে আসিয়া পড়ে। মুখের গহ্বরে আসিয়া এই রসগুলি মিশ্রিত হইলে আমরা লালা বলিয়া থাকি। প্রত্যেক গ্রন্থি নিঃসৃত রসের গুণাগুণের যথেষ্ট তারতম্য আছে। কাজেই প্রত্যেকটি পৃথকভাবে আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত।

Submaxiallary saliva বা হনুগ্রন্থি লালা:—সাধারণতঃ আমরা গলায় "বিচি" হইয়াছে বলিয়া যাহা দেখাই সেইটাই এই হনুগ্রন্থি। ভবিষ্যতে যখন গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে তখন ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। এক্ষণে আমাদের কার্য্যের জন্য একটু জানা দরকার যে হনুগ্রন্থি বলিয়া একটা গ্রন্থি গল দেশে আছে আর এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসবাহী প্রণালীর নাম Wharton's duct এই প্রণালীর মুখ "কস দাঁতের" পার্শ্বে অবস্থিত। হনুগ্রন্থি লালা পাইতে

হইলে এই Wharton's ductএর মধ্যে কাচের সুক্ষ নল (glass canula) দিয়া একটি পাত্রে রস সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময় জীহ্বাগ্রন্থি (Sublingual gland) নিঃসৃত রস এই Wharton's duct দিয়া আইসে সে ক্ষেত্রে আমরা মিশ্রিত লালাই পাইয়া থাকি আর কাজে কাজেই ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করা অসম্ভব। তবে এরূপ ক্ষেত্রে জীহ্বা কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া কাচের নলটি এক ইঞ্চ পরিমিত ঠেলিয়া দিলে আর জীহ্বাগ্রন্থির রস আসা সম্ভবপর নহে।

মানুষের হনুগ্রন্থি নিঃসৃত লালা স্বচ্ছ তরল জলীয় পদার্থ। তবে কিছুক্ষণ বায়ু সংযোগে থাকিলে ইহার আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন মধ্যে মধ্যে একটু আধটু চাপ বা flocculi বাঁধে তখন আর তত স্বচ্ছ থাকে না। সাধারণতঃ litmus কাগজের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ইহা ক্ষার প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অগ্নির সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে একটু "ঘোলাটে" হয়ে তাহাতে অম্ল সংযোগ করিলে আর অধিক ঘোলাটে হয়। এই লালার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০০২৬ হইতে ১·০০৩৩ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা ০·৩৬—০·৪৬ পর্য্যন্ত কঠিন পদার্থ (Solid) থাকে। খাদ্যের বিভিন্নতায় জলীয় অংশের অনেক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে কিন্তু কঠিন পদার্থের কোনও তারতম্যই ঘটে না। Eckhard বলেন ইহাতে অল্প মাত্রায় Sulphocyanates নামক পদার্থ সেই আবার Oehl ও Sertoliর মতে ইহাতে কর্ণ গ্রন্থি অপেক্ষা কম Sulphocyanates আছে। Calorimeter নামক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হনুগ্রন্থিতে শত করা ০·০০৪ আর কর্ণ গ্রন্থিতে শত করা ০·০৩ Sulphocyanates আছে। ইহাতে ptyalin আছে।

PTYALIN.

এতগুলি দ্রব্যের মধ্যে ptyalin নামক দ্রব্যটিই অত্যাধিক আবশ্যকীয়। এই ptyalin একটি enzyme। পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা enzyme সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষেত্রে পাঠকদের অবগতির জন্য এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে enzymeএর গুণ এই যে নিজের কোন বিকৃত না ঘটিলেও ইহা অপরাপর দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে তাহাদিগকে অতি সহজে বিশ্লিষ্ট করে। অর্থাৎ ptyalin যখন কোন শ্বেতসার দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয় তখন শ্বেতসারের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে তখন এই অদ্রবণীয় শ্বেতসার দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত হয় কিন্তু ptyalinএর কোনও বিকৃতি ঘটে না।

তৃণ ও গুল্মভোজী জন্তুদের লালাতেই ptyalin অত্যধিক থাকে। মৎসের ও Cetacea ভুক্ত জন্তুদের সামান্য মাত্র ptyalin থাকে কতকগুলি জন্তুর লালাতে একেবারেই ptyalin থাকে না। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুদের লালায় এই

ptyalin নাই। এক্ষেত্রে ptyalinএর আবশ্যকতা নাই বলিয়াই বোধ হয় এই দ্রব্য পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ptyalinএর প্রধান কার্য্য শ্বেতসার (carbohydrate) জাতীয় অদ্রবণীয় খাদ্য হইতে দ্রবণীয় শর্করা করা মাংসাসী জন্তুরা একেবারে শ্বেতসার খায় না বলিলেই হয় কাজেই তাহাদের ptyalinএর আবশ্যকতা নাই। মানুষের কিন্তু হনু ও কর্ণ উভয় গ্রন্থিতেই এই ptyalin বর্ত্তমান কাজেই ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে মানুষ কেবল মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। জন্মিলেই কর্ণ গ্রন্থিতে ptyalin বর্ত্তমান থাকে তবে দুই মাস অবধি হনুগ্রন্থিতে কোনও চিহ্নই থাকে না। ঘোড়ার হনুগ্রন্থি হইতে যে লালা বহির্গত হয় তাহা zymogen অবস্থায় বহির্গত হয়। ইহার সহিত সুরাসার মিশাইলে বা বায়ুতে কিয়ৎক্ষণ থাকিলে তবে ptyalinএ পরিণত হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জগৎবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক Mialhe প্রথমে এই ptyalin সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি absolute alcohol দিয়া লালা হইতে ptyalinকে পৃথক করেন। এইরূপে লালাতে সুরা মিশ্রিত হইলে লালার অম্লসার অংশ জমিয়া তলে অধঃনিক্ষিপ্ত এবং তৎসঙ্গে এই ptyalin ও অধঃ নিক্ষিপ্ত হয়। Mialhe প্রথমে প্রমাণ করিলে যে এই অধঃনিক্ষিপ্ত দ্রব্য strong alcoholএ অদ্রবণীয় হইলে ও Weak alcohol ইহা অতি সহজেই দ্রবণীয় এবং তখন ইহার সহিত শ্বেত-সার জাতীয় দ্রব্য মিশাইলে ইহা দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত হয়। তিনি ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে লালাতে যে দ্রব্যের জন্য অদ্রবণীয় শ্বেত-সারের বিকৃতি ঘটে ইহাতে অর্থাৎ এই অধঃনিক্ষিপ্ত দ্রব্যও সেই দ্রব্য আছে। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিলেন যে ইহার সহিত maltএর diastaseএর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে সে কারণে তিনি ইহার "diastase animal ou salivaire" নাম করণ করিলেন।

কিন্তু এক্ষণে নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে malt diastase ও ptyalin এর কার্য্যকারিতা একইরূপ হইলেও তাহারা দুইটি আলাদা পদার্থ। তাপের তারতম্যে ইহাদের কার্য্য কারিতার যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। Robert প্রমাণ করিলেন যে লালার সর্ব্বাধিক কার্য্য কারিতা ৩০° হইতে ৪৫°C উত্তাপের মধ্যে আবার Kjeldahlএর মত যে ইহার সর্ব্বাধিক কার্য্যকারি—উত্তাপ (optimum temperature) ৪৬°C. তাহার পর উত্তাপ বাড়াইলে ইহার কার্য্য কারিতার যথেষ্ট হ্রাস হয় এবং প্রায় ৬৫° হইতে ৭০° ডিগ্রি উত্তাপে ইহা একেবারে লোপ পায় এবং নষ্ট হইয়া যায়। Kuhne বলেন যে ৬০° ডিগ্রি উত্তাপেই ইহার কার্য্য কারিতার লোপ ঘটিয়া থাকে। অপর পক্ষে Chittendon ও Martin বলেন ৫০° হইতে ৫৬° ডিগ্রিতেই malt diastaseএর কার্য্য কারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (optimum temperature) আর ৬০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না কিন্তু ৮০° ডিগ্রি উত্তাপে একেবারে

নষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া malt diastase কেবল মাত্র শত করা ·০৫ ভাগ salicy—lic acidএ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু ptyalinএ অন্ততঃ শতকরা ·১ ভাগ না দিলে কার্য্যের কোনও ব্যাঘাতই ঘটে না আর শতকরা ১ ভাগ দিলে কার্য্য লোপ পায়। কাজেই দেখা যাইতেছে অস্পষ্ট দৃষ্টিতে যদিও diastase of malt ও ptyalin এর কার্য্য কারিতা এক হইলে ইহা বাস্তবিকই দুইটি ভিন্ন পদার্থ।

Malt diastase ও ptyalinএ পার্থক্য থাকিলেও amylopsin ও ptyalinএর মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই বুঝিতে হইবে। amylopsinকে অনেক বৈজ্ঞানিক pty-alin নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আবার কাহার ও কাহারও মতে এই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে amylopsinএর কার্য্যকারিতা অত্যধিক। Ptyalin সাহায্যে অদ্রবণীয় শ্বেত-সার দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত হইতে অনেক সময় লাগে কিন্তু amylopsinএর দ্বারা অতিশীঘ্র ও অতি সহজে এই বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া amylopsin দ্বারা লব্ধ শর্করা একটু পৃথক। কিন্তু আর একটা এই যে দুইটির ঘনত্ব হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। amylopsin অনেকের মতে বেশী ঘন (concentrated)। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে malt diastaseএর সহিত ptyalin তাপের তারতম্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়া থাকে কিন্তু amylopsin ও ptyalin সে পার্থক্য আদৌ লক্ষিত হয় না। যথেষ্ট লালার সংমিশ্রণেই অতি অল্প মাত্রই dextrose হয় কিন্তু অল্প মাত্র amylopsin দ্বারা অতি সহজে শ্বেত-সার হইতে অধিক পরিমাণে dextrose উৎপন্ন হয়। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকগণ বলেন This is a difference in degree and not in kind, and may well be due to a difference in concentration of enzyme.*

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে Cohnhiem আরও বিশুদ্ধ ptyalin প্রাপ্ত হইবার প্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি লালায় প্রথমে Phosphoric acid ও চুনের জল দ্বারা tricalcic phosphate অধঃ নিক্ষিপ্ত করেন। তাহা ছাড়া ইহাতে ptyalin ও protied অধঃ-নিক্ষিপ্ত হয়। পরে পরিস্রুত জলের সাহায্যে অতি সহজেই ptyalinকে দ্রবণীয় করিয়া লওয়া যায়।

এই প্রকারে লব্ধ ptyalinকে অতি সহজেই diastatic কার্য্য কারিও দেখা যায় অর্থাৎ অদ্রবণীয় শ্বেত-সারকে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করে। কিন্তু ইহাতে protied কোনও কোনও চিহ্নই থাকে না। সিদ্ধ করিলে জমাট বাঁধিয়া অধঃনিক্ষিপ্ত হয় না nitric acid, murcuric cholride, tannic acid, potassium ferrocyanide দ্বারা কোন প্রকার বিকার ঘটে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে protied থাকে না। কিন্তু ইহা-তেও ptyalinএ chlorides, phosphates প্রভৃতি থাকিয়া যায়। অধিক মাত্রায় সুরা

* Schafers Text Book of Physiology.

সার দিয়া পেঁজা তুলার ন্যায় phosphate অধঃনিক্ষিপ্ত হয়। এই দ্রব্যকে অল্প উত্তাপে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে বহুকাল ইহার কার্য্যকারী শক্তি থাকে। আবশ্যকমত এই শুষ্ক দ্রব্যকে জল গুলিয়া লইলেই কার্য্য চলিতে পারে।

Wittich লালা গ্রন্থিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল Glycerineএ ভিজাইয়া পরে পেষণ করিয়া যে রস পাওয়া যায় তাহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে ptyalin থাকে। পরে Strong alcohol দ্বারা অম্লসার জাতীয় দ্রব্যকে অধঃনিক্ষিপ্ত করিয়া পরিস্রুত জলে ধৌত করিয়া লইলেই বিশুদ্ধ অবস্থায় ptyalin প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রমশঃ

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ।

আদিম মানবের ভাস্কর্য্য।—আমরা বহুগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে আদিম মানব পর্ব্বত গাত্রে চিত্র অঙ্কন করিত। কিন্তু অধ্যাপক ক্যাপিটন (capitan) ফরাসী রাজ্যের আরাইজি জেলায় সম্প্রতি আদিম মানবের ভাস্কর্য্য চাতুর্য্যের নিদর্শন পাইয়াছেন। তিনি তথায় দুইটি বন্য মহিষের কর্দ্দম নির্ম্মিত মস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মস্তক অন্ততঃ ৩০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

ত্যক্ত ময়লার সদ্ব্যবহার।—ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্ব বিষয়ে চেষ্টা এই যে কিরূপে সমস্ত জিনিসের সদ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে বটে যে "যাকে রাখ সেই রাখে" কিন্তু সেই নিয়মানুসারী কার্য্য খুব কমই হইয়া থাকে। সম্প্রতি প্যারি নগরের যাবতীয় ময়লা কিরূপে আবশ্যকীয় ব্যবহার দ্রব্যে পরিণত করা হইতেছে তাহার আভাষ দেওয়া যাউক। পূর্ব্বে ময়লা লইয়া গিয়া সমুদ্র-বক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজ কাল ইহাকে electric furnaceএর সাহায্যে ১০০০° উত্তাপে পুড়ান হইতেছে। পুড়াইয়া যাহা slag অবশিষ্ট থাকে তাহা চুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইট প্রস্তুত করা হয়। এরূপে প্রস্তুত ইট খুব মজবুত হয়। আর পুড়াইবার সময় যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতেই ফল ফলিয়া থাকে তাহা ছাড়া এরূপ উৎপন্ন energy বা শক্তি অন্য কার্য্যে ও লাগান হয়। প্যারিতে ৯টা ফলে ২৬০০ টন ময়লা পুড়ান হইত কিন্তু সম্প্রতি দুইটি মাত্রতে ৯০০ টন করিয়া প্রত্যহ পুড়ান হইতেছে। ইহাকেই বলে বুদ্ধি।

৩য় বর্ষ।) জুলাই, ১৯১৪। (৭ম সংখ্যা।

আলোক।*

(ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আলোকের প্রতিফলন, দিক্‌পরিবর্ত্তন, ডিফ্রাক্‌শন, পাতলাস্তরের বর্ণ-প্রকরণ, এমন কি পোলারিজেশন ইত্যাদির সম্যক ব্যাখ্যা করিবার জন্য আলোকের কণিকা-মূলক উপপত্তি ব্যবহার করিতে যাইয়া নিউটন যে সমস্ত অভাবনীয় মূলসূত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এতৎ প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে প্রথমে আলোচিত হইবে।

এই সমস্ত স্বীকৃত বিষয়কে নিউটন নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন—(Optics Prop. xii)

"আলোকের প্রত্যেক কিরণ, আলোকরশ্মি-প্রতিভঙ্গ-সক্ষম (refracting) কোন পদার্থ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় একটা অতিক্ষণস্থায়ী অবস্থা বা গঠন প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থা বা গঠন আলোকের অগ্রসরণ কালে নির্দ্দিষ্ট সমপরিমাণ সময় বিরাম অন্তর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অবস্থা বা গঠন স্বীয় প্রত্যেক পুনরাবর্ত্তনে এরূপ ভাবে আলোক-কিরণসমূহের বিন্যাস করে যে, তাহারা পরবর্ত্তী প্রতিভঙ্গ-সক্ষম পদার্থ দিয়া সহজে প্রবাহিত হইতে পারে এবং সেই অবস্থা পুনরাবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই প্রতিভঙ্গ-সক্ষম-পদার্থ দ্বারা সেই আলোক-কিরণগুলি সহজে প্রতিফলিত হইতে পারে।"

* ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) ডাক্তার ডি, এন, মল্লিক এম, এ, এস সি, ডি, এস্‌, আর, এস, ই, প্রণীত দশম পুস্তিকার (Bulletin No. 10) বঙ্গানুবাদ।

"প্রতিফলিত বা দিক-পরিবর্ত্তিত আলোকে দেখিলে কোন পাতলা প্লেটএ যে বর্ণ সঞ্জাত হয়, সেই বর্ণের বিন্যাস দ্বারা (নিউটনের মতানুসারে) উপরি উক্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ কোন পাতলা স্বচ্ছ পদার্থের যে স্থানেই হউক পতিত হইলে এবং পতন কোণ সর্ব্বত্র সমান হইলে ও স্বচ্ছ পদার্থের স্থূলতা সমান্তর শ্রেঢ়ী ক্রমে (arithmetiacl progression) বৃদ্ধি পাইলে, কোনও আলোক এবং সেই জাতীয় সমস্ত আলোক পর্য্যায়ক্রমে বহুবার প্রতিফলিত ও দিকপরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

(১, ৩, ৫,—প্রতিফলনের অঙ্ক ; ০, ২, ৪—দিক পরিবর্ত্তনের অঙ্ক।)"

নিউটন আরও বর্ণনা করিয়াছেন :—"প্রতিফলনোন্মুখ ও প্রতিবাহনোন্মুখ কিরণ-বিন্যাসের পুনরাবর্ত্তনকে আমি (নিউটন) আলোকের প্রতিফলন-ভঙ্গি (fits) ও প্রতিবাহন-ভঙ্গি বলিব ও এইরূপ দুইবার পুনরাবর্ত্তন সময়ের ব্যবধানকে ভঙ্গিকাল ব্যবধান বলিব।" পুনরায় তিনি বলিয়াছেন (ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা) "কোনও স্থূল স্বচ্ছ পদার্থে আলোকরশ্মিমালা পতিত হইলে, তাহার কিয়দংশ প্রতিফলিত এবং অপরাংশের গতি বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া প্রতিবাহিত হইয়া যাইবার কারণ এই যে, যেগুলি প্রতিফলিত হয়, তাহাদের ভঙ্গি প্রতিফলনোন্মুখ এবং অপর গুলির প্রতিবাহনোন্মুখ।"

এই সমস্ত ভঙ্গির যথাসম্ভব ব্যাখ্যা সপ্তদশ প্রশ্নে প্রদত্ত হইয়াছে—"যখন কোন স্বচ্ছ পদার্থে কিরণ পতিত হয়, এবং পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয় ও বক্রীভূত হইয়া প্রবাহিত হয় তখন কি এই স্বচ্ছ পদার্থে একটা কম্পনের বা আলোড়নের তরঙ্গ উদ্রিক্ত হয় না? এই তরঙ্গ কি আলোক কিরণকে অতিক্রম করে না? এই তরঙ্গ মালার প্রত্যেক তরঙ্গ আলোক কিরণকে পরে পরে অতিক্রম করিয়া আলোক কিরণের প্রতিফলন ভঙ্গি ও প্রতিবাহন ভঙ্গি আনয়ন করে না?" *

আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য তিনি অনুমান করিয়াছেন (২৬ প্রঃ) যে আলোক কিরণের বহুসংখ্যক পার্শ্বদেশ রহিয়াছে। আলোকের দ্বিধাবক্রীভূত (double refraction) হইবার কারণ—আলোকরশ্মির চারিটি পার্শ্বদেশ।

আলোকরশ্মির ভঙ্গি এবং পোলারিটি (polarity) দ্বারা অতি পাতলা পর্দ্দার বর্ণ-প্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আলোকের যাবতীয় ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, এই ভঙ্গির দৈর্ঘ্য পতন-কোণের সিক্যাণ্ট (secant) এর অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে উপরি উক্ত অভিমত যাবতীয় উপপত্তির কৃত্রিমতা মাত্র বিশিষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট করে ; এরূপ মীমাংসা ন্যায়সঙ্গত নহে, কেননা ইহা আরও সহজবোধ্য সরল কোনও নিয়মের ফল মাত্র। †

* এক্স-রে উৎপত্তির অধুনাতনকালে প্রস্তাবিত মূল সূত্র বা উপপত্তির সহিত তুলনীয়।

† *cf.* Kepler's Laws of Planetary motion, in particular the third law.

আলোকের ডিফ্র্যাকশনের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত প্রশ্নে সন্নিবিষ্ট আছে :—

রশ্মির রিফ্র্যান্‌জিবিলিটি (refrangibility) বিভিন্ন হইলে, নমনীয়তাও কি বিভিন্ন হয় না? এবং বিভিন্ন ভাবে বক্রীভূত হয় বলিয়া রশ্মিমালা কি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায় না? এইরূপে পৃথক হইয়া যায় বলিয়াই কি ডিফ্র্যাক্‌শন্‌এর বর্ণ উদ্ভূত হয় না (এই সমস্ত ডিফ্র্যাকশনের আদর্শ তিনি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছিলেন)?" এবং অন্যত্র তিনি ব'লয়াছেন—

"বাইন জাতীয় মৎস্যের গতির সময় যেমন তাহার দেহ এদিক ওদিক বাঁকিয়া যায়, আলোক-িরণ কোন পদার্থের প্রান্তে বা পার্শ্বদেশে পতিত হইলে কি সেইরূপ কয়েক বার বাঁকিয়া যায় না? ডিফ্র্যাক্‌শনের রঞ্জিত আলোক উৎপত্তির কারণ কি এই বক্রতা নহে?" (প্রঃ ৩য়)

কিন্তু যদিও নিউটন এই সমস্ত ব্যাখ্যার মূলে আলোকের কণিকামূলক উপপত্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ধারণা অন্যতর উপপত্তি গ্রহণেও উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি বলিয়াছেন, যদিও কণিকামূলক উপপত্তিসমূহ লইয়া বিচার করিতেছি, তথাপি এই উপপত্তির তাৎপর্য্য নির্ভুল নাও হইতে পারে।" অধিকন্তু এই কণিকামূলক উপপত্তির বিরুদ্ধ উপপত্তি ও তাহার গুণাবলী সম্বন্ধেও তাঁহার সম্যক ধারণা ছিল।

এই জন্যই তিনি ত্রয়োদশ প্রশ্নে তরঙ্গ মূলক উপপত্তির দ্বারা বর্ণোৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন :—

"নানা জাতীয় আলোকরশ্মি কি নানারূপ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ উৎপাদন করে না? এই সমস্ত তরঙ্গ তাহাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে নানাবিধ বর্ণের জ্ঞান উৎপাদন করে; যে সমস্ত রশ্মি অধিকতর রিফ্র্যান্‌জিব্‌ল্‌ তাহাদের কম্পনও ক্ষুদ্রতম।"

পুনরায় সপ্তদশ প্রশ্নে পূর্ব্বে যে "ভঙ্গি"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি আলোকের দ্বিবিধ উপপত্তিই ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু অষ্টবিংশতি প্রশ্নে—আলোকের ঋজুরেখায় প্রবাহণের ব্যাখ্যায় তরঙ্গমূলক উপপত্তির বিষম দুর্ব্বোধত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যদি চাপ বা গতির দ্বারা আলোক গঠিত হইত, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে বা কিছু সময়ে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে ইহা ছায়া উৎপাদন করিত। কেননা কোন তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের মধ্যে বাধা থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বাধা অতিক্রম করিয়া চাপ বা গতি দূরে যাইতে পারে না। এই বাধা গতির খানিকটা অংশ প্রতিরুদ্ধ করিবেই, কিন্তু এই গতি নানা দিকে বাঁকিয়া বাধার দূরবর্ত্তী স্থানে, তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের স্থির নিশ্চল অংশে পুনর্ব্যাপ্ত হইবে।

কিন্তু শব্দ যেরূপ কম্পন দ্বারা প্রবাহিত বা উৎপন্ন হয় সেইরূপ কম্পন দ্বারা আলোক প্রবাহিত হইলে আলোকের দ্বিধাবক্রীভূত হইবার কারণ মীমাংসিত হয় না।

এই সকল গোলযোগ লক্ষ্য করিয়াই তিনি (২৯ প্রঃ) কণিকামূলক উপপত্তি সমর্থন করিলেন এবং এতদ্দ্বারা ছায়ার উৎপত্তির কারণের ব্যাখ্যা করিলেন—"আলোক রশ্মি কি উজ্জ্বল পদার্থের গাত্র নিঃসৃত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি নহে? এই সমস্ত আলোক কণিকা, সর্ব্বত্র সম নিবাড়তা বিশিষ্ট কোন পদার্থ বাহিয়া, ছায়া উৎপাদন না করিয়া, ঋজু রেখায় প্রবাহিত হইতে পারে। বাস্তবিক আলোকরশ্মির প্রকৃতিই এইরূপ।"

এই সমস্ত উপপত্তি অনুমান করিয়া লইবার পূর্ব্বে তিনি আরও একটি সহজ-বোধ্য কল্পনা ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল কল্পনামাত্র বলিয়া ইহাকে তিনি স্বলিখিত প্রবন্ধে স্থান দান করেন নাই। অথচ এই প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি এই কল্পনা ধারণা করিয়াছিলেন। তিনি রয়াল সোসাইটির জন্য ওল্ডেনবর্গকে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধ প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

যদি আমাকে অন্য কোনওরূপ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ হইবে ঃ—যদি ইহাকে সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে আলোক যেরূপই হউক না কেন ইহা ইথারে কম্পন উৎপাদন করিতে সক্ষম। প্রথমতঃ এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে, আলোক প্রবাহণে ইথাররূপ কোন অবলম্বন আছে। ইহার গঠন অনেকটা বায়ুর অনুরূপ কিন্তু আরও অধিকতর পাতলা, সূক্ষ্ম, অত্যধিক স্থিতিস্থাপক।

দ্বিতীয়তঃ—ইথার বায়ুর ন্যায় কম্পনশীল অবলম্বন; কিন্তু ইথার-কম্পন আরও ক্ষীপ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। মানবের স্বরের দ্বারায় পরে পরে বায়ুতে যে সমস্ত তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, তাহাদের দূরতা ১ ফুট বা অর্দ্ধ ফুট মাত্র; কিন্তু ইথারের তরঙ্গের দূরতা এক ইঞ্চের ১,০০,০০০ ভাগের ১ ভাগ অপেক্ষাও অল্পতর। তৃতীয়তঃ বায়ুতে যেরূপ, ইথারেও সেইরূপ কোনও তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ অপেক্ষা দীর্ঘতর, কিন্তু এই দুই জাতীয় তরঙ্গের বেগ সমানই ক্ষীপ্র। কাজেই ইথার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে প্রভেদ আছে কিন্তু গতিতে বা বেগে ভিন্নতা নাই। অতএব চতুর্থতঃ আমার অনুমান হয় যে আলোক ইথার নহে, কিম্বা ইহার কম্পনশীল বেগ নহে, কিন্তু কোন উজ্জ্বল পদার্থ হইতে প্রবাহিত অন্য কোন রূপ ভিন্ন জাতীয় ব্যাপার। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা ইহাকে অনেকগুলি গতিশীল ধর্ম্মের সমষ্টি মাত্র বলিতে পারেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, ইহা কল্পনাতীত ক্ষুদ্রতম অতি ক্ষীপ্রগতি সম্পন্ন নানা আয়তন বিশিষ্ট কণিকা সমষ্টি মাত্র। এই সমস্ত কণিকা উজ্জ্বল পদার্থ হইতে এক-

টির পর একটি করিয়া বহু পরে পরে নির্গত হইতে থাকে, কিন্তু তথাপি দুইটি কণিকা নির্গমনের সময় ব্যবধান ধারণারও দুঃসাধ্য অল্পতম। আমি ইহাকে ইথারের কম্পনের অনুরূপ মনে করি না। প্রথমতঃ আলোক এবং ইথার স্বভাবতঃ পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই আলোকের প্রতিফলন এবং বক্রীভবন বা দিক পরিবর্ত্তন সংঘঠিত হয়। অতএব এই ইথারের স্পন্দন দ্বারাই আলোকের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম শক্তি জড়পদার্থের স্থূল কণিকা সমূহকে বিলোড়িত করিয়া উত্তপ্ত করিতে পারে।"

"এক্ষণে বর্ণের ব্যাখ্যা এইরূপ হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, যেমন নানারূপ শব্দায়মান দ্রব্য শব্দ উদ্রিক্ত করে, এবং তাহার ফলে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কম্পন উদ্রিক্ত হয়, সেইরূপ আলোকের রশ্মিসমূহ স্বচ্ছ পদার্থের দৃঢ় বহির্দ্দিকে পতিত হইয়া ইথারে কম্পন উৎপাদন করিলে, এই রশ্মিসমূহ নানারূপ দৈর্ঘ্যের কম্পন উৎপাদন করে। এই তরঙ্গ সমূহের মধ্যে দীর্ঘতম তরঙ্গগুলি উজ্জলতম আলোক, যেমন লোহিত এবং পীত এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গগুলি নীল এবং বেগুনিয়া উৎপাদন করে। এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী তরঙ্গ গুলির দ্বারা হরিৎবর্ণ এবং সকল বর্ণের একত্র মিশ্রণ দ্বারা শ্বেতবর্ণ উৎপাদিত হয়।"

যাহা উক্ত হইল, তাহাই স্থূলতঃ আলোকের তরঙ্গমূলক উপপত্তি। এই উপপত্তি দ্বারাই হাইগেন্‌স্, ফ্রেনেল এবং ইং আলোক বিজ্ঞানের অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত যাবতীয় ব্যাপারের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা কেবল মাত্র বল ও গতিবিজ্ঞান মূলক। ইহার সহিত তুলনা করিলে আলোকের কণিকামূলক উপপত্তি কেবলমাত্র গতিবিজ্ঞান মূলক ছিল। এই জন্য তরঙ্গ মূলক উপপত্তি অপেক্ষা কণিকামূলক উপপত্তির স্পষ্টতঃ একটা সুবিধা ছিল। কিন্তু আলোকের দুইটি বিশেষত্ব রহিয়াছে, ইহার যে কেবল গতি আছে তাহা নহে, ইহার একটা সময় মূলক অবস্থাও রহিয়াছে। নিউটন অবশ্যই কণিকা মূলক উপপত্তির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে স্বীয় ব্যাখ্যায় সাময়িক অবস্থা-সূচক একটা উপাদান (ভঙ্গি) প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল। তাহাতেও আলোক বিজ্ঞানের যাবতীয় পরিচিত ব্যাপারের ব্যাখ্যা বিশদ না হওয়ায় তাঁহাকে বর্ণের কারণের ব্যাখ্যার জন্য স্পষ্টতঃ কম্পনের "দৈর্ঘ্য" অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে তরঙ্গ মূলক উপপত্তির দ্বারা আলোকের ঋজু রেখায় প্রবাহণের সুচারু ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই তিনি এই উপপত্তির সম্পূর্ণতাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্তু যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তরঙ্গমূলক উপপত্তির বিশেষ পক্ষাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও নিউটন একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন। কেননা তিনিই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, আলোক ইথার নহে, কিম্বা ইথারের

কম্পনও নহে, ইহা একটা শক্তি বিশেষ এবং ইথার আশ্রয় করিয়া ইহা সেই শক্তি প্রকটিত করিবার একটা উপায় মাত্র। এইরূপ আশ্রয় সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে যে সাময়িক অবস্থার কথা উল্লিখিত হইল, তাহা যাবতীয় আলোক বিজ্ঞানের ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সাময়িক অবস্থা—কণিকামূলক উপপত্তি মতে আলোকের নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যায় কিরূপে প্রবেশ করান সম্ভবপর, তাহা ধারণা করা সহজসাধ্য না হইলেও এই সাময়িক অবস্থাই তরঙ্গমূলক উপপত্তির ভিত্তির উপাদান স্বরূপ। সেই জন্যই এই "সাময়িক অবস্থার" উপলব্ধি পরবর্ত্তী তরঙ্গ-মূলক উপপত্তির প্রাথমিক সোপান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উপপত্তি দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে আলোক-শক্তির কারণ তরঙ্গায়িত গতি। ঋজুরেখার দ্বারা আলোকের প্রবাহণ ও ডবল্ রিফ্রাক্‌শন্ এই দুইটি নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা নিউটন ভালরূপে করিতে পারেন নাই। কিন্তু যেমনই এই দুইটির ব্যাখ্যা, তরঙ্গমূলক উপপত্তির দ্বারা সম্যকরূপে মীমাংসিত হইয়া যাইল, অমনই ইহাই আলোকের বল ও গতিবিজ্ঞান সম্মত উপপত্তি বলিয়া পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল।

"ঋজুরেখায় আলোকের প্রবাহণ" এই নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা হাইগেনের অভিমত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অভিমত স্থূলতঃ এই যে, প্রত্যেক তরঙ্গের উপরিভাগ নূতন বিক্ষোভের উৎপত্তির মূল স্বরূপ। অতএব (১) তরঙ্গের উপরিভাগ পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে যে সমস্ত তরঙ্গ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে ঐ তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। (২) যে কোনস্থানের বিক্ষোভ এই সমস্ত বিক্ষোভের ভেক্টর সমষ্টি vector sum)। এই দুই অভিমতের প্রথমটির দ্বারা হাইগেনস্ সম্পূর্ণরূপে আলোকের দিক পরিবর্ত্তন ও প্রতিফলন এই দুই নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিলেন অধিকন্তু আইস্‌ল্যাণ্ড স্পারের (Iceland spar) ন্যায় ইউনিয়্যাক্‌সিয়াল (uniaxial) স্ফটিকের অভ্যন্তরে তরঙ্গের উপরিভাগ গোলক বা অণ্ডবৎ হইলে, এই সমস্ত স্ফটিকের আলোকের ডবল্ রিফ্রাক্‌শন্‌ও প্রথম অভিমত দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অভিমতের দ্বারা (এই অভিমত রীতিমত ব্যাখ্যাত হইলে) আলোক যে ঋজুরেখায় প্রবাহিত হয় তাহার কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তরঙ্গ-মূলক উপপত্তি প্রস্তাবিত হইবার প্রায় একশত বৎসর অতীত হইলে তবে ফ্রেনেল এবং ইয়ং ইহাকে সুপ্রণালীরূপে উক্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি বস্তুতঃই আলোক তরঙ্গের প্রতিরোধ-মূলক অভিমত। ইহা হইতে ইহাই বুঝায় যে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অতিমাত্র অল্প বলিয়া, আলোক তরঙ্গ

প্রান্তের অত্যল্পাংশ মাত্র দ্বারাই কোন স্থান আলোকিত হয়। অতএব আলোক নিয়মতঃ, ঋজুরেখায় প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং আলোক রশ্মি কোন রন্ধ্র পথে প্রবাহিত হইলে, নিউটনও বিচার করিয়াছেন যে রন্ধ্র অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইলে, আলোক রশ্মি সেই রন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে বাঁকিয়া যায়। ইহার দ্বারা তরঙ্গ-মূলক উপপত্তির প্রাথমিক বাধা—এইরূপ হইলে আলোকের যেরূপ ছায়া পাত হয় অর্থাৎ আলোকের যেরূপ অবসান হয়, শব্দেরও সেইরূপ ছায়া পাত অর্থাৎ শব্দের নিবৃত্তি হওয়া উচিত—খণ্ডিত হইয়া যায়। কেননা, আলোকের তরঙ্গ শব্দতরঙ্গের তুলনায় যেরূপ ক্ষুদ্রতম, সেইরূপ শব্দের ছায়াপাত অর্থাৎ শব্দের নিবৃত্তি প্রকাণ্ড বাধা না হইলে হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এইরূপই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

গত একশত বৎসর ও অস্ত্রচিকিৎসা।

বর্ত্তমান কালে চিকিৎসা শাস্ত্রের যে যে অঙ্গের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অস্ত্র চিকিৎসার উন্নতিই সর্ব্ব প্রধান। আজ কাল অস্ত্রচিকিৎসক অসাধ্য সাধন করিতেছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা জন সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইত, আজ তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই অভাবনীয় অভ্যুদয়ের যে যে সময়ে বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহারই ২। ১টি এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

১৮৩৬ খৃঃ অঃ।

আজকাল যে প্রথায় অস্ত্রচিকিৎসিত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা হয়, ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে জারমান দেশে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ঐ বৎসর কেইজারওয়ার্থ নগরে এতৎ উদ্দেশ্যে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্থানেই স্বনামধন্যা নাইটিং-গেল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন, পরে তাঁহার এই শিক্ষা তাঁহার মস্তকে যশের মুকুট স্থাপন করিয়াছিল। যে সমস্ত রমণী শুশ্রূষা বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নাইটিংগেল, ফ্রাই, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, মহারাণী আলেক্‌জান্দ্রা, এবং আমাদের বর্ত্তমান মহারাণী মেরীর নামই সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

চিকিৎসিতের আগারে গমন, ক্ষত ধৌত করণ, ব্যাণ্ডেজ বন্ধন, উপদেশ প্রদান, অবসর রঞ্জন ও সাময়িক শিক্ষা দান, ইত্যাদি বিষয়ে শুশ্রূষাকারিণীগণ রীতিমত শিক্ষা পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মনোবৃত্তি এরূপে গঠিত করা হয় যে, বিশেষ প্রয়োজন ও

বিপদস্থলে তাঁহাদের অনায়াসে উপস্থিত বুদ্ধি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এক্ষণে অস্ত্র-চিকিৎসক শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত তাঁহার অস্ত্রোপচার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। তিনি জানেন এই সমস্ত রমণীর সহায়তা অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে কি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দ।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে এডিনবারা রয়াল ইন্‌ফারমারী নামক অস্ত্রচিকিৎসাগারে (Edinburgh Royal Infirmary) প্রথম ক্লোরাফরম্ সহযোগে পীড়িতকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচার ক্রিয়া পরিচালিত হয়। ঐ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ক্লোরোফরম প্রয়োগের ১১ দিন পূর্ব্বে সার জেমস্ সিম্প্‌সন নিজ গৃহে কোন রোগীতে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করেন। সার জেম্‌স্ সিম্প্‌সন্ চিকিৎসকের আর্ত্তনাদে, করুণ ক্রন্দনে ও যন্ত্রণায় এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সিম্পসন, ক্লোরোফরম প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে নানাবিধ পদার্থ প্রয়োগে রোগীর যন্ত্রণা উপশম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ওয়ালডি ক্লোরোফরমের প্রয়োগ আবিষ্কার করিলেন। বর্ত্তমানকালে ক্লোরোফরম প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসা কি সুসাধ্য হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। পূর্ব্বে চিকিৎসিতকে সুরা দ্বারা, অহিফেন দ্বারা, বা নানাবিধ বিষ প্রয়োগ দ্বারা উন্মত্ত করিয়া রাখা হইত। তথাপি তাহারা অস্ত্রোপচারের সময় বিষম চিৎকার করিত, যন্ত্র-ণায় ছটফট করিত। তখন চিকিৎসকের সহকারিগণ বল প্রয়োগে রোগীকে চাপিয়া ধরিত। মনে মনে সে দৃশ্য কল্পনা করিলেও ভয় হয়। আজকাল অস্ত্রোপচার সমাধা হইয়া যাইলে কেবলমাত্র ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া চিকিৎসিত বুঝিতে পারে যে সেই স্থানে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দ।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে পচন-নিবারক বা ক্ষতে রোগবীজাণু-অন্তপ্রবেশনিবারক পদ্ধতি মহামতি লর্ড লিষ্টার প্রারব্ধ করিলেন। ইহার ফলে রোগ নিবারণ বা উপশম কল্পে অস্ত্রোপচার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পচন-নিবারক পদ্ধতি—ইহার অর্থ কি? রোগ বীজাণু এক প্রকার উদ্ভিদ-বীজ বিশেষ। এই সমস্ত বীজ উপযুক্ত পাত্র, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা পাইলে সংখ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে কোটী কোটী রোগ উদ্ভিদ-বীজাণু প্রতিনিয়ত উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোন ক্ষত স্থানে উক্ত বীজাণু পতিত হইলে এবং সেই ক্ষত, সেই সময়ের তাপমাত্রা ইত্যাদি উপযুক্ত হইলে, সেই বীজাণু তথায় পতিত হইয়া সংখ্যায় অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়া সেই ক্ষত ত্বরিত গতিতে বাড়াইয়া তুলে,—ইহার ফলে ক্ষত উপশম হয় না, বীজাণুর বিষক্রিয়া

শরীরে প্রকাশ পায় এবং পীড়িতের মৃত্যু ঘটে। এই পচন-নিবারক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যু সংখ্যা অতিশয় হ্রাস পাইল। পূর্ব্বে অস্ত্রোপচারে মৃত্যু সংখ্যা শত করা প্রায় ৫০এরও অধিক ছিল, কিন্তু ইহার পরে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়া শত করা ১টিতে পর্য্যবসিত হইল। পূর্ব্বে এমন অনেক ব্যাধি ছিল যে, তাহা চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়াই লোকের ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অভাবনীয়রূপে সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, মানবজগতে যে উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। প্রথমে লোকে যন্ত্রণার ভয়ে অস্ত্র চিকিৎসা করাইতে চাহিত না, আবার যদি বা অস্ত্র চিকিৎসা করাইত, তাহা হইলে এই রোগ বীজাণুর আক্রমণে জীবনের আশাও বিনষ্ট হইত। কাজেই অস্ত্র চিকিৎসা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। পরে ক্লোরোফরম্, ইথার ইত্যাদি প্রয়োগে হতচৈতন্য করাইয়া অস্ত্র চিকিৎসা প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইলে, যন্ত্রণার অবসান হওয়ায় লোকে অস্ত্র চিকিৎসায় প্রথম প্রথম শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল বটে, কিন্তু জীবন রক্ষার ব্যাপার পূর্ব্ববৎ দেখিয়া অস্ত্র চিকিৎসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে সার ফ্রেডারিক ট্রিভস্, পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার গৃহ কিরূপ ঘৃণার জনক ছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন—Sixty years ago the operating room was the dirtiest room in the hospital; the surgeon operated in the dirtiest coat in his possession—a coat stiff with blood and animal filth; he was as proud of this blood-stained rag as a peer of ancient lineage may be of his faded ceremonial robes. কিন্তু বর্ত্তমানকালে হাসপাতালের অস্ত্রোপচার মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ-স্বরূপ। গৃহের প্রাচীর, মেঝে, সিলিং ইত্যাদি গ্লেজ্‌ড্ (চিনা মাটির বা ঐ জাতীয় চক্‌চকে) টাইল ইত্যাদির দ্বারা আবৃত থাকে। এই সমস্ত টাইল অনায়াসে রীতিমত ধৌত করা যায়। এখন এই সমস্ত গৃহের কোণ থাকে না। কাজেই গৃহের কুত্রাপি ধূলি বা জঞ্জাল বা ময়লা সঞ্চিত হইতে পায় না। হস্ত এবং অস্ত্র রীতিমত ভাবে ধৌত করিবার সুচারু বন্দোবস্ত আছে। ক্ষত ড্রেস্ করিবার উপাদানসমূহ ধৌত করিবার ও ষ্টেরেলাইজ্ অর্থাৎ রোগবীজাণু শূন্য করিবার জন্য অন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ রহিয়াছে। তথায় পাত্রাদি, গরম জলে রীতিমত ফুটাইয়া লওয়া হয়। আদর্শ অস্ত্রোপচার গৃহের অব্যবহিত পার্শ্বে রোগীকে ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি প্রয়োগে অজ্ঞান করা হয়, এবং অজ্ঞান হইয়া যাইলে তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে করিয়া অস্ত্রোপচার গৃহে রোগীকে আনয়ন করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে রোগী যেন কিছুতেই শাণিত অস্ত্রাদি দেখিয়া ভীত হইয়া না পড়ে। অন্য একটি গৃহে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করেন। সেই পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও রোগী

জানিতে পারে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে বা কোন কারণ বশতঃ গৃহে পূর্ণ আলোকের অভাব হইলে, তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প জ্বালাইয়া গৃহ আলোকিত করা হয়। অস্ত্রোপচার করিবার টেবিল শিল্প-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। অস্ত্র চিকিৎসক এবং তাঁহার সহকারিগণ শ্বেত বসনে আচ্ছাদিত থাকেন। এক্ষণে ক্লোরোফরম এবং পচন-নিবারক প্রথা অস্ত্র-চিকিৎসা জগতে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে চমৎকৃত হইতে হয়।

১৮৮২ খৃঃ অব্দ।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে কক্ (Koch) সাহেব টিউবারকল্ বা যক্ষার রোগ বীজাণু আবিষ্কার করিলেন। এই ব্যাসিলাস বা রোগ বীজাণু আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বিষম ব্যাধির আক্রমণ হইতে লোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ও আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে। সম্প্রতি লোকে বুঝিয়াছে যে মক্ষিকাদি, যাহাদের অত্যাচারে গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, সেই মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গগুলি এই রোগ প্রসারে অতিশয় সহায়তা করে। কাজেই লোকে যাহাতে মক্ষিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহার রীতিমত বন্দোবস্ত করিতেছে। এইরূপে লোকে নানারূপে সাবধান হইয়া যক্ষা, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি প্রায় দুরারোগ্য ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে পরিত্রাণ পাইতেছে।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দ।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে এক্স-রে আবিষ্কৃত হইল। এই আলোকের অদ্ভুত শক্তি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকগণ ইহাকে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্যার্থে প্রয়োগ করিলেন। ইহার দ্বারা অস্থি ভঙ্গ, অস্থির স্থানচ্যুতি ইত্যাদি অতি সহজেই ধরিয়া ফেলা যায়। কেননা এই আলোক দ্বারা মাংসাদি স্বচ্ছ হইয়া যায়। শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে সূচিকা বা গুলি ইত্যাদি প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাহার স্থান এই আলোকের সাহায্যে অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে।

টেলিফোন ইত্যাদি অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষরূপে সাহায্য করে নাই বটে, কিন্তু সাধারণ চিকিৎসায় ইহা সময়ে সময়ে বেশ সহায়তা করে। অবশ্য আমাদের দেশে এরূপ সহায়তার সংবাদ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে ইউরোপ, আমেরিকা আদি বৈজ্ঞানিকদেশে সময়ে সময়ে টেলিফোন ইত্যাদি বেশ সহায়তা করিয়া থাকে। বিলাতে কোন সময়ে এক রমণী নিজ সন্তানের "ক্রুপ" হইয়াছে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়েন, এবং তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিয়া ডাক্তারকে সংবাদ প্রদান করেন। কিন্তু ডাক্তারের আদেশ মতে রমণী শিশুকে টেলিফোনের মুখের নিকট অল্প সময় মাত্র ধরিলেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিশুর ক্রুপ হয় নাই। তিনি রমণীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন।

স্বর্গগত সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড একবার এক বিষম রোগাক্রান্ত হয়েন। সেই রোগের কারণ বিজ্ঞচিকিৎসকগণ মনে করিলেন যে "লিভারে ঠাণ্ডা" লাগিয়াছে। এই পীড়ার কোনরূপ নাম ছিল না। সার সামুয়েল উইল্‌ক্‌স নির্দ্দেশ করিলেন যে এই ব্যাধি বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাই য্যাপেণ্ডিসাইটিস্ নামে পরিচিত ছিল। এই সময় হইতে য্যাপেণ্ডিক্‌স্ যে একরূপ বিষম ক্ষতের আশ্রয় স্থল, তাহা চিকিৎসকগণ বুঝিতে পারিলেন এবং সেই সময় হইতেই তথায় অস্ত্রোপ-চারে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম হইতে লাগিল। গলষ্টোন (পিত্তকোষ জাত পাথুরী) অপসারণ করিতে অস্ত্র চিকিৎসা যেরূপ অসাধ্যসাধন করিতেছে, তাহা ২০ বৎসর পূর্ব্বে লোকের অজানিত ছিল। পিত্তজাত বেদনার (biliary colic) পীড়ায় যাঁহারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের জীবন বাস্তবিকই বিষময়। ঔষধ সেবনে এই পীড়া নিরাময় হইতে পারে না। সার টমাস ওয়াটসন এই বেদনা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"The pain that attends the passage of a gall-stone is often dreadful. Perhaps there is no pain to which the body is subject that is more severe. You will not wonder at this, when you consider that through a tube of which the nataral size scarcely exceeds that of a goosequill there somesimes passes a stone as big as a wallnut." এই ব্যাধি নিরাকরণ জন্য অর্থাৎ পাথুরী অপসারণ জন্য অস্ত্র চিকিৎসা নিতান্তই দুরূহ। ব্যাধির অবস্থা অতিশয় সরল হইলে তলপেটের প্রাচীর কাটিয়া, এবং পিত্তকোষ কাটিয়া পাথরগুলিকে অপসারণ করিতে হয় এবং অপসারণের পরে পিত্তকোষ সীবন করিয়া তলপেটের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া অবশেষে তলপেট সীবন করিয়া দিতে হয়। ইহাতে যে ক্ষত হয় সে ক্ষত অল্প দিনের মধ্যেই নিরাময় হয়। কিন্তু যদি মহামতি লর্ড লিষ্টারের পচন-নিবারক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে এই ব্যাধি উপশমার্থে অস্ত্র প্রয়োগে কেহই প্রয়াস পাইত না, এবং এই ব্যাধি চিরকাল জনসমাজে দুরারোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত।

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, হৃদযন্ত্রে ছিদ্র করিয়া তদভ্যন্তরস্থ পূয ইত্যাদি অপসারিত করা হয়। পূর্ব্বে এরূপ ভাবে চিকিৎসা করা নরহত্যার নামান্তর মাত্র ছিল। অ্যাম্পুটেট করা বা পীড়িত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা আজকাল অতিশয় সুসাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এরূপ ভাবে অনেক সময় অঙ্গ বিচ্ছিন্নও করা হয় না। তৎপরিবর্ত্তে আহত স্থান গভীর করিয়া কর্ত্তন পূর্ব্বক ক্ষত স্থান পচন নিবারক দ্রব্যাদির দ্বারা বিশোধিত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে অতিশীঘ্র ক্ষত নিরাময় হয় এবং বিচ্ছিন্ন করিবার কারণেরও অবসান হয়।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানবের জীবনও নানারূপে অধিকতর রূপে বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। মোটরকার, মোটর সাইকল, ট্রাম, রেলওয়ে, ইত্যাদিতে শত শত লোক আহত হইতেছে। কত লোকের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইতেছে, কাহারও অস্থি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, কত লোকের জানু অস্থি বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় এক্স-রে ও পচন নিবারক চিকিৎসা আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সমস্ত বিপদের কবলে মানবের মৃত্যু অনিবার্য্য হইত।

এরূপও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে একজন আমেরিকান অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্ চিকিৎসক এক প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্য প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন। এমন কি মূত্রাশয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিও একশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য শরীরে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

আজকাল বড়ই বিস্ময়কর যুগ আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে জগৎ যেন অভিনব প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার উন্নতিতে জগৎ স্তম্ভিত। অস্ত্র চিকিৎসার অভ্যুদয়ের মূল—লর্ড লিষ্টার প্রবর্ত্তিত পচন-নিবারক পদ্ধতি। ১৮৩৬ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত অস্ত্র চিকিৎসায় যেরূপ মানবের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তজ্জন্য জগতের যেরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে, ভূত বিজ্ঞান (Physics ও রসায়ন বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বিজ্ঞানে মানবের জ্ঞান এত বৃদ্ধি পায় নাই, বা মানবের এত অধিক প্রয়োজন সাধিত হয় নাই। সমস্ত বিষয়েই যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহাতে আর ১০০ বৎসর পরে হয়ত মানবজাতির অবস্থা অন্যরূপ হইয়া উঠিবে। এই জন্য সময়ে সময়ে দুঃখ হয় যে, যদি ভগবান দয়া করিয়া আমাদিগকে আরও ১০০ বৎসর পরে পৃথিবীতে পাঠাইতেন, তাহা হইলে সেই সময়ে মানব জাতির, সুখ সম্পদ, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য, অধিকতর কর্ম্মদক্ষতা ও শক্তি দেখিবার অবসর পাইতাম।

কীট পতঙ্গাদির ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

কীট পতঙ্গাদির জীবনে এমন কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হয় যে, তদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ কার্য্য সংসাধন জন্য ঘ্রাণশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ ঘ্রাণশক্তি ব্যতীত এই সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সমস্ত কার্য্যের উদাহরণ অসংখ্য। অনেকে "উইঢিপি" দেখিয়াছেন। উইঢিপি উইএর বাসস্থান বা উই রাজ্য। এইরূপ পিপীলিকাতেও ঢিপি বা বাসস্থান বা রাজ্য স্থাপন করিয়া বসবাস করে। পিপীলিকা কিরূপ সামাজিক প্রাণী তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এই বাসস্থানে যদি একই জাতীয় অথচ অন্য দলের পিপীলিকা প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের পিপীলিকাগুলি দূর করিয়া দেয়। কিরূপে পিপীলিকাগুলি অন্য দলের পিপীলিকাটিকে বুঝিতে পারে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া অনেকে অনেকরূপ কল্পনা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করেন যে, পিপীলিকাগণ স্বীয় দলের মধ্যে কয়েকরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে। যদি নবাগত পিপীলিকাটি সেই ভাষা অবগত না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দেয়। কিন্তু কীট পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী মাত্রেই বধির। বিশেষতঃ পিপীলিকা পূর্ণ বধির। পিপীলিকা কিছুই শুনিতে পায় না। এক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারে এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অমূলক। কিন্তু পিপীলিকার ঘ্রাণশক্তি যে অতি তীক্ষ্ণ তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি দূরে মিষ্ট দ্রব্য পড়িয়া থাকিলে পিপীলিকা আঘ্রাণ দ্বারা তাহার স্থান নিরূপণ করে। অতএব এক জাতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দলের পীপিলিকার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ গন্ধ রহিয়াছে, সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া একদলের পিপীলিকা অন্য দলের নবাগত পিপীলিকাকে সহজেই ধরিয়া ফেলে।

এইরূপ যদি কোনও প্রাণীর মৃতদেহ কোনও স্থানে গলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানের সম্পূর্ণ অপরিচিত শত শত কীট পতঙ্গ কতিপয় ক্রোশ দূর হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ডিম্ব প্রসব করে। এক্ষেত্রে তাহারা এই দূরবর্ত্তী অপরিচিত প্রদেশ, একমাত্র গলিত দেহের গন্ধ দ্বারা স্থির করে। এক প্রকার কীট, সব্জী ভোজী জীবের মলরাশি হইতে গোলক প্রস্তুত করিয়া লইয়া যায়। ইহা পল্লীবাসী অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মল-গোলক সমূহে এই সমস্ত কীট ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু এই সমস্ত কীট কি গন্ধ দ্বারাই এই মলরাশির দিকে আকৃষ্ট হয়? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ অতি অল্পই স্থির করিতে পারিয়াছেন। মহামতি ফাবর

(Fabre) একজন অতি প্রসিদ্ধ কীট তত্ত্ববিৎ। তিনি কীট পতঙ্গাদির জীবন বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করেন। তাঁহার পরীক্ষার সূত্র প্রজাপতির যৌন নির্ব্বাচন লইয়া আরব্ধ হয়। এই পতঙ্গগুলি নানা রূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অতি দূরতর স্থান হইতে আগমন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। ফাবর কতকগুলি স্ত্রী প্রজাপতিকে একটি ধাতুর জালতির মধ্যে আবদ্ধ করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অনেকগুলি পুং প্রজাপতি উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। এই পরীক্ষার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, যে সমস্ত পুং প্রজাপতি সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি সেই প্রদেশে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না বা কচিৎ দুই একটি দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু যদি স্ত্রী প্রজাপতিগুলিকে একবারে সম্পূর্ণ বন্ধ, বায়ু চলাচল পথরুদ্ধ কাচের শূন্যগর্ভ গোলকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে পুং প্রজাপতি গুলি আদৌ আকৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত বায়ু চলাচল করিতে পারে এরূপ পাত্রে আবদ্ধ করিলেই পুং প্রজাপতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ নানা পরীক্ষা দ্বারা ফাবর প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত পতঙ্গ গাত্র হইতে একরূপ গন্ধ নিঃসৃত হয়, সে গন্ধ মনুষ্য নাসিকা ধরিতে পারে না। কিন্তু এই গন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া পতঙ্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্রিক্ত করে। অবশ্য ফাবরের পরীক্ষা হইতে এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে যে, কীট পতঙ্গাদির ঘ্রাণশক্তি উচ্চতর জীবের ঘ্রাণ শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক তীক্ষ্ণতর এবং সেই শক্তি অতি সামান্য গন্ধেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠে।

ধূমপানের অপকারিতা।

পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই যে তামাক ব্যবহৃত হয় একথা পাঠকদের জানাইয়াছি। তামাক ব্যবসায়ে যদিও অত্যধিক অর্থাগম হইতে থাকে তবুও ন্যায় ও সাধারণের স্বাস্থ্যের দিক হইতে বলা উচিত "এই বিষের অবাধ চাষ বাঞ্ছনীয় নহে।" তামাকের চাষ করিয়া আজ আমেরিকার বহুলোক ক্রোড়পতি ইজিপ্ট বা মীসর দেশের সহিত তামাকের বা সিগারেটের নাম জড়িত আর তুর্কীর তামাক লক্ষপতিরও আদরের বস্তু! ব্যবসার দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা অতি লাভজনক ব্যবসা। ইহা দ্বারা দেশের অনেক লোকের অন্ন জুটিতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা সত্য তাহার অপলাপ করিলে চলিবে না। সত্য কথা বলিলেই বলিতে হইবে তামাক তীব্র বিষ এই বিষ যত শীঘ্র পৃথিবী হইতে উঠিয়া যায় ততই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল। আজ হয়ত আমার

এই প্রবন্ধ পড়িয়া পাঠকের হাস্ত সম্বরণ করা দুরূহ হইবে কিন্তু আজ না হইলেও দশ দিন পরে জগতের সকল লোককে উচ্চ কণ্ঠে এই গরলের বিরুদ্ধে নানা প্রকার জল্পনা প্রচার করিতে হইবে।

ব্যবসায় যথার্থই অর্থাগম হয়। তাই বলিয়া অবাধে যে কোনও ব্যবসা চলিতে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও বিধেয় নহে। এই কারণেই আবগারী বিভাগের সৃষ্টি। আমাদের দেশের গভর্মেণ্ট যদ্যপি কড়া আইন কানুন দ্বারা মদ্য গঞ্জিকা কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে লোককে চালিত না করিতেন তাহা হইলে পাঠক একবার ভাবুন আমাদের কি দশা হইত। আমাদের সহৃদয় গভর্মেণ্ট উদার! সকলেই অবগত আছেন যে অহিফেন বা আফিনের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। এই আফিম বেচিয়া ভারত গভর্মেণ্ট কত টাকা পাইতেন কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে এই ব্যবসায় জগতের লোক নীতি পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন তখনই ইহার ব্যবসা এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর অল্প কালের মধ্যেই এই ভীষণ মাদক দ্রব্য বাজারে পাওয়া যাইবে না। যতটুকু ঔষধ পত্রাদির জন্য আবশ্যক কেবল মাত্র ততটুকুই উৎপন্ন হইবে। কি উদার নীতি দেখুন! আশা করি শীঘ্রই তামাক সম্বন্ধেও এইরূপ একটা আইন হইবে। এত কড়া না হইলেও অন্ততঃ ইহার অবাধ প্রচলন দমন করাটা বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়াছে। আজ কাল ছেলে বুড়া সকলেই ধূম পান করিতে শিখিয়াছে। এমন কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভিখারীর মুখেও সিগারেট দেখা যায়।

তামাক তীব্র বিষ একথা পাঠকের সম্মুখে বার বার আনিয়াছি বলিয়া হয়ত অনেকেই আমার উপর "পুনরুক্তি" দোষটা চড়াইবেন। আমি এই দোষ লইতে বেশ রাজী আছি। বারম্বার বলিবার উদ্দেশ্য এই বিষয় যেন পাঠকের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়। ইহার যেন একটা ছাপ পড়ে। চির জীবনেও যেন কেহ একথা না বিস্মৃত হন। যিনি যখনই ধূমপান করিবেন যেন তখনই তাহার মনে পড়ে যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা পাপ করিতেছেন। পাপ বলিলাম কেন? আত্মহত্যা করা মহাপাপ ইহাতে আইনতঃ সাজা হয়। তামাক খাওয়া যে কোনও প্রকারেই হউক না আত্মহত্যা না হইলেও slow poisoning একথাটা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার ব্যবহারে শরীরে উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক শরীর ব্যাধিমন্দির হয় তাহা ধ্রুব সত্য।

কোন কিছুর বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে জিনিসটার বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তামাকের উপাদান কি কি তাহা নিম্ন তালিকায় দেওয়া গেল।

যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সকলেই বুঝিয়াছেন তামাকের বিষের নাম নিকোটিন। এই নিকোটিন এলকালয়ড (alkaloid) বংশীয়। এই বংশের সকল-

গুলিই তীব্র বিষ। আমরা নিকোটিন সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করিতেছি। তামাকের গুণের তারতম্য জল বায়ুর গুণে ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে তামাকের চাষ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।* সাধারণতঃ malic, citric, acidএর সহিত নিকোটিন থাকে। এই নিকোটিন ছাড়া এলকালয়ড বংশীয় বিষ অল্প বিস্তর যথেষ্ট থাকে; তাহাদের মধ্যে nicotinine, nicotein, nicotelline, pyrrolidine methyl-pyrrolidine নামই উল্লেখ যোগ্য।

বিশুদ্ধ নিকোটিন জলীয় স্বচ্ছ তরল পদার্থ বিশেষ। ইহাতে এক প্রকার গন্ধ আছে। ধূমপায়িগণ এই গন্ধের সহিত সুপরিচিত। নিকোটিন বায়ু সংযোগ ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়। যাহারা অত্যন্ত ধূমপান করেন তাহাদের আঙ্গুলের উপর যে হরিদ্রাবর্ণের দাগ দেখা যায় এই নিকোটিনই তাহার কারণ। ২৪৭° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ইহা ফুটিতে থাকে এবং ইহার অপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০১১। জলে ইহা অতি সহজেই দ্রবণীয় নিকোটিনের মত বিষ জগতে অতি অল্পই আছে। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা prussic acidএর সমতুল্য। এই প্র্যাসিক এসিড যে কিরূপ বিষ তাহা সকলেরই জানা আছে। ইহা সেবনের কয়েক সেকেণ্ড পরেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কয়েক ফোটা দেহের মধ্যে ঢুকিলেই প্রাণ বায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়। তামাকের বিষ নিকোটিনও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অতি অল্প মাত্রায়ও ইহা কিরূপ প্রচণ্ড তাহা ধূমপায়ী মাত্রেই জানেন। যখন প্রথমে ধূমপান অভ্যাস করেন তখন কি একটা অদ্ভুদ কষ্ট হয় সে কথা সকল ভুক্তভোগীই স্বীকার করেন। অবশ্য এই তীব্র বিষ ক্রমশঃ অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। ইহা তখনও প্রাণঘাতক না হইলেও শরীর যে যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

বিষ মাত্রেই শরীরের অপকার করিয়া থাকে। সমস্ত বিষেই স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হয় তাহা সকলেরই জানা আছে। অহিফেন সেবীর যতই আনন্দের কথাই শুনুন না কেন প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে। এই অফিম চীন জাতীকে কিরূপ অবনত করিয়াছিল তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই! যাহা বিষ তাহাতে অপকার হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই—থাকিতে পারে না। চীন যে দিন বুঝিল আফিম তাহাকে জগতে জড় করিয়াছে সেই দিনই সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল এ বিষ আর খাওয়া হইবে না। চীন জাতি কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বিষ ত্যাগ করিয়া সভ্য ও স্বাধীন জগতের কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন একবার দেখুন! বহুকাল হইতে পাশ্চত্য দেশে মদ্যপানের প্রথার খুব প্রচলন। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে সর্ব্বদেশে মদ্য ত্যাগ করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে অবাধে মদ্যের প্রচলন ছিল কিন্তু এখন কিসে সৈনিকগণ ইহা ত্যাগ করিবে

* মল্লিখিত তামাকের চাষ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহা জাতীয় চিন্তায় পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মেনির সৈনিকগণ এখন আর কেহ মদ্য পান করে না। সেইরূপ এমন এক সময় আসিবে যখন জগতে সকলেই ধূমপান হইতে বিরত হইবে।

অনেকে এরূপ ভাণ করিয়া থাকেন যে কোনও প্রকার রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ধূমপান করিয়া থাকেন। কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহাতে আর সন্দেহ হয় নাই। কোনও কোনও স্থলে উপকার হয় বটে কিন্তু অন্যত্র ইহার কোনও উপকারিতা নাই। এ সম্বন্ধে Stanley Redgrove, B. Sc., F. C. S. বলেন "Nicotine is an excessively violent poison, its action in pure state being at least as rapid as that of prussic acid. Even in quite small quantities it may produce very unpleasacet symptoms, as most smokers are aware from the memory of thier first pipe. By continued use however, the system becomes to some extent protected against the poisonous effect of nicotine; though there can be no question but that the immoderate use of tobacco is highly injurious."

সর্ব্বপ্রথমে Dworzak ও Heinrich এই নিকোটিন লইয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারা স্বয়ং নিজ দেহ মধ্যে এক মিলিগ্র্যাম মাত্র নিকোটিন সূচিকা দ্বারা পূরিয়া দেন। ইহাতেই তাহাদের বেশ অসুস্থ বোধ হইয়াছিল প্রথমে মুখে ও গল নালীর মধ্যে এক প্রকার চিনচিন করিতে লাগিল পরে ক্রমাগত মুখে লালা আসিতে লাগিল আর এক প্রকার অদ্ভুদ রকম যন্ত্রণা পাকস্থলী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত হস্ত পদাদিতে প্রসারিত হইল। গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। পাঠক একবার ভাবুন কত অল্পতে এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। এক গ্র্যাম কত অল্প তাহা সকলেই জানেন তাহারই হাজার ভাগের এক ভাগ। তাহার পর তাঁহারা দুই মিলিগ্র্যাম দিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন তখন মাথা ধরিল সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল ঘর বাড়ী চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস অনুভূত হইল। তখন কাণে কম আওয়াজ যাইতে লাগিল ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল পৃথিবী যেন শূন্য দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ধূমপায়ীই ধূমপান অভ্যাসের সময় এইরূপ অনুভব করিয়াছেন।

যখন তিন চার মিলিগ্র্যাম আন্দাজ ব্যবহার করা হইল তখন প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে মূর্চ্ছার সূচনা আরম্ভ হইল। প্রাণ মন হুহু করিতে লাগিল। সর্ব্বাংশ রক্ত শূন্য হইয়া পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। হাত পা শীতল হইতে আরম্ভ হইল। মুহুর্মুহু বমি হইতে লাগিল শেষে ভেদ হইতে লাগিল। এক জনের হাত পা কাঁপিতে লাগিল পৃষ্ঠ দেশের মাংস পেশীতে খিল ধরিতে লাগিল শ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্টে চলিতে

লাগিল। অপর ব্যক্তির দুর্ব্বলতা মূর্চ্ছা হস্ত পদাদির কম্পন আরম্ভ হইল। দেহের উপর কি যেন উঠিতেছে এরূপ অদ্ভূদ অনুভবও হইতে লাগিল। দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার প্রতাপ ছিল তবে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে প্রায় তিন দিন লাগিয়াছিল। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন nicotine কি ভয়ঙ্কর বিষ।* ছয় মিলিগ্র্যামেই একজন যুবকের মৃত্যু হয়।

ধূমপানে অনেক সময় প্রাণত্যাগ ঘটিয়া থাকে। Cases of poisoning both accidental and criminal by means of tabacco are more numerous especially the former. Many have occured through the use of Clysters prepared from tobacco and through external application of the herb in the form of a poultice as well as cases in which the poison has been taken through the mouth.

সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে এই বিষের প্রতিশোধক নাই। কিন্তু curareএর সাহায্যে মাংসপেশীর খিল ধরা (cramps) বন্ধ হইয়া থাকে। Zalacks ২৫ মিলিগ্র্যাম নিকোটিনের বিষকে Nasturtium officinale সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে তামাকের ধূমে কি কি থাকে তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। প্রধানতঃ কার্ব্বন ডাইক্সাইড, কার্ব্বন মনক্সাইড Hydrogen sulphide, hydrogen cyanide বা prussic acid, নিকোটিনে এমনিয়ার প্রায়ই বিকার ঘটে হয় pyridine না হয় collidine হইয়া থাকে।

এইবার আমরা এই ধূমপান প্রথা সম্বন্ধে জগতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মতামত লিপিবদ্ধ করিতে বসিলাম। পাঠক দেখিবেন যে অনেক লোকই এ প্রথার বিরোধী। আমাদের দুর্ভাগ্য এত যে আমরা জোর করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিতেছি। আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে লোকে খাইতে না পাইয়া পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করিতে বসিয়াছে তথাপি ধূমপান করিতে ছাড়িতেছে না। এই সকল লোককে কিরূপে ধূমপানে বিরত করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আগামী বারে আলোচনা করিব। আমাদের দেশের যুবকগণ আজকাল ফ্যাসানের জ্বালায় ধূম পান করিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিতেছে। আমাদের দরিদ্র দেশে আজকাল যাহার ১৫ টাকা মাহিনা তাহারও মাসিক দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত সিগারেটের বিল হইয়াছে। একে ম্যালেরিয়া ও ক্ষয় রোগে দেশ উজাড় হইতেছে তাহার উপর আবার অনেকে ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞতা বশতঃ মৃত্যু দ্বারে দাঁড়াইতেছেন।

* Poisons : Thier effects and Detection, by Alexander and Meredith Wynter Blyth.

ধূমপান রোধ করিবার জন্য আমেরিকা আজকাল বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। ইহাই জগতের নিয়ম! ভারতে অফিমের চাষ অবাধে হইত এবং কতকোটি টাকা ইহাতে আয় হইত ভারতই আজ আফিমের চাষ বন্ধ করিতেছে! আমেরিকার অনেকে তামাকের ব্যবসা করিয়া ধনকুবের হইয়াছে তাই আমেরিকাই এই প্রথা রোধ করিতে বদ্ধ পরিকর!! আমেরিকা জগতে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন এবারও এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন।

জগত বিখ্যাত Edisonএর নাম আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই শুনিয়াছেন। তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা জগতের কত হিত সাধন করিয়াছেন একথা কাহারও অজ্ঞাত নাই। তিনি তাহার West Orange কারখানার চতুর্দ্দিকে সাইন-বোর্ডে লিখিয়াছেন:—

Cigerattes NOT TOLERATED

They dull the brain.
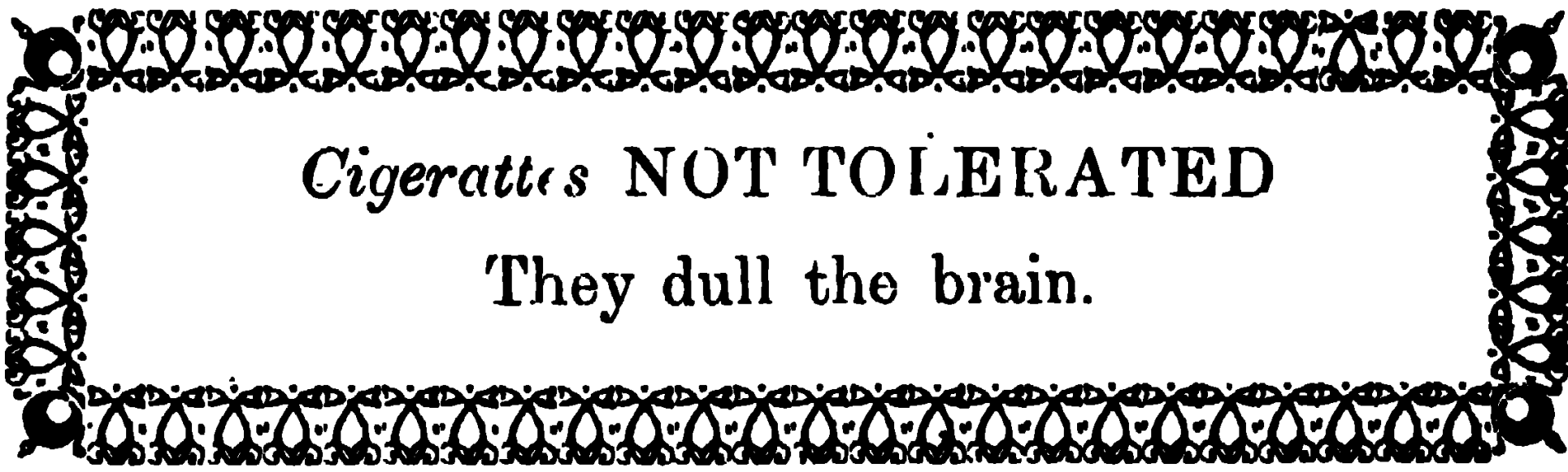
Edison স্বয়ং প্রায় ২০ প্রকার সিগারেটের বিশ্লেষণ করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে সি'ারেট মাত্রই বিষাক্ত। যাহাতে তাঁহার কারখানায় কোনও লোক এই বিষ না ব্যবহার করে তাহার জন্য তিনি এইরূপ সাইনবোর্ড লাগাইয়াছেন আর এ বিষয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এ স্থলে Edisonএর উক্তি পাঠকের অবগতির জন্য লিখিত হইল।

"এই বিষ মানুষের মস্তিষ্ক নিস্তেজ করিয়া দিয়া তাহার বুদ্ধিকে প্রসারিত হইতে দেয় না। মনের উদ্যম একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। Evaristo Madero মেক্সিকোর প্রতিনিধির ভ্রাতা একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে মেক্সিকোর লোকেরা সকলেই ধূমপায়ী। এই কারণেই বোধ হয় মক্সিকোর লোক কতকটা নিরেট বা মূর্খ।" Edison পূর্ব্বে ধূমপান করিতেন কাজেই তাহার উক্তিতে মিথ্যা নাই। তিনি চান যাহাতে কারখানার লোকের মস্তিষ্ক খুব সতেজ থাকে। তাঁহার কাজ লইয়াই কথা। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকিলেই তাঁহার কার্য্য চলিবে। কাজেই তিনি বিশেষ করিয়া দেখেন তাঁহার কারখানার লোকেরা যেন সিগারেট খাইয়া মস্তিষ্ক নিস্তেজ করিয়া না ফেলে। **He believes; cigarette-smoking renders persons less able to exersoise thier faculties and he therefore banishes the offending cigerattes.**

তাহার পর এক্ষণে আমেরিকায় অনেক লোকেই কারখানায় সিগারেট বা অন্য প্রকার ধূমপান প্রথা রদ করিয়াছেন। অনেকস্থলে রেলের কুলিদের ধূমপান করিতে দেওয়া হয় না কেন না তাহাতে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার পর এক বিখ্যাত মটরগাড়ী ওলাও ধূমপান রদ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশ করিবে না! ইচ্ছা করিলে আমরাও এই প্রথা অবলম্বন করিতে পারি। ইঞ্জিনীয়ারগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের অধিনস্থ কর্ম্মচারিদের ধূমপান রোধ করিতে পারেন; বড় বড় ছাপাখানা-ওলারা তাঁহাদের অধিনস্থ শত শত লোককে এই সর্ব্বনাশকারী প্রথা হইতে বিরত করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে সবই হইবে কিন্তু এই বিষয় কয়জন হাত দিবেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সকলেই যদি চেষ্টা করেন অতি অল্পকালের মধ্যেই এ প্রথা দমন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের যাহারা শিক্ষিত তাহারা শিক্ষাভিমানেই গেলেন!! তাঁহারা কি এই সকল অজ্ঞ লোকদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ইহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিবেন? না তাঁহারা ত বুঝাইবেন না আবার নিজে বুঝিয়াও ধূমপান করিতে ছাড়িবেন না। এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট আমরা বাতুল আর আমাদের কথা প্রলাপ মাত্র! যাহাই হউক আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

অল্প ধূমপানে ক্ষতি কম হয় বটে কিন্তু অল্প ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট নহে। আমার বেশ জানা আছে যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা দিনে অন্ততঃ ২০টা সিগারেট বা ১০টা চুরুট খাইয়া থাকেন। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এইরূপে পয়সা পুড়াইবার আবশ্যকতা কি? সাধারণতঃ প্রত্যেকেই অন্ততঃ ১০টা সিগারেট প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাবুন কি অর্থের অপব্যয় তাহা ছাড়া সাধ করিয়া মরণকে বরণ করিবার ইচ্ছা!!

মত সংগ্রহঃ—নিউইওর্কএর River Side হাসপাতালের Chaplain Edward Cleveland M. A. মহোদয় বলেন *:—

"নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে গেলেও এই বলিতে হয় ধূমপানে বাস্তবিকই শরীর ও মনের যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকে যে অল্প ব্যবহারে বিশেষ ক্ষতি হয় না। ক্ষতি বিশেষ না হইলেও ক্ষতি যে হয় তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ঔষধ হিসাবে যে জিনিস উপকারী সুস্থ অবস্থায় তাহা যে হানিকর তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমরা এখানে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা অল্প ব্যবহারের কথাই বলিতেছি কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা কেবল অত্যধিক ধূমপানের অপকারিতা লিপিবদ্ধ করিতেছি।"

* Medical Times, June, 1914.

"সকলেই জানেন যে অল্প অল্প ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমে শেষ তাহা আর কোনও বাধাই মানিতে চাহে না। প্রথমে যাঁহারা ধূমপান করেন তাঁহারা বন্ধুবান্ধবের নিকট এক আধ "টান" দিয়াই খুসী থাকেন পরে নিজেই দুই একটা ব্যবহার করেন পরে তাহার আর মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকে না তখন অবাধে চলিতে থাকে। আমাদের এই দরিদ্র দেশের কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা এখানে মুটে মজুরের দশ বার পয়সা মাত্র আয়। তাহার মধ্যে প্রায় অনেক লোকের প্রত্যহ দুই পয়সা ধূমপানে ব্যয়িত হয়। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহই সাহস করিয়া বলিবে না যে ধূমপান ভাল। সকলেই ইহার অপকারিতার কথা স্বীকার করে।"

"সকলেই জানেন যে যত অল্পমাত্রাতেই ব্যবহার করা হউক না কেন তামাক বিষ। আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য যে লোকে যেন বেশ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করে যে বেশী মাত্রায় যাহা এক দিনে হয় অল্প মাত্রাতেও সময়ে ঠিক সেইরূপেই মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস ফুস পাকস্থলী আক্রান্ত হইয়া থাকে This article is written to remind its readers that the habitual smoking of tobacco in moderation will if given time enough, produce similar results in heart, brain, stomach, lungs and other vital organs to those brought about more rapidly by smoking to excess."

"আমার এই উক্তির প্রমাণ ধূমপায়িরা দিবেন তাঁহারাই বলুন যে সুস্থ শরীরে কেবলই বিষ গ্রহণে কি ফল দিবে। আজই হউক আর দশ দিন পরেই হউক তাঁহারা নিশ্চয়ই নানা প্রকার উৎকট পীড়ায় ভুগিবেন। যিনি জানিয়া শুনিয়া ধূম-পানে রত হন তিনি আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত।"

"ধূম পানে নিম্ন লিখিত ব্যাধিগুলি হইয়া থাকে :—

Tabacco Blindness বা "ধূমপান অন্ধতা" এই রোগ বড়ই দুশ্চিকিৎস্য। যত প্রকার চক্ষুর রোগের আছে তাহার মধ্যে ইহা অতি উৎকট ব্যাধি। ওষ্ঠের, জিহ্বার গলার যত প্রকার cancer বা ঘা হয় তাহার অধিকাংশই ধূমপান ঘটিত। প্যারী নগরের বিখ্যাত চিকিৎসক Bouchard বলেন যে অধিকাংশ হৃদ্ রোগ ধূমপান ঘটিত; Bouchard হৃদ্‌রোগের বিশেষজ্ঞ এস্থলে তাঁহার মত অগ্রাহ্য নহে। তিনি বলেন যে গত দশ বৎসরে এই রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন শতকরা ১০ জন ধূমপায়ীর মূত্রের সহিত albumen নির্গত হইতে থাকে। লণ্ডন নগরের বিখ্যাত চিকিৎসক Wright বলেন যে ধূমপান করিলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (resistance) একেবারে কমিয়া যায় কাজেই লোকে অতি অল্পেই ক্ষয়কাশের কবলে পতিত হয়। যে ক্ষয়কাশ রোগ আপনা হইতেই পৃথিবী ওজড় করিতেছে ধূমপায়িগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রোগকে ডাকিতেছেন! Phipps

Institute এ মৃত্যুর পরে ব্যবচ্ছেদে (Post mortem examination) দেখা যায় যে ধূমপায়িগণ প্রায় দ্বিগুণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে। জগতের বিখ্যাত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে উল্লেখ দেখা যায় যে Bright's disease, Arterio-Sclerosis, Angina pectoris, প্রভৃতি উৎকট রোগ সব ধূমপান জনিত। আবার এই সমস্ত রোগ শত ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিখ্যাত London Lancet পত্রিকা বলেন যে nicotine ছাড়াও তামাকে ভয়ঙ্কর বিষ থাকে সেটি কারবন মনক্সাইড। প্রতি ঔন্সে প্রায় ৩।৪ পাইট এই বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হয় অর্থাৎ প্রায় একটি সিগারেটে এই পরিমাণে কারবন মনক্সাইড থাকে। এই বাষ্পও যে কি ভয়ঙ্কর বিষ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমরা যখন ভাবি যে শতকরা $\frac{২}{১০}$ ভাগেও জীবের মৃত্যু ঘটিয়াছে আর $\frac{৪}{১০}$ ভাগে মানবেরও মৃত্যু হইতেছে তখন যে ধূমপানে এত রোগ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছুই থাকে না। অনেকে বলেন যে অমুক ধূমপান করিয়া বহু বৃদ্ধ বয়স অবধি বাঁচিয়াছিলেন। এরূপ দু চারিটা উদাহরণ দেখান যাইতে পারে কিন্তু প্রত্যেক এরূপ বৃদ্ধের সহিত সহস্র লোকের মৃত্যু কারণ ধূমপান ঘটিত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

Russian National Health Societyর কার্য্য বিবরণী পাঠে জানা যায় যে ধূমপানে বালক ও যুবকদের কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। St. Petersburg নগরের চিকিৎসা ও বাণিজ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শত করা ২১।২২ জন ধূমপায়ী। আবার এই ধূমপায়ী শতকরা ১৬ জনের কোনও না কোনও প্রকারের ফুসফুসের ব্যাধি আছে। যাঁহারা ধূমপান করেন না তাঁহাদের শতকরা ১০ জন মাত্র এরূপ ব্যাধি গ্রস্থ।

যাঁহারা ১৬ বৎসরের পূর্ব্বেই সিগারেট খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন তাহারই অধিকাংশ রোগে ভুগিয়া থাকেন। Tale Universityর ডাক্তার J. W. Seaver বলেন যাঁহারা ধূমপান করেন না তাঁহারা কালেজ জীবনের চারি বৎসরের মধ্যে দৈর্ঘ্য সামর্থ্যে সর্ব্ব বিষয়ে ধূমপায়ী অপেক্ষা শতকরা ১৮ জন হিসাবে বাড়িয়াছেন। যাঁহারা মধ্যে মধ্যে ধূমপান করেন তাহারও ধূমপানকারী অপেক্ষা শতকরা ১২ জন অধিক স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছেন। আবার ফুসফুস যন্ত্রের সম্বন্ধে এ বিষয় আরও বিসদৃশ্য লক্ষিত হয়।

In actual lung capacity, this fact is very significant, the non smokers gained 50 per cent over regular smokers and 35 percent over irreguler smokers.

(ক্রমশঃ)

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেত-সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গত প্রবন্ধে কারবন ডাইঅক্সাইড সম্বন্ধে যথা সম্ভব আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে পত্রহরিৎ বা ক্লোরোফিল (chlorophyll) সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। এই পদার্থ সন্নিবেশের জন্যই বৃক্ষাদি হরিৎবর্ণ ধারণ করে। পৃথিবীর মাধুর্য্যের প্রধান কারণ বৃক্ষলতাদি। কিন্তু বৃক্ষলতাদি যদি হরিৎ না হইত, তাহা হইলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কুত্রাপি এরূপ নয়ন মুগ্ধকর হইত না। এতদ্ব্যতীত আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ কার্য্যে পত্র হরিৎ একান্ত প্রয়োজনীয়।

যাবতীয় প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের মৌলিক উপাদান প্রোটোপ্ল্যাজম্। অথবা ইহাই মৌলিক জীবনী শক্তি। বৃক্ষাদি প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ, অতএব ইহাদেরও প্রোটোপ্ল্যা-জম আছে। পত্রহরিৎ প্রোটোপ্ল্যাজমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রোটোপ্ল্যাজম ও পত্রহরিতের সংযুক্ত নাম ক্লোরোপ্লাষ্ট (chloropast)। সময়ে সময়ে পত্রহরিৎ প্রোটোপ্ল্যাজমের উপর পাতলা চর্ম্মবৎ আবরণ স্বরূপ হইয়া থাকে। কখনও কখনও পত্রহরিৎ কণিকা আকারে প্রোটেপ্ল্যাজমে বিক্ষিপ্ত থাকে। সুরাসার দ্বারা পত্র হরিৎ দ্রবীভূত হইয়া নিঃসৃত হইয়া আইসে। সুরাসারে দ্রব পত্রহরিৎ গাঢ় সবুজ দ্রাবণ। প্রতিফলিত আলোকে এই দ্রাবণ দেখিলে অতি মনোরম লাল বর্ণ ধারণ করে। পত্রহরিতের সুরাসার দ্রাবণে বেন্‌জিন্ (benzene) ঢালিয়া রীতিমত নাড়িলে সুরাসারের সহিত ক্রিয়ায় একরূপ হরিদ্রাভ স্তর পড়ে এবং বেনজিনের সহিত পত্রহরিৎ দ্রবীভূত হইয়া নীলাভ হরিৎ দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। এই হরিদ্রাভ পদার্থ ক্যারোটিন অঙ্গার হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ এবং কমলাবর্ণের দানা বাঁধে। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন C_{40}, H_{56}। কিন্তু নীলাভ হরিৎ দ্রাবণটি অত্যন্ত জটীল, এবং ইহার অধিকাংশই দ্রবীভূত পত্র হরিৎ। আলোক কর্ত্তৃক সংশ্লেষণ ব্যাপারে এই নীলাভ হরিৎ পদার্থটিই অতি প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহার গবেষণাতেই পণ্ডিতগণ সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাকেও দানার আকারে পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার অবস্থা তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ ইহাকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য নানারূপ নির্দ্দেশক (formula) ব্যবহার করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহাতে নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরাস্ আছে। মস্তিষ্ক পুষ্টির জন্য ফস্‌ফরাস্ ঘটিত লেসথিন নামক এক প্রকার বস্তুর আবশ্যক। ডিম্বে লেসিথিন পাওয়া যায়। পত্র হরিতের ফসফরাস্ অনেকটা লেসিথিনের

হ্যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম রহিয়াছে।

এই পত্র হরিৎ লইয়া বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। উইল্স্টিটার, ম্যাচলিউস্কি, ষ্টকলাসা, (Willstætter, Machlewski, Stoklasa) ইত্যাদি বহু পণ্ডিত এ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। শোণিত বিশিষ্ট জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য হিমোগ্লবিন নামক এক প্রকা পদার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পত্র হরিৎকে বিশ্লিষ্ট করিলে দেখা যায় যে, হিমোগ্লবিনে যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, ক্লোরোফিলেও সেই সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান। জীবের প্রাণ রক্ষার্থ হিমোগ্লবন যেরূপ প্রয়োজনীয়, পত্র হরিৎ উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষার্থ সেইরূপ প্রয়োজনীয়। পত্র হরিতের রসায়নিক তত্ত্ব এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু অঙ্গার ঘটিত রসায়ন বিজ্ঞানে এতৎ সম্বন্ধে নানাবিধ আশ্চর্য্য জনক ও চমৎকার পরীক্ষা এবং গবেষণা সঙ্কলিত আছে।

যাঁহারা আলোক বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্পেকট্রাম (spectrum) কি এবং ব্যাণ্ড (band) কি তাহা অবগত আছেন। এতৎ প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা অসম্ভব। ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইবে। শুভ্র আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া লোহিতাদি ৭টি বর্ণে বিভক্ত হয়। যে যন্ত্র দ্বারা এইরূপ বিশ্লেষণ করা যায় তাহাকে স্পেকট্রস্কোপ বলে। সূর্য্যালোকের স্পেকট্রাম্এ নানারূপ কৃষ্ণকায় লম্ব রেখা পাত হয়, পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্যালোক সূর্য্য হইতে বাহির্গত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পরিবেষ্টিত বহুবিধ বাষ্পীভূত পদার্থের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। সূর্য্যে যে যে পদার্থ আছে, বাষ্পেও সেই সেই পদার্থ আছে। আলোক ইথারে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোনও পদার্থ নিঃসৃত আলোক তরঙ্গ সেই জাতীয় পদার্থের মধ্য দিয়া আগমন করিবার সময় পরিশোষিত হইয়া যায়। কাজেই সেই স্থানে তরঙ্গের অভাব হয়। এইরূপ আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া স্পেকট্রাম উৎপাদন করিলে, আলোকের যে যে স্থানে তরঙ্গের অভাব ঘটে সেই সেই স্থানে দাগ পড়ে। ইহাকে য্যাবসর্প্শন্ ব্যাণ্ড (absorption band) বলে। এইরূপে শুভ্র আলোক যদি অন্য কোন পদার্থের মধ্য দিয়া যাইয়া স্পেকট্রাম উৎপাদন করে, এবং স্পেকট্রামে যদি ব্যাণ্ড পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যে পদার্থের মধ্য দিয়া আলোক প্রবাহিত হইতেছে, সেই সেই পদার্থ, যাহা হইতে আলোক উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেও বর্ত্তমান আছে। পত্র হরিৎকে সুরাসারে দ্রবীভূত করিয়া তৎবাহিত আলোকের স্পেকট্রামে দেখা যায় যে তাহার লোহিত বর্ণে অতি পরিষ্কার একটি য্যাবসর্প্শন্ ব্যাণ্ড পড়িয়াছে। কোন জীবিত বৃক্ষপত্রে শুভ্রালোকের স্পেক্ট্রাম নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করিলে দেখা যায় যে পত্রের যে স্থানে স্পেকট্রামের লোহিত অংশ নিক্ষিপ্ত ছিল, সেই অংশেই

অধিক পরিমাণে শ্বেতসার (Starch) উৎপাদিত হইয়াছে। অতএব শুভ্রালোকের লোহিত অংশে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাই শোষণ করিয়া পত্রহরিৎ আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণে সহায়তা করে। এই যে শক্তি শোষিত হয়, তাহার অধিকাংশ, পত্র নিজ পুষ্টির জন্য গ্রহণ করে, এবং ইহা হইতে বৃক্ষপত্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই শক্তির অতি অল্প অংশ মাত্র আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণের ফলে অর্থাৎ অঙ্গার-হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থে প্রচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ আমাদের চর্ম্ম শোষণ করিলে, তৎ-শক্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের শরীরে কিরূপ অসুখকর ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা আলোকচিত্রণের কার্য্য অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত পদার্থ সমষ্টি রৌপ্য-ঘটিত লবণে এরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করে যে, পদার্থ-সমষ্টির চিত্র প্লেটে চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়ায় যেমন কোন কোন ফ্লুওরেসেণ্ট (fluorescent) পদার্থ, মাত্র রাসায়নিক ক্রিয়া উত্তেজকের কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ কেহ কেহ মনে করেন যে, পত্রহরিৎ আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণে সেইরূপ ক্রিয়া-উত্তেজকের কার্য্য মাত্র করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, পত্রহরিৎ সৌরশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে পরিণত হইতে সাহায্য করে মাত্র, এবং এই তড়িৎশক্তি কারবন ডাইঅক্সাইড এবং জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণের প্রথম পদার্থ উৎপাদিত করে।

প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই নিশ্বাস গ্রহণ অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ আবশ্যক। কাজেই বৃক্ষও নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ বৃক্ষও অক্সিজেন গ্রহণ ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে না। বৃক্ষ কারবন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া পুষ্টি সাধন করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন করে।

অত্যল্প আলোক হইলেই আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গার-শোষণ ক্রিয়া পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু আলোক অত্যল্প হইলে যে কারবন ডাই-অক্সাইড গৃহীত হয়, তাহার পরিমাণও অল্প হইয়া পড়ে। অতএব অত্যল্প আলোকে অক্সিজেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া উদ্বৃত্ত না হয়, ততক্ষণ পরিত্যক্ত হয় না। খুব সম্ভবতঃ যে সমস্ত অবস্থায় উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে, তত্তৎ অবস্থায় আলোক-কর্ত্তৃক-সংশ্লেষণ ব্যাপার সুচারুরূপে পরিচালন জন্য আলোকের অভাবে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটেনা, পরন্তু কারবন ডাইঅক্সাইড, জল, উপযুক্ত তাপ-মাত্রার অভাবেই উক্ত কার্য্য পরিচালনে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আমরা জানি ন্যুব্জা-কার কাচখণ্ড সমূহ বিস্ফারিত আলোককে একত্রিত করিয়া একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে, এবং যে স্থানে কেন্দ্রীভূত করে তথায় আলোকের ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কোন কোন বৃক্ষ আওতায় অর্থাৎ ছায়া যুক্ত স্থান ব্যতীত জীবিত থাকে না, অথবা কোন কোনটি ছায়া যুক্ত স্থানেই বেশ বর্দ্ধিত হয়। ইহাদের যে সমস্ত কোষে (cell) ক্লোরো-

প্ল্যাষ্ট থাকে, সেই কোষগুলি ন্যুব্জাকার কাচ খণ্ডের ন্যায় সজ্জিত থাকে, এবং যতটুকু আলোক পতিত হয়, তাহাকে একত্রিত করিয়া ক্লোরোপ্ল্যাষ্টের উপর পাতিত করে। সাধারণ বৃক্ষে ক্লোরোপ্ল্যাষ্টের উপর আলোক পুঞ্জীভূত করিবার নানাবিধ আশ্চর্য্যজনক উপায় রহিয়াছে, এবং পতিত আলোকের অবস্থানুসারে কোষমধ্যস্থ ক্লোরোপ্ল্যাষ্টের স্থানও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রত্যেক পত্রই বৃক্ষদেহে নিজের স্থান এরূপ ভাবে করিয়া লইতে চেষ্টা করে যে, সে যেন প্রচুর আলোক পায়। কাজেই এরূপে পত্র বৃক্ষদেহে সজ্জিত হয় যে, কোন পত্র অপর পত্রের আলোক লাভের চেষ্টা এবং পথ প্রতিরোধ করিতে না পারে*। উচ্চ স্থান হইতে (যে দিক হইতে অধিকাংশ আলোক পতিত হয়) একটি বৃক্ষ দেখিলে দেখা যায় যে, বৃক্ষ মস্তক নিরবচ্ছিন্ন হরিৎপত্র আবরণে আবৃত রহিয়াছে। কাজেই বৃক্ষে যতটুকু আলোক পতিত হয়, তাহার সমস্তই কাযে লাগিয়া থাকে। বৃক্ষে অত্যুজ্জ্বল শুভ্রালোকে পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতসার উৎপাদিত হইতে থাকে না, কিয়ৎকাল পরে শ্বেতসার উৎপাদিত হয়। ইত্যবসরে শ্বেতসার প্রস্তুত হইবার প্রথম উপাদান সমূহ উৎপাদিত হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সমস্ত উপাদান প্রচুর সঞ্চিত হইলে তবে শ্বেতসার উৎপাদিত হয়। একটি পত্রের মধ্যে জল শূন্য ভাগের ওজন আলোক পাইলে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই বৃদ্ধিই আলোক প্রাপ্তিকালে উৎপাদিত শ্বেতসারের পরিমাণ নহে। এই বৃদ্ধি দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে পত্রে কেবল মাত্র তত পরিমাণ শ্বেতসার সঞ্চিত আছে মাত্র। উৎপাদিত শ্বেতসারের অবশিষ্টাংশ প্রবাহিত হইয়া গৌণ শ্বেতসার বা secondary starch রূপে অন্যত্র সঞ্চিত হইতে থাকে। আলুর প্রধান উপাদান শ্বেতসার, এই শ্বেতসার প্রথমে পত্রে উৎপাদিত হইয়াছিল, অবশেষে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মৃত্তিকা অভ্যন্তরে লুক্কায়িত শাখাপ্রান্তে আলুর আকারে সঞ্চিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে আয়তন পরিমাণ কারবন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয় ঠিক সেই আয়তন পরিমাণ অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয়। এই গৃহীত কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে প্রথম বিভেদনীয় পদার্থ—শ্বেত-সার। শ্বেত-সারের আণবিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক ১২,০০০ হইতে ৩০,০০০। কাজেই এরূপ জটীল পদার্থ কেবলমাত্র জল ও অঙ্গার হইতে উৎপন্ন—এরূপ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বিখ্যাত উদ্ভিদ-

* এইরূপ চেষ্টার ফলে "লিফ মোজেয়িক (Leaf mosaics)" উৎপাদিত হয়। অতএব লিফ মোজেয়িক বলিলে বৃক্ষদেহে পত্রের এরূপ বিন্যাস বুঝায় যে, তৎ বিন্যাস দ্বারা প্রতি পত্রের আলোক লাভ-পথ অন্য পত্র কোনও রূপে প্রতিরুদ্ধ করিতে না পারে। লিফ মোজেয়িক জন্য বৃক্ষ অতি সুন্দর ও নয়নানন্দকর হয়

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেয়ারের (Baeyer) মতে অঙ্গার এবং জল হইতে প্রথমে ফরম্যালডি-হাইড উৎপাদিত হয়, এবং ইহা অতি শীঘ্র গাঢ় হইয়া শর্করায় পরিণত হয়। খুব সম্ভবতঃ ইহাই আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ ব্যাপারের প্রকৃত ক্রিয়া ও ধর্ম্ম। পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণের প্রথম উৎপাদিত অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ গ্লুকোজ; এবং এই গ্লুকোজ হইতে, পরে উদ্ভিদের প্রয়োজনানুসারে শর্করা, মাখন জাতীয় পদার্থ, প্রোটীন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। অধিকাংশ বৃক্ষেই দিবাভাগে এই গ্লুকোজ অতি শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া শ্বেত-সার উৎপাদন করে, এবং এই শ্বেত-সার উদ্ভিদ-কোষ পূর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু যেমনই আলোকের অবসান হইতে থাকে, অমনই অর্থাৎ সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে আলোক-কর্তৃক সংশ্লেষণ-ব্যাপার বন্ধ হয়, এবং দিবসের উৎপাদিত শ্বেত-সার, গ্লুকোজ এবং ঐ জাতীয় সহসা দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষের অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। অতএব এক্ষণে ধরিয়া লওয়া হউক যে, গ্লুকোজই প্রথম অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ। তাহা হইলে আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণে যেরূপ ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে নির্দ্দেশিত করা যাইতে পারে।

$$6CO_2 + 6H_20 = C_6H_{12}0_6 + 6O_2$$
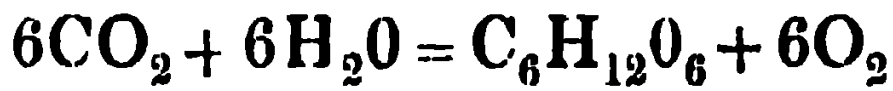
কারবন ডাইঅক্সাইড জল গ্লুকোজ অক্সিজেন।

এই সমীকরণ দ্বারা আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণের যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হইল না। কেবলমাত্র সাধারণ-বোধ্য একটা তথ্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির বিষয় আজও পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত রহিয়াছে। গ্লুকোজ দগ্ধ করিলে তাহার তাপ-শক্তির পরিমাণ ৩.৭৫ ক্যালরি। এই শক্তির সমস্তাংশই প্রথমে সূর্য্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

অবশ্য সমস্ত বৃক্ষই শ্বেত-সার রূপে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখেনা। তবে অধিকাংশ বৃক্ষেই শ্বেত-সার উৎপাদিত হয়। লিলি, অরকিড এবং অ্যামারিলিস্ (amaryllis) বর্গের যাবতীয় বৃক্ষে আদৌ শ্বেত-সার উৎপাদিত হয় না, অথবা শ্বেত-সারের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প মাত্র। কিন্তু রবিশস্যাদি, শুঁটি-জাতীয় বৃক্ষাদিতে ও আলু জাতীয় বৃক্ষবর্গে প্রচুর শ্বেত-সার সঞ্চিত হয়। যদি শ্বেত-সার উৎপাদিত না হয়, তাহা হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কতিপয় বৃক্ষে ইক্ষু-জাতীয় শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৈলময় পদার্থ, নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, গ্লুকোসাইড্স্ ইত্যাদি খুব সম্ভবতঃ আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণের ফল নহে, বোধ হয় এই সমস্ত জটীল অঙ্গার-হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ, কিছু পরে গ্লুকোজের সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়া, অথবা গ্লুকোজ নিজেই বিভিন্ন উপায় ঘনীভূত হইয়া উৎপাদিত হয়। আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণের প্রথম পদার্থসমূহের রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদনের প্রচুর শক্তি থাকে। ঠিক এই

অবস্থায় এই সমস্ত পদার্থ নাইট্রেট, ফসফেট, সালফেট ইত্যাদির সহিত ক্রিয়ায় প্রোটিন উৎপাদিত করে। হরিৎ পত্রে নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া মুহূর্তে সাধিত হয়, মানুষের যন্ত্রাগারে বা ল্যাবরেটীতে কখনই এ সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে না।

যদি উদ্ভিদ কোষে গ্লুকোজ, সারকোজ, গ্লিসারিণ বা ঐ জাতীয় পদার্থ প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে, তাহা হইলে অন্ধকারে পত্রহরিৎ অবর্ত্তমানেও উদ্ভিদ কোষ সমূহ শ্বেত-সারে পূর্ণ হইতে পারে। কাজেই আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ ব্যাপার দ্বারা অন্য কোনও পদার্থ উৎপাদন এবং শ্বেত-সার উৎপাদন, এই দুইটিতে প্রভেদ যথেষ্ট। নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, মাখন জাতীয় পদার্থ এবং অন্যান্য নানাবিধ অঙ্গার ঘটিত পদার্থও অন্ধকারে উৎপাদিত হইতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এরূপও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আলোক প্রাপ্ত হইলে, অনেক জলজ উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম্ বা জীবনী শক্তির মৌলিক উপাদান এবং পত্রহরিৎ, অর্থাৎ ক্লোরোপ্ল্যাষ্ট সঙ্কুচিত হয় এবং তাহাদের প্রোটীন জাতীয় পদার্থ শ্বেত-সারে পরিণত হয়। এরূপও সম্ভব যে হয়ত আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ বলিলে ইহাও বুঝায় যে এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্ল্যাষ্ট নিহিত প্রোটীন জাতীয় পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া অঙ্গার-হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থের উৎপাদন করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলোক-কর্তৃক-সংশ্লেষণ এবং শ্বেত-সার উৎপাদন এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ফরম্যালডিহাইড উৎপাদিত হয়। ইহা সত্য কি না তাহা স্থির করিবার জন্য পণ্ডিতগণ হরিৎ পত্রে ইহার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ফরম্যালডিহাইডকে ঘনীভূত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বেত-সার উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েকজন পণ্ডিত বাস্তবিকই পত্রে নানাবিধ আরক প্রয়োগে ফরম্যালডিহাইডের অস্তিত্ব-সূচক লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই ফরম্যালডিহাইড আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছুই স্থির হয় নাই। ইহা অপেক্ষা আরও জটীলতর য়্যালডিহাইড সম্প্রতি কারটিনস এবং ফ্র্যানজেন কোন কোন পত্র হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পত্রে ফরম্যাল্‌ডিহাইড বা ঐ জাতীয় দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া শ্বেতসারের উৎপাদনের চেষ্টায় পণ্ডিতগণ অংশতঃ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ফরম্যালডিহাইডের ক্ষার ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রাবণে ফরম্যালডিহাইড আপনাআপনিই ঘনীভূত হইয়া গ্লুকোজের ন্যায় শর্করা উৎপাদন করে। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, মৃদু এবং নীরব তড়িৎ বিচ্ছুরণে কারবন ডাইঅক্সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া ফরম্যাল্‌ডিহাইড উৎপাদন করে, এবং এই ফরম্যালডিহাইড পূর্ব্বোক্তরূপে শর্করা উৎপাদন করে। ষ্টক্লাসা লক্ষ্য করিলেন যে, ক্ষার বর্ত্তমানে, বেগুনিয়া-অতীত

আলোক* কারবন ডাই অক্‌সাইড এবং নব-উৎপাদিত হাইড্রোজেনের মিশ্রণের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদিগকে শর্করার পরিবর্ত্তিত করে। ফরম্যালডিহাইড এবং অক্‌জালিক দ্রাবক কাচের নলে পূরিয়া নলের দুই মুখ বন্ধ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিলে যে গুলি রৌদ্রে রাখা হয় সেইগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সরবোজ উৎপাদিত হয়। কাচে অত্যল্প মাত্র ক্ষার ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যমান থাকে, আলোক এবং এই ক্ষার উক্ত প্রক্রিয়ায় ক্যাটালিসিস্ (catalysis)এর † ন্যায় কার্য্য করে। তাড়িৎ এবং বেগুনিয়া অতীত আলোক তাপ-মাত্রাকে এরূপ পরিমাণে হ্রাস করে যে, এই সমস্ত পদার্থ ঘনীভূত হইতে পারে। অন্য উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা জল বা জিলাটিনের উপর অতি পাতলা এক স্তর পত্রহরিৎ উৎপাদিত হইয়াছে। এই কৃত্রিম পত্র আলোকিত করিয়া অতি সামান্য ক্যাটালেস প্রযুক্ত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য যদি হাইড্রোজেন পেরক্‌সাইড উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। পরীক্ষকগণ বলেন যে আলোকিত করিবার অবস্থানুসারে এবং কারবন ডাইঅক্‌সাইড বর্ত্তমান থাকিলে সামান্য পরিমাণ ফরম্যাল্‌ডিহাইড উৎপাদিত হয়। এই সমস্ত আধুনিক পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শর্করা এবং চিনি উৎপত্তির মূলে ফরম্যাল্‌ডিহাইড উৎপত্তির উপপত্তি সত্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আলোক কর্ত্তৃক সংশ্লেষণ এই নৈসর্গিক ব্যাপারের কতকাংশ কিরূপে সম্পাদিত হয় মানব তাহা বুঝিতে পারিতেছে। অধিকন্তু এই নৈসর্গিক ব্যাপারের কতকাংশ কৃত্রিম উপায়ে মানব স্বীয় পরীক্ষাগারে সম্পাদন করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

---

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শুভ্রালোক বিশ্লিষ্ট হইলে, লোহিতাদি ৭ বর্ণের ৭টি আলোক উৎপন্ন হইয়া পাশে পাশে সজ্জিত হয়। এই আলোক সজ্জার এক প্রান্তে লোহিত এবং অন্য প্রান্তে বেগুণিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে লোহিত এবং বেগুণিয়ার পরেও আলোক থাকে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। বেগুণিয়া প্রান্তের এই অতীন্দ্রিয় আলোককে ultra-violet বা বেগুণিয়া অতীত এবং লোহিত প্রান্তের অতীন্দ্রিয় আলোককে ultra-red বা লোহিত অতীত আলোক বলে।

† ক্যাটালিসিস। উদাহরণ—পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার রাসায়নিক যৌগিক অত্যন্ত অধিক উত্তপ্ত হইলে অক্সিজেন প্রদান করে। কিন্তু ইহার সহিত বালি বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাইলে অল্প উত্তাপে অক্সিজেন নির্গত হয়। অথচ বালির কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। এস্থলে কেবলমাত্র পোটাসিয়াম ক্লোরেট কার্য্য করে। অতএব যে পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণে সহায়তাকরে, অথচ স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, তাহাকে ক্যাটালিসিস বলে।

মানব ও বিহঙ্গম।

প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, উদ্ভিদ ব্যতীত জীব কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। সমস্ত জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। কাজেই মানব অন্যান্য জীব অপেক্ষা উদ্ভিদ হইতে শ্রেষ্ঠ উপকার পাইয়া থাকে। আমাদের খাদ্য— উদ্ভিদ; বাসগৃহ নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান—উদ্ভিদ। মোট কথা মানবের মানবত্ব উদ্ভিদের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত।

এই উদ্ভিদ রাজ্যের প্রধান শত্রু কীট-পতঙ্গ। প্রতি বৎসর কত মনোরম বৃক্ষ, কত ফলপ্রসূ সুবিশাল পাদপ, কত ওষধি কীট পতঙ্গের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি কীট-পতঙ্গ না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী শস্য-সম্পদে পূর্ণ হইয়া থাকিত। শত শত কৃষকের বৎসর-ব্যাপী পরিশ্রমের ফল এক দল পঙ্গপালের অর্দ্ধঘণ্টা স্থায়ী অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া যায়।

জগতে কত অসংখ্য প্রকার কীট-পতঙ্গ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্য যাবতীয় জীবের সংখ্যা একত্রিত করিলেও কীট-পতঙ্গের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিকতর হইবে। এই সমস্ত কীট-পতঙ্গের ক্ষুৎশক্তি অপরিমেয়; এইরূপ তাহাদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির বিবরণ শুনিলে উপকথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একটা "শুয়া পোকা" এত পত্র ভোজন করে যে, পত্র রাশির ওজন পরিমাণ পোকার শরীরের ভারের দুই গুণ অপেক্ষাও অধিকতর। এই পরিমাণে খাইলে একটা সাধারণ গাভী ২০।২২ মণ ঘাস খাইয়া ফেলিত।

উদ্ভিদ-জীবনের প্রধান অন্তরায় - পক্ষান্তরে মানবের পরম শত্রু—কীট-পতঙ্গের একমাত্র হন্তা বিহঙ্গম। পক্ষীর প্রধান খাদ্য কীট-পতঙ্গ। যদি কীট-পতঙ্গ নির্ব্বিবাদে বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে পৃথিবী বহু শত বৎসর পূর্ব্বে জীব শূন্য, উদ্ভিদ শূন্য, এমন কি এই সমস্ত কীট-পতঙ্গ শূন্যও হইয়া যাইত। কিন্তু পক্ষী কীট-পতঙ্গ নষ্ট করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। পক্ষি-শাবকের শরীর এত ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং পূর্ণ বয়স্ক পক্ষীর পরিশ্রম এত অধিক যে, জীবনীশক্তি সংরক্ষার জন্য তাহাদের প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। পক্ষিকুলের পরিপাকশক্তি, অতিশয় তীক্ষ্ণ, এবং খাদ্যও অতি অল্প সময়ে পরিপাক হইয়া যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া পক্ষী ভোজন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। বিশেষতঃ সন্তানপালনের সময় তাহারা খাদ্য অন্বেষণে অতিমাত্র ব্যস্ত থাকে। পক্ষিশাবকের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাগ্নিতে দিবসে এত অধিক কীট-পতঙ্গের আহুতি হয় যে, তাহা সহসা বিশ্বাস করা কষ্টকর। শীতের প্রাক্কালে বা

বসন্তেই পক্ষিসমূহ অধিক সংখ্যক কীট-পতঙ্গ নষ্ট করে। এই সময়ে কীট-পতঙ্গ ডিম্ব হইতে স্বীয় আকার ধারণ করিয়া বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই পক্ষীর উদর গহ্বরে বিশ্রাম লাভ করে। এইরূপে কোটী কোটী কীট-পতঙ্গ সম্পূর্ণ বিধ্বংশ হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পক্ষিকুল কীট-পতঙ্গ নাশ করিয়া উদ্ভিদ রাজ্যের—সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির—কি মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। যদি পক্ষিকুল এই কীট-পতঙ্গ নাশে কোনওরূপে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কীট-পতঙ্গের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া এক বিশেষ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

বন্যপাদপের স্বাভাবিক কীট-শত্রু আছে। এই সমস্ত বৃক্ষেই তাহাদের শত্রুকুল পুষ্ট হয় ও আশ্রয় পায়। এই সমস্ত কীটের শত্রু বিহঙ্গম। বিহঙ্গমও পাদপে আশ্রয় ও খাদ্য উভয়ই পায়। কাজেই পাদপ বিহঙ্গের প্রভূত কল্যাণকর; সেইরূপ বিহঙ্গও পাদপের প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বিহগকুলকে ফলশালী উদ্যানের পরম অমঙ্গলকর বলিয়া নিন্দা করিতে পার; কিন্তু এই অমঙ্গল বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাজেই উদ্যানপালক সময়ে সময়ে এই অমঙ্গলে বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু পক্ষী স্বীয় কার্য্যের মূল্য স্বরূপ উদ্যানের ফল ভোজনের নিশ্চয়ই অধিকারী।

প্রতি বৎসর ধান্য সংগ্রহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু পক্ষী তৃণ বা শস্য-উদ্ভিদের গুচ্ছাভ্যন্তরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া সন্তানোৎপাদন ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সমস্ত উদ্ভিদ পক্ষী ও বহুবিধ কীট পতঙ্গ উভয়কেই আশ্রয় ও খাদ্য দান করে। যদি পক্ষিকুল বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহারা কীট-পতঙ্গের বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রতিবন্ধক দান করে। যদি কোন কারণবশতঃ ক্ষেত্রে পক্ষিসংখ্যা অল্প হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজাত উদ্ভিদ, কীটের দ্বারা বহু অপচিত হইয়া থাকে।

পক্ষী ব্যতীত তৃণাদি উৎপাদিত হইতে পারে না। কোন এক জাতীয় পোকার সন্তান সন্ততি যদি কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত শ্যামল প্রান্তর অতি অল্প কালে তৃণ শূন্য হইয়া যাইতে পারে। কাঠ বিড়াল, মুষিক, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শস্যাদির প্রভূত অপচয় করিয়া থাকে। কিন্তু সারস, বক ইত্যাদি পক্ষী এই সমস্ত জন্তুর পরম শত্রু। আমরা লক্ষ্য করি না বটে, কিন্তু প্রত্যেক কৃষকই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বহুশত মুষিক এত ধান্যাদি শস্য অপচয় করিয়া ফেলে যে সময়ে সময়ে এই অপচয় কৃষকের বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। যদি মাংস ভোজী পক্ষিসমূহ এই সমস্ত ক্ষুদ্রকায় জন্তুর গতিবিধি প্রতিহত না করিত অর্থাৎ তাহাদের ধ্বংস সাধন না করিত তাহা হইলে বোধ হয় কৃষকগণকে প্রতিবৎসর রিক্ত হস্তে ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত।

শকুনি, গৃধিনী, পেচক ইত্যাদির শাবকগুলি বহুকাল বাসায় অবস্থান করিয়া পুষ্ট হয়, কাজেই বহুকাল ধরিয়া তাহাদিগের পিতা মাতাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই খাদ্যের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। সন্ততির ক্ষুৎকাতরতায় এই সমস্ত পক্ষী সময়ে সময়ে এত অধীর হইয়া পড়ে যে, অন্যবিধ খাদ্য সংগ্রহের সময় না পাইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া গৃহপালিত কুক্কুট ইত্যাদির শাবক ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু যদি ভাবা যায় যে, এই সমস্ত পক্ষী ফলকর উদ্যানে বা শস্য পূর্ণ ক্ষেত্রে শত শত মূষিকাদি জন্তু নাশ করিয়া কি মহৎ কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা হইলে ২।১টা কুক্কুট শাবক ধ্বংশ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক সভ্যতার বা বিলাস অগ্নিতে শত শত জ্যোৎস্নাশুভ্র মাংশাসী পক্ষী আহুত হইতেছে। যদি এইরূপে রমণীর অকারণ বিলাস স্রোতে এমন উপকারী পক্ষী সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অবস্থা নিতান্ত সুখকর থাকিবে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এই পক্ষিকুল বিধ্বংস হওয়ায় যে ক্ষতি হইতেছে তাহা প্রত্যেকেরই বিবেচ্য। গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্যও এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যের অবস্থাও ভারতের অনুরূপ। সেখানেও প্রতি বৎসর কোটী কোটী পক্ষী নিহত হইতেছে। এই পক্ষিসমূহ আদৌ শস্য স্পর্শ করে না। একমাত্র মূষিকাদি ক্ষুদ্র অপকারী জীব খাইয়াই প্রাণ ধারণ করে। অথবা জলাভূমির পার্শ্বে অবস্থান করিয়া নানাবিধ অশুভকর কীট-পতঙ্গ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। এই সমস্ত কীট-পতঙ্গ মাত্রেই নিকটবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রের প্রচুর অপচয় করিয়া থাকে। শ্বেতকায় সারস বা বক ধান্য ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে বহুবিধ জীব নষ্ট হয় অথচ উৎপাদিত শস্যের মঙ্গল হয়। এই ধান্যই চীন ও ভারতের প্রধান শস্য।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে মৎস্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পক্ষের লোভে বহু জলচর পক্ষী প্রতি বৎসর নিহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কীট মৎস্য ডিম্ব খাইয়া ফেলে, তাহাদের পরম শত্রু এই সমস্ত জলচর পক্ষী। কিন্তু পক্ষীর হ্রাস হওয়ায় মৎস্য ডিম্ব হন্তা কীটসমূহ অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে মৎস্য প্রচুর উৎপাদিত হইতেছে না।

গল পক্ষী জলের উপরিভাগে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তু অবস্থান করে তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। অবশ্য সময়ে সময়ে কোন অনবধান মৎস্য-শিশুও ইহাদের চঞ্চুতে প্রাণ হারায় বটে, কিন্তু ইহারা মৎস্য চাষের অন্তরায় একথা আদৌ স্বীকার্য্য নহে। বরং ইহারা মৎস্য চাষের অন্তরায় বহুবিধ কীট পতঙ্গ খাইয়া চাষে সহায়তা করিয়া থাকে গল পক্ষী বন্দর ইত্যাদির গলিত পশু মাংস খাইয়া বন্দর আদি পরিষ্কার রাখে। যেরূপ কাক, চিল, শকুনি, গৃধিনী স্থল ভাগের গলিত পশু ও জঞ্জাল অপসারিত করে, গলও সেইরূপ জল ভাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে।

অতএব পক্ষী মানবের পরম উপকারী বন্ধু স্বরূপ। তথাপি মানব অজ্ঞতা বশতঃ সাময়িক মোহের বশে এমন মিত্রের বিনা কারণে অপকার করিয়া নিজের অকল্যাণ সাধন করে।

নাইট্রোজেন ও কৃষি।

নানাবিধ কারণের উপর জীব ও উদ্ভিদের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু তাহাদের পুষ্টির প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ অবস্থায় গৃহীত হয় না। ইহার রাসায়নিক পবিবর্ত্তন সাধিত হইয়া জীব বা উদ্ভিদের উপযোগী হইলে তবে তাহা গৃহীত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন কৃষি কার্য্যের জন্য কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা কোন দেশের কৃষকেই ভাল কারয়া অনুধাবন করে না।

প্রায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ৪ ভাগের প্রায় ৩ ভাগ নাইট্রোজেন। কিন্তু নাইট্রোজেন অতি অদ্ভুত প্রকৃতির বায়বীয় পদার্থ। ইহার যেন সজীবতা নাই। জাড্যতা দোষের জন্য ইহা কাহারও সহিত সহসা মিলিতে চাহে না। আবার যদিও কোনরূপে মিলিত হয়, তাহা হইলে সামান্য কারণেই তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

বৃক্ষের পুষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন রহিয়াছে, তথাপি বৃক্ষ নাইট্রোজেন অভাবে সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণ নাইট্রোজেন প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের দ্বারা গৃহীত হয় না, ইহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কৃষকগণ নানারূপে বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ পাইয়া থাকে, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ তাহারা প্রায়ই এই সমস্ত পদার্থ অকারণে নষ্ট করিয়া ফেলে।

অনেক উদ্ভিজ্জ-খাদ্যে নাইট্রোজেন থাকে। এই খাদ্য জীব জন্তু গ্রহণ করিলে তাহাদের পাকস্থলীতে এই সমস্ত খাদ্যের নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ জান্তব নাট্রোজেন ঘটিত পদার্থে পরিণত হয়। জন্তুর শরীর প্রতিনিয়তই ক্ষয়িত ও পুনর্গঠিত হইতেছে। এই ক্ষয়িত পদার্থ জন্তু শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আইসে। জন্তুর শরীর গঠনে যদি নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই পদার্থ ক্ষয়িত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় অবশ্যই জান্তব-নাইট্রোজেন সহ বাহির হইয়া আইসে। এই নিষ্ক্রান্ত পরিত্যক্ত জান্তব নাইট্রোজেন

ঘটিত পদার্থের নাম ইউরিয়া, অর্থাৎ জীব জন্তুর শরীর হইতে নাট্রোজেন ইউরিয়া আকারে বহির্গত হইয়া আইসে।

এই ইউরিয়া বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বিশেষ বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই ইউরিয়া কৃষকগণের নিকট মহামূল্য পদার্থ। কেননা ইহাতে নাট্রোজেন রহিয়াছে। এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া বা উদ্ভিদ বীজাণু ইউরিয়াকে অতি শীঘ্র গাঁজাইয়া তুলে। এইরূপে গাঁজিয়া উঠিলে ইহা আমোনিয়ামে পরিণত হয়। এইরূপে গবাদি পশুর মলমূত্রে ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সারের উৎকৃষ্ট অংশ নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে গোবর, গোমূত্র বা অশ্ব বিষ্ঠা, অথবা মানবের মল মূত্রাদি পচিয়া উঠে, সেই স্থান হইতে আমোনিয়ার তীব্র গন্ধ উত্থিত হয়। ইহার কারণ এই যে জীবদেহ নিষ্ক্রান্ত ইউরিয়া গাঁজিয়া আমোনিয়া রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আমোনিয়া অতিশয় উদ্বায়ী পদার্থ। কাজেই যেমনই ইউরিয়া আমোনিয়ায় পরিণত হয়, আমোনিয়া তৎক্ষণাৎ বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া যায়। কোন কোন নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া, বায়ু চলাচল পথ মুক্ত থাকিলে, আলোক একবারে না থাকিলে এবং অতি অল্প ক্ষার ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে আমোনিয়াকে নাইট্রাস্ দ্রাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; এবং চূণ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে নাইট্রাইট লবণ উৎপাদন করে।

অতএব যদি কৃষকগণ সময় মত গোবরাদি সারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাহাতে সারের নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে তাহাকে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সারের নাইট্রোজেন আমোনিয়া আকারে নষ্ট না হইয়া, এই আমোনিয়া নাইট্রাইট লবণে পরিণত হইতে পারে। এই নাইট্রাইট উদ্ভিদের পুষ্টি সাধক নহে। ইহা অন্য এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ক্ষেত্রেই নাইট্রেট লবণে পরিবর্ত্তিত হয়। এই নাইট্রেট লবণ উদ্ভিদাদি পুষ্টি সাধনের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় ক্ষেত্রের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তনের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। যদি ভূমি জল পূর্ণ থাকে বা পচা কর্দ্দম পূর্ণ থাকে বা অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকে, তাহা হইলে নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হয় না। অধিকন্তু অন্য এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া তৎক্ষণাৎ নাইট্রাইট নষ্ট করিয়া ফেলে।

উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেন নাইট্রাইট, অতঃপর নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য জান্তব সহায়তার অপেক্ষা করে না। যে সকল উদ্ভিদে নাইট্রোজেন রহিয়াছে, তাহা যখন গলিত হইতে থাকে, সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে, নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেনকেই প্রথমে নাইট্রাইট পরে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। আবার যে সমস্ত উদ্ভিদে নাইট্রোজেন থাকে, সেই সমস্ত

উদ্ভিদ দগ্ধ হইবার সময় বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেন প্রস্থান করে, সেই নাইট্রোজেন কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ গ্রহণ করিয়া নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া নিজের পুষ্টি সাধন উপযোগী করিয়া লইতে পারে। এই সমস্ত উদ্ভিদের মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদের শুঁটি ফল ধরে, সেই সমস্ত উদ্ভিদ প্রধান। মটর, অরহর, ইত্যাদি এই শ্রেণীর গাছে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ দগ্ধ করিলে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন বায়ু মণ্ডলে প্রস্থান করে। এইরূপ জন্তুর মলমূত্রাদি দগ্ধ করিলেও নাইট্রোজেন বায়ু মণ্ডলে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে পিষ্টক আকারে গোবর, অশ্ব, মহিষ, ছাগাদির মলমূত্রাদি ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। ইন্ধনের জন্য অন্য নানাবিধ পদার্থ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু গোশালার আবর্জ্জনা এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট সার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আমরা যে উপায়ে গোবরাদি সঞ্চিত করি, তাহাতে ইহার সারের উপযোগী উৎকৃষ্ট অংশ অর্থাৎ নাইট্রোজেন আমোনিয়া আকারে বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। উন্মুক্ত বাতাসে গোবরাদি পচাইয়া তুলিলে তাহার নাইট্রোজেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু চুণ ইত্যাদি চাপা দিলে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থানে স্তূপীকৃত করিলে, অথচ বায়ু চলাচল পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিলে জান্তব নাইট্রোজেন অনায়াসে নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধনের উপযোগী করিতে পারে। এই সমস্ত বৃক্ষ নাইট্রোজেনকে নিজ দেহে উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী করিয়া রক্ষা করে। অতএব যদি কোন কৃষক তাহার কোন পতিত জমী উর্ব্বর করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষেত্রে প্রথমে শুঁটি ফলধারী বৃক্ষ উৎপাদিত হয় কৃষকের তাহা করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদেরই দেশের একজন ব্রাহ্মণ-কৃষক ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে অরহর বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া সময় মত অরহর কলাই সংগ্রহ করেন; অবশেষে বৃক্ষকে জমীতে পচাইয়া বৃক্ষের উর্ব্বরতা শক্তি এত বৃদ্ধি করিয়া তুলেন যে অন্য মূল্যবান শস্যের জন্য সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে আদৌ সার প্রয়োগ করিতে হয় না। প্রাকৃতিক উপায়েও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে সময় ঝঞ্ঝাবাত ও বিদ্যুত চকিত হইতে থাকে, সেই সময়ে তড়িৎ শক্তিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রিক দ্রাবকে পরিণত হয়। এই নাইট্রিক দ্রাবক ধৌত হইয়া আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নাইট্রিক দ্রাবক ধাতব পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রেট উৎপাদন করে। এই নাইট্রেট উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবতঃ দুইটি উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাটে্রাজেন উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী হয়,—বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাবে এবং শুঁটিধারী বৃক্ষের

কর্ম্মকারিতায়। কিন্তু বৃক্ষাদি হইতে নানাবিধ কারণে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে প্রস্থান করে, তাহার সমস্তই এই দুই উপায়ে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে কি না, তাহা বিষম সন্দেহের স্থল। যাহাই হউক বর্ত্তমান কালে সমগ্র মানব চিলি প্রদেশের খনিজ নাইট্রেট লইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সময়ে চিলির নাইট্রেট নিঃশেষ হইবে, তখন যে কি অবস্থা তাহা বৈজ্ঞানিকগণের নিতান্তই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু বারুদাদি রণ-সম্ভার উৎপাদনে এত অধিক নাইট্রেট প্রয়োজন হয় যে, নাইট্রেটের মূল্য এইজন্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত অধিক মূল্য দিয়া কৃষকগণ কখনই নাইট্রেট ক্রয় করিতে সক্ষম হইতে পারে না। তবে যে সমস্ত স্থলে সামান্য পরিমাণ ক্ষেত্রে প্রচুর শস্যের প্রয়োজন, সেই সমস্ত স্থলে বহুমূল্য দিয়াও কৃষকগণ সারের জন্য নাইট্রেট ক্রয় করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে সারে পরিণত করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে নাইট্রোজেনের মিলিত হইবার শক্তি অতি অল্প। কাজেই নাইট্রোজেনকে সারে পরিণত করিবার কোনও সুলভ উপায় আজও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইতেছে না। তবে বৈজ্ঞানিক যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বাভাবিক নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিণত করিবার সুলভ উপায় আবিষ্কৃত হইবে, এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে নাইট্রেটের দুরন্ত অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই সম্ভাবিত হইবে না। ইতিমধ্যেই তড়িৎ প্রয়োগে বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন লইয়া ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং সায়ানামাইড উৎপাদন করিয়াছেন এবং ফলও বিশেষ আশাপ্রদ হইয়াছে।

গোবর আদি অতরল (solid) জান্তব পদার্থ অপেক্ষা, মূত্রাদি তরল জান্তব পদার্থ উৎকৃষ্টতর সার। কেননা ইহাতেই অধিক নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থাকে। অতএব যাহাতে গবাদির মূত্র নষ্ট হইয়া না যায়, তাহা লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক কৃষকের কর্ত্তব্য। যদি তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত তরল সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ সুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলে মূত্রাদি কোন একটা আধারে সঞ্চিত করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি মূত্রাদি ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমপরিমাণ জল এবং অল্প পরিমাণ সুপার ফস্‌ফেট (অস্থিসার) প্রয়োগ করিয়া অতঃপর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। উদ্ভিজ্জ-ভোজী জীবের মূত্রে অতি অল্প পরিমাণ ফস্‌ফেট থাকে বলিয়া ইহাতে অল্প ফস্‌ফেট মিশাইয়া দেওয়ায় উপকার হইয়া থাকে। গোবরাদি যে স্থানে পচিতে থাকে, সেই স্থানে মূত্রাদি নিক্ষেপ করিলে বিশেষ ফল হয়। যাহা হউক কৃষক ইচ্ছা করিলে গবাদির মল মূত্রকে বৃথা নষ্ট না করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করিতে পারে। গোবরাদির উপর গোশালার তৃণাদি আবর্জ্জনা ও সামান্য জিপসাম বা ঐ জাতীয় চূর্ণ পদার্থ প্রয়োগ

করিলে ফল উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সার গহ্বরে সঞ্চিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সমতল যায়গায় রাখিলে তত কার্য্যকর হয় না। যাহা হউক যদি ক্ষেত্রস্বামী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে সুবিধা থাকিলে ক্ষেত্রে শুটি ফলধারী বৃক্ষ প্রথমে উৎপাদন করিয়া, অবশেষে তাহাই ক্ষেত্রে পচাইয়া এবং শেষে গোবরাদি সার প্রয়োগ করিয়া মূল্যবান শস্য উৎপাদন করিতে পারেন।

দ্রব্য গুণ কিরূপে লব্ধ ?

শরীর ধারণের জন্য মানব মাত্রেরই প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের. প্রয়োজন, অনশন উপবাসে শরীর কৃশ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, এবং মানবকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। শুনা যায় ঋষি তপস্বীরা ক্ষুধা তৃষ্ণার বশীভূত ছিলেন না, অনাহারে দীর্ঘকাল কাটাইতে পারিতেন, খাদ্যের প্রয়োজন হইত না। ইদানীন্তন কালে হরিদাস সাধু ও অন্যান্য কয়েক জন সাধু পুরুষের কথা শুনা গিয়াছে, তাঁহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত জল স্পর্শ না করিয়াও সচ্ছন্দ শরীরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনেকে তাহা প্রত্যক্ষও করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে নহে। সকলকেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইতে হয়, অতএব না খাইলে চলে না। আহারে দেহের বল ও পুষ্টি সাধন করে কিন্তু যদি তাহা স্বাস্থ্যের অনুপযোগী হয় তাহা হইলে তাহা শরীরের ইষ্ট সাধন না করিয়া অনিষ্টোৎপাদন করে, অতএব খাদ্যের বলবীর্য্য ও উপকারিতা বুঝিয়া তাহা গ্রহণ না করিলে পীড়া জন্মে, শরীর অসুস্থ হয় এবং সেই অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণ নষ্ট করে। যে খাদ্য দ্বারা শরীরের পোষণ হয় তাহাই সুখাদ্য, অন্যথা অখাদ্য, তাহা গ্রহণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমরা নিত্য যে সকল খাদ্য নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের দোষ গুণ জানা গিয়াছে। কোন নূতন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইলেই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে এবং অন্যের ব্যবহার দেখিতে হয়। পরীক্ষা ব্যতীত কোন জিনিষই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতএব সামান্যতঃ বুঝিতে হয় যে, পরীক্ষা দ্বারাই দ্রব্য গুণ জানিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত যে যে দ্রব্যের যে যে গুণ জানিতে পারা গিয়াছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতে হয়।

শরীর ধারণের জন্য নিত্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাই খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। যে যেরূপ খাদ্যে অভ্যস্ত সে প্রতিদিন তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে দ্রব্যান্তর গ্রহণ করিলে পরিপাক হয় না, অজীর্ণতা জন্মে, পীড়া গ্রস্ত হইতে হয়। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ করিবার পক্ষে জল বায়ুরও প্রাধান্য আছে। অন্নের ব্যবহারেও পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরীক্ষা ব্যতিরেকে অন্ন একবারেই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল এরূপ মনে করা যায় না। এরূপ সামান্যতঃ দেখা যায় যে, পরীক্ষা দ্বারাই দ্রব্য গুণ লাভ হয় কিন্তু ইহার ভিতর একটী কথা আছে—এখনও এই বিশাল ভারত ভূমিতে এমন অসভ্য বর্ব্বর বন্য জাতি আছে যে তাহারা অদ্যাপি শস্য বা অন্নের ব্যবহার জানে না—মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষীর মাংসেই জঠর জ্বালার নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তাহারা সভ্য জগতের সহিত তাহার কোন সংস্রব রাখে না, কোন সংবাদও লয় নাই, স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, অথচ পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারেও সমর্থ। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি সাঁওতাল ভীলাদি অসভ্য জাতির মধ্যে যে সকল ঔষধ আছে তাহা অব্যর্থ। এক সম্প্রদায় বন্য কুলি আমাদের দেশে মজুরি করিতে আসিয়া কিছু সময় অবস্থিতি করিয়াছিল। অবশ্য তাহারা অর্থের ব্যবহার জানিত, অন্নাদি সভ্য জাতীয়ের খাদ্য গ্রহণেও অভ্যস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল অসভ্য বন্য জাতির কথা বলিয়াছি ইহারা তাহাদের ন্যায় ততট অসভ্য নহে—সভ্য জাতির সংস্রবে আসিয়াছিল। একদিন তাহাদের মধ্যে একজন কুলির সর্পাঘাত হয়, তাহাতে তাহারা ভীত বা ব্যাকুলিত হইল না জঙ্গল হইতে একটা উদ্ভিদ লইয়া সর্পাহত ব্যক্তিকে চিবাইতে দিল, চিবাইতে চিবাইতে যে ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছিল, রক্তের পরিবর্ত্তে তাহা দিয়া নীলাভ তরল পদার্থ বাহির হইতে লাগিল, তাহার কিয়ৎ কাল পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তি বেশ সুস্থ স্বচ্ছন্দ হইল। তাহার মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতেছিল, বাক রোধ হইয়াছিল, মৃত্যুর অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল—সেই শিকড় চিবাইতে চিবাইতে সমস্ত দূর হইল। আমরা বহুচেষ্টাতেও সেই উদ্ভিদটী কি জানিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; বহু অর্থ দিতে সম্মত হইলাম, পঞ্চাশটী টাকা দেখাইলাম, কিছুতেই সেই দৈনিক চারি আনা উপায় ক্ষম কুলি স্বীকার পাইল না, বলিল—"বাবু তোদের ও কিছু হবে না, আমার ওযুধেও কাট করবে না।" অর্থাৎ আমার ঔষধের গুণ নষ্ট হইবে। যখন আমরা জিজ্ঞাসিলাম—"তুই মরিলেই তো ঔষধ নষ্ট হইল?" সে উত্তর করিল—"আমি মরবার সময় আমার ছেলেকে দিয়ে যাবো। এই রকমেই তো আমাদের চলে আসছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ঔষধ জানে কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতে বলে দিলে ওযুধের গুণ থাকবে না। তোরা এ ওযুদ পাবি না। শত টাকা দিলেও পাবি না।"

অসভ্য মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া পশুপক্ষীর বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে তাহাদেরও মধ্যে রোগোপশমের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে—ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইলে তাহারা বমন করে আর কুকুর বিড়ালে ধান্যাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। ইহাই বা কি? এ জ্ঞান তাহাদের প্রকৃতিগত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নতুবা কে তাহাদিগকে শিখাইল। তাহাদের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায়ী পৃথক পশু নাই—তাহারা আপনারাই আপনাদের চিকিৎসা করে। অতএব কেমন করিয়া না বলিব যে, এই দ্রব্যগুণ জ্ঞান তাহাদের প্রকৃতিগত। হিন্দু, মনুষ্যের এই জ্ঞানকে দৈব বলেন। হিন্দুর এই দ্রব্যগুণ জ্ঞান দেবলোক হইতে লব্ধ, দেবরাজ ইন্দ্র ইহা মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে বোধ হয়, দেবলোক রোগতাপশূন্য নহে। সেখানেও জরমরণাদি রোগ শোক সমস্তই ছিল আছে। দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব, তবে তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসীর ন্যায় ভঙ্গুরদেহধারী নহেন, অনেকটা সুস্থ স্বচ্ছন্দ ও সবল, জরামরণাদির ততটা বশীভূত নহেন; হইবেনই বা কেন—যাঁহাদের রোগ প্রতীকারের উপায় এবম্বিধ, যাঁহাদের দ্রব্যগুণ জ্ঞান এতাদৃশ বিস্তৃত, তাঁহারা সে সহজেই আধিব্যাধির বশীভূত হইবেন, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না।

মর্ত্ত্যবাসী ঋষি তপস্বিগণ নর দেহধারী থাকিলেও তাঁহাদের যে সুরলোকের সহিত আলাপ পরিচয়াদি ছিল. এমন কি সম্বন্ধ সংস্রবের কথাও পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। মর্ত্ত্যলোকের উপকারার্থ তাঁহারা দেবলোক হইতে মহামূল্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লাভ করিয়া এখানে তাহার জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন সে পক্ষে সন্দেহ নাই। দেবলোকেও যে পরীক্ষা দ্বারা দ্রব্যগুণ জানিতে পারা গিয়াছিল, তাহাও কল্পনায় আনিতে পারা যায়, প্রাচীন ঋষিগণের উক্তিতে তাহার আভাসও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা পরীক্ষা অপেক্ষা যোগবলের উপরই অধিক নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যোগবল নাই, সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি, তবে রোগ প্রতিকারে যে দৈবের সংস্রব নাই. এমন কথা বলিতেও সাহসী নহি। নিরপেক্ষ ভাবে সকল দিক না দেখিলে সত্যের সন্ধান লাভ করা যায় না। তাহাই আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কাজের জিনিষ।

কৃত্রিম ফিরোজা প্রস্তর।—নির্দ্দোষ হস্তিদন্ত হইতে স্বাভাবিক ফিরোজা প্রস্তরের আকারে হস্তিদন্ত খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ও গঠিত করিয়া তাম্র অক্সাইডের পূর্ণ শক্তি অ্যামোনিয়া দ্রাবণে একপক্ষ কাল ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। অতঃপর হস্তিদন্তের টুকরাগুলি রীতিমত ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই কৃত্রিম ফিরোজা প্রস্তরের ন্যায় দেখিতে হইবে। যদি বর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গাঢ় না হয়, তাহা হইলে পুনরায় উক্ত দ্রাবণে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে।

কাষ্ঠ ও প্রস্তরের উপযোগী হোয়াইটওয়াশ।—২০ ভাগ পাথুরিয়া চূণে উত্তপ্ত জল এরূপ পরিমাণে ঢালিয়া দিতে হইবে যেন চূণের উপর অন্ততঃ ছয় ইঞ্চ জল থাকে। এই চূনের জলে বাহির করিয়া লইয়া ইহাতে পুনরায় সামান্য জল মিশাইতে হইবে। অতঃপর জলমিশ্রিত চূণের জলে ১ ভাগ জিঙ্ক সালফেট এবং অল্প পরে অর্দ্ধভাগ সাধারণ লবণ যোগ করিতে হইবে। এই হোয়াইট ওয়াশকে রঞ্জিত করিবার জন্য ইহাতে ১$\frac{১}{২}$ ভাগ ওকার, বা সামান্য ভুষা কালী, বা ২ ভাগ আম্বারও $\frac{১}{২}$ ভাগ ভুষা কালী মিশাইতে পারা যায়।

কাগজের খেলনার জন্য বার্ণিশ।—১ম প্রণালী—রবার ১ ভাগ; চাঁচগালা ২ ভাগ; বেনজোল ১২ ভাগ। রবারকে কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটিয়া বেনজোলে ক্রমশঃ প্রয়োগ করিয়া ক্রমাগত নাড়িয়া দ্রবীভূত করিয়া ফেল। অতঃপর এনামেল করা পাত্রে এই দ্রাবণকে ঘরের বহির্দ্দেশে মুক্ত বাতাসে বালির উপর বসাইয়া উত্তপ্ত কর। এবং কাঠির দ্বারা ঘুটিতে ঘুটিতে ধীরে ধীরে এবং অল্পে অল্পে কাঁচগালা চূর্ণ মিলাইতে থাক। অল্প পরে নামাইয়া শীতল করিলে কাগজের উপরে লাগাইবার উপযুক্ত হয়। ২য় প্রণালী।—রবার ১ ভাগ; স্প্যায়ফল্ট (আলকাত্‌রা নহে)—২ ভাগ; বেনজোল ২ ভাগ। ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় মিলাইতে হইবে। ৩য় প্রণালী।—রোজিন ২ ভাগ, তারপিন তৈল সিকি ভাগ। সমস্তগুলি ধীরে ধীরে মিলাইয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে।

৩য় বর্ষ।)　　　　আগষ্ট, ১৯১৪।　　　　(৮ম সংখ্যা

মোটর গাড়ীর জন্য লঘু মিশ্রিত-ধাতুর প্রয়োজনীয়তা।

আজ কাল মোটরগাড়ীগুলিকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিবার মানসে মোটর ব্যবসায়িগণ নানা প্রকার ধাতুর সহিত এলুমিনিয়ম্ ধাতুকে মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত ধাতুর যাবতীয় ধর্ম্মগুলি সম্যক প্রকারে অবলোকন করতঃ তাহাদিগকে যাহাতে কার্য্যে লাগান যাইতে পারা যায় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

প্রতি বৎসরে অধুনা যত এলুমিনিয়ম ধাতু খনি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ১৫ অংশ তড়িত সংক্রান্ত ব্যাপারে, ৬৫ অংশ মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ে, এবং ২০ অংশ অন্যান্য নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্বারা ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এলুমিনিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনেক প্রকার ধাতুর সহিত এলুমিনিয়মকে মিশ্রিত করিয়া দেখা হইয়াছে বটে কিন্তু দস্তার সহিত এলুমিনিয়মকে মিশ্রিত করিলে যে মিশ্রিত ধাতু হয় তাহা এলুমিনিয়মের অপরাপর মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট এবং নানাবিধ মোটরগাড়ী সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী। কখন কখন দস্তা ও এলুমিনিয়মের মিশ্রিত ধাতুতে কিয়ৎ পরিমাণে তাম্র বা ম্যাগ্‌নেসিয়ম মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ মিশ্রিত ধাতু আরও দৃঢ় এবং সুদীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত ধাতু crank-cases, gear-boxes প্রভৃতির ছাঁচের জন্য মোটর গাড়ীর কারখানায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা ৮৮ অংশ এলুমিনিয়ম্, ১০ অংশ ম্যাগনেসিয়ম্ এবং মাত্র ২ অংশ তাম্র

থাকে। এই মিশ্রিত ধাতুর প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ দুই শত হইতে প্রায় তিন শত মণ ভার সহিতে পারে।

দস্তা ও এলুমিনিয়মের এই মিশ্রিত ধাতুটি ঈদৃশ অন্যান্য মিশ্রিতধাতু অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী; কিন্তু আজকাল সহজ তাড়িত উপায়ে লভ্য এলুমিনিয়মের স্বল্প মূল্য বশতঃ যে সকল দস্তা ও এলুমিনিয়মের মিশ্রিত ধাতু দ্রব্য ভূরি ভূরি সংখ্যায় প্রস্তুত হইতেছে, তাহারা এতাদৃশ স্থায়ী হয় না। বহুদিন পরে ইহারা নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে যদি এই মিশ্রিত ধাতুতে অপর কোন একটি মৌলিক পদার্থ মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে তাহা কেবল যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা নহে উপরন্তু উহার অনেক গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এক্ষণে ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক যে মৌলিক পদার্থটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা যে কি তাহা ভালরূপ জানা নাই। কোনও কোন আবিষ্কারক কতকগুলি উপকরণ একত্রিত করিয়া সুদীর্ঘকালস্থায়ী এবং উৎকৃষ্ট দস্তা ও এলুমিনিয়মের মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত করিবার জন্য তাহা patent করিয়া কোন্ কোন্ ধাতু সেই মিশ্রিত ধাতুতে আছে তাহা প্রচার করিয়া বেড়ান; কিন্তু তাই বলিয়াই যে বুঝিতে হইবে যে সেই সকল ধাতু গুলি সকল সময়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যদিই বা হয় তাই বলিয়া যে সেই মিশ্রিত ধাতুতে তাহারা সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা নহে, যেহেতু অনেক সময়ে ইহা দেখা গিয়াছে যে, যে সকল ধাতুর মিশ্রণে কোন একটি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া প্রস্তুতকারকগণ কহিয়া থাকেন সেই সমস্ত ধাতু সকল সময়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা অধিগত হয় না।

উত্তম এবং দীর্ঘকালস্থায়ী এলুমিনিয়মের মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল ধাতু সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে Nickel, Manganese, Silicon, লৌহ, Sodium, Chromium, Tungsten, Titanium, পারদ এবং Magnesiumই সর্ব্ব প্রধান।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্ব্বে এলুমিনিয়মের সহিত ম্যাগ্নেসিয়ম মিশ্রিত করিয়া একটি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আজকালকার Magnalium নামক এলুমিনিয়ম ও ম্যাগ্নেসিয়মের মিশ্রিত ধাতু পূর্ব্বকার তাদৃশ মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, অথচ পূর্ব্বকার মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা Magnaliumএ ম্যাগ্নেসিয়মের ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। পূর্ব্বকার এলুমিনিয়ম ও ম্যাগ্নেসিয়মের মিশ্রিত ধাতুতে শতকরা ১০ ভাগ ম্যাগ্নেসিয়ম থাকিত কিন্তু আধুনিক Magnaliumএ শতকরা ১·৬ ভাগ ম্যাগ্নেসিয়ন থাকে। এই যে মিশ্রিত ধাতু ইহাতে যদি শতকরা ১ ভাগ তাম্র এবং Nickel মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও উৎকৃষ্ট হয়।

American Society of Automobile Engineers নামক সম্মিলনীতে একটি পঠিত প্রবন্ধে এই লেখা ছিল যে internal combustion ইঞ্জিনের cylinder এবং piston "Magnalium"এর দ্বারা প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে। লণ্ডনেও একটি ছোট ইঞ্জিন আছে যাহার crank shaft এবং fly wheel ব্যতীত সমস্ত অংশই এলুমিনিয়মের মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মিত। ইহা সুন্দররূপে কার্য্য প্রদান করিতেছে।

যেমন দস্তা বা ম্যাগ্‌নেসিয়মের সহিত এলুমিনিয়মকে মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত ধাতু হইতেছে তেমনি আবার তাম্র কখনও কখনও বা Nickelকে এলুমিনিয়মের সহিত মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু আজকাল কেবল দুইটি ধাতু মিশাইয়া যে মিশ্রিত ধাতু (binary alloys) তাহার আর ততোধিক আদর হইতেছে না।

এলুমিনিয়মের সহিত এমন কি চারি পাঁচটি ধাতু মিশাইয়া আজকাল এক প্রকার মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইতেছে; তাহা সর্ব্বত্র আদৃত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ এলুমিনিয়ম এবং বাকি ৫ ভাগ নানা প্রকার ধাতু আছে। সকলেই অধুনা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে এই উপায়েই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইতে পারে বটে তবে ইহা বহু কষ্টসাধ্য এবং ইহাতে বহু পরীক্ষার প্রয়োজন যেহেতু এলুমিনিয়ম ব্যতীত আরও চারি পাঁচটি ধাতু লইয়া যখন ইহা প্রস্তুত হয় তখন কোন্ ধাতুটি কি পরিমাণে মিশাইলে মিশ্রিত ধাতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে ইহা নির্দ্দেশ করা অনায়াস সাধ্য নহে।

বহু পরীক্ষার পর ইদানীং Miralite নামক একটি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা নানা প্রকার যন্ত্র সম্বন্ধীয় কার্য্যে (engineering works) ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ এলুমিনিয়ম ৪ ভাগ Nickel এবং ১ ভাগ অন্যান্য কতকগুলি ধাতু থাকে। এই Miraliteকে ছাঁচে ফেলা, পাকান, roll করা, ইহা হইতে তার টানা প্রভৃতি সমস্তই হইতে পারে উপরন্তু জলে বা কোন ক্ষার পদার্থে রাখিলে ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। খানিকটা Miralite একটা জাহাজের নিম্নদেশে বাঁধিয়া জলের মধ্যে ছয় মাস কাল যাবৎ রাখিয়া দেখা হইয়াছিল যে তাহা ক্ষয় হওয়াত দূরের কথা কোনও প্রকার অপরিস্কার হয় নাই— ছয় মাস পূর্ব্বে যেমন পরিস্কার ছিল ঠিক তেমনি রহিয়াছে।

Hydrochloric অম্ল ব্যতিরেকে অপর কোন অম্ল ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। এলুমিনিয়মের যত মিশ্রিত ধাতু আছে সমস্তই Hydrochloric অম্লে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এই দোষ যে কেবল Miraliteএর তাহা নহে। আবার ইহার আরও একটি প্রধান গুণ এই যে ইহা ঘর্ষণাদি ক্ষয় সম্পাদক ব্যাপারে তাদৃশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

ইহা দেখা গিয়াছে যে একটি রেলের গাড়ী, যাহার চক্র, চক্রদণ্ড প্রভৃতি সমস্ত অংশ এই নবাবিষ্কৃত miralite নামক মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মিত, সমস্ত বৎসর ধরিয়া চালাইয়াও তাহার কোন অংশ কোনরূপে নষ্ট হয় নাই। তাহা হইলে এই মিশ্রিত ধাতু যখন সমুচিতরূপে ব্যবহারোপযোগী হইবে তখন ক্ষয় নিবারণার্থ যে তৈলের আজকাল এতই প্রয়োজন হয় তাহা আর তত হইবে না। তাহা হইলে এই তৈলব্যবসায়ীদের দম্ভ অনেকটা দূর হইবে।

Miraliteএর specific gravity ২·৬২ এবং এলুমিনিয়মের specific gravity ২·৫৬ ; তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে ইহা প্রায় এলুমিনিয়মের মতই লঘু। উপরন্তু ইহার ভারসহ গুণ এলুমিনিয়ম ও দস্তার মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা অধিক। শেষোক্ত মিশ্রিত ধাতুর এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান ২০০ হইতে ৩০০ মন পর্য্যন্ত ভার বহন করিতে সমর্থ কিন্তু Miraliteএর এক বর্গ ইঞ্চি ২৫০ হইতে প্রায় ৪০০ মন ভার সহিতে পারে।

সুতরাং Miralite যে অধুনা মোটর গাড়ীর জন্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা কে না স্বীকার করিবেন ? ইহা ব্যবহার করিলে কেবল যে মোটরের ভারের কিছু লাঘব হইবে তাহা নহে উপরন্তু ক্ষয়নিবারণার্থ তৈলের তত প্রয়োজন হইবে না ; সেও একটা কম সুবিধার কথা নহে।

Miralite আবিষ্কার করিয়াই আবিষ্কারকগণ ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহারা সচেষ্ট রহিয়াছেন। দেখা যাউক ইহা অপেক্ষা আর কিরূপ উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। আর আমাদের কি ক্ষমতা আছে ? চুপ করিয়া বসিয়া দেখা এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলে বদন ব্যাদান করা ব্যতীত আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে ? সুতরাং সকল দেশবাসী বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতঃ নিয়ত নব নব আবিষ্কারে রত থাকুন আর এই চির অলস বঙ্গবাসী বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখুন আর পরস্পরে বলা বলি করুন :"এমন জাত বড় হবে না ত আমরা হব ?"।

শ্রীমন্মথলাল সরকার, বি এ।

দ্রব্য গুণ কিরূপে লব্ধ ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অগ্রে আমার আপনার কথা বলি। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার জলে ভিজিয়া কটিবাত, যাহাকে ইংরাজীতে Lumbago বলে—সেই রোগাক্রান্ত হই। আয়ুর্ব্বেদ মতে পাচন, ঘৃত, তৈল অনেক ব্যবহার করি ; ২।৩ মাস শয্যাগত থাকিয়া কিছু উপশম পাইলাম, কিন্তু রোগ সমূলে উৎপাটিত হইল না, সময়ে সময়ে আক্রমণ করিত। তদবস্থায় ৫।৭ দিন থাকিয়া সুস্থ হইতাম।

পাঁচ সাত বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হয়, তাহার মধ্যে আমি মেদিনীপুরে গিয়া প্রায় তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তৎকালে সেখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। তৎসূত্রে প্রায় প্রতিদিন তাঁহার নিকট গতায়াত করিতাম। তিনি আমার কটিবাতের কথা শুনিয়া বলিলেন, তাঁহারও ঐ রোগ ছিল; একজন সাঁওতাল তাঁহাকে একটী শিকড় কোমরে বাঁধিতে দিয়াছিল তাহাতেই তিনি একবারে নীরোগ হইয়া যান, কিন্তু সে ঔষধত অন্যকে দিবার নয়—সাঁওতালও তাঁহার পরিচিত নহে— ফলতঃ তিনি বড় দুঃখিত হইলেন।

তাহার পরে আমি কলিকাতায় আসি, আমার কোন আত্মীয় আমাকে বলিলেন—হরিণের শৃঙ্গ ক্ষুদ্রাকারে লইয়া তাহাতে ছিদ্র করিয়া মুগরোর সূতায় (যাহাকে স্থান বিশেষে বনআনারস বলে, চিনিবার উপায়—লম্বা প্রায় ২-২॥ হাত, মধ্যস্থল আধ হাত, আড়াই পোয়া চওড়া, অগ্রভাগ সূচাগ্র, রং ঘোর সবুজ নহে যেন সাদা মিশ্রিত। ইহাকে ৫।৭ দিন জলে পচাইলে সূত্র বাহির করা যায়।) গলাইয়া কটিদেশে ধারণ করিলে একবারে আরোগ্য লাভ করা যায়। আমি তাহাই করিলাম। ধারণ কালে যে একদিনেই যাতনা দূর হইয়াছিল তাহা নহে, ১০।১৫ দিন রাখিবার পর বেদনা সারিয়া যায়। সেই অবধি প্রায় ১০।১২ বৎসর বেশ ভাল আছি—কেবল আমি নহি আমার ৫।৭টী আত্মীয় স্বজনও লম্বেগোর (Lumbago) যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

মধ্যে ৫।৭ দিনের জন্য একবার উহা কটিচ্যুত হওয়ায় পুনরাক্রমণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু কটিতে ধারণ মাত্র সুস্থ আছি। সংপ্রতি ২।৩ মাস হইল আমার কটিচ্যুত হইয়া উহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাতে কিন্তু আর পুনরাক্রমণ ঘটে নাই। যাঁহারা লম্বেগোর (Lumbago) যাতনা ভুগিতেছেন, তাঁহারা পরীক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহ রায় নামক ব্যক্তি আমাদের বিশেষ পরিচিত; তাঁহার নিবাস হুগলী জেলার ধন্যাখালী থানার অন্তর্গত মান্দাড়া গ্রামে। তাঁহার পত্নী কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শ্বেত্রী রোগাক্রান্ত হয়েন। শশীভূষণ ইহাতে বিলক্ষণ উৎকলিকাকুল হইয়া উঠেন, নানা প্রতীকার করেন, কিছুতেই কিছু হইল না।

অবশেষে তিনি একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বাটীর জল নির্গম স্থানে একটী অঙ্কুর জন্মিয়াছে, সেই অঙ্কুরটী সেখান হইতে সরাইয়া অন্যত্র রোপণ করিলে তাহাতে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে, তাহার পাতার রস লাগাইলেই শ্বেত্রী সারিয়া যাইবে। শশীভূষণের আর নিদ্রা হইল না। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইলে অন্তঃপুরের জল নির্গমস্থলী পরীক্ষা করিয়া তিনি একটী মাত্র অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন; যত্ন পূর্ব্বক সেটীকে সরাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে তাহা হইতে যে গুল্ম জন্মিল তাহার রস শ্বেত্রী স্থানে লাগাইলে তাহার পত্নী রোগ মুক্ত হইলেন। সেই কথা শুনিয়া সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের একজনের ঐ ব্যাধি হইয়াছিল তিনিও ঐ উদ্ভিদের রস ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করেন।

উহা ফলপকান্ত উদ্ভিদ, কিয়দ্দিন পরে তাহার শুটী পাকিলেই উদ্ভিদটী শুকাইয়া যায়। শশীভূষণ তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য উপায়ে এরূপ দুশ্চিকিৎস্য রোগ মুক্তির কথা তিনি আরামবাগে মোকদ্দমা উপলক্ষে গিয়া অনেকের নিকট গল্প করিলে এক শ্বেত্রী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয় তাহা শুনিয়া শশীভূষণের নিকট সেই উদ্ভিদের বীজ লইয়া মাটীতে বপন করেন। দীর্ঘকাল পরেও তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপাদন না দেখিয়া তিনি চিন্তিত হয়েন; সেই দিন রাত্রি কালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে অচিরে অঙ্কুরোৎপন্ন হইবে এখনও সময় হয় নাই। পরে স্বপ্নের সফলতা জন্মিল, তিনিও তাহার দ্বারা উপকৃত হইলেন।

সেই ব্যক্তি আরামবাগ ডাকঘরে চাকরী করিতেন। এই রূপে অনেক স্বপ্নলব্ধ মহৌষধ প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া গিয়া থাকে। শুনিলে একবারে এই সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু আপনার চক্ষু কর্ণের উপর কাহার না তাহা জন্মে? এইরূপ স্বপ্নলব্ধ ঔষধাদির উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া থাকি, ইহাও আমাদের মহদ্দোষ ও ত্রুটী, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য জাতি এরূপ বিষয়ে উদাসীন বা অযত্নবান নহেন তাই তাঁহারা আজি বৈজ্ঞানিক পথে আমাদের অপেক্ষা অধিকার অগ্রসর। সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান হইলেই তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় বৈজ্ঞানিক সত্য এইরূপেই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

এই ভূখণ্ডে যে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিয়ত আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে তাহাদের তথ্য নির্ণয়ে যদি আমরা পরাঙ্মুখ হই তাহা হইলে আর আমাদের উন্নতির আশা কোথায় ? পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ আকাশ কুসুমের ন্যায় বিষয় লইয়া কত লোক সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাহার সংখ্যা হয় না। যিনি যাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহাতে তিনি এই মরজগতে অমর হইয়া যাইতেছেন এবং তদ্দারা জগতের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আমরা কেবল আপনার চিন্তা লইয়াই বিব্রত কি উপায়ে ভাল খাইব, ভাল পরিব, মোটর, বগি হাঁকাইব আর ফাঁকা নামের দুন্দভি বাজাইব তাহারই জন্য ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকি। দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কি করিতেছি ?

ইউরোপ আমেরিকার লোকের অনেকেই আত্ম সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সংসার সুখ পরিহার পূর্ব্বক অনশনে কাল কাটাইয়া জগতের মঙ্গল জনক কার্য্যে প্রাণ পাত করিতেছেন। সত্য বটে সে সকল দেশে এইরূপ ব্যক্তিগণকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিবার জন্য মুক্তহস্ত লোক অনেক আছেন। কিন্তু কালে আমাদের দেশেও সেরূপ লোকের অভাব হইবে না। নিরাশার আকাশে যখন তারকনাথ, রাসবিহারীর ন্যায় আশার সূর্য্য দেখা দিয়াছেন তখন আর আমাদের ভাবনা কি ? পরার্থের দিকে বাঙ্গালীর মন ছুটিয়াছে।

অতঃপর আনুসঙ্গিকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানব্রত অবলম্বন করুন, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হউক।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বুদ্ধির প্রাখর্য্য।

সাধারণের একটি ভুল ধারণা এই যে লোকে যত বুড়া হয় ততই তাহার বুদ্ধি প্রখর হইতে থাকে। প্রবীন ব্যক্তি মাত্রই বলিয়া থাকেন "হাজার হ'ক বাবা আমি বুড়া মানুষ তোমাদের চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশী"। কথাটা অপাত-দৃষ্টিতে সত্য মনে হইলেও ঠিক সত্য নহে। আমরা যদি পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করি তাহা হইলে এই ভ্রম দূর হইবে। জীবনে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে যখন বুদ্ধির প্রাখর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সময় সাধারণতঃ যৌবন কাল। অবশ্য এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না তাহা নহে। Lord Kelvin প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। তবে সচরাচর যৌবনেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে ইহাই আধুনিক ধারণা। এরূপ হইবার একটা যে কারণ থাকে না তাহা নহে। বয়স যখন অল্প থাকে তখন অধ্যবসায় বলিয়া জিনিসটা থাকে। হৃদয়ের বল, কর্ম্মে আসক্তি, জীবনের ইচ্ছা স্বার্থত্যাগ ও অন্যান্য প্রকারের কত গুণ সেই সময় হৃদয়ে যত স্থান পায় অন্য সময়ে তত পায় না। আমি বলিতে চাহি না যে বৃদ্ধের হৃদয়ে এ গুণ গুলি স্থান পায় না তবে মস্তিষ্কের প্রাখর্য্য এবং বিবেকের চালনাটা যৌবনেই অধিক। যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে কৃতিত্ব দেখাইয়া জগতে নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই যৌবনে বা বাল্যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। কেহই একেবারে বৃদ্ধ বয়সে মহৎ হইতে পারেন নাই।

উৎসাহ, তেজ, স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মে ইচ্ছা গুণ গুলা যৌবনের; কাজেই যৌবনেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যায়। নেপোলিয়ন বাল্যবস্থা হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, চট্ করিয়া বুঝিয়া লইতেন এবং কার্য্যে লাগিয়া গেলে সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। এগুণ গুলা নেপোলিয়ানের বাল্যে না জন্মিলে তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিতেন না "Impossible ?— Impossible is a word to be found in the dictionaries of fools."

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বুদ্ধির প্রাখর্য্য আপনা হইতে আসে না। প্রথমে অধ্যবসায় বলে কর্ম্ম করিতে হয়, খাটিতে হয় তবেই বুদ্ধি আসিয়া জুটে। অদৃষ্টবাদী তাহাদের বুদ্ধি একটু অল্প— বৈজ্ঞানিকরা এরূপ বলিয়া থাকেন। আমরা ভারতবাসী আমরা অদৃষ্টবাদী সেই কারণেই আমাদের বুদ্ধি অল্প নয় ত? ইংরাজিতে

যাহাকে environment বলে বুদ্ধির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কিছু ঘনিষ্ঠ। আমি বসিয়া থাকিব কিম্বা শুইয়া ঘুমাইব স্বপ্নে আসিয়া দেব দূত আমাকে বুদ্ধি দিয়া যাইবে এই গল্প ধর্ম্ম গ্রন্থেই শোভা পায় প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে নয়। উঠিয়া পড়িয়া লাগ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, একথাই সত্যের বাণী আর এই কথার প্রচারই সত্য প্রচার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই অসামান্য অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য চাই তবেই কাজ হাঁসিল হইবে। "সমুদ্র শুষিব" পণ না হইলে উন্নতি হওয়া দায়। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন, অমর কবি সেক্সপীয়ার, উপন্যাসিক বলজ্যাক, চিত্রকর রূবেন কিরূপে কার্য্য করিয়া জগতে কীর্ত্তি রাখিয়াছেন !!

বিখ্যাত উদ্ভাবকগণের জীবনী আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে সকলেই অতি অল্প বয়সে বিজ্ঞানের সেবা আরম্ভ করেন। আর সেই সেবা করিবার সময় তাঁহারা প্রত্যেকটির "খুঁটি নাটি" অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমরা অনেকেই বিজ্ঞান পড়িবার সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বড় রাজি নহি। আমাদের সকলেই পুঁথিগত বিদ্যায় সন্তুষ্ট। হাতে কলমে কাজ করা বড় পচ্ছন্দ করি না। এ দোষটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। আমরা পড়িবার সময় ধরিয়া লই যে যাহা লেখা আছে তাহা সত্য। কিন্তু যাঁহারা জগতে উদ্ভাবক বলিয়া খ্যাতি লইয়াছেন তাঁহারা যে জিনিস লইয়া পড়িয়াছেন তাহার একটা হেস্ত নেস্ত না করিয়া ছাড়েন নাই।

তবে এসব কথা সত্বেও ঐশ্বরিক ক্ষমতা একটা থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, যে কোনও বিষয় চেষ্টা করিলে একটা মস্ত বিদ্বান হওয়া যায় কিন্তু কথাটা মস্ত ভুল। বৈজ্ঞানিকদের মত যে একটা লোক উত্তর দিকে দশ মাইল হাঁটিতে পারে বলিয়া যে সে দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে দশ মাইল হাঁটিতে পারিবে তাহার কোনও মানে নাই। যে ব্যক্তি অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য যে কোনও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারিতেন এ কথা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না। যে ইচ্ছা গান শিখিতে পারে, চেষ্টা করিলেই চিত্র-শিল্পী বা ভাস্কর হওয়া যায় এ সব কথা এই বৈজ্ঞানিক যুগে চলিবে না ; তাহা হইলে আমরা দেশে অসংখ্য জগদীশ বোস, প্রফুল্ল রায়, রবীন্দ্র নাথ, অবনীন্দ্র নাথ পাইতাম, ঘরে ঘরে মাষ্টার মদনের গান শুনিতাম। বিজ্ঞান বলে যে প্রত্যেক বিদ্যার জন্য মস্তিষ্কের একটা অংশ পুষ্ট হয়। যাঁহার যে অংশ পুষ্ট তিনি সেই বিষয়ে চেষ্টা করিলে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। তবে সেই সব অংশের পরিচালনা হওয়া আবশ্যক। অল্প বয়সে এই সব বিষয়ে পরিচালনা হইলে—

"Some mute inglorious Milton here may rest.

Some Cromwell guiltless of his country's blood"

বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় না। ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু সদ্ব্যবহার হওয়া চাই তাহা না হইলে কিছু হইবে না। শুনা যায় Mozart ৫ বৎসর বয়সে গল্প

লিখিয়াছিলেন; Handel ১১ বৎসর বয়সে পদ্য রচনা করেন; Beethoven ১৬ বৎসর বয়সে সভা কবি (court musician) হন; Pascal ১৬ বৎসর বয়সে conics section লেখেন; Lagrange ১৯ বৎসর বয়সে অঙ্ক শাস্ত্রের একটি বিশেষ গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন; ২ং বৎসর বয়সে জগদ্বিখ্যাত Henry Maxwell গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব শুনা যায় এবং Clerk Maxwell ৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই bell wiring সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন !!!

কোন বিষয়ে একটা উদ্ভাবন করিতে গেলে আরও একটু বুদ্ধি পাকার দরকার হয়। তখন জগতের অনেক বিষয়ের জ্ঞান জন্মে কাজেই প্রকৃত কাজের জিনিষ করিতে একটু সময় লাগে। কোথায় কি বাধা আছে জানিতে বুঝিতে না পারিলে কার্য্যোপযোগী কিছুর উদ্ভাবন ঘটিয়া উঠে না। James Watt ৬ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম Steam বা বাষ্পের প্রভাব লক্ষ্য করেন তাহার পর তিনি ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া শেষে ২৯ বৎসর বয়সে Steam Engine বাহির করেন। কাজেই একটু বয়স না হইলে জগতের উপকারী কোন দ্রব্য উদ্ভাবন করাটা সম্ভব নহে।—Perkin ১৯ বৎসর বয়সে aniline dye বাহির করিয়া coal-tar-industryর পথ মুক্ত করেন। এক্ষণে এই coal tar হইতে অসংখ্য প্রকারের রং করিয়া বেচিয়া জার্ম্মেনি ও আমেরিকা ক্রোরপতি হইতেছেন। Steam engine নীচের Reaperএর উদ্ভাবক Mc Cormic ২২ বৎসরে এই যন্ত্র বাহির করেন। Westinghouse ও Marconi সাবালক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে air-brake ও wireless telegraphy বাহির করেন; Hall ও Heroult ২৩ বৎসর বয়সে aluminium reduction বাহির করেন। তাম্রের নীচেই এই ধাতু আজ কাল অধিক মাত্রায় ব্যবসা বানিজ্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ঠিক দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে Heroult জগদ্বিখ্যাত Electric furnace প্রস্তুত করেন।

এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ ২০টি উদ্ভাবনের তালিকা করিলে দেখিতে পাই যে ৩২ বৎসরই average age of inventors; শতকরা ৮০ ভাগেরই উদ্ভাবক ৩০ বৎসরের পূর্ব্বেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন।

নাম	উদ্ভাবকের বয়স।
বাষ্পীয় কল	২৯
Cotton Gin	২৭
আলোক চিত্র	৪০
Reaper	২২
টেলিগ্রাফ	৪৬

নাম	উদ্ভাবকের বয়স
Vulcanizaton	৩৯
সেলাই কল	২৬
Bessemer Process	৪২
First coal tar Product	১৮
Regenerative Furnace	৩০—৩৪
ডাইনামো	২২
Air brake	২২
টেলিফোন	২৯
ইনক্যানডেসাণ্ট ল্যাম্প	৩২
গ্যাসোলিন	৫০
ষ্টীম টারবাইন	২৮
এলুমিনিয়াম	২৩
ইনডাক্‌সান মোটার	৩১
তারহীন তড়িৎবার্ত্তা	২২
এরোপ্লেন	৩৫—৩৮

এই তালিকার সহিত যদি Spinning jenny (২৫), ether as anæsthetic (২৭), first synthetic product (২৮), ফনোগ্রাফ (৩০) কারবন জিঙ্ক ইলেট্রিক-সেল (৩০), লিনোটাইপ (৩০), ষ্টীম হ্যামার (৩০), অপ্‌থ্যালম্যাসকোপ (৩০), বৈদ্যুতিক welding (৩৩), first locomotive (৩৩), ডিনামাইট (৩৫), ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল, (৩৫) ইত্যাদি যোগ দিই তাহা হইলে উদ্ভবকারী শক্তি প্রায় ৩৩·৫ হয়। আবার ইহার সহিত যদিও আরও অপেক্ষাকৃত অল্প আবশ্যকীয় উদ্ভাবনের তালিকা যোগ দিই তাহা হইলে বয়স ৩৫·৩ দাঁড়ায়।

জগতের সর্ব্ব বিখ্যাত উদ্ভাবনগুলি প্রায় ৩৩ বৎসরের পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে।

এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ২৭ হইতে ৩৬ বৎসর বয়সেই উদ্ভাবনের সময়। কিন্তু ৩০ বৎসরের নিম্নেই অধিকাংশ আবশ্যকীয় উদ্ভবশক্তির বিকাশ দেখা যায়। Edison, Brush, Thompson ৩০ বৎসর বয়সে বৈদ্যুতিক আবিষ্কার করিয়া জগতের নানা প্রকার উপকার করেন। উক্ত বয়সে তাঁহারা generation, transmisson, ও light প্রভৃতি বিষয় কার্য্যে প্রযুক্ত করেন। প্রায় ঐ বয়সেই Spargue রিচমণ্ড নগরে ট্রলি চালান প্রথা প্রচলন করেন। ৩০ বৎসর বয়সের বহু পূর্ব্বেই Stanley সাহেব alternating current সম্বন্ধে আলোচনা করেন। Tesla ৩১ বৎসর বয়সে Polyphase currentএর শক্তি প্রচার করিয়া জগতের মহা হিত সাধন করিলেন।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে হয় ত অনেকেই মনে করিবেন যে বয়স বেশী হইলে বোধ হয় বুদ্ধি শক্তির বিলোপ ঘটে। কিন্তু বিলোপ বা atrophy বলিলে আমরা যাহা বুঝি ঠিক সেইরূপ একটা কিছু হয় কিনা বলা বিশেষ কঠিন। এরূপ দেখা যায় যে বৃদ্ধবয়সে অনেকেও অনেক অভিনব ব্যাপার উদ্ভব করিয়াছেন যথা :— Bessemer's Process, টেলিগ্রাফ, গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, কিনামিটোস্কোপ, ইলেক্ট্রো-প্লেটিং, voltaic pile, সাইফন, রেকর্ডার, ড্যানিয়াল সেল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে ৫০ বৎসরের পর যে বুদ্ধিশক্তি বিলোপ ঘটে সেটা বেশ বুঝা যায় কেননা ঐ সময়ে প্রায় কোনও বিশেষ উপকারী দ্রব্যের উদ্ভাবন শুনা যায় না। তবে ৭৬ বৎসর বয়সে Bunsen, vapour calorimeter বাহির করেন এবং আজ Edison এত বয়সেও যেমন কর্ম্মপটু M. G. Farmerও ৬০ বৎসরের পর সেইরূপ কর্ম্মপটু ছিলেন। ৬০ বৎসরের পর নূতন আবিষ্কারের মধ্যে Harveyর বিখ্যাত Harveyized steelই উল্লেখ যোগ্য। ৫০ বৎসরেই প্রায় প্রাখর্য্য নির্ব্বাপিত হয়। এ বয়সের উল্লেখ যোগ্য উদ্ভাবনের মধ্যে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, X-ray, Jacquard loom ও Mariners' compass। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ আবিষ্কারের একটা তালিকা দিলাম।

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
পার্কিন	১৮	এনিলিন রং	১৮৫৬
উইলিয়াম্ সিমেনস্	২০	ষ্টীম এঞ্জিন গভর্ণর	১৮৪৩
বিসিমার	২১	সীসার উপর তাম্রের ইলেক্ট্রো প্লেটিং	১৮১৩
কোল্ট	২০	রিভল্‌বার	১৮৩৫
মারকনি	২১	তারহীন তড়িৎবার্ত্তা (প্রথম)	১৮৯১
ওয়েষ্টিং হাউস	২২	Air brake	১৮৬৮
ম্যাক্ কর্ম্মিক	২২	First Reaper built	১৮৩১
হল্	২৩	এলুমিনিয়াম বহিষ্করণ	১৮৮৬
হিরাউন্ট	২৪	ঐ	১৮৮৬
এডিসন্	২৪	Stock Ticker	১৮৭১
এলিস্	২৪	Non-caustic varnish remover	১৯০২
ক্রম্পটন্	২৫	তাঁত	১৭৭৮
ম্যাক্ কর্ম্মিক	২৫	Reaper (কার্য্যকারী)	১৮৩৪
মারকনি	২৫	তারহীন বার্ত্তবহ (সফল)	১৯০০
হোই	২৬	সেলাই কল	১৮৪৫
হুইট্‌নি	২৭	Cotton Gin	১৭৯২

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
ডেভি	২৭	Voltaic arc	১৮০৫
ইরক্‌সন্	২৭	Steam fire engine	১৮৩০
ডাঃ মর্টন	২৭	সংজ্ঞাহীনকারী ঔষধ	১৮৪৬
এডিসন্	২৭	Quadruplex telegraph	১৮৭৪
ব্রাস	২৭	ডাইনামো ও আর্ক ল্যাম্প	১৮৭৬
ওয়েল্‌সব্যাক্	২৭	গ্যাস বারনার	১৮৮৫
উলার	২৮	Synthetic organic compound	১৮২৮
ওয়াট্	২৯	ষ্টীম ইঞ্জিন	১৭৬৫
হুইট্‌ওয়ার্থ	২৯	Planer	১৮৩২
ফারমার	২৯	বৈদ্যুতিক রান্নাঘর	১৮৪৯
বেল্	২৯	টেলিফোন	১৮৭৬
পারসনস্	২৯	Steam Turbine (first)	১৮৮৪
বেকলাণ্ড	২৯	Velox paper	১৮৯২
ফ্যারাডে	৩০	বৈদ্যুতিক মোটর	১৮২১
ন্যাসমাইথ্	৩০	ষ্টীম হ্যামার	১৮৩৮
বুনসেন্	৩০	Carbon Zinc cell	১৮৪১
সিমেনস্ (Fred)	৩০	Regenerative furance	১৮৫৬
এডিসন্	৩০	ফনোগ্রাফ	১৮৭৭
হেল্মহোলজ	৩০	Opthalmoscope	...
মারগেন্থালার	৩০	লীনোটাইপ্ (প্রথম)	১৮৮৪
ফারমার	৩১	Electric fire-alarm telegraph	১৮৫১
টেস্‌লা	৩১	Polyphase Current Motor	১৮৮৮
এডিসন্	৩২	কারবন ফিলামেণ্ট	১৮৭৯
ষ্টীপেন্‌সন্	৩৩	Locomotive	১৮১৪
টম্পসন্	৩৩	Electric Welding	১৮৮৬
হো	৩৪	রোটারী প্রেস	১৮৪৬
সিমেনস্	৩৪	Regenerative furnace	১৮৫৭
অটো	৩৪	গ্যাসইঞ্জিন	১৮৬৬
নোবেল	৩৪	ডিনামাইট	১৮৬৭
ইষ্টম্যান	৩৪	কোডাক্ ক্যামেরা	১৮৮৮
রাইট্	৩৪	Aeroplane	১৯০৫

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
এডিসন্	৩৫	Central Station distribution	১৮৮২
হিরাউল্ট	৩৫	ইলেকট্রিক ষ্টীল	১৮৯৮
এচিসন্	৩৫	Carborundum	১৮৯১
আর্করাইট	৩৬	কাপড় বুনিবার কল	১৭৬৮
ফুলটন্	৩৬	Submarine	১৮০১
নীলসন্	৩৬	Hot air blast	১৮২৮
মারগেন্থালার	৩৬	লীনোটাইপ (কার্য্যকারী)	১৮৯০
ডেভি	৩৭	সেফটিল্যাম্প	১৮১৫
রাইট	৩৮	Aeroplane	১৯০৫
ওয়াট	৩৮	কার্য্যকারী ষ্টীমএঞ্জিন	১৭৭৪
সিমেন্স্	৩৮	Regenerative furnace (perfected)	১৮৬১
ম্যাকে	৩৯	জুতাসিলাই কল	১৮৬০
গুডইয়ার	৩৯	রবার প্রস্তুত প্রণালী	১৮৩৯
গেলী	৩৯	Hot air dry blast	১৮৯৪
ডীসেল্	৩৯	Internal combustion motor	১৮৯৭
ড্যাগেয়ার	৪০	আলোক চিত্রণ	১৮২৯
ওয়েষ্টীংহাউস্	৪০	Quick acting brake	১৮৮৬
এচিসন্	৪০	গ্রাফাইটের অনুকরণ	১৮৯৬
বীসীমার	৪২	Convertor	১৮৫৫
ফুলটন্	৪২	ষ্টীম চালিত নৌকা	১৮০৭
কেলভিন্	৪৩	সাইফন রেকর্ডার	১৮৬৭
কর্ট	৪৪	Reverberatory Puddling Furnace	১৭৮৪
বার্গনেটেলি	৪৪	ইলেক্ট্রো-প্লেটিং	১৮০৫
বুনসেন	৪৪	বারনার	১৮৫৫
সিমেনস্	৪৪	Open hearth Process	১৮৬৭
ঐ	৪৪	ডাইনামো	১৮৬৭
অটো	৪৪	গ্যাস এঞ্জিন (কার্য্যোপযোগী)	১৮৭৬
টেলর	৪৪	High speed Steel	১৯০০
ষ্টীভেনসন্	৪৫	কার্য্যকারী রেলগাড়ী	১৮২৬
ডেনিয়াল	৪৬	Battery cell	১৮৩৬
মর্স	৪৬	টেলিগ্রাফ	১৮৩৭

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
এডিসন ...	৪৬ ...	কিনামিটোস্কোপ ...	১৮৯৩
ভল্টা ...	৪৭ ...	Voltaic pile ...	১৭৯২
কেলভিন ...	৫০ ...	আধুনিক সমুদ্র কম্পাস ...	১৮৭৪
ডীমলার ...	৫০ ...	গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ...	১৮৮৪
রন্‌জেণ্ট্ ...	৫০ ...	X-Ray ...	১৮৯৫
ওয়ারনার সীমেন	৫১ ...	ডাইনামো ...	১৮৬৭
জ্যাকর্য়াড ...	৫১ .	তাঁত ...	১৮০১
ইরিক্‌সন্ ...	৫২ ...	Hot air engine ...	১৮৫৫
ড্যমলিয়ার ...	৫২ ..	গ্যাসোলিন গাড়ী ...	১৮৮৬
মোর্স ...	৫৩ ...	সর্ব্বসাধারণের জন্য টেলিগ্রাফ ...	১৮৪৪
ইরিক্‌সন্ ...	৬০ ...	Monitor ...	১৮৬৩
হার্ভে ...	৬৭ ...	Harveyized Steel ...	১৮৯১

সব সময়ে যে অল্প বয়সেই কেবল উদ্ভাবকের বুদ্ধিশক্তি প্রকাশিত হয় তাহা নহে। আমরা যে দিকে দেখি সেই দিকেই এই নীতি দেখিতে পাই, যে, যাহার কিছু বিদ্যা বুদ্ধি থাকে তাহা অল্প বয়সেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বুড়া বয়সে বড় কিছু হয় না। অনেক বালকের অতি অল্প বয়সেই অঙ্ক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখা যায়। সঙ্গীত বিষয়েও এইরূপ দেখা যায়। এ বিষয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলিয়া একটা জিনিস আমরা স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অনেক সময় কোনও জিনিসের ঐশ্বরিকত্ব মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন মস্তকের এক একটা অংশ পুষ্ট হইলে লোকে এক একটা বিষয়ে বিশারদ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেন যে হঠাৎ ঐ অংশ বাড়ে তাহা বলা বড়ই শক্ত। আমাদের কলিকাতার মাষ্টার মদনের কথা কাহারও অজ্ঞাত নাই। আবার এমনও দেখা যায় যে, যে বাটীতে সঙ্গীত আলোচনা আদৌ নাই সেই বাড়াতে জন্মাইয়া কেহ অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীত বিষয়ে বিশারদ হইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে !!

Jonathan Edwards ১০ বৎসর বয়সে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। Goethe নাকি ৮ বৎসর বয়সেই নিজ মাতৃ ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া তাঁহার ল্যাটিন, ইটালিয়ান, গ্রীক ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছু কিছু বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। মিলটন ১৫ বৎসর বয়সে লাটিন ভাষায় উচ্চ দরের কবিতা লিখিয়া জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে Hamilton যে ভাবে পত্রাদি লিখিতেন তাহা অনেকের অদৃষ্টে উপযুক্ত বয়সেও ঘটিয়া উঠে না। Raphael ১৭ বৎসরের পূর্ব্বেই যে ছবি আঁকিয়াছিলেন তাহার আজ পর্য্যন্ত তুলনা নাই !!

এইবার আমরা একটু বীরত্ব কাহিনী আলোচনা করি। ২৫ বৎসর বয়সে আলেক্‌জাণ্ডর পৃথিবীর অধিশ্বর হইয়াছিলেন। হ্যানিবল ২৬ বৎসর বয়সে কার্থি-জিয়ান সেনাদলের সেনাপতি বা Commander-in-chief হইয়াছিলেন। নেপো-লিয়ান ২৭ বৎসরের পূর্ব্বেই আধুনিক সমর নীতির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের বালক পুত্তের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে! পৃথি্-রাজের বীরত্ব গাথা কাহার অজ্ঞাত? তবে ৪০ বৎসর বয়সে Ceasar প্রথম বীরত্বের পরিচয় দেন। আবার গত Franco-Prussian warএর সেনাপতি Von Moltke ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বীরত্বের ও বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরিচয় দেন। তবে এক্ষেত্রে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকেও উন্নতি করিতে বড় দেখা যায় না কারণ প্রথমে অতি নিম্নস্তর হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির মার্গে উঠিতে হয় বলিয়া ইহা সময় সাপেক্ষ। অধিকাংশ বীরের কীর্ত্তি ৪০ বৎসরের পরই শ্রুত হইয়া থাকে। সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ, অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও বাণিজ্য বিশারদ অল্প বয়সে ঘটিয়া উঠে না। তবে অল্প বয়সে রাজনীতিজ্ঞ হয় না বলা চলে না। William Pitt ও Alexander Hamilton তাহার উদাহরণ। এ সম্বন্ধে Wyman লিখিয়াছেন—

"The highest flight of imagination, the acutest insights into scientific truth, and the most dazzling of military operations have often been the products of comparative immaturity, but the more humdrum activities in the affairs of the state or in the conduct of state or finance require leadership of tested experience. It is this fact which makes the record of William Pitt and Alexander Hamilton (one becoming Prime Minster of England at 24 and the other being colonies leading financial authority at the same age) so extraordinary—not inherent brilliancy of their performances, but in extreme rarity of instance of that kind."

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্য

স্বভাবতঃ আমরা ভগবানের নিকট যে সমস্ত বিষয়ে আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া থাকি, তন্মধ্যে স্বাস্থ্য সর্ব্ব প্রধান। "স্বাস্থ্য ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান" এই মহাবাক্যের প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দ্বারাই আমরা ভগবদ্দত্ত জীবন সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে উপভোগ করিতে পারি অর্থাৎ জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। স্বাস্থ্যই আমাদের কর্ত্তব্য সাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায় স্বরূপ; পুত্র পরিবারের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, স্বদেশের প্রতি মানবের যে অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? এই জন্যই হিন্দু মুনি ঋষির প্রধান নীতি "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য বলিলে নীরোগ ও যন্ত্রণাহীন শরীর কেবল এই টুকু মাত্র বুঝায় না। শারীরিক ও মানসিক অপ্রতিহত স্ফুর্ত্তি, নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্দাম কর্ম্ম চঞ্চলতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরশঙ্ক অনুরাগ, এক কথায় মনুষ্যত্বই স্বাস্থ্যের প্রকৃত অর্থ। বাস্তবিক স্বাস্থ্য এমনই জিনিষ যে ইহার জন্য সকলেরই লালায়িত হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য যাহাতে রক্ষা হয়, তজ্জন্য প্রতিনিয়ত বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। স্বাস্থ্য রক্ষা করা সহজ, কিন্তু নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব।

আমরা যখন স্বাস্থ্য সম্পদ উপভোগ করি, তখন স্বাস্থ্য রক্ষা করা যে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। তখন স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ও অহিতকর অনেক আমোদ প্রমোদে ও কার্য্যে আমরা অনায়াসে যোগ দিই। বিশেষতঃ আমাদের প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে কি না তাহা একবার না ভাবিয়াও স্বাস্থ্যের অপকারী কার্য্যে অনায়াসে যোগ দিই।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালের যাবতীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত ও সমাজসংক্রান্ত ক্রিয়া কলাপের প্রত্যেকটিই স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল ছিল। এমন কি সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে চিররুগ্নও ক্রমশঃ স্বাস্থ্যবান হইতে পারিত। কিন্তু মধ্য যুগে আমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম কলাপে আমাদের প্রবৃত্তি এরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং কর্ম্ম কলাপ এরূপ কদাচার সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল যাহা কিছু ছিল তৎসমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক পুনরায় সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। এখন বিদ্যালয় ইত্যাদিতে প্রথম হইতেই যাহাতে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এরূপ প্রবন্ধ সমূহ অধীত হইতেছে। অবশ্য এরূপ অধ্যাপনার ফল কখনই আশু হইতে পারে না। আমরা

দেখি হয়ত কোন পুস্তকে লেখা রহিয়াছে—"ধূলি-লিপ্ত মক্ষিকা সমাচ্ছন্ন খাদ্য মোদকের দোকান হইতে লইওনা"। বালক পাঠ সমাপ্তির পরেই তৎক্ষণাৎ সেই রূপ খাদ্য অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতেছে। অবশ্য শিক্ষায় প্রথম প্রথম কোনও ফল হইতেছে না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কেননা ইতোমধ্যেই আমাদের মন এরূপ খাদ্য ক্রয় করিবার সময় অল্প সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। অতএব হয়ত আমাদের পুত্র পৌত্রাদি খাদ্য, পানীয় জল, নির্ম্মল বায়ু, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সাবধান হইতে পারিবে।

খাদ্যাখাদ্য বিচারে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান বাস্তবিক যতকাল আমরা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে না পারিতেছি ততকাল বিশেষ লাভ নাই। এই জ্ঞানের সহিত আমাদের Common sense বা সাধারণ জ্ঞানের একযোগে কর্ম্ম করা উচিত। এই সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আর নাই। আমরা যদি এই সাধারণ জ্ঞানকে বেশ পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে যে সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণে বিজ্ঞানকেও নির্ব্বাক হইতে হইয়াছে, সে সমস্ত স্থলেও আমরা অনায়াসে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারি।

আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি, যে আমাদের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ খাদ্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি ও ভেজাল শূন্যতা, পানীয় জলের নির্ম্মলতা, ব্যায়ামের পরিমাণ ও প্রকৃতি অথবা আমাদের করণীয় কার্য্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি এই কয়টি বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে কেবল মাত্র পানীয় জল সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

যে জল আমরা পান করি, তাহা আমাদের শরীরের প্রধান অংশ স্বরূপ। শরীর গঠনের জন্য বা ক্ষয় প্রাপ্ত শরীরের পুনর্গঠনের জন্য কিম্বা শরীরে শক্তি উৎপাদন জন্য আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে কার্য্য চলিতেছে সেই কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য আমাদের প্রচুর জল প্রয়োজন।

যে শোণিতে প্রত্যেক পেশী অবিরত স্নাত হইতেছে এবং যে শোণিত আমাদের শরীরের সমগ্র ওজনের বার ভাগের ১ ভাগ, সেই শোণিতের শতকরা ৮০ ভাগ জল। সমগ্র শরীরের ওজনের ৬০ ভাগ জল। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ প্রতিদিন ৫ ৬ পাইট জল পান করে কিম্বা তাহার প্রতিরূপ কোন খাদ্য ভোজন করে। কয়েক জাতীয় খাদ্য যেমন দুগ্ধ (ইহার জল পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ) শাকসব্জী ও ফল মূল (এই সমস্ত খাদ্যে প্রচুর জল আছে) ইত্যাদি ভোজনে বিশুদ্ধ জল পানের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে জল শরীর রক্ষার্থ কিরূপ প্রয়োজনীয়। সর্ব্বত্রই জল প্রয়োজন। শরীর রক্ষার্থ জল যখন এরূপ প্রয়োজনীয় তখন সেই জল যদি দূষিত হয়, তাহা হইলে শরীর রক্ষা কার্য্য কিরূপে সুচারুরূপে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা

অনায়াসবোধ্য। আমরা জানি যে কয়েক জাতীয় পীড়া, বিশেষতঃ সংক্রামক পীড়া একরূপ বিশেষ রোগ উৎপাদনশীল উদ্ভিদ-বীজাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়া কর্ত্তৃক উৎপাদিত ও সংক্রামিত হয়। এই বীজ খাদ্য দ্বারা, বায়ু দ্বারা এবং জল দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমাদের রক্তে যে দুই প্রকার কণিকা রহিয়াছে—শ্বেত ও লোহিত রক্ত কণিকা—তন্মধ্যে শ্বেত রক্ত কণিকা বা ফ্যাগোসাইট্‌স্ (phagocytes) এই সমস্ত অভ্যাগত বীজাণুর সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগতই ধ্বংস করিতেছে, কাজেই যতকাল আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ততকাল এই শ্বেত রক্ত কণিকা বেশ সবল ও শক্তিসম্পন্ন থাকে এবং আমরাও বহিরাগত রোগ-বীজাণুর দ্বারা কিছুতেই আক্রান্ত হই না অর্থাৎ আমরা আদৌ পীড়িত হই না। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ আমাদের শারীরিক শক্তি নষ্ট হয় যদি আমরা কোন কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে এই সমস্ত শ্বেত কণিকার শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। তখন তাহারা আর বহিরাগত রোগ-বীজাণুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হয় না কাজেই রোগ-বীজাণু বিজয়ী সৈনিকের ন্যায় অধিকৃত শরীরকে নানা ভাবে মথিত করিয়া ফেলে। জল সহযোগে যে সমস্ত রোগ-বীজাণু শরীরে বাহিত হয়, তন্মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর ইত্যাদি প্রধান। রোগীর মল মূত্রে কোটী কোটী রোগ-বীজাণু বর্ত্তমান থাকে; কোনরূপে এই মল মূত্র পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হইলে গ্রামে বা নগরে মড়ক প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশ্য কেবল পানীয় জল দ্বারাই যে এই সমস্ত সংক্রামক রোগের বীজাণু ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, ইহারা সাধারণ মক্ষিকা পদ প্রলিপ্ত হইয়া বা অন্য নানাবিধ উপায়ে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু মক্ষিকা যে রোগ প্রসারে সহায়তা করে তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতানৈক্য আছে। রোগ-বীজাণুর কথা ছাড়িয়া দিলেও আরও অন্য নানাবিধ উপায়ে জল দূষিত হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূষিত জলে প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থজ—উদ্ভিজ্জ অথবা জান্তব—নানাবিধ বস্তু পচিয়া জলে দারুণ হলাহল মিশ্রিত হইতে পারে। চিকিৎসকগণ বলেন যে, এইরূপ জল পানে, মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, অজীর্ণতা পেটের পীড়া, আলস্য ইত্যাদি পীড়া উপস্থিত হয়—অর্থাৎ শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পানীয় জলের দোষে একপ ব্যারাম হয় না, পরন্তু ভোজ্য দ্রব্য দূষিত হইলে এই ব্যাধি উপস্থিত হয়। জলে এই সমস্ত ব্যাধি উৎপাদক বিষ পাওয়া যায় না। যাহা হউক অবরুদ্ধ জলে উদ্ভিজ্জ বা জান্তব বস্তু গলিত হইলে, যে জল দূষিত হয় তাহা নিশ্চয়ই। গলিত জলজ-উদ্ভিদ-দূষিত জল পানে গা বমি বমি করে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কাজেই এরূপ জল যে পানের অযোগ্য তাহা নিশ্চয়ই। তদ্ব্যতীত অনেক জলজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হইলেই জল দূষিত হয়, তাহাদের গলিত হইবার প্রয়োজন হয় না। পানা, প্যানিফল ইত্যাদি যে পুষ্ক-

রিণীতে উৎপন্ন হয়, তাহার জল পূঁষের ন্যায় হইয়া উঠে, এরূপ জল পান যে স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, তাহার জন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় না। স্রোতস্বীর জলে অবশ্য এরূপ দোষ থাকিতেই পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের পানীয় জলে যাহাতে কোনমতে মল মূত্র আসিয়া না পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে অধিবাসিগণের মল মূত্র ত্যাগের প্রধান স্থান পুষ্করিণীর পাহাড়। এরূপ পুষ্করিণীর জল একবারে বিপদশূন্য হইতেই পারে না। বঙ্গপল্লীর রমণীগণের আর একটি অতি বিশ্রী কদভ্যাস রহিয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই জলে মূত্র ত্যাগ করেন। ইহা যে কি ভয়ঙ্কর প্রথা তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। যাহাতে এ প্রথা একবারে বন্ধ হয়, তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক মৎস্যাদি জলচর জীব জান্তব ও উদ্ভিজ্জ নানাবিধ গলিত পদার্থ খাইয়া জলের নির্ম্মলতা রক্ষা করে বটে, কিন্তু যে জল লইয়া রন্ধন করিতে হইবে, যে জল স্বামী, পুত্র, পিতা মাতার জন্য আহরণ করিতে হইবে, সেই জলে মূত্র ত্যাগ করা বাস্তবিকই বিভৎস আচার। যে সমস্ত নগর স্রোতস্বীর তীরে অবস্থিত তথায় স্থানীয় অধিবাসিগণও নিরাপদ নহে। কেননা আজ কাল জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতস্বীর তীরেই কল কারখানা স্থাপিত হয়, এবং এই সমস্ত কারখানার আবর্জ্জনা জলে নিক্ষিপ্ত হয়; এই আবর্জ্জনা মিশ্রিত জল কি করিয়া সুপেয় হইতে পারে? এই জলে প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থজ অথবা ধাতব আবর্জ্জনা যাহাতে নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সৌর শক্তির দ্বারাই জল প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হয়। জল ক্রমাগতই বাষ্পীভূত হইতেছে। বরফ বিগলিত হইয়া জল না হইয়াও বাষ্পীভূত হয়। শীত গ্রীষ্মাদি সমস্ত ঋতুতে দিবারাত্রি সমস্ত সময়ে, ঘনঘটাচ্ছন্ন বা নির্ম্মল দিবসে ক্রমাগত জল বা আর্দ্র পদার্থের জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হইতেছে। এই বাষ্পই যে উপরের শীতলতা সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি, শিশির, তুষার ইত্যাদি আকারে পুনরবতরণ করে, তাহা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। অতএব জল বাষ্পীভূত হইলে জান্তব, উদ্ভিজ্জ বা ধাতব পদার্থ পড়িয়া থাকে। কাজেই বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ স্বভাবিক জল। আমাদের যাবতীয় জলাশয়,—পুষ্করিণী, হ্রদ, নদ, নদী, নির্ঝর, কূপ ইত্যাদি—বৃষ্টির জলে অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ স্বাভাবিক জলে পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হয়। অতএব সূর্য্য আমাদের জলাশয়ের জল অনেক পরিমাণে বিশোধিত করিয়া দেয়।

স্বভাবতঃ আমরা রাসায়নিকত্বের হিসাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পাইতে পারি না। জলে দ্রবীভূত হয় না, এরূপ পদার্থ অতি বিরল। মৌলিক ধাতুও জলে বিগলিত হয়। লৌহ কটাহে বা তাম্র পাত্রে জল রাখিলেও লৌহ ও তাম্র জলে বিগলিত হয়, কেননা আমরা বুঝিতে পারি যে জলে লোহাটে বা তামাটে গন্ধ হইয়াছে; অতএব যৌগিক

পদার্থ যে দ্রবীভূত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বায়বীয় পদার্থও জলে দ্রবীভূত হয়। জল উত্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিবামাত্র যে বুদ্বুদ বাহির হয়, তাহা জলীয় বাষ্প নহে, জলে দ্রবীভূত বায়বীয় পদার্থ। ইহা নানা উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল স্বভাবতঃ পাওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা যে জল পান করি তাহা রাসায়নিকের যন্ত্রাগারে উৎপাদিত বিশুদ্ধ জল নহে—তাহা কেবল পানের যোগ্য এই মাত্র। পানের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা, জল যেরূপ ভূস্তর বাহিয়া প্রবাহিত হইয়া সঞ্চিত হয়, সেই স্তরের উপাদানের উপর নির্ভর করে। ইহা হইতেই কোমল জল বা soft water এবং অকোমল জল বা hard waterএর উৎপত্তি হয়। উত্তপ্ত না করিয়াও যে জলে অনায়াসে সাবানের ফেণা উৎপাদিত হয়, তাহাই কোমল অর্থাৎ ইহাতে অধিক ধাতব পদার্থ দ্রবীভূত নাই, নতুবা অকোমল। যদি কঠিন প্রস্তর স্তর বাহিয়া প্রবাহিত হইয়া জল সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জল কোমল। কেননা কঠিন প্রস্তর সহসা বিগলিত হয় না। কিন্তু খড়ি বা চূণ ঘটিত প্রস্তর বাহিয়া যে জল সঞ্চিত হয় তাহা অকোমল। কেননা জল বায়ুমণ্ডলের কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রচুর পরিমাণে বিগলিত করিয়া ফেলে, এই কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস-সম্মিলিত জল খড়ি বা চূণ ঘটিত প্রস্তরকে গলাইয়া ফেলে। কাজেই এইরূপ জলে যথেষ্ট পরিমাণে চূণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য জলকে বিশেষরূপে পরিশোধিত করে। ভূস্তরেও জল পরিশোধিত হয়। ইহার গলিত দূষিত পদার্থ সমুহ মৃত্তিকা সংস্পর্শে আসিয়া অক্সিডাইজড্ হইয়া কতকাংশে বিনষ্ট হয়, এবং ভাসমান পদার্থ সমুহ ভূস্তরে প্রতিহত হইয়া ছাঁকা হইয়া যায়। কিন্তু যদি মৃত্তিকা স্তর জঞ্জাল, আবর্জ্জনা বা দূষিত পদার্থে অবরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে মৃত্তিকার, দূষিত জল পরিশোধিত করিবার শক্তি আপনাআপনিই নষ্ট হয় এবং দূষিত জল নির্ম্মল না হইয়া আরও দূষিত হইয়া যায়।

পদার্থ সমূহকে দ্রবীভূত করা জলের যেমন একটা প্রধান ধর্ম্ম, সেইরূপ পদার্থ বহন করিয়া লইয়া যাওয়াও জলের একটি অন্যতম ধর্ম্ম। এই বাহিকা ধর্ম্মের উপরেও জলের পানীয়ত্বের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ভর করে। বৃষ্টি, নির্ঝর স্রোত, বন্যা ইত্যাদি পৃথিবীর উপরিভাগ বিধৌত করিয়া ফেলে, এবং তাহার যাবতীয় আবর্জ্জনা বহিয়া লইয়া যাইয়া জলাশয়ে সঞ্চিত করে। এইরূপেই নদীর উপকূল ভগ্ন হয়। কঠিন প্রস্তরও জলের ক্রমাগত আঘাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। উড়িষ্যার একটি প্রবাদ আছে—"ধীরি পানি পাথর কাটিয়ে"। বন্যার প্রবল স্রোতে শত শত নুড়ি, প্রস্তর এইরূপে পর্ব্বত অঙ্ক হইতে স্খলিত হইয়া দেশ দেশান্তরে নীত হয়। এইরূপে নদীর মোহানায়, কর্দ্দম, পলি, প্রস্তর খণ্ড, বালুকা ইত্যাদি জমিয়া "ব" দ্বীপ নির্ম্মিত হয়। এই সমস্ত জমী অতিশয় উর্ব্বর। এই ঘোলা জল কখনই পানীয় হইতে পারে

না। ইহাকে ফিল্টার করিয়া লওয়া উচিত, অর্থাৎ যাহাতে জলে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকা কণিকাগুলি ছাঁকা হইয়া যায়, তাহা করা উচিত। যদি এই জলে প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থজ কোনরূপ দূষিত পদার্থ না থাকে তাহা হইলে কেবল ছাঁকিয়া লইলেই ইহা পানের যোগ্য হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

আলোক।*

(ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হাইগেন্স্ ও ইয়ং কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলোকের তরঙ্গমূলক উপপত্তির দ্বারা ফ্রেনেল আলোকবিজ্ঞানের সামান্য নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহের কতকটা সম্পূর্ণ গণিতমূলক ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি স্বভাবতঃ গতি বিজ্ঞানমূলক (kinematical)। তবে যে যে স্থলে তিনি গতি ও বল বিজ্ঞানমূলক (dynamical) ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি তত ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহে, অন্ততঃ সেইরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেই স্বীকৃত বিষয়গুলির অর্থ সঙ্গত করা দুরূহ।

এক্ষণে সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদ শূন্য গতি ও বল বিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যে কম্পন দ্বারা আলোক গঠিত সেই কম্পন যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই আশ্রয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

আলোক প্রবাহণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সরলতম কল্পনা এই যে, পূর্ব্বোক্ত আশ্রয় স্থিতিস্থাপক। এই কম্পনগুলি আড়াআড়ি (transverse) ভাবে কম্পিত হইয়া পরিচালিত হয় বলিয়া, এই আশ্রয় স্বয়ং বিচ্ছিন্ন হইবার বেগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। এক্ষণে আমরা জানি যে এইরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই স্থিতিস্থাপক এবং কঠিন। অতএব আলোকের আড়াআড়ি কম্পন যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরিচালিত হয়, তাহার স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম থাকায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি যে এই আশ্রয় কঠিন স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে। আলোক প্রবাহণের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইলে, আমাদিগকে স্বভাবতঃই ধারণা করিয়া লইতে হয় যে এই

* ডাক্তার ডি, এন, মল্লিক বি এ, এস সি, ডি, প্রণীত ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) দশম পুস্তিকার (Bulletin No 10) বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়ই আদর্শ আশ্রয়। এইরূপ আদর্শের ধারণা করার দুরূহতা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে এইরূপ স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থের বিদ্যমানতা ধারণা করা দুরূহ। কিন্তু আমরা জানি যে কোনও পদার্থ গতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালিত হয়। যখন বায়ুর মধ্য দিয়া কোন পদার্থ অপরিবর্ত্তনীয় গতিতে গমন করে, তখন আমরা জানি বায়ুর আচরণ প্রায় নিখুঁত তরল পদার্থের (perfect fluid) ন্যায়—কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্কোচনশীল (compressible)। আবার যখন শব্দের দ্রুত কম্পমান গতি বায়ু মধ্য দিয়া চালিত হয়, তখন স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় বায়ু সঙ্কোচনে বাধা প্রদান করে। এইরূপ কোন পদার্থ, নিখুত তরল পদার্থের ন্যায়, নক্ষত্রাদি অন্তরীক্ষ বিক্ষপ্ত পদার্থের অপরিবর্ত্তনীয় গতিতে বাধা প্রদান করে না, কিন্তু আলোকের অতি দ্রুত অধঃ ঊর্দ্ধ কম্পমান গতি সঞ্জাত হইলে সেই তরল পদার্থ স্বয়ং বিচ্ছিন্ন হইবার বেগকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে।

অতএব ইথারকে কঠিন স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় ধরিয়া লইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভের কি ফল হইতে পারে, তাহা অনায়াসে হিসাব করা যাইতে পারে। এইরূপ হিসাব গ্রীন পূর্ব্বেই করিয়াছেন। এই হিসাবে বুঝিতে পারা যায় যে দুইটি তরঙ্গ সঞ্জাত হয়। ইহার একটি চাপ ঘটিত (pressural) এবং অন্যটি টর্সনাল (torsional)। এই টর্সনাল তরঙ্গই আলোক উৎপাদক। তদনুসারে, গ্রীন অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে চাপ ঘটিত তরঙ্গ অসীম বেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এইরূপ অনুমান অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কেন না ইহা পোলারাইজিং কোণ (polarising angle) সম্বন্ধীয় সুবিদিত নৈসর্গিক ব্যাপার ব্যাখ্যাত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে স্ফটিক পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা ঘটিত উপপত্তির ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ডবল্ রিফ্র্যাকশন্ (double refraction) বা আলোকরশ্মির দ্বিধা প্রতিভঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, কোন স্ফটিকে ইথারের কাঠিন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ইথারের ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান। এই হইতেই এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে দুইটি করিয়া পোলারাইজিং কোণ থাকে। তাঁহার উপপত্তি দ্বারা এইরূপও সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, পোলারাইজিং আলোকের কম্পন পোলারিজেশন সমতলের সহিত সমান্তরাল, ইহা ফ্রেনেলের উপপত্তির বিপরীত। কেননা তাঁহার মতে এই কম্পনগুলি সমতলের সহিত লম্ব ভাবে অবস্থিত।

অতএব এক্ষণে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে চাপ ঘটিত তরঙ্গের প্রবাহণ ০ কি না; তাহা হইলে শক্তি বা energy সম্বন্ধীয় যে সমস্ত অভিমত রহিয়াছে, তাহার সহিত অনৈক্য ঘটিতে পারে না। লর্ড কেলভিন দেখাইলেন যে, এরূপ অভিমত গ্রাহ্য বটে, তবে ইনফিনিটিতে (infinity) ইথারের সীমান্ত প্রদেশে ইথারের

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ম্যাক কুলো (Mac Caulaugh) পূর্ব্বেই এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন যে, আলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের বিচারে, আলোকের বিক্ষোভ আড়াআড়ি বলিয়া ইথারের স্বয়ং বিচ্ছিন্ন হইবার শক্তির ফাঙ্কশন্ (function) ইহার আণবিক বিঘূর্ণনের ফাঙ্কশন্ মাত্র। এইরূপ হইলে লর্ড কেলভিনের উপপত্তির অনুযায়ী সমস্ত ফল পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কল্পনার কোনটির দ্বারাই কিন্তু বাস্তবিক আলোকের সাধারণ নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ— যেমন প্রতিফলন, দিক পরিবর্ত্তন, দ্বিধা প্রতিভঙ্গ ইত্যাদি—সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের এবং য়্যাবারেশন্ (aberation), ডিস্পার্সন্ (dispersion) ফ্লুওরেসেন্স (fluorescence) ইত্যাদির বিশদ ব্যাখা করিতে হইলে বস্তু এবং ইথারের মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

কাউচি (Cauchy) সর্ব্ব প্রথম এইরূপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। স্ফটিকের ন্যায় পদার্থ সমূহে ইথারের পরমাণুগুলি বস্তুর পরমাণুর চতুষ্পার্শে। তাঁহার মতে যেন গোলার মধ্যে এরূপ বিন্যস্ত রহিয়াছে যে গোলার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ইথারের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্ম রহিয়াছে। এই গোলাগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত এবং একটি গোলার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ইথারের যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম রহিয়াছে প্রতি গোলার সেই সেই স্থানে সেই সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান। এইরূপ অনুমান করিয়াও তিনি চাপ ঘটিত তরঙ্গের অস্তিত্ব পাইতে লাগিলেন।

এই বিষয়ে লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh) যেরূপ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কোনও তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থের পরিভ্রমণ দেখিয়া এরূপ অনুমিত হয় যে এইরূপ পরিভ্রমণে কোন স্বচ্ছ কঠিন পদার্থের অণুর ঘনত্ব পরিবর্ত্তিত হয়। এবং এই পরিবর্ত্তন, স্ফটিকের ন্যায় পদার্থ সমূহে কম্পনের গতির অভিমুখী হয়। যদি ইহা গ্রহণীয় হয়, এবং বস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও ইথারের কাঠিন্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, যদি এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে [illegible]-য়্যাক্শিয়াল (bi-axial) স্ফটিকে একটা তরঙ্গতল পাওয়া যাইতে পারে। এই তরঙ্গতল ফ্রেণেল বর্ণিত তরঙ্গতল। কিন্তু ইথার যে ল্যাবাইল তাহাও স্বীকার করা অনিবার্য্য। (ক্রমশঃ)

বাল্যে ধূমপান ও তাহার নিবারণের উপায়।

আজকাল আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে ধূমপান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে। সর্ব্বদাই আমরা পথে, হাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই অসংখ্য অল্পবয়স্ক ধূমপায়ী দেখিতে পাই। এই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া আমরা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই ইহাকে দূষণীয় মনে করেন না। আবার যাঁহারা ইহাকে দূষণীয় বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করেন না। তাঁহারা গর্ভমেণ্টের দ্বারা আইন প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী। এই শ্রেণীর লোকের স্বভাব এই যে, তাঁহারা নিজে কোনও কার্য্য করিতে চাহেন না, সমস্ত কার্য্যকেই গর্ভমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। নিজেদের যেন কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে। আইনের দ্বারা সমস্ত কার্য্যের সমাধান কল্পনা করিয়া কোন কার্য্য না করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে যাহা কোনও কারণে রাজা আপততঃ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না প্রকৃত রাজভক্ত প্রজার সেই কার্য্য একটু একটু করিয়া আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত কি না; কালে সুবিধা মত রাজা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। অনেক দেশে অল্প বয়সে ধূমপান বিধি নিষিদ্ধ; তাহাতে উপকারও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত কার্য্য আইনের দ্বারা সমাধান কল্পনা করা এবং আইনে নাই বলিয়া প্রকৃত লোকহিতকর কার্য্যে বিরত থাকা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। আইনের সাহায্য ব্যতীত অল্পবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে ধূমপান প্রথা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে পারা যায়; আইনের সাহায্য ব্যতীত আমরা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারি না তাহা নিশ্চিত। কিন্তু এক দিনে কোন কার্য্যের পূর্ণতা কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র; কথায় বলে "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" যদি আমরা এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে সেটা অল্প লাভের কথা নহে।

আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক ভদ্র সন্তান সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। তামাক খাইতে হইলে অনেক সাজ সরঞ্জম চাই কিন্তু সিগারেট, বিড়িতে সে সমস্ত গোল আদৌ নাই; এইরূপ নানা কারণে ভদ্র সন্তানের পক্ষে তামাক সেবন ঘটিয়া উঠে না। কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে ধূমপান বলিলে সিগারেট বা বিড়ি বুঝিতে হইবে।

ভদ্রসন্তানগণ সচরাচর ১০ কিম্বা ১২ বৎসর বয়সে এই কুঅভ্যাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ৬।৭ বৎসরের বালকের মুখে আমি বহুবার সিগারেট বা বিড়ি দেখিয়াছি। এই

অল্প বয়সেই তাহারা ধূমপানে এমন অভ্যস্ত হয় যে পান করিবার সময় তাহারা কোনরূপ কষ্ট বোধ করে না। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহারা বেশ সিগারেট "টানিতে" থাকে এবং সেই সময় নানারূপ মুখ ভঙ্গিও করিতে থাকে।

এইস্থলে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথম—এত অল্প বয়সে ইহারা এই অভ্যাস কিরূপে শিক্ষা করে? দ্বিতীয়—এই সমস্ত খরচ ইহারা কোথায় পায়? এই দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর সম্বন্ধে আমার যাহা অনুসন্ধানের ফল তাহাই লিখিতেছি।

প্রথম—এই সম্বন্ধে সচরাচর তিন চারি প্রকার কারণ আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সাধারণতঃ বালকগণ এই কুঅভ্যাস বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে দুই চারিটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক থাকে। তাহারা সেই শ্রেণীর মণ্ডল বা পাণ্ডা বা Bully হইয়া থাকে; অল্প বয়স্ক বালকগণ তাহাদিগকে নেতা মনে করে এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। ইহাদের অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া এই নেতাদের কথা শুনিতে হয় না শুনিলে নানা রূপে লাঞ্ছিত হইতে হয়। এই সমস্ত পাণ্ডা বালকগণই প্রায় সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের মূল। তাহারা নিজেদের আবশ্যক মত পান, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি কিনিয়া নিজেরা অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দলের সকলকেই এক একবার ব্যবহার করিতে আদেশ করে; সকলকে ব্যবহার করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে একথা যেন কোনও রূপে প্রকাশ না পায়। সকলেই এক পাপে লিপ্ত কাজেই সে দলের কেহ সহজে গুরুজনের নিকট বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। দলের কেহ এই আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলে, নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া কখনও জোর করিয়া, কখনও "এক ঘরে" বা "আড়ির" ভয় প্রদর্শন করিয়া, কখনও নানারূপ অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া, বালকের অনিচ্ছা সত্বেও এ পাপ কার্য্যে তাহাকে লিপ্ত করান হয়; এইরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে। ধূমপান কালে কেহ মুখবিকৃতি করিলে বা কাশিলে তাহার প্রতি "পাড়া গেঁয়ে চাষা," "অসভ্য" প্রভৃতি অসহ্য বাক্যবাণ প্রয়োগ করা হয়। দলের মধ্যে এইরূপ অপমানিত হইবার ভয়ে অনেকেই বেশ হাস্যবদনে একটু একটু করিয়া ধূমপান করিতে অভ্যাস করিয়া লয়; এই রকমে ক্রমশঃ সে দলের পাণ্ডাদের মধ্যে একটু প্রতিপত্তি পাইয়া থাকে। পাণ্ডা বলিয়া গণ্য হওয়া বালক কেন অনেক বৃদ্ধেরও লোভনীয় কাজেই এ কার্য্যে বালকগণ অতি অল্প কালের মধ্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অনেকে বিদ্যালয়ে না শিখিয়া ক্রীড়াস্থানে, ফুটবলের মাঠে শিখিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটু আধটু বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়। যে বাটীতে অনেক সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে দুই একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক থাকে সে ক্ষেত্রেও এই পাপ সহজে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। এই বয়োবৃদ্ধ বালকগণের প্রতি শিক্ষকগণের এবং অভিভাবকগণের বিশেষ

দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এইরূপ বয়োবৃদ্ধ বালকের অবস্থিতিই যে একটি কারণ তাহা আমি ১৫ আনা স্থানে দেখিয়াছি।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা যাক। প্রথমেই দেখাইয়াছি যে কিরূপে অল্প-বয়স্ক বালকগণ পাণ্ডাগণের (Bully) নিকটে এই কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। যখন বালক-গণ ধূমপানে বেশ অভ্যস্ত হয় এবং ইহা তাহাদের একটা নেশা বা স্ফূর্ত্তির জিনিস হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাদের নিজের খরচে এই সমস্ত স্ফূর্ত্তি বা সুখ উপভোগ করিতে হয়। অনেক সময় দলের অপরকে খাওয়াইবার turn বা "পালা" পড়ে। তখন পাণ্ডারা এই সমস্ত turn ভোগ করে ; নিজেরা বড় খরচ করে না।

এইবার কথা হইতেছে যে এই বালকগণ এ সমস্ত খরচের পয়সা কোথায় পায় ? আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে জলখাবারের জন্য বালকগণকে সে সমস্ত পয়সা দেওয়া হয় তাহা হইতে এই খরচ চালান হইয়া থাকে। যে সমস্ত বালক জল খাবারের পয়সা পায় না তাহারা মারবেল লাটিম প্রভৃতি ক্রীড়া দ্রব্য কিনিবার নাম করিয়া পয়সা লইয়া এই সমস্ত কুকার্য্য করিয়া থাকে। যখন turn বা পালা পড়ে সেই সময় খরচ না করিতে পারিলে হাস্যাস্পদ হইবে এই ভয়ে অনেককে বাটী হইতে অসদুপায়েও পয়সা লইতে দেখা যায়। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা এ সমস্ত কার্য্যে একেবারে সিদ্ধ হস্ত হইয়া পড়ে। তখন এই কার্য্য করিতে তাহাদের কোনওরূপ কষ্ট পাইতে হয় না ; ইহা তখন তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

ধূমপান শিক্ষার কথা বলা সমাপ্ত হইল। এইবার ইহার নিবারণের উপায় সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। এই প্রথা হ্রাস করিতে হইলে বালকদিগকে "হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে হইবে" ; অর্থাৎ বালকদিগকে প্রহার বা তাড়না করিয়া কোন সুফল ফলিবে না। অধিকাংশ স্থলে আমি এ সম্বন্ধে খুব বেশী রকম লক্ষ্য করিয়াছি। কেবল প্রহার দ্বারা যাহারা বালককে সুবোধ ও সুশীল করিতে চাহেন তাঁহারা বালকদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞ বলিতে হইবে। বালক শাসন কার্য্যটা মিষ্ট কথায় এবং নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। কেবল "চোকরাঙ্গানই" বালকের পক্ষে যথেষ্ট। "মারের চোটে ভূত পালায়" এইরূপ যাহাদের ধারণা তাঁহারা এ ক্ষেত্রে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বালকগণের হাতে কোনরূপ পয়সা না পড়ে কেবল যদি এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা যায় তাহা হইলে অতি সহজে এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারা যায়। বালক-গণ তাহা হইলে পাণ্ডাগণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দলত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। অনেকস্থলে পাণ্ডাগণ তাহাকে দলে একবারেই লয় না। পাণ্ডাগণ যে

বালকগণকে শিক্ষা দেয় তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বার্থ থাকে। ভবিষ্যতে তাহাদের নিকটে অনেক "প্রত্যুপকার" আশা করে। "Mutual help" বা পরস্পরের সাহায্যের জন্য পাণ্ডাগণ শিক্ষা দেয় কিন্তু যখন তাহাদের সে আশায় ছাই পড়ে তাহারা তখন আর দলভুক্ত করিতে চাহে না এ কথা আমি খুব জোরের সহিত বলিতে পারি কারণ আমি অধিকাংশ স্থলে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এইরূপ করিতে হইলে বালকদিগের হাতে বিদ্যালয়ে জলখাবারের জন্য যে পয়সা দেওয়া হয় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। পরিচারক বা অন্য কোনও উপায়ে জলখাবার পাঠাইয়া দিলে বেশ ভাল হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নানা কারণে এইরূপ বন্দবস্ত ঘটিয়া উঠে না। তাঁহাদের পক্ষে বালক যখন বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাইবে সেই সময়ে জলখাবার তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। বিস্কুট বা খাবার যেরূপ রুচি সেইরূপ দিতে পারেন। কিন্তু কোনও কারণে এ ক্ষেত্রে বালকের আব্দারের কথায় কান দেওয়া বিধেয় নহে কারণ তাহা হইলে তাহার উৎসন্ন যাইবার পথ বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। বালকগণ তাহাতে রাজি না হইলে বিদ্যালয় হইতে আসিলে তাহাদের জলখাবারের বন্দোবস্ত করাই ভাল। কিন্তু কোনও ক্রমে তাহাদের হাতে পয়সা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই জলখাবারের পয়সাই অনেকের সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বালকের সমস্ত অভাব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূরণ করাই শ্রেয় কিন্তু কদাচ পয়সা দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত বালকের অভিভাবক যদি এই প্রথা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বিনা আইনে ভদ্র সন্তানের মধ্যে ধূমপান প্রথা অতি সহজে তিরোহিত হইতে পারে। এই প্রথা দ্বারা সমস্ত বালকের ধূমপান নিবারণ করা যায় না সে কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু অনেক পরিমাণে সফলকাম হওয়া যাইতে পারে একথা আমি খুব জোরের সহিত বলিতে পারি।

ভদ্রসন্তানের মধ্যে ধূমপান প্রথা রদ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি কারণ ইহাতে কাহাকেও আইন আদালত করিতে হইবে না। সুকুমার মতি বালকগণকে অতি সহজে এই পাপ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। দুই জন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রীর সহিত আমার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহারাও এই প্রথার অনুমোদন করেন। তাঁহারা ইহাকে বিশেষ কার্য্যকরী ও প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্যান্য বালকদিগের মধ্যে এই প্রথা রদ করিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় আমি নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। ধূমপানকারী বালকদিগকে কোনও কার্য্যে নিয়োগ না করা একটা উপায় বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহা কার্য্যকারী কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে দুই চারিটি কথা বলিবার বাসনা রহিল।

এই উপায় বা অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া এ বিষয়ে কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না এবং অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না জানাইলে বাধিত হইব।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবস্থানুবর্ত্তিতা।

(Adaptation.)

জীবজগত তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ সামগ্রীর উপর তাহাদের স্বভাব গঠনের জন্য নির্ভর করে। একই বস্তু স্থান পরিবর্ত্তন বা ঋতুপরিবর্ত্তনের জন্য বিভিন্ন আকার ও স্বভাবের হয়। বোম্বাই আম এখানে উৎপাদিত হয় বটে কিন্তু ততদূর সুমিষ্ট কখন হয় না। আবার দেখা যায় যে ভাল রূপ বৃষ্টি হইলে আমের স্বাদ যেরূপ সুমিষ্ট হয় অল্প বৃষ্টি হইলে কখন তাহা হয় না। সামান্য দুই চারিটী উদাহরণ দ্বারা জিনিষটী বিশদভাবে বুঝান যাইবে :—

১ম। আমরা দেখিতে পাই যে শীত সমাগমে বিরল-লোমযুক্ত পশুর লোম বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে শীতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

২য়। দাঁড়ীর হাত মাংসল, পাল্কী-বাহকের কাঁধ স্থূল হয়, আর ডাকহরকরার পাগুলি মাংসল হইতে দেখা যায়; তাহার কারণ একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তাহারা ঐ সমস্ত অঙ্গের অত্যধিক চালনা করে। জীবিত বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমাগত চালনা করিলে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধিক কার্য্যক্ষম হয়।

৩য়। যদি অভ্যাস করা যায় তবে যে মনুষ্য প্রথমে অর্দ্ধ মণ ভার উত্তোলন করিতে পারে না পরে সে দুই মণ বা ততোধিক ভার উত্তোলন করিতে পারে।

৪র্থ। আফিং খোর যে পরিমাণে আফিং খায় মাত্রায় বাড়াইয়া তাহা সে এত বেশী করিতে পারে যে তাহাতে সহজে সে মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে না।

৫ম। মরুপ্রদেশে জল পাওয়া যায় না। সেখানে অতি সাবধানে জলের ব্যয় করিতে হয় নচেৎ জলাভাবে প্রাণ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সেই জন্য মরুপ্রদেশে গাছগুলি পত্রপল্লববিহীন হইয়া কয়েকটী কাঁটা লইয়াই সন্তুষ্ট হয়।

উপর্য্যুক্ত উদাহরণ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য প্রাণী মাত্রেই কতকগুলি অবস্থার বশে পরিচালিত হয়। এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ সেই অবস্থার মত গঠিত হইয়া যায়।

উপরোক্ত উদাহরণ হইতে আরও বুঝা যায় যে কতকগুলি পরিবর্ত্তন কেবল প্রাণিগণের নিজ জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও কতকগুলি বংশানুক্রমিক হয়। প্রথমোক্ত গুলিকে স্বোপার্জ্জিত ও শেষোক্ত গুলিকে বংশানুক্রমিক অবস্থানুবর্ত্তিতা (Acquired and Hereditary Adaptation.) বলে। এই বংশানুক্রমিক অবস্থানুবর্ত্তিতা হইতে জীবের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা বাহির হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাণিগণ (Living body) দুই উপায়ে জলবায়ুকে নিজের উপযোগী করিয়া লয়। প্রথমটী তাহার স্বোপার্জ্জিত (acquired) ও দ্বিতীয়টী বংশানুক্রমিক (hereditary); এখন দেখা যাউক কোন্‌টী কিরূপ ভাবে কার্য্যকারী হয়।

স্বোপার্জ্জিত :—আত্মরক্ষার্থে অনেক জীব বহুবিধ উপায় অবলম্বন করে, বিশেষতঃ প্রাণিভুক্ জীব মাত্রেই ঐরূপ করিতে বড় পটু। একদিকে তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যেমন মাংসের আবশ্যক অন্য দিকে যে প্রাণীকে তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে তাহার প্রাণও তাহার কাছে তত প্রিয়তর। তা ছাড়া জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেও প্রাণী মাত্রেরই উপর অনেক পরিবর্ত্তন অধিকার বিস্তার করে। নিম্নের দুই একটী উদাহরণের দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

১ম। শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত কম সুতরাং ঐ সমস্ত দেশের লোকের গাত্রে উত্তাপনিবারণী বর্ণবিন্দু (Pigment granules) থাকে না। কিন্তু যখন উহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসে তখন উহাদের প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমশঃ তাহাদের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া তামাটে (brown) হয়; তখন তাহাদের দেহে বর্ণবিন্দু দেখা যায়।

২য়। শীতকালে একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে গরু ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম খুব বৃহৎ হয় এবং গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই উহা ঝরিয়া পাতলা (thin) হইয়া যায়।

৩য়। শীতপ্রধান দেশে এক জাতীয় পক্ষী আছে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ভোজী। গ্রীষ্মকালে মাঠে ঘাস ইত্যাদি থাকে সুতরাং ঘাসের মত রং হইলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে প্রাণ ধারণ করিতে পারে। সেই সময় তাহাদের রং শুষ্ক ঘাস বা খড়ের মত হয়। আবার যখন শীতকালে বরফ পড়ে তখন জল স্থল সব শাদা। তখন শাদা পদার্থ ছাড়া আর প্রত্যেক বস্তুই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং ঐ সকল পক্ষী শীতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিত্যাগ * করিয়া শাদা হয়।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে স্বোপার্জ্জিত উপযোগিতা ব্যক্তি বিশেষের বা জাতি বিশেষের প্রাণ রক্ষার্থে বহুল ভাবে প্রযোজ্য। এখন আমরা বংশানুগত উপযোগিতার কথা বলিব। †

* পরিবর্ত্তন না বলিয়া পরিত্যাগ বলার কারণ পরে বলা যাইবে।

† স্বোপার্জ্জিত বিষয় যেমন স্থায়ী বা অস্থায়ী হয় সেইরূপ এই প্রকারের উপযোগিতাও স্থায়ী বা অস্থায়ী হয়। এই স্থায়ী উপযোগিতাই বংশানুক্রমিকের উৎপাদক।

প্রথমতঃ বংশের একজন যে বিষয়ে সুবিধা পায় সে তাহার বংশানুক্রমে তাহা ভোগ করিতে চাহে। আবার এক জলবায়ুতে পিতা মাতার শরীর যে ভাবে গঠিত ও পোষিত হয় সন্তানাদিরও তাহা হইয়া থাকে। এইরূপভাবে বংশানুক্রমিক উপযোগিতা আসিয়া পড়ে। আর একবার উহা বংশানুগত হইয়া পড়িলে তখন আর তাহা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে না। এ বিষয়ে একটী অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যথা:—শীত প্রধান দেশে দেহের পূর্ণতা সাধন হইতে বিলম্ব হয়। এই জন্যই ইউরোপীয় বালিকাগণের কুমারী কাল (age of puberty) প্রায় ১৬।১৭ বৎসর। উহার পূর্ব্বে কুমারী কাল অতিক্রম করিলে অনেক অসুখের কারণ হয়। কিন্তু ইতিহাস দেখিলে বুঝা যায় যে ইহুদিগণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে বহু শতাব্দি পূর্ব্বে ইউরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তথায় তাঁহাদের বহু পুরুষ কাটিয়া গেল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেহ অতি অল্প বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ ইহুদিগণও এই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন। এখন যাহারা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী তাঁহারাও ইহার আধিপত্য ছাড়াইতে পারেন নাই। এখন ইহুদি বালিকার কুমারী কাল ১০।১২ বৎসর এইরূপ অনেক উদাহরণ দেখা যায়।

যাহা হউক, এ বিষয়ের উদাহরণ এত বেশী যে একটু পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাণী মাত্রের স্বভাব বংশানুগত উপযোগিতার সমবায়ে গঠিত। আরও দেখা যায় যে প্রাণিগণ অধিকাংশ স্থলে বংশানুগত স্বভাবের দ্বারাই চালিত হয়। কেবল অল্প কয়েকটী বিষয়ে আত্মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে। এখানেও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের গভীর খাদে এবং নদীতে বাঁশপাতা নামক এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায় উহারা অত্যন্ত পাতলা উহাদের এক পিট বেশ শাদা কিন্তু অপর পিট কাদা রঙ্গের। সর্ব্বদা কাদা সংলিষ্ট থাকে এবং উক্ত পার্শ্বে আলোক লাগে না বলিয়া উহাদের রং ঐ প্রকার কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাদের দুইটী চক্ষুই এক দিকে। অপর দিকে আদৌ চক্ষু থাকে না। তাহাতে এই প্রাণীর অসুবিধা হয় না এবং চক্ষু ও নষ্ট হয় না। এক্ষণে ঐ সকল মৎস্যের ডিম যদি অল্পপরিসর অগভীর স্থানে ফুটান যায় ত দেখা যায় যে উহাদের দুই পিটের রং যদিও প্রায় সমান হয় তথাপি চক্ষু দুইটী এক পার্শ্বেই থাকিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য কতটুকু।

এক জাতীয় বৃক্ষের একই রকমের ফুল হয়। একটু কারণ অনুধাবণ করিলে বুঝা যায় যে এখানেও বংশপরম্পরাক্রমে কার্য্য করিবার ক্ষমতা কত অধিক। আরও দেখা যায় যে, জীবদ্বারা-রেণুবাহী পুষ্প (Entomophylus) দেশকালের অপেক্ষা না রাখিয়া চিরদিনই একই ভাবে গঠিত ও পুষ্ট হয় (pollinated) ।

এই সকল বিষয় হইতে বুঝা যায় যে প্রাণী মাত্রেই ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন প্রকারে বর্দ্ধিত হইতে চাহে। কিসে নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে চলে এই লইয়া জীব মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত। সুবিধা পাইলেই তাহারা সেই দিকেই ছুটিয়া যায়। তখন আর দেশ কাল পাত্র বিবেচনা থাকে না। এই হইতে ক্রমে তাহারা সকল বিষয়কে তাহাদের উপযোগী করিয়া লয়। আরও কথা এই যে, এইরূপ হইতেই একই শাখা (Species) হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রশাখার (order) উৎপত্তি হয়। পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া নূতন পাইতে সকলে ব্যস্ত সুতরাং এই পুরাতন হইতেই যে নূতনের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার বহু প্রাণী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই যে স্বকীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে ইহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল স্থলের ব্যক্তিগত বা স্বোপার্জ্জিত acquired) উপযোগিতা বংশানুক্রমে পরিণত হয় কি না? একটু চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে তাহা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বলিষ্ঠের পুত্র বলিষ্ঠ হয় না। পাল্কীবেহারার কাঁধ মোটা হইলেও তাহার পুত্রের কাঁধ যে মোটা হয় না ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। বাপের প্রত্যেক ছেলেই বাপের মত হয় না। তবে একের অভ্যাস ক্রমশঃ অন্যে সংক্রামিত হইয়া তাহা বংশানুগত হয়।

এখন দেখা যাউক কোন্ কোন্ স্বোপার্জ্জিত উপযোগিতা বংশানুক্রমে পরিণত হয় ও কোনগুলি হয় না।

(১) শারীরিক বিকৃতি ও সৌন্দর্য্য কখনও কখন বংশানুক্রমে পরিণত হয়। ইহা একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায় ও পূর্ব্বে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

(২) প্রবৃত্তির মধ্যে অনেকগুলি বংশ পরম্পরা চালিত হয়।

(৩) জল বায়ু (climate) পরিবর্ত্তনের জন্য যে উপযোগিতা তাহা স্থান বিশেষে বংশানুগত না হইলেও অধিকাংশ স্থলে হয়।

(৪) জীবন ধারণের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে বংশানুযায়ী।

(৫) আর স্বভাবজঃ পরিবর্ত্তনগুলিও বংশানুগত।

শ্রীঅনাথজীবন বসু।

সূর্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা সূর্য্যের আকৃতি কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এইবার সূর্য্যের আয়তন, গঠন. পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব এবং অপরাপর চিত্তবিনোদনকারী ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিব।

সৌর জগতে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী এতই ক্ষুদ্র যে তাহা একেবারে নগণ্য বলিলেও চলে। সূর্য্যের আয়তন যদি একটি টেনিস্ বলের মত ধরা যায় তাহা হইলে পৃথিবীর আয়তন একটি ক্ষুদ্র সরিষার মত হইবে, কি বোধ হয় তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে। আমাদের পৃথিবীর মত যদি ১৩,৩১,০০০ গ্রহ একত্রিত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের সমষ্টি সূর্য্যের আয়তনের মত হয়। ইহা কি সাধারণ কথা? আমাদের মধ্যে কয়জন ইহা ভাবিয়া দেখেন যে, যে সূর্য্যকে আমরা প্রতিদিন প্রভাতে একটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত থালের ন্যায় আকাশে উঠিতে দেখি তাহা এরূপ বিশালকায়? আমরা পার্থিব কোন প্রকাণ্ড দ্রব্য দেখিলে বিস্মিত হই; বড় বড় গাছ, সুদূর-বিস্তৃত-পর্ব্বতশ্রেণী, বিশাল-দেহ হস্তী, প্রভৃতি বৃহৎ দ্রব্য নয়নগোচর হইলে আমরা দশনপংক্তি বাহির করিয়া আমাদিগের কৌতূহল প্রকাশ করি, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখি না যে, যে সমস্ত বস্তু অতি বৃহৎ ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই এ জগতে তদপেক্ষা সহস্র, লক্ষ, কোটী, পরার্দ্ধগুণ বৃহৎ বস্তুরও অভাব নাই।

সূর্য্যের আয়তন।

জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্শেল (Herschel) সূর্য্যের এইরূপ সুবিশাল আয়তনের কথা প্রচার করিবার কালে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যবিন্দু-প্রদেশ (center) হইতে চন্দ্রের মধ্যবিন্দু-প্রদেশ যতদূর সূর্য্যের ব্যাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রায় তাহার অষ্টগুণ দূর। তাহা হইলে কোন প্রকারে যদি সূর্য্যকে আনিয়া পৃথিবীর উপর এমন ভাবে ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, যাহাতে পৃথিবীর মধ্যবিন্দুতে সূর্য্যের মধ্যবিন্দু মিশাইয়া যায় অর্থাৎ coincide করে, তাহা হইলে সূর্য্যের উপরিদেশ (surface) চন্দ্র হইতে বহুদূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ এই পৃথিবী যদি সূর্য্যের মত বৃহৎ ও বাষ্পীয় হইত এবং পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পরের স্থানের (relative position) যদি কোনরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিত তাহা হইলে চন্দ্রকে পৃথিবীর জঠরে চির বসবাস করিতে হইত।

Newcomb এবং Herschel সূর্য্যকলঙ্ক (Sun-Spots) বিবরণ কালে কহিয়াছেন যে, এই সকল কলঙ্ক যদিও সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তত্রচ এক একটির ব্যাস কখনও কখন ৪০,০০০ ক্রোশের অধিক হয়। অর্থাৎ এইরূপ একটি কলঙ্ক মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত নয় দশটি পৃথিবী অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে সূর্য্য যে কি প্রকাণ্ড বস্তু তাহা পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

সূর্য্য এ পৃথিবী হইতে কত দূরে অবস্থিত তাহা চক্ষে দেখিলেই অনুমান করিতে পারা যায় না। ইহার দূরতা নির্ণয় কিরূপে করা হইয়াছে সে সকল জটিল ও ভয়প্রদর্শক গণিত-সম্বন্ধীয় সংখ্যা লইয়া আলোচনা করতঃ পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। কিরূপে সূর্য্যের Parallax বাহির করিতে হয়, Parallax হইতে কিরূপে Horizontal Parallax বাহির হয় এবং তাহা হইতে কিরূপেতাহার দূরতা নির্ণয় করিতে হয়, সে সমস্ত কথা লইয়া আন্দোলন না করিয়া কেবলমাত্র উহা আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় ৪,৬৪,০০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। ইহা বড় সামান্য দূর নহে। দশ ক্রোশ পথ চলিতে হইলে পাঠক হয় ত বড়ই ক্লান্ত বোধ করিয়া প্রতি ক্রোশের দৈর্ঘ্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। তাহা হইলে ৪,৬৪,০০,০০০ ক্রোশ যে কি পদার্থ তাহার আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের ব্যবধান।

কিন্তু পাঠক এই দূরের কথা শুনিয়াই বিস্মিত হইবেন না। যদিও সূর্য্যের কথা বলিতে বলিতে আর কিছু বলা উচিত নহে, তবু যখন দূরতা-সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে তখন দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অনেক পাঠক হয় ত পৃথিবী হইতে সূর্য্যের এত দূরতা জানিয়া আশ্চর্য্য হইবেন; তাই বলিতেছিলাম যে সূর্য্যের দূরতার বিষয় জ্ঞা › হইয়া যদি তাঁহারা এতাদৃশ আশ্চর্য্যান্বিত হন তাহা হইলে অপরাপর সুদূরস্থিত গগণবিহারী বস্তুদিগের (Heavenly bodies) দূরতার কথা শুনিয়া না জানি তাঁহারা আরও কত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

এক একটি তারকা ইহা অপেক্ষা যে কত বেশী দূরে অবস্থিত তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পৃথিবী হইতে তারকা মণ্ডলী যে কতদূরে অবস্থিত তাহা বুঝাইতে হইলে একটু ঘুরাইয়া বলিলে ভাল হয়। আলোকের একটা গতি আছে—অর্থাৎ আলোক গতিশীল। কথাটা যেন কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে কি হইবে তবে কথাটা সত্য। আলোক যে মুহূর্ত্তে জ্বালা হয় সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আলোক-রশ্মি অনন্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে যতক্ষণ না কোন প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া তাহার অন্তরায় হয়। যদি দূর হইতে একটি ল্যাম্প জ্বালা দেখা যায় তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে আলোটা জ্বালা হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই

আলো আসিয়া চক্ষে পড়ে না; অর্থাৎ ল্যাম্প হইতে চোখে আসিয়া পড়িতে আলোক-রশ্মির কিছু সময় লাগে। কিন্তু ইহার গতি এতই দ্রুত যে তাহা বুঝা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ এই আলোকের গতিও বাহির করিয়াছেন। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক-রশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল বা ৯৩,০০০ ক্রোশ গমন করিয়া থাকে। যদি একটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প একটি দর্শকের নিকট হইতে ৯৩,০০০ ক্রোশ দূরে রাখিয়া জ্বালা হয় তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে সেই আলোটা জ্বালা হয় তাহার এক সেকেণ্ড পরে ল্যাম্পের আলোক সেই দর্শকের চক্ষে আসিয়া পড়ে।

সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে প্রায় ৮ মিনিট ও ২০ সেকেণ্ড সময় লাগে। কিন্তু যে তারকা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তাহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে প্রায় তিন বৎসর কাল লাগে। তাহা হইলে সূর্য্য অপেক্ষা সেই তারকা কত সহস্রগুণ দূরে অবস্থিত তাহা বুঝা যাইতেছে। আবার কোন কোন তারকার আলোক পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে সহস্র বৎসরের অধিক লাগে; কাহারও কাহারও আবার তদপেক্ষা আরও অধিক সময় লাগে। সে সমস্ত তারকামণ্ডলী যত দূরে অবস্থিত তাহা মানুষের অনুমান শক্তিরও অগোচর। পাঠকবর্গ—অবশ্য সকলে নহে, কেহ কেহ—ভাবিবেন যে ইহা "পাগলামী" ইহা আবার কখন সত্য হয়? কিন্তু বাস্তবিকই ইহা সত্য—অতি সত্য। তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৪,৬৪,০০০,০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত শুনিয়াই চকিত হওয়া উচিত নহে।

আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের আয়তন প্রায় একই প্রকারের দেখায়। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষাই অনেক ক্ষুদ্র। প্রায় ৩৯টী চন্দ্র একত্রিত হইলে তবে পৃথিবীর আয়তনের তুল্য হয়। তাহা হইলে সূর্য্য অপেক্ষা ইহা আরও কত ক্ষুদ্র তাহা বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিয়া লইতে পারেন। হয় ত কেহ বলিবেন তাহাই যদি হয় তাহা হইলে পৃথিবী হইতে দুইটিকে এক আয়তনের দেখায় কেন? ইহা শক্ত কথা নহে। আমরা জানি যে একটি বস্তু যতদূরে যায় ততই তাহাকে ক্ষুদ্র দেখায়। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত; পৃথিবী হইতে মোটে ১,১৯,৩৯২ ক্রোশ দূরে। সেই জন্য চন্দ্রকে অধিক ক্ষুদ্র দেখায় না। নভশ্চরের মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে।

Photosphere বা আলোক-চক্র।

সূর্য্যের যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিশ্চক্র দৃষ্ট হয় তাহাকে Photosphere বা আলোক-চক্র বলে। যদি শুধু চক্ষে ইহা দেখা যায় তাহা হইলে কেবল শ্বেতাভ, অতিশয় উজ্জ্বল একটি চক্রাকার বস্তু ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। চন্দ্রের অঙ্গে যেরূপ কাল কাল রেখা দৃষ্ট হয় সূর্য্যের অঙ্গে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না।

তবে যদি খুব শক্তিশালী (powerful)* দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে দেখা যায় তাহা হইলে ইহার সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় ক্ষুদ্রকায় চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়; এবং মাঝে মাঝে বড় বড় কাল কাল চিহ্নও দেখা যায়। শেষোক্ত বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নগুলিকে সৌর কলঙ্ক বা Sun-spots বলে। ইহাদিগের সম্বন্ধে যাবতীয় কথা পরে বলা হইবে। যদিও আলোক-চক্রে ইহাদিগকে দৃষ্ট হয় তত্রচ ইহাদিগের কথা আপাততঃ না বলিয়া আলোক-চক্রের বিষয় কিছু বলিব।

অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণের দ্বারা বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সূর্য্যকে অবিকল এক থালা গরম "মাড়" বা "ভাতের ফেন্" বলিয়া মনে হয়। চালের গুঁড়ার মত যে সমস্ত বস্তুকে সূর্য্যের গাত্রদেশে নড়িতে চড়িত উঠিতে নামিতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রত্যেকে প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ দীর্ঘ।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে Mr. Nasmyth নামক ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ অতি বৃহৎ এবং অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে সূর্য্যের আলোক-চক্র ভাল করিয়া দর্শন করতঃ এই অবগত হইয়াছিলেন যে সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গে যে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন গুলি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের আকৃতি সরু ও দীর্ঘ, অনেকটা উইলো (willow) বৃক্ষের পত্রের মত দেখিতে। এইরূপ বস্তু বহুল পরিমাণে একত্রিত হইয়া সূর্য্যের আলোক-চক্রকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। Nasmyth সাহেবের এই কথা তাঁহার কাছে সত্য হইতে পারে কিন্তু অপর কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ এ কথায় অনুমোদন করেন নাই।

তাহার পর অধ্যাপক ল্যাংলি (Professor Langley) † এই বিষয় লইয়া পড়েন এবং সূর্য্যের এই চিহ্নগুলি কি হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করেন। তাঁহার অতিশয় শক্তি-বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তিনি এই স্থির করেন যে, সূর্য্যের উপরিদেশে গতিশীল অতিশয় ক্ষুদ্র শ্বেতাভ বিন্দুগুলির মাঝে মাঝে আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর এই শ্বেতাভ চিহ্নগুলিকে অপেক্ষাকৃত আরও শক্তিশালী দূরবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ল্যাংলি সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেন যে ইহারা প্রত্যেকে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্রতম বিন্দুর সমষ্টি মাত্র। এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুগুলি নানারূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণের আধার (medium)এ ভাসমান আছে। ইতি পূর্ব্বে শ্বেতাভ বস্তুদিগের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য বিন্দুর কথা বলা হইয়াছে, তাহারা আর কিছুই নহে, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রতম জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুগুলির

* শক্তিশালী (powerful) দূরবীক্ষণ অর্থে সেইরূপ দূরবীক্ষণ যদ্দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদি গগনবিহারী বস্তু বা কোন প্রকার দূরস্থিত বস্তুকে অতিশয় বৃহদাকার দেখায়।

† এই ব্যক্তি পেন্‌সিল ভেনিয়া দেশের অন্তর্গত এলিঘ্যানি নগরের মানমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

অবর্ত্তমানে ভিতরকার কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণের বিন্দুর মত দেখায়। ইহাদিগকে "pores" বা "ছিদ্র" বলা হইয়া থাকে। এই "ছিদ্র" দিগের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আয়তন নাই। যে গুলিকে বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যায় তাহাদের ব্যাস ২″ হইতে ৪″ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আধুনিক জ্যোতির্বেত্তা M. Hanskeyও সূর্য্যের অঙ্গদেশে এইরূপ চিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি এই বিন্দুদিগকে ক্রমাগত নড়িতে চড়িতেও দেখিয়াছেন। আজকাল ফটোগ্রাফের প্রাদুর্ভাবের জন্য এই বিষয় শিক্ষা করিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। দুই চারি সেকেণ্ড অন্তর সূর্য্যের বর্দ্ধিত ফটোগ্রাফ (Enlarged Photograph) লইয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্রতম বিন্দুগুলি কত শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। Hanskey সাহেব এই বিন্দুদিগের গতিশীলতার একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই কথা বলেন যে, অত্যধিক উষ্ণতাবশতঃ সূর্য্যের ভিতরকার বিন্দুগুলি উপরে উঠিবার সময় উপরিদেশের বিন্দুগুলিকে সরাইয়া দেয়; সেইজন্য সেই বিন্দুদিগের এইরূপ গতি ঘটে।

Photosphere বা আলোক-চক্র সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে কিন্তু কোন্‌টি যে সত্য তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে ভয়ঙ্কর উষ্ণতাপ্রযুক্ত সূর্য্যের ভিতরে এবং চতুঃপার্শ্বে যে ভয়ঙ্কর একটা উপদ্রব (disturbance) ঘটিতেছে তাহা নিশ্চয়।

একটি "ভুষা পড়ান" কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্যোতিশালী। যত প্রান্তের দিকে যাওয়া যায় ততই দেখা যায় যে জ্যোতি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। মধ্যদেশে সূর্য্যের জ্যোতি যেরূপ প্রখর, উষ্ণতা এবং রাসায়নিক কিরণও (chemical rays)* সেইরূপ প্রখর। প্রান্তদেশে রাসায়নিক কিরণ অত্যন্ত অল্প, আলোক কিরণ তদপেক্ষা অধিক এবং উত্তাপ কিরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক-চক্রের মধ্যদেশ

* রাসায়নিক কিরণ (chemical rays) অর্থে সেই কিরণ যদ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের শ্বেত আলোক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমষ্টি মাত্র যথা:—লোহিত, কমলা, পীত, হরিত, ঈষৎ নীল, ঘোর নীল এবং বেগুনি ইহা অনেকেরই জ্ঞাত আছে। ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়া দেখিলে এই সকল বর্ণ দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, এইরূপ ত্রিকোন বিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া আলোক গমন করিলে তাহার মূলীভূত (component) বর্ণালোকগুলি পরস্পর পৃথক হইয়া যায়। এক্ষণে এই মূলীভূত বর্ণালোকগুলির মধ্যে যে গুলি অধিক বক্রণীয় (more refrangible), যথা:—ঘোর নীল, বেগুনি এবং এইদিকের আরও বক্রণীয় অদৃশ্য অন্যান্য কিরণগুলি—তাহাদিগের প্রধান গুণ এই যে, ইহাদিগের দ্বারা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। সেইজন্য এই কিরণগুলিকে রাসায়নিক কিরণ বলে। এইরূপ কমলা, লোহিত এবং এই দিকের অল্পতম বক্রণীয় (less refrangible) কিরণগুলির দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; ইহাদিগের কার্য্য উষ্ণতা প্রদান করা; সেইজন্য ইহাদিগকে উত্তাপ কিরণ বলে। এবং পীত, হরিত প্রভৃতির দ্বারা উষ্ণতা সঞ্জাত হয় না বা রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, উপরন্তু ইহাদিগের দ্বারা আলোক রশ্মির তীব্রতা জন্মিয়া থাকে; সেইজন্য ইহাদিগকে আলোক কিরণ কহে।

হইতে যতই প্রান্তদেশে যাওয়া যায় ততই তাহার আলোক কিরণ, উত্তাপ কিরণ এবং রাসায়নিক কিরণ হ্রাস পাইতে থাকে। যে পরিমাণে উত্তাপ কিরণ হ্রাস পায় তদপেক্ষা অধিকতর পরিমানে আলোক কিরণ হ্রাস পায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে রাসায়নিক কিরণ হ্রাস পাইয়া থাকে। তিন জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা এই তিন প্রকার কিরণ সূর্য্যের মধ্যদেশ হইতে প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত কি পরিমানে হ্রাস পাইতে থাকে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। ল্যাংলি (Langley) নামক খ্যাতনামা জ্যোতির্বেত্তা উত্তাপ কিরণ সম্বন্ধে, পিকারিং (Pickering) আলোকের কিরণ সম্বন্ধে এবং ভোজেল (Vogel) নামক অপর একজন পণ্ডিতবর রাসায়নিক কিরণ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।—

সূর্য্যের আলোক-চক্রের মধ্যদেশ হইতে প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যত দূর।	উত্তাপ কিরণ।	আলোক কিরণ।	রাসায়নিক কিরণ।
·০০	১০০	১০০	১০০
·১২৫	...	৯৯	১০০
·২৫	৯৯	৯৭	৯৮
·৩৭৫	...	৯৪	৯৫
·৫০	৯৫	৯১	৯০
·৬২৫	...	৮৬	৮১
·৭৫	৮৬	৭৯	৬৬
·৮৫	...	৬৯	৪৮
·৯৫	...	৫৫	২৫
·৯৬	৬২	...	২৩
·৯৮	৫০	...	১৮
১·০০	...	৩৭	১৩

তাহা হইলে ইহা দেখা যাইতেছে যে এক বর্গমিনিট স্থানে আলোক-চক্রের মধ্যদেশে সূর্য্য যতখানি উষ্ণতা প্রদান করে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উষ্ণতা প্রান্তদেশে প্রদান করে; মধ্যদেশে সেইটুকু স্থানে যতটা আলোক প্রদান করে তাহার প্রায় তিন অংশের এক অংশ আলোক প্রান্তদেশে প্রদান করে; এবং সেই পরিমিত স্থানে মধ্যদেশে রাসায়নিক কিরণগুলি যত পরিমাণে প্রদত্ত হয় তাহার প্রায় অষ্টাংশের এক অংশ রাসায়নিক কিরণ প্রান্তদেশে প্রদত্ত হয়।

তাহা হইলে ইহার কারণ কি? কোন কারণবশতঃ সূর্য্যের মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তদেশে উত্তাপ, আলোক এবং রাসায়নিক কিরণগুলি এতাদৃশ অল্প পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়? ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ—সূর্য্যের মধ্যদেশ অপেক্ষা প্রান্তদেশ আমাদের নিকট হইতে অধিক দূরে অবস্থিত। ইহা বুঝিতে প্রথমতঃ একটু গোলমাল ঠেকিবে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহা অতিশয় সহজ বলিয়া বোধ হইবে। সূর্য্যের মধ্যদেশ অপেক্ষা প্রান্তদেশ প্রায় ২,১৬,০০০ ক্রোশ দূরে কাজেই সমস্ত কিরণের প্রাখর্য্য কিঞ্চিৎ যে হ্রাস হইবে তাহা আর বিচিত্র কথা কি?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে উত্তাপ কিরণ আলোক কিরণ এবং রাসায়নিক কিরণ এরূপ বিভিন্নভাবে হ্রাস পায় কেন? অবশ্য ইহা একটা জিজ্ঞাস্য বটে সেই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সূর্য্যের আলোক-চক্রের মধ্যদেশ অপেক্ষা প্রান্তদেশে কিরণজালের এতাদৃশ হ্রাস হইবার দুইটি কারণ আছে। দ্বিতীয় কারণটি বলিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

দ্বিতীয় কারণ এই :—পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যেমন একটি বায়ুমণ্ডল (atmosphere পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে ঠিক সেই রকম সূর্য্যের চারিদিকেও একটি বায়ু ও বাষ্প মণ্ডল (Solar atmosphere) সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুতরাং আলোক-চক্রের সমান্তরালে (parallel) বা সমতলভাবে (horizontally) যে কিরণগুলি প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাদিগকে, আলোক চক্রের উপর হইতে লম্বভাবে (vertically) যে কিরণগুলি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা সূর্য্যের গভীরতর বায়ু এবং বাষ্প-মণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রচালিত হইতে হয়। এক্ষণে যে কিরণগুলি অধিকতর এবং গভীরতর বায়ু ও বাষ্প মণ্ডল ভেদ করিয়া যায় তাহাদিগের বহু অংশ সেই মণ্ডল কর্ত্তৃক শোষিত (absorbed) হইয়া বিনষ্ট হয়। এক্ষণে সূর্য্যের প্রান্তদেশ হইতে যে সমস্ত কিরণ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহাদিগকে সূর্য্যের গভীরতর বায়ু ও বাষ্প মণ্ডল ভেদ করিয়া আসিতে হয়; সেই জন্য তাহাদিগের অনেক কিরণের অপচয় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই বাষ্প-মণ্ডলের মধ্য দিয়া চালিত হইলে অন্যান্য কিরণ অপেক্ষা রাসায়নিক কিরণগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নষ্ট হইয়া থাকে এবং উত্তাপ কিরণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প নষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাষ্প কর্ত্তৃক রাসায়নিক কিরণগুলি অধিকতম ভাবে এবং উত্তাপ কিরণগুলি অল্পতম ভাবে শোষিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সূর্য্যের আলোক-চক্রের প্রান্তদেশে রাসায়নিক কিরণ অপেক্ষাকৃত এত অল্প।

উপর্য্যুক্ত ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রমান ঘরে বসিয়া বসিয়াই পাওয়া যায়। আমরা জানি একটা ফটোগ্রাফের কাচ (negative) হইতে ছবি (positive) লইতে হইলে সেই কাচের উপর এক খণ্ড ফটোগ্রাফের কাগজ (Printing out paper) দিয়া একখানি ফ্রেমে চড়াইয়া রৌদ্রে ধরিতে হয়। ক্রমে সেই কাগজে ছবি ফুটিতে থাকে। আমরা দেখি যে দুপুর বেলা এই ছবি অতি শীঘ্র কাগজে ফুটে, কিন্তু যত "বেলা পড়িতে" থাকে ততই কাগজে ছবি ফুটিতে বিলম্ব হয়। অতঃপর বৈকালে যখন সূর্য্য আরক্তবরণ ধারণ করে তখন কাগজে ছবি কিছুতেই ফুটে না; ইহার কারণ এই যে দিঙমণ্ডল প্রদেশ (Horizon) হইতে সৌর কিরণগুলিকে পৃথিবীর গভীরতর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিতে হয়। সেই জন্য সূর্য্যের আলোক উদয় ও অস্তকালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলস্থিত বাষ্পরাজী কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমানে অপচিত হইয়া থাকে।

তাহার উপর আবার সৌর কিরণের মধ্য হইতে রাসায়নিক কিরণগুলির অধিকাংশ এই বাষ্পকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া বিনষ্ট হয়। সুতরাং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যে পরিমানে রাসায়নিক কিরণ সৌর কিরণের সহিত আসিয়া ভূমিতলে পতিত হয় গভীরতর বায়ু ও বাষ্পমণ্ডলের মধ্য দিয়া আসিতে হয় বলিয়া প্রভাত ও সায়ংকালে সে পরিমাণে রাসায়নিক কিরণ আসিয়া ভূমিতলে পতিত হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে আসিয়া পতিত হয়। যে কারণে সূর্য্যের আলোক-চক্রের প্রান্তদেশ অপেক্ষা মধ্যদেশে আলোক, উত্তাপ ও রাসায়নিক কিরণ অধিক ঠিক সেই কারণেই প্রভাত ও সায়ংকাল অপেক্ষা দ্বিপ্রহর কালে সৌর কিরণে আলোক, উত্তাপ ও রাসায়নিক কিরণ অধিক থাকে।

এক্ষণে তাহা হইলে বুঝা গেল যে কি নিমিত্ত সূর্য্যের মধ্যদেশ প্রান্তদেশ অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, উত্তপ্ত এবং রাসায়ন-কার্য্য-সম্পাদন-পটু।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকের বায়ু ও বাষ্পমণ্ডল থাকাতে সূর্য্যের সকল প্রকার কিরণ বহু পরিমানে অপচিত হয়। কিন্তু কত পরিমানে যে অপচিত হয় সে বিষয়ে "নানা মুনির নানা মত" আছে। তবে কিরণগুলি যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমানে নষ্ট হয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। তাহা ছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও সূর্য্যের কিরণের যথেষ্ট অপচয় হয়। এইরূপ নানা কারণে সৌর কিরণ যদি অপচিত না হইত তাহা হইলে সূর্য্যের আলোক-চক্র আরও উজ্জ্বল, আরও উষ্ণ হইত ও অধিকতর ভাবে রাসায়নিক কার্য্য সম্পাদন করিত, এবং নীল ও বেগুণি বর্ণালোকের (the more refrangible rays) বাষ্পকর্ত্তৃক এতাদৃশ অপচয় হইত না বলিয়া সূর্য্যকে একটু নীলাভ দেখাইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথলাল সরকার বি এ

৩য় বর্ষ।) সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। (৯ম সংখ্যা।

ব্যোমযানে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ এতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন প্রথম প্রথম ইহা আবিষ্কৃত হয় তখন বোধ হয় কেহ একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে এতটা শীঘ্র ইহা এতাদৃশ কার্য্যকর হইয়া উঠিবে এবং শূন্যমার্গে সংবাদ একদেশ হইতে যে অপর দেশে পরিভ্রমণ করিবে ইহা সম্ভব বলিয়া হয় ত কেহ বিশ্বাসই করিতেন না। Titanic নামক মহার্ণবপোত যখন জলমগ্ন হয় তখন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মৃত্যুর ভয়ঙ্করী মুষ্টির মধ্য হইতে মুক্তি পান ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যদ্যপি সেই জাহাজে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ'র যন্ত্র না থাকিত তাহা হইলে এই ব্যক্তিগণও যে তাঁহাদের গত সহযাত্রীদিগের অনুগমন করিতেন তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে মহাত্মা এতগুলি জীবের জীবন দান করিয়াছিলেন তিনি আর কেহই নন, সেই তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ'র পরিচালক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মৃত্যুর গ্রাস হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি এতগুলি জীবকে উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু আপনি মহাসমুদ্রের অতল তলে নিমগ্ন হইলেন।

আজ কাল বৃহৎ অর্ণবপোত মাত্রেই এই তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ আছে; যেহেতু অনন্ত সমুদ্র মাঝে সুদূরাবস্থিত পৃথক পৃথক জীবমণ্ডলীকে এই যন্ত্র এক প্রকার একত্রিত করিয়া রাখিয়া অনেক ভরসা প্রদান করে। দূরাবস্থিত হইলেও এই যন্ত্র সমুদ্রবক্ষে ভাসমান ব্যক্তিবৃন্দের মনের মধ্যে যেন এক প্রকার নৈকট্যভাব আনয়ন

করে, এবং শুধু তাহাই নহে, বিপদকালে পরস্পরের সাহায্যার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

আজ কাল ব্যোমযানেও আবার তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সহস্র সহস্র হস্ত উপর হইতে ব্যোমযানের যাত্রিবর্গ ধরাবাসী-দিগের সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা যুদ্ধ বিগ্রহে বহু কার্য্যে লাগিয়া থাকে। উপর হইতে শত্রুবর্গের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ পুনরায় নিম্নে অবতরণ করিয়া সংবাদ প্রদান করা বহু সময়সাপেক্ষ বলিয়া এই যন্ত্র ব্যোমযানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সংবাদ নিজ পক্ষীয় সেনার নিকট পঁহুছে। ইহার দ্বারা কেবল যে সময়ের কিছু সুবিধা হয় তাহা নহে, ব্যোম-যানের পেট্রোল খরচও কিছু অল্প হয় এবং নিম্নে আসিয়া সংবাদ প্রদান করিতে যতটুকু সময় যাইত সেই সময়ের মধ্যে আরও অনেক কার্য্য সমাধান করিবার সুবিধা হয়।

ব্যোমযানে এই যন্ত্র থাকায় আর একটা সুবিধা এই যে, ইহা যখন যাত্রী লইয়া একদেশ হইতে অন্য দেশে যাইবে তখন কোন্ সময় ঝড় আসিবার সম্ভাবনা বা কোন্ সময় ঘোর কুজ্ঝটিকা আসিয়া পৃথিবীকে আবরণ করিতে পারে সে সমস্ত সংবাদ ভূমিতলস্থ জল-বায়ুসম্বন্ধীয় "আস্তানা" (metereological station) হইতে তাহাদের নিকট যথা সময়ে যাইয়া পঁহুছে ; সুতরাং আর তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা না থাকিবারই কথা।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Slaby সর্ব্ব প্রথমে ব্যোমযানে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ ব্যবহার করেন। যদিও সে সময়ে এই যন্ত্র আজকালকার মত এতটা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই তথাপি ইহা কোন রকমে ব্যোমযানে লাগাইয়া Slaby সাহেব সেই সময়ে একটা অভিনব ব্যাপার দেখাইয়া লোকসমাজে ধন্য হইয়াছিলেন। তখনকার ব্যোমযানের আকৃতি ভিন্ন প্রকারের ছিল। আজ কাল ইহা যেমন চুরট্ বা সিগারের মত দীর্ঘাকৃতির প্রস্তুত হইয়া থাকে পূর্ব্বে তাহা বর্ত্তুলাকৃতির হইত। ইহা অধিক দিনের কথা নহে। বোধ হয় ভারতনিবাসী অনেকেই সেদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তুলাকার ব্যোমযান আকাশে উঠিতে দেখিয়াছেন। অধুনা যেরূপ আকৃতির ব্যোমযান হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভারতনিবাসী কোন ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা চাক্ষুষ দর্শন ঘটে নাই। বরং উড়োকল অনেকেই দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বকার এইরূপ বর্ত্তুলাকার ব্যোমযানে তত বেশী স্থানের সঙ্কুলান হইত না বলিয়া Slaby সাহেব তাহাতে কেবলমাত্র সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্রটি (receiving apparatus) বসাইয়াছিলেন।

আজ কাল প্রায় সমস্ত Zeppelin নামক ব্যোমযানে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। জার্ম্মানী দেশের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে কতকগুলি তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহের "আস্তানা" (Stations) শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অতি উচ্চ ধূম নির্গমের লৌহ নলের উপর এই Station গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহাতে আপনা আপনি কার্য্যসম্পাদন হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। এই Stationগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জার্ম্মাণীর সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে বিক্ষিপ্ত থাকায় কোন একটি ব্যোমযান জার্ম্মাণী দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে কোন ব্যোমযান অসাবধানতাবশতঃই হউক বা অজ্ঞাতবশতঃই হউক জার্ম্মাণী দেশের সীমার বাহিরে যাইতে থাকে, অমনি সেই স্থানের Station হইতে উপরে সংবাদ প্রেরিত হয়। তৎক্ষণাৎ ব্যোমযানের গতি ফিরিয়া যায়; সুতরাং তাহা আর নিজ দেশ অতিক্রম করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী কোন দেশে গমন করিতে পারে না।

জল বায়ুর ভাব কি প্রকার—অনতিবিলম্বে ঝড় আসিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ ব্যোমযানে প্রেরণ করিবার জন্ম মাঝে মাঝে আবার বড় বড় Station নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উত্তর মেরুদেশে পরিভ্রমণের জন্য Wellman কর্ত্তৃক যে ব্যোমযান প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ বসাইবার কথা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বসাইবার পূর্ব্বেই ব্যোমযানটি নষ্ট হইয়া যায়।

আজ কাল ব্যোমযানে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ যেরূপ ব্যবহৃত হইতেছে উড়োকলেও সেইরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। তবে উড়োকলের আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাতে যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহা অতিশয় ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার দ্বারা বড় যন্ত্রের মত সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

ব্যোমযান অর্থে আমরা বুঝি যাহার মধ্যে লঘু বাষ্পীয় পদার্থ থাকে, এবং যে বাষ্পীয় পদার্থ এই ব্যোমযানকে শূন্যে ভাসমান রাখে। এক্ষণে ব্যোমযানে তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ বসাইতে হইলে তিনটি বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ—যন্ত্রটিকে সাধ্যমত লঘু করা কর্ত্তব্য—যেহেতু অত্যধিক ভারি হইলে বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—তাড়িত-তরঙ্গ বিক্ষেপণ কালে যাহাতে তড়িতের স্ফুলিঙ্গ (sparks) কোনওরূপে ব্যোমযানের আভ্যন্তরিক দাহ্য বাষ্পীয় পদার্থের সংস্পর্শে না আসিতে পারে। কারণ যদি কোন রকমে তাহা সংঘটিত হয় তাহা হইলে ব্যোমযানের আভ্যন্তরিক সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থে এক কালীন অগ্নি লাগিয়া মহান্ অনিষ্ট সম্পাদন করিবে।

তৃতীয়তঃ—শূন্যে থাকিয়া যন্ত্রটিকে ভূমির সংস্পর্শে আনয়ন করা (earthing) বড় সহজে হয় না। তাড়িতযন্ত্রমাত্রেরই ভূমিস্পর্শে থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাব ব্যোমযানে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে ব্যোমযানে একটি কৃত্রিম ভূমির (earth বা counterpoise) সৃষ্টি করিতে হয়।

তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহে দুইটি প্রধান দ্রব্য বিশেষ আবশ্যক। প্রথমতঃ—এরিয়াল (Aerial)—অর্থাৎ যে যন্ত্র দ্বারা সংবাদ সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ—কৃত্রিম ভূমি (earth বা counterpoise)—অর্থাৎ যদ্দ্বারা এই যন্ত্রটির জন্য একটি প্রকাণ্ড তাড়িত-আধার গঠিত হয়।

এরিয়াল আর কিছুই নহে অতি উচ্চ লৌহদণ্ড মাত্র। এই লৌহদণ্ডতে সুদূরপ্রেরিত তাড়িত প্রবাহ আসিয়া লাগে এবং সেই লৌহদণ্ড বহিয়া নিম্নে সংবাদ-গ্রহণ-যন্ত্রে (receiving apparatus) আসিয়া সংবাদ প্রদান করে। যাঁহারা কলিকাতার দুর্গের নিকট বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ অনেকগুলি অত্যুচ্চ এরিয়াল দেখিতে পাইবেন; কিন্তু ব্যোমযানে ত আর এইরূপ ভাবে এরিয়াল বসান যাইতে পারা যায় না, সেই জন্য ব্যোমযানে যে স্থানে যাত্রীবর্গ বসিয়া থাকেন তাহার নিম্নদেশ হইতে এরিয়াল বহুদূর পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা স্থলগত এরিয়ালের মত দৃঢ় এবং অচল (fixed) ভাবে গঠিত হয় না, কারণ তাহা হইলে যখন স্থল হইতে খুব অল্প উচ্চে ব্যোমযানটির পরিভ্রমণ করিবার প্রয়োজন হইবে তখন ইহা স্থলে স্পর্শ করিয়া ব্যোমযানের অবাধ গতিবিধির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। ইহা এইরূপভাবে গঠিত যে, প্রয়োজন কালে ইহা অতি শীঘ্র ঝুলান বা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু পাছে কখন ঘটনা সূত্রে ইহা কোন রকমে গাছ পালায় আটকাইয়া গিয়া ব্যোম-যানের অপরিমেয় ক্ষতি সম্পাদন করে, সেই কারণে, এই এরিয়াল এইরূপ পরিমাণের টানসহ করা হয় যাহাতে অল্প বিস্তর টান পড়িলেই ইহা ব্যোমযান হইতে ছিন্ন হয়।

এই এরিয়ালের তার ফস্ফর-ব্রোঞ্জ (Phosphor-bronze) নামক মিশ্রিত-ধাতু নির্ম্মিত। ব্যোমযানের যে স্থানে এই তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহ'র যন্ত্র সংস্থাপিত হয় সেই স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এই এরিয়াল একটি কপিকলে জড়ান থাকে। এরিয়ালের নিম্নমুখে একটি ভারি সীসার গোলক বাঁধা থাকে। সীসার গোলা বাঁধিবার কারণ এই যে, ইহা থাকাতে এরিয়ালটি শীঘ্র ঝুলাইয়া দিবার সুবিধা হয় এবং যখন এরিয়ালটি ঝুলাইয়া দেওয়া হয় তখন ইহা বেশ টানের মাথায় থাকে। উড়োকলে এই কপিকলটি তাড়িত-বার্ত্তাবহযন্ত্রের উপরে না থাকিয়া যে ব্যক্তি এই যন্ত্র পরিচালনা করে তাহারই নিকট থাকে।

এরিয়ালটি মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। অগ্র ভাগের কতকটা হয়ত কৃষ্ণবর্ণের, তাহার পর কতকটা শ্বেতবর্ণের, তাহার পর কতক লোহিত, তাহার পর কতক তাম্রবর্ণের ইত্যাদি। ইহার যে কোন কারণ নাই তাহা নহে। কারণ না থাকিলে পাশ্চাত্যবাসীরা অযথা কোন কার্য্যই করেন না। সংবাদ-প্রেরণযন্ত্রের (Transmitting apparatus) উপযুক্ত এবং নির্দ্ধারিত তাড়িত-তরঙ্গের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য (different wave-lengths) অনুযায়ী এই এরিয়ালটি রঞ্জিত করা হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সংবাদ-প্রেরণ যন্ত্রের (Transmitting apparatus) জন্য কতকগুলি নির্দ্ধারিত দৈর্ঘ্যের তাড়িত-তরঙ্গ আছে কেবলমাত্র যে গুলি উক্ত যন্ত্র দ্বারা বিধিমতে পরিচালিত হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প দৈর্ঘ্যের তাড়িত-তরঙ্গ ইহা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেনা। ধরিয়া লওয়া গেল যে, কোন একটি ব্যোমযানে তাহার সংবাদ-প্রেরণযন্ত্রের দ্বারা কেবলমাত্র "ক", "খ", "গ" ও "ঘ" দৈর্ঘ্যের তাড়িত-তরঙ্গমালা পরিচালিত হয়; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কি অল্প দৈর্ঘ্যের তাড়িত-তরঙ্গ পরিচালিত হয় না। এক্ষণে তাড়িত-তরঙ্গের চারি প্রকার দৈর্ঘ্যের জন্য এরিয়ালটিকেও চারি অংশ করিয়া লইয়া এক এক অংশ এক এক প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। "ক" দৈর্ঘ্যের তাড়িত তরঙ্গের জন্য হয়ত এই এরিয়ালকে অধিক ঝুলাইবার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ পর্য্যন্ত ঝুলাইলে "ক" এর পক্ষে যথেষ্ট হয়; সেইরূপ এরিয়ালের শ্বেতবর্ণ পর্য্যন্ত ঝুলাইলে "খ"য়ের পক্ষে উপযোগী হয়; লোহিতবর্ণ পর্য্যন্ত ঝুলাইলে "গ"য়ের পক্ষে উপযোগী হয়; এবং তাম্রবর্ণ পর্য্যন্ত ঝুলাইলে "ঘ"য়ের পক্ষে উপযোগী হয়। সুতরাং যখন যে প্রকার দৈর্ঘ্যের তাড়িত-তরঙ্গের দ্বারা সংবাদ প্ররণ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন এরিয়ালের ঠিক সেইরূপ দৈর্ঘ্য ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

এরিয়ালটি চালন-চক্র (propeller) বা অন্যান্য ঘূর্ণ্যমান পদার্থের নিকট যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য ইহাকে একটি তাম্র-নির্ম্মিত চোঙার মধ্য দিয়া নিম্নে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। যদি কোন প্রকারে ইহা চালন-চক্র বা অপর কোন ঘূর্ণ্যমান চক্রের সহিত জড়াইয়া যায় তাহা হইলে তাহার ফল যে কি ভয়ঙ্কর হইবে তাহা আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তাবহে এরিয়াল যেমন প্রয়োজনীয় কৃত্রিম ভূমিও (earth বা counterpoise) সেইরূপ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শূন্যমার্গে থাকিয়া ভূমির সহিত সংস্পর্শে আসা তাদৃশ সুবিধাজনক নহে বলিয়া ব্যোমযানে ভূমির কার্য্যটা ব্যোমযানের যাবতীয় ধাতব পদার্থের সমষ্টি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে হয় না তথায় ব্যোমযানের চতুর্দ্দিকে তারের জাল জড়াইয়া সে অভাব পূরণ করিয়া লওয়া হয়।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার বি এ।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোগ ও ইহার প্রতীকার।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের আবশ্যকতা।

রোগের প্রতীকারের চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির ও তাহাদের সম্মিলিত জাতির পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, কারণ আমাদের দেশের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন সংক্রামক রোগের অধিকারে দেশের অধিবাসিমাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, তখন কোন্ কোন্ সামান্য বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলে রোগের সংক্রামতা কমে, তাহা আবাল বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে জানা সমান ভাবে উচিত। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অপর একটী নাম শরীর-বিজ্ঞান; এবং সেজন্য দেশের বালকদিগকে এ বিষয়ে এরূপ ভাবে শিক্ষিত করা উচিত যাহাতে তাহারা রোগগুলি সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইয়া নিজ নিজ ও নিজ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যত্নবান হইতে পারে।

অতি সভ্য দেশে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ, যাহারা সামান্য ভাবে শিক্ষিত তাহারাও, রোগের মূল কারণ কি তাহা জানে না বা জানিবার চেষ্টা করে না। কেন যে তাহারা এবং তাহাদের প্রিয়তম পুত্র কন্যাগুলি রোগের জ্বালায় জ্বালাতন হয় তাহারা তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। আমাদের দেশের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ, যাহারা আমাদের দোষে আজ মূর্খ, তাহারা রোগ ভগবানের শাস্তি বলিয়া নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সমস্ত রোগ সামান্য চেষ্টায় দূরীভূত হয়, তাহারা তাহাকে রোগ না ভাবিয়া ভূত প্রেতের উপদ্রব মনে করিয়া ঝাড়ন, ফুঁক ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে; ইহারা যদি সেই রোগের প্রকৃত প্রতীকারার্থে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে অধিকাংশ সময়ে নিশ্চিন্ত মনে ও প্রফুল্ল চিত্তে দিনপাত করিতে দেখা যাইতে পারে। যদি তাহারা সামান্য অনুধাবন দ্বারা রোগকে রোগ বলিয়া বুঝিয়া লয় ও তাহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে রোগ-প্রপীড়িত বঙ্গভূমি আবার সত্বরই হাস্যোৎফুল্ল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রোগ প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে রোগোৎপত্তির কারণ জানিতে হইবে, নচেৎ রোগ নিবারণার্থে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল

হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে গ্রামে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে সেখানে কেন ম্যালেরিয়া হইতেছে তাহা না জানিয়া কেবল রাশী রাশী কুইনিন খাইয়া প্রতীকার আশা করা নিতান্ত ধৃষ্টতা মাত্র। অবশ্য কুইনিনের ফলে আক্রান্ত অবস্থায় আরোগ্য লাভ করিলেও পুনঃ পুনঃ পীড়িতের পীড়ার আক্রমণের আশঙ্কা যায় না। অতএব রোগের প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রোগের মূল কারণ, রোগের বাহক ও তাহার স্বভাব কিরূপ তাহা জানা প্রয়োজন। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধাদি অনির্ণীত রোগের উপর প্রয়োগ করিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগের কারণ ও প্রকৃতি নির্ণীত না হয় ততক্ষণ কোন ঔষধ কার্য্যকরী হয় না, কিন্তু কোন রোগের উপর নির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে রোগ নির্মূল হইয়া আরোগ্য হয়। আরও কথা এই যে, রোগের উপশম লাভ অপেক্ষা রোগ হইবার পূর্ব্বে সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক। যাঁহারা রোগের নির্ণয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে পারেন তাঁহারা যথার্থ চিকিৎসক-পদবাচ্য। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা সম্যক জ্ঞাত থাকিলেও সাধারণ ব্যক্তিগণ যদি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মোটামুটি সহজ নিয়ম-গুলি জানিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষা পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইবেন; এবং সাধারণের ইহা জানাও অতীব আবশ্যক।

অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি সহজে তাহার পিতৃপিতামহগণের অনুকরণে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সহজে তাহাদিগকে সেই পথ হইতে বিচলিত করা একরূপ অসম্ভব। এমন কি শিক্ষিত ও উন্নতমনা ব্যক্তিগণও সহজে কুসংস্কার হইতে অন্য দিকে যাইতে চাহেন না। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে যখন কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইত তখন সে গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি সেই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহারা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া, তাহাদের চিরপ্রচলিত ঝাড়ন, ফুঁক ইত্যাদির সাহায্য লইত ও ফলে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন যাইত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, সংক্রামক রোগ গ্রামে বিশেষ প্রবল হইলেও গ্রামবাসীর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মৃত্যু সংখ্যা অনেক স্থলে হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উপকারিতা কত তাহা বুঝা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে যখন প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন প্রত্যহ যত সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এখন তাহার তুলনায় মৃতের সংখ্যা অতি কম। কিন্তু পূর্ব্বে কলিকাতা সহর মৃত্যুর আলয় স্বরূপ ছিল বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে খুব সরল ও সহজ ভাবে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এমন কতকগুলি বিষয় থাকিবে যাহা মানব মাত্রেরই উপকারী হইবে ও পালন করিলে মানব সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া থাকিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বা শরীর পালন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটী কথা শুনিয়াছেন। যখন কোন বাড়ী, ঘর অথবা সহর ইত্যাদির কথা উঠে তখন সকলে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে রোগ ও স্বাস্থ্যের নিকট সম্বন্ধ আছে। যখন আমরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি তখন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা আমাদের জানা উচিত; এবং ইহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যে বিজ্ঞান মতে কার্য্য করিলে আমরা, আমাদের দেহ, ঘর, বাড়ী, গ্রাম, দেশ ইত্যাদির স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে পারি ও অস্বাস্থ্যকর স্থান উন্নত করিতে পারি তাহাকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলে। এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে, এবং আমরা সত্বর প্রমাণও করিব যে, প্রত্যেক জিনিষকে পরিষ্কার ও নির্ম্মল রাখার অপর নামই স্বাস্থ্য। সুতরাং সহজ কথায় স্বাস্থ্য অর্থে পরিচ্ছন্নতা। এবং ক্রমশঃ আমরা দেখাইব কেমন করিয়া স্বল্লায়াসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে কেমন সহজে রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। এখন রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে পরিষ্কার থাকিতে হইবে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

১। যে কোন খাদ্যই হউক না কেন তাহা পরিষ্কার হওয়া উচিত।

২। যে কোন কার্য্যের জন্যই জল ব্যবহার করি না কেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

৩। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র ও বাসের গৃহ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

৪। বাতাস—যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

কারণ ইহাদের প্রত্যেকে রোগের ব্যাপক ও বাহক। যদি এই গুলি অপরিষ্কার হয় তাহা হইলে রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

যেখানে অপরিষ্কার সেইখানে রোগের বাস। পরিচ্ছন্নতা কিরূপে রোগ আক্রমণ ও বিস্তৃতি নিবারণ করে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা রোগ, রোগের কারণ ও তাহার আক্রমণ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

বহু শতাব্দি পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই মনুষ্য রোগকে পাপের শাস্তি বা উপদেবতার আক্রমণ বলিয়া মনে করিত। দুষ্ট নরনারীগণ রোগের পরিচালক এই বিশ্বাস বহু শতাব্দি হইতে মানবের মনে প্রবলভাবে আধিপত্য করিয়া আছে।

কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দি ধরিয়া চিকিৎসকগণ প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্ব্বক রোগের কারণ অনুধাবন করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ গত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে যে রোগ আমাদিগকে সচারাচার আক্রমণ করে ও যাহার জন্য আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় সেই সমস্ত রোগের মূল কারণ স্থির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকৃতির বিষয়েও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে রোগ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যনিরূপণ মানসে এত ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতেছে ও হইয়াছে যে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ কাল প্রায় প্রত্যহই যত নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে মণিষীগণ ততই উৎসাহের সহিত অন্য নূতন তথ্যের আবিষ্কারে ব্যস্ত হইতেছেন। তাঁহারা কেবলই যে রোগোপশমের চেষ্টা করিতেছেন তাহা নহে উপরন্তু তাঁহারা রোগ নিবারণ কল্পেই মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রোগোপশম অপেক্ষা রোগ নিবারণ করাই কর্ত্তব্য।

রোগের কারণ কি? আমরা প্রত্যেক রোগের বিষয়ই আলোচনা করিব না। কারণ তদ্দারা বিশেষ লাভ হইবে না। আর বিশেষজ্ঞগণ সে বিষয়ে বিশেষ তৎপর আছেন। আমরা রোগের প্রধান কারণ কি ও যে সমস্ত রোগের হাত হইতে দেশবাসী নিস্তার না পাইয়া ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে তাহার উপশম ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে দুই চারটী কথা বলিব। আর যে উপায় অবলম্বনে দেশবাসীর নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে আমরা বিশেষ ভাবে তাহারই আলোচনা করিব।

রোগের কারণ।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুকে বহুগুণ বড় করিয়া দেখায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু রোগই বীজাণু দ্বারা সৃষ্ট হয় এবংঐ বীজাণুই সমস্ত রোগের মূল কারণ।

যে সমস্ত জীব অন্য জীবের উপর বাস করে ও তাহাদের জীবনীশক্তি অপহরণ করিয়া নিজ জীবন ধারণ করে তাহাদিগকে পরাশ্রয়ী বলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদ্ বিশেষ ও কতকগুলি জীব বিশেষ। কতকগুলি বৃক্ষকে আক্রমণ করে ও কতকগুলি জন্তুগণকে আক্রমণ করে।

পরাশ্রয়ী। (Parasite)

মানুষ এইরূপ বহু পরাশ্রয়ীর আশ্রয় স্থান। কতিপয় কৃমি, লিলি কীট প্রভৃতি জীবগণ মনুষ্য দেহে বাস করে। এইগুলি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু

অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্ ও জীবগণ মনুষ্য দেহে আশ্রয় লাভ করে। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের কথা আলোচনা করিব।

এই পরাশ্রয়িগণের মধ্যে উদ্ভিদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং ইহারা আমাদের এত অনিষ্ট করে যে, আমরা যে বিষয়ে বর্ণনা করিব তাহার তুলনায় ইহা কিছু নয়। তাহারা মনুষ্য শরীরে আশ্রয় লাভ করে ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জীবনীশক্তির রোধ করিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না। কিন্তু তাহারা আণুবীক্ষণিক। তাহারা আহার্য্য ও পেয় বস্তুর সহিত মুখ দিয়া আমাদের উদরে, নিশ্বাসের সহিত নাসিকা রন্ধ্র দিয়া ফুসফুসে, দেহের ক্ষত স্থান দিয়া ও পোকা মাকড় দষ্ট স্থান দিয়া দেহে প্রবেশ করিয়া রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাহাদের প্রথম আক্রমণে আমরা কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেহকে আক্রমণ করে তখন বেদনা, জ্বালা, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের সমক্ষে প্রকটিত হয়। কখন কখন তাহাদের আক্রমণ এত দ্রুত ও সাংঘাতিক হয় যে, তাহাদের আক্রমণের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্য প্রায় মরণাপন্ন হয় (যথা কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি)। আর কতকগুলি ক্রমশঃ মানবের জীবনীশক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করে, পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে (যথা জ্বর, রক্তামাশায় ইত্যাদি)। বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাদিগকে (bacteria) উদ্ভিজ্জ-রোগবীজাণু অথবা (bacilli) জান্তব-রোগবীজাণু বলে, কিন্তু চলিত কথায় তাহাদিগকে রোগবীজাণু বা বীজাণু বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথ জীবন বসু।

রেডিয়াম।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

১৮৯৮ খৃঃ অব্দে করাসী বিদুষী শ্রীমতী কুরী রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। জগতে প্রতিনিয়তই কত অভিনব পদার্থ আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইতেছে, কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কারে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে, অন্য কোন আবিষ্কারে এরূপ হয় নাই। পৃথিবীস্থ যাবতীয় সুসভ্য দেশের সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে অথবা নিজ নিজ পরীক্ষাগারে অথবা কেবলমাত্র রেডিয়ামের ধর্ম্ম পরীক্ষার্থেই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইহার ধর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই ১৬ বৎসরেই এক রেডিয়াম সমস্ত বৈজ্ঞানিককে নূতন কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই সামান্য কালের পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিকই এই অপরূপ পদার্থের নাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন না।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম যত, পৃথিবীতে রেডিয়ামের অস্তিত্ব তত কাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত খনি হইতে রেডিয়াম উত্তোলিত হইতেছে, সেই সমস্ত খনিতে লোকে বহুশতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কাজেই রেডিয়াম কিরূপে এত কাল অনাবিষ্কৃত পড়িয়াছিল, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু প্রকৃতি এই মহামূল্য অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ পর্ব্বতে পর্ব্বতে অতি অল্পমাত্রায় ছড়াইয়া অতি সুন্দর ভাবে গোপন করিয়া রাখিয়া আসিতেছিলেন, পরে যখন মানব রেডিয়ামের গুণ গ্রহণে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখনই তাহার নয়ন সমক্ষে এই মহামূল্য পদার্থের ভাস্বর দীপ্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।

কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ হইতে রেডিয়াম নিষ্কাশিত হয়। এই সমস্ত খনিজ পদার্থের মধ্যে পিচব্লেণ্ড প্রধান। ইহা অত্যন্ত ভারী, এবং দেখিতে অনেকটা পেনসিলের "সীস্" অর্থাৎ গ্রাফাইটের ন্যায়। কোন একটি খনিতে প্রচুর পরিমাণে পিচব্লেণ্ড পাওয়া যায় না। কোন একস্থানে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া পিচব্লেণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনিজতাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এই খনিজতালে নানাবিধ ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে "সীসা" প্রধান। রেডিয়াম আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিচব্লেণ্ড কেবলমাত্র ইউর্যানিয়াম অক্সাইডের জন্য উত্তোলিত ও সংগৃহীত হইত। পিচব্লেণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক ইউর্যানিয়াম অক্সাইড। এই ইউর্যানিয়াম বাণিজ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। দ্রব্যাদিকে বর্ণরঞ্জিত করিবার জন্য ইহা বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বেক্‌রেল নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক

দৈবাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, ইউর‍্যানিয়ামঘটিত লবণ হইতে এরূপ এক প্রকার মৃদুল আভা উদ্ভাসিত হইতে থাকে যে, তদ্দ্বারা আলোক চিত্রণের প্লেটে ক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের মন এক্স-রে নামক নব আবিষ্কৃত আলোকের ব্যাপার লইয়া আন্দোলিত হইতেছিল। বেক্‌রেলের এই পর্য্যবেক্ষণ লইয়া কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা করিতে লাগিলেন। অন্য সময় হইলে হয়ত কেহই বেক্‌রেলের এই পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতেন না। এই সময়ে শ্রীমতী কুরী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে তাঁহার স্বামীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থিনী ছাত্রীর ন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন। শ্রীমতী কুরী যে পদার্থ হইতে এই আভা বহির্গত হইতে থাকে, তাহাকে পৃথক করিয়া এক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে পরীক্ষা করিতে যাইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে পিচব্লেণ্ড হইতে ইউর‍্যানিয়ম নিষ্কাশিত করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতেই এই আভা অধিকতর বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া শ্রীমতী কুরী অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। অতঃপর তিনি এই পরিত্যক্ত অবশিষ্ট পিচব্লেণ্ড হইতে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রেডিয়াম ঘটিত লবণ আবিষ্কার করিলেন।

রেডিয়াম একরূপ ধাতব পদার্থ। যে সমস্ত ধাতু হইতে ক্ষার উৎপন্ন হয়, রেডিয়াম সেই সেই ধাতু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব ২২৬। অতএব যে সমস্ত অতিগুরু পদার্থ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে রেডিয়াম তৃতীয়। ইউর‍্যানিয়াম প্রথম, থিউরিয়াম দ্বিতীয় এবং রেডিয়াম তৃতীয়। রেডিয়াম শ্রেণীর ধাতু হইতে যে সমস্ত লবণ উৎপাদিত হয় রেডিয়াম হইতেও সেই সেই লবণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এবং ইহাদের রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অবিভিন্ন। রেডিয়াম আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রেডিয়ামের সালফেট, ব্রোমাইড, ক্লোরাইড, ইত্যাদি উৎপাদিত হইয়া আসিতেছিল। বিশুদ্ধ রেডিয়াম উৎপাদন করা অসম্ভব ছিল। কেননা বিশুদ্ধ রেডিয়াম উৎপাদিত হইবামাত্র বায়ু সংস্পর্শে আসিয়া অক্সিডাইজড্ হইয়া যাইত। যাহা হউক গত বৎসর বিশুদ্ধ রেডিয়াম উৎপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিতান্তই অস্থায়ী। তবে রেডিয়াম ঘটিত লবণ লইয়াই যাবতীয় কার্য্য রীতিমত পরিচালিত হইতেছে, বিশুদ্ধ রেডিয়ামের প্রয়োজন হয় না।

পিচব্লেণ্ড হইতে রেডিয়াম নিষ্কাশন করা বিশেষ ধৈর্য্য ও অতিশয় ব্যয় সাপেক্ষ। ৫০,০০,০০০ ভাগ পিচব্লেণ্ডে মাত্র এক ভাগ রেডিয়াম পাওয়া যায়। প্রথমে পিচব্লেণ্ডকে চূর্ণ এবং দগ্ধ করিয়া ও অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতঃ দ্রাবক (acid) প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে ইউর‍্যানিয়াম নিষ্কাশিত করিতে হয়। অতঃপর বহুবিধ বিভিন্ন ক্রিয়ার পর যে দ্রাবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে রেডিয়াম ঘটিত লবণ থাকে। পরে এই দ্রাবণে মিশ্রিত অন্যবিধ ধাতুঘটিত পদার্থের দানা বাঁধাইয়া

লইলে রেডিয়াম ঘটিত বিশুদ্ধ ক্লোরাইড বা ব্রোমাইড লবণ অবশিষ্ট থাকে। ১ টন (২৭ মণ) অত্যুৎকৃষ্ট পিচব্লেণ্ড হইতে কিঞ্চিদধিক ২ গ্রেণ মাত্র রেডিয়াম ঘটিত লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

রেডিয়ামের অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, ইহা হইতে অনবরত আলোক ও উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে। রেডিয়ামঘটিত লবণ হইতেও রেডিয়ামের অনুরূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। এই ক্রিয়ার একমাত্র কারণ লবণে রেডিয়ামের অস্তিত্ব, অতএব যে লবণে যত অধিক পরিমাণ রেডিয়াম থাকে, সেই লবণ হইতে তত অধিক পরিমাণে তাপ ও আলোক বহির্গত হইতে থাকে। ১৯০০ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিলেন যে, রেডিয়াম ঘটিত লক্ষণ দ্রবীভূত করিলে তাহা হইতে একরূপ গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। সেই সময়ে অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, এইরূপ নির্গমনেও রেডিয়ামের ভার-পরিমাণ হ্রাস পায় না, কাজেই ক্রিয়া হইলেও শক্তি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু ইহা অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক মূলসূত্রসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রিয়া অর্থেই শক্তির অপচয়। অথচ ক্রিয়াস্বত্বেও রেডিয়াম অব্যাহত কিরূপে থাকিতে পারে, এই অভিনব ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা বৈজ্ঞানিকগণের নিকট অসম্ভব হইয়া উঠিল। যাহা হউক পরে বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারিলেন ও প্রমাণ করিলেন যে, রেডিয়াম কিছুতেই অব্যাহত থাকিতে পারে না। ইহারও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ক্ষয়ের মাত্রা এত অল্প যে, তাহা সহসা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। রেডিয়াম হইতে আলোক ও তাপ ২,০০০ দুই সহস্র বৎসর বিকীরিত হইলে ইহার পরিমাণ অর্দ্ধেক মাত্র হ্রাস পায়।

রেডিয়াম হইতে যে আলোক বহির্গত তাহা ত্রিবিধ। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকগণ য়্যাল্‌ফা, বিটা, এবং গামা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোক নয়নে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব নানাবিধ উপায়ে প্রমাণিত ও প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রথমতঃ আলোক চিত্রণের প্লেটে আলোক যেরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করে, এই অদৃশ্য আলোকও সেইরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করিতে পারে। কতকগুলি পদার্থ জলে বা অন্য তরল পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া দ্রাবণ সূর্য্যালোকে ধরিয়া তাহা হইতে প্রতিফলিত আলোকে দেখিলে, দ্রাবণ হইতে একরূপ আভা বহির্গত হইতে থাকে। দ্রবীভূত কুইনাইনে এইরূপ নীল আভা দেখিতে পায়। যে সমস্ত পদার্থ (যেমন কুইনাইন ইত্যাদি) দ্রবীভূত হইলে তাহাদের দ্রাবণ হইতে বা যে সমস্ত তরল পদার্থ (যেমন কেরোসিন ইত্যাদি) হইতে এইরূপ বিশেষ আভা নির্গত হয়, সেই সমস্ত পদার্থকে ফ্লুওরেসেণ্ট পদার্থ বলে। এই সমস্ত ফ্লুওরেসেণ্ট পদার্থের মধ্যে উইলেমাইট, কুন্‌জাইট ইত্যাদি অন্ধকারে রাখিয়া রেডিয়াম আনয়ন করিলে পদার্থগুলি হইতে আভা নির্গত হইতে থাকে।

এমন কি অন্ধকারে হীরক পর্য্যন্ত রেডিয়াম সান্নিধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। রেডিয়াম আনয়ন করিলে বায়বীয় পদার্থ আইওনাইজ্‌ড্‌ হইয়া উঠে। সাধারণতঃ বায়বীয় পদার্থ তড়িৎ অপরিচালক। কিন্তু রেডিয়াম দ্বারা আইওনাইজ্‌ড্‌ গ্যাস তড়িৎ পরিচালক। একটি বাক্সে এক খণ্ড প্রকাণ্ড হীরকের সহিত রেডিয়াম রাখিয়া দিলে হীরক মনোরম নীল আভা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্য হীরক বাদামীবর্ণ হইয়া যায়। ব্যাঙাচিকে রেডিয়াম আলোকে আলোকিত করিলে তাহা হইতে বিকলাঙ্গ দুর্ব্বল, অপুষ্ট-দেহ ভেকশিশু উৎপাদিত হয়। বৃক্ষের বীজ রেডিয়াম আলোকে ধরিলে জীবন শূন্য হইয়া যায়। কোন কোন বীজ মরে না বটে কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ শিশু উৎপাদনে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যে পদার্থে প্রয়োগে পদার্থ গাঁজিয়া উঠে সেই সেই পদার্থ নিষ্ক্রীয় হইয়া উঠিবার পর রেডিয়াম সংযোগে পুনরায় তাহারা ক্রিয়াশীল হয়। নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া রেডিয়াম যোগে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা হ্রাস হইয়া থাকে। যে কাচ পাত্রে রেডিয়াম রক্ষিত হয়, তাহা বাদামী বর্ণ বা বেগুনিয়া বর্ণ হইয়া উঠে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন রেডিয়ামের য়্যাল্‌ফা আলোক কিরণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা গঠিত এই সমস্ত কণিকা সম তড়িৎ অর্থাৎ Positive Electrictyর দ্বারা তড়িন্ময় হইয়া থাকে। এই সমস্ত কণিকা অতি তীব্র গতিতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছুরিত হয়। এই কণিকার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এক গ্রেন রেডিয়াম ব্রোমাইড্‌ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০,০০,০০০ কণিকা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপার হইতে আর এক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাম্‌জে এবং সডি লক্ষ্য করিলেন যে, যদি কোন বদ্ধ পাত্রে রেডিয়াম রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কণিকা-বিচ্ছুরণ ফলে এক নূতন পদার্থ আবির্ভূত হয়। এই নূতন পদার্থের আলোক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, হিলিয়ামের আলোক বিশ্লিষ্ট হইলে যেরূপ ভাবে প্রতিভাত হয়, এই নূতন পদার্থের বিশ্লিষ্ট আলোকও সেই ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই হিলিয়াম এক মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। অতএব আবদ্ধ রেডিয়ামের মৃদুল বিচ্ছুরণে এক নূতন মৌলিক পদার্থ "হিলিয়াম" ধীরে ধীরে উৎপন্ন হইতে থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এক মৌলিক পদার্থ অন্য মৌলিক পদার্থে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীন রাসায়নিকগণ মূল্যহীন অথবা সামান্য ধাতব পদার্থকে, যেমন লৌহ তাম্র ইত্যাদিকে, মূল্যবান অসামান্য ধাতুতে, যেমন সুবর্ণ ইত্যাদিতে, পরিবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। রেডিয়াম দ্বারা প্রাচীন রাসায়নিকগণের স্বপ্ন অনেকটা সম্ভাবিত হইতেছে। যে সমস্ত পদার্থ হইতে এইরূপ আভা নির্গত হয় তাহাদিগকে র‍্যাডিওয়্যাকটিভ (radio-active) পদার্থ বলে। অতএব রেডিয়াম একটি র‍্যাডিওয়্যাকটিভ্‌ পদার্থ। পরে প্রমাণিত হইয়াছে র‍্যাডিও-

র‍্যাকটিভ পদার্থ হইতে আলোক কণিকা বিচ্ছুরিত হইলে হিলিয়াম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক রেডিওর‍্যাক্‌টিভ-পদার্থবিশিষ্ট খনিজ তালে হিলিয়াম বর্ত্তমান থাকে। অতএব যে স্থানে হিলিয়ামের অস্তিত্ব আছে, সেই স্থানে রেডিওর‍্যাক্‌টিভ পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্যে প্রচুর পরিমাণে হিলিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব সূর্য্যেও প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম রহিয়াছে।

বিটা রশ্মি রাশি রাশি ইলেক্‌ট্রন্ (electron) দ্বারা গঠিত। এই সমস্ত ইলেক্‌ট্রন্ বিসম-তড়িৎ বা negative electricity বিশিষ্ট। এই সমস্ত ইলেক্‌ট্রন্ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, এবং তাহাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৭০,০০০ মাইল অর্থাৎ প্রায় আলোকের গতির সমান। এই বিটা রশ্মির ভেদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। সিকি ইঞ্চ স্থূল সীসা চাদর ভেদ করিয়াও এই রশ্মি প্রবাহিত হয়।

গামা রশ্মির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। রেডিয়াম হইতে যে পরিমাণ রশ্মি বহির্গত হয়, তাহা ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র গামা রশ্মি। এই গামা রশ্মির ভেদিকা শক্তি অতিশয় অধিক। ইহা এক্স-রে নামক রশ্মির সমতুল্য। গামা রশ্মি মানব শরীর ভেদ করিয়াও ৬ ইঞ্চ মোটা কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়াও আলোক চিত্রণের প্লেটে ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই গামা রশ্মির পরিমাণ হইতেই কোন একটি বদ্ধমুখ নলে কতটুকু রেডিয়াম রহিয়াছে তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে, নল হইতে রেডিয়াম বাহির করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। বাণিজ্যে এইরূপেই রেডিয়ামের পরিমাণ স্থির করা হয়, হাতে লইয়া ইহার ক্রয় বিক্রয় করা অসম্ভব; প্রথমতঃ ইহাতে অনেক রেডিয়ামের অপচয় হইত, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ভাবে স্পর্শ করাও বিপজ্জনক, কেননা ইহা দ্বারা নানাবিধ দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। ১ গ্রেণ রেডিয়ামের মূল্য ১৫,০০০ টাকা। এই গামা রশ্মিই পীড়া উপশমে অধিক কার্য্যকর।

রেডিয়াম লবণ দ্রবীভূত করিলে দ্রাবণ হইতে যে "এমানেশন্" (emanation) বা আলোক বিচ্ছুরণ হয়, তাহা দ্রাবণ-উদ্ভূত উজ্জ্বল বায়বীয় পদার্থ। সার উইলিয়াম র‍্যাম্‌জে ইহাকে নিটন্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রেডিয়াম কালক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে এবং এই ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে নিটন উৎপাদিত হয়। এই নিটন অতি শীঘ্র অন্য একটি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহাকে র‍্যাক্‌টিভ ডিপজিট (active deposit) বলে, এই নূতন পদার্থ হইতে রেডিয়ামের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ রশ্মি নির্গত হইতে থাকে। শুষ্ক অবস্থায় রেডিয়াম হইতে নিটন পৃথক ভাবে বহির্গত হয় না। কিন্তু নিটন বহির্গত হইয়াই র‍্যাক্‌টিভ ডিপজিট উৎপাদিত করে। এই উৎপাদনের হার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় থাকে। কোন গৃহে যদি এই গ্যাসের অতি অল্প মাত্র বহির্গত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থ বহুদিন ধরিয়া র‍্যাডিও র‍্যাক্‌টিভ থাকে। রেডিয়াম ঘটিত লবণ দ্রবীভূত করিয়া তাহা হইতে শত শত বৎসর

ধরিয়া এমানেশন গ্রহণ করা যাইতে পারে, তথাপি রেডিয়ামের কোনরূপ অপচয় হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

রেডিয়ামের তাপমাত্রা বা temperature গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা অল্প অধিক থাকে। ইহার আলোক বিচ্ছুরণ গাত্র চর্ম্মে লাগিলে সেই স্থানে দুরারোগ্য ক্ষত উৎপন্ন হয়।

রেডিয়াম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প যে সেই অল্পতার ধারণা করা যায় না। খনিজতালে কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। নানাবিধ খনিজ তালে রেডিয়ামের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তড়িৎ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, রেডিয়ামের ক্রিয়া-শক্তি জলে, স্থলে, পর্ব্বতে, সূর্য্যে এমন কি বায়ুমণ্ডলেও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নিদ্রা।

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জীবনের মাধুর্য্যের মূল্য বুঝিতে হইলে ও মাধুর্য্য উপভোগের সুখ কতটুকু তাহার পরিমাণ করিতে হইলে, ক্লেশে পতিত হওয়া আবশ্যক এবং কষ্টভোগে দুঃখ কতটুকু তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রথমে লাভ করা আবশ্যক। এই দার্শনিক অভিমত সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য কি না, তাহা সন্দেহের বিষয় হইলেও, ইহা নিদ্রায় সম্যক প্রযোজ্য। নিদ্রা-উপভোগ-সুখের মূল্য বা নিদ্রা ভগবানের কি কল্যাণকর আশীর্ব্বাদ, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে অনিদ্রা, বা নিদ্রার অভাব কি বা তাহাতে যন্ত্রণা কতটুকু তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মশক্তি দৃঢ় করিবার, মনে বলাধান করিবার এক কথায় শরীরে পুনর্জ্জীবন সম্পন্ন করিবার এমন অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। অনেক লোক অনিদ্রায় কষ্ট পাইয়া থাকেন; রজনীতে বিনিদ্র অবস্থায় তাঁহারা শয্যায় ছটফট করিতে থাকেন। এক এক ঘণ্টা তাঁহাদের নিকট এক এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা আকুল হৃদয়ে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হয়েন, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় আদৌ কর্ণপাত করেন না। তাঁহারা নিদ্রা লাভের জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। রবার্ট সাদে (Robert Southey) "The Doctor" নামক পত্রিকায় বিনিদ্রের নিদ্রা লাভের চেষ্টার বর্ণনা করিয়াছেন—

I listened to the river and to the ticking of my watch; I thought of all sleepy sounds and of all soporific things—the flow of water, the humming of bees, the motion of a boat, the waving of a field of corn, the opera, Mr. Humdrum's conversations, Mr. Proser's poems, Mr. Laxative's speeches, Mr. Lengthy's sermons,"—
কিন্তু বিনিদ্রের সকল চেষ্টা বৃথা হইল। মধুর নিদ্রা বিনিদ্রের চক্ষু নিমিলিত করে না। মহামতি সেক্‌স্‌পীয়ার ৪র্থ হেনরীর আত্ম কথনে বিনিদ্রের আক্ষেপ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

" O Sleep, O gentle Sleep,
  Nature's soft nurse, how have I frighted thee,
That thou no more wilt weigh my eyelids down.
  Nor sleep my senses into forgetfulness."

কবিসত্তম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিনিদ্রের নিদ্রালাভের ব্যর্থ প্রয়াস অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"A flock of sheep that leisurely passed by,
One after one: the sound of rain, and bees
'Murmuring; the fall of rivers, wind and seas,
Smooth fields, white sheets of water and pure sky;
I have thought of all by turns, and yet do lie
Sleepless! and soon the small birds' melodies
Must hear, first uttered from my orchard trees;
And the first cuckoo's melancholy cry.
Even thus last night, and two nights more, I lay,
And could not win thee, Sleep! by any stealth:
So do not let me wear to-night away:
Without thee what is all the morning's wealth?
Come, blessed barrier between day and day,
Dear mother of fresh thoughts and joyous health."

প্রতি তিন ঘণ্টায় ১ ঘণ্টা, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৮ ঘণ্টা, বৎসরে ৩ মাস, ৭০ বৎসর জীবনে ২৩ বৎসর আমরা নিদ্রায় কাটাইয়া দিই। আমরা প্রত্যেকেই প্রায় কুম্ভকর্ণ বা Rip van Winkle. অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কি করিয়া জীবনের কাল-পরিমাণ

দীর্ঘ করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই জারমান দার্শনিক টিপ্পনী করিয়াছিলেন—"জীবনের এত অধিক সময় নিদ্রিত অবস্থায় যদি কাটাইতে হয়, তাহা হইলে জীবনের কাল-পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার প্রয়োজন কি?"

অতএব নিদ্রা কি?—এই প্রশ্ন যত শীঘ্র উত্থাপিত করা যাইতে পারে ইহার সম্যক সমাধান তত শীঘ্র সম্ভবপর নহে। নিদ্রার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুশীলন করিলে নিদ্রার কোন বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বরং এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠে এরূপ অনুমান হয়, যে মানব এতৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য সেরূপ যত্নবান নহে। বাস্তবিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিদ্রার ন্যায় বিষয়ের গবেষণায় বৈজ্ঞানিকগণ সেরূপ মনোযোগ দেন নাই। ইহার কি কারণ হইতে পারে? "Brain and Personality" নামক গ্রন্থে ডাক্তার উইলিয়ম এইচ টমসন তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে কার্য্য পুনঃপুনঃ সাধিত হয়, বা যে ঘটনা পুনঃপুনঃ সাধিত হয়, তাহা আমাদের এত পরিচিত হইয়া উঠে, যে তাহা অত্যদ্ভুত হইলেও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারে না। নিদ্রার পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই নিদ্রার মাধুর্য্য বা অত্যদ্ভুতত্ব আপনাআপনিই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব নিদ্রার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তাহা আমরা ভাবিবার অবসর পাই না। অধিকন্তু ভূমিষ্ট হইয়াই মানব নিদ্রার সহিত এরূপ পরিচিত হইয়া উঠে, যে পরবর্ত্তী জীবনে জ্ঞানলাভ করিয়া নিদ্রা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কথা আদৌ তাহার মনোমধ্যে উদিত হয় না।

এক্ষণে নিদ্রার কিরূপ সংজ্ঞা হইতে পারে? মৃত্যু এবং প্রবুদ্ধ অবস্থার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই নিদ্রা। প্রবুদ্ধ অবস্থা অর্থে ইন্দ্রিয় ঘটিত সমস্ত কার্য্য শক্তি এবং জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির পূর্ণ শক্তি বুঝায়, এবং মৃত্যু অর্থে সমস্ত শক্তির তিরোধান বুঝায়। অতএব সুনিদ্রা অর্থে জ্ঞান বুদ্ধির সাময়িক তিরোধান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ অবস্থায় আমরা অজ্ঞান হইয়া পড়ি, আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, এবং পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়াদি বিশ্রাম উপভোগ করে। তথাপি এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে কেন আমরা এরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়ি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক নিদ্রার নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ কি? অথবা প্রবুদ্ধ অবস্থা ও নিদ্রিত অবস্থার প্রভেদ কতটুকু? যখন আমরা নিদ্রিত হই তখন আমাদের চক্ষুর উপর চক্ষুর পাতা নিমীলিত হইয়া যায়, চক্ষুর তারকা সঙ্কুচিত হয়, এবং স্বতঃ উত্তেজনায় কর্ম্মশীল পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, এবং সমস্ত শরীর বিশেষতঃ বদনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শান্তির প্রতিকৃতি প্রস্ফুট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুল হইয়া যায়, নাড়ীর বেগ ক্ষুদ্ধ হয়, শোণিত চাপ হ্রাস পায়, মস্তিষ্কের স্থালী সঙ্কুচিত হয়, এবং

মস্তিষ্কের রক্ত পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে নিদ্রিতাবস্থায় মস্তিষ্ক সঙ্কুচিত ও বিবর্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গেই মস্তিষ্ক গোলাপ আভা যুক্ত ও প্রসারিত হইয়া উঠে। নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের শরীরের নিম্ন অর্দ্ধাংশ উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিকতর ভারী হয়। তখন মস্তিষ্ক অপেক্ষা পদদ্বয়ের ভার অধিকতর হইয়া থাকে। এতদর্থে নানারূপ পরীক্ষা সাধিত হইয়াছে। কোন শয্যার ঠিক মধ্যবিন্দু এক সূক্ষ্ম-শীর্ষ স্তম্ভের উপর রক্ষা করা হইল। অতঃপর কোন লোক তাহার শরীরের ভার-কেন্দ্র শয্যার মধ্য বিন্দুর উপর রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইল। লোকটি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকসহ শয্যা উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং পদাংশ নিম্নে নামিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, নিদ্রিতাবস্থায় মস্তিষ্কের শোণিত-স্রোত নিম্নমুখী হইয়া শরীরের অন্যাংশে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ মাত্রেই অমনই মস্তিষ্ক পুনরায় শোণিত আকর্ষণ করিয়া লয়। এই সমস্ত পরীক্ষা ও নৈসর্গিক ব্যাপার হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মস্তিষ্কের শোণিতাভাব ও নিদ্রা এতদুভয়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্মগ্রন্থির ক্রিয়া ও ঘর্ম্মের কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে সামান্যতঃ বুঝা যাইতেছে যে কি কারণে নিদ্রাকালে গৃহের বাতাস অতি শীঘ্র দূষিত ও অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে। শরীরাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিদ্রিতাবস্থায় বেশ ক্রিয়াশীল থাকে। বহির্দ্দিকস্থ যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলীরও ক্রিয়া শক্তি অক্ষুন্ন থাকে। এই নিমিত্তই আমরা নিদ্রা উপভোগের জন্য কোন নীরব নির্ম্মল স্থানের অন্বেষণ করি, কেননা এস্থলে কোনরূপ গোলমাল বা অন্য উৎপাত আসিয়া বহিঃ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া শক্তিকে উদ্রিক্ত করিবে না। আমরা চক্ষুর পাতা চক্ষুর উপর নিমীলিত করিয়া দিই। উদ্দেশ্য এই যে, অতি তীক্ষ্ণ-শক্তি-সম্পন্ন দর্শন স্নায়ুর উপর আলোক পতিত হইয়া যেন দর্শন স্নায়ু কিছুতেই উদ্রিক্ত না হয়।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নিদ্রাকালে এক মস্তিষ্ক ব্যতীত আর কোন অংশই নিদ্রিত হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের সমস্ত অংশই কি নিদ্রিত হইয়া পড়ে? সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ বেশ জাগ্রত থাকে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে স্বপ্ন দর্শন অসম্ভব হইত। স্বপ্নে আমরা নানাবিধ বিষয় অনুভব করি। কখনই ভয়ে আত্মহারা হই, কখন বা সুখে বিহ্বল হইয়া উঠি। ঠিক বায়ু প্রবাহে মেঘ যেরূপ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ও বিতাড়িত হইতে থাকে তাহার কোনও দিকে গতির স্থিরতা থাকে না। স্বপ্নেও সেইরূপ অনুভূত বস্তুর কোনওরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি বা প্রকৃতি থাকে না। আমরা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখি, কীর্ত্তির স্বপ্ন দেখি, কোন কঠিণ কার্য্যে সাফল্যের স্বপ্ন দেখি, দুঃখের স্বপ্ন দেখি, সুখের স্বপ্ন দেখি, নানাবিধ স্বপ্নে আমরা আত্মহারা হই, কখনও বা ম্রিয়মান হই।

কত মনোরম দৃশ্যের কত প্রানান্তকর লোমহর্ষণ ঘটনার স্বপ্নে আমরাই প্রধান নায়কের কার্য্য করি। কত সুমহান কীর্ত্তির জয়স্তম্ভ আমরা স্বপ্নে প্রতিষ্ঠিত করি, কত অসাধ্য সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করি। যদি স্বপ্ন সত্য ও সার্থক হইত, রাইট ব্রাদার্সের এইরোপ্লেন নির্ম্মাণ, বঙ্কিমের চির মধুর উপন্যাসাবলী, নেপোলিয়নের কীর্ত্তি কলাপ, অতি অপদার্থ সামান্য জিনিষে পর্য্যবসিত হইত। অতএব স্বপ্ন দর্শন যখন সত্য আর কোন কিছুর উপলব্ধি মস্তিষ্কের জাগ্রত অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে অংশ জাগ্রত থাকিলে মনুষ্য কল্পনা করিতে পারে সেই অংশ নিশ্চয়ই জাগ্রত অর্থাৎ কর্ম্মশীল থাকে।

অনেকে অবগত আছেন যে, বহু ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় শয্যাত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইয়া থাকেন, বা বহু ব্যক্তি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জাগ্রত অবস্থার ন্যায় অর্থসঙ্গত কথা কহিয়া থাকেন। নিদ্রিত অবস্থার লোকে কথা কহিতে পারে, চলিতে পারে, হাসিতে পারে, কাঁদিতে পারে, সঙ্গীত আলাপ করিতে পারে, এমন কি অতি কঠিণ গণিত বিষয় প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে, অথচ তাহার নিদ্রা উপভোগের কোনও ব্যাঘাত হয় না। ডাক্তার উইলিয়ম এইচ, টমসন নিদ্রিতাবস্থায় অনেক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর উপাখ্যান নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—কোন বিদ্যালয়ে যাইও নামে এক যুবক অধ্যয়ন করিত। কোনও রজনীতে যাইও গণিতের একটি কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি সেই অঙ্কের সমাধান হইল না। অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া যুবক শয়ন করিল। রাত্রি ৩টার সময় তাহার গৃহ সঙ্গীর নয়নে হঠাৎ আলোক পতিত হইলে সঙ্গীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং দেখিতে পাইল আলোক জ্বালিয়া যাইও রজনী উপযোগী বসনেই সেই প্রশ্নের সমাধানে অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গী তৎক্ষণাৎ যাইওকে এরূপ অসময়ে কঠিন প্রশ্নের সমাধানে বিরত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু যাইও কোনওরূপ উত্তর না দেওয়ায় সঙ্গী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। প্রভাতে যখন উভয় বন্ধুতে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ছিল তখন যাইও বলিল—গত রজনীর নিদ্রায় তাহার অবসান আদৌ দূরীভূত হয় নাই। বন্ধু শ্রবণ করিয়াই বলিল "তুমি রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া অঙ্ক করিতে লাগিলে, তবে কেমন করিয়া তোমার শ্রান্তি দূর হইবে।" যাইও বলিল যে সে এরূপ কখনই করে নাই, কিন্তু টেবিলে অঙ্কের নির্ভুল সমাধান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ক্লেগ হর্ন্ নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অতি শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রিত হইল। কিন্তু যথা সময়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্গী-

গণের সহিত নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া, অবশেষে কয়েকটি গান গাহিয়া পুনরায় শয়ন করিল, কিন্তু প্রভাতে এই সমস্ত ঘটনার কোনটিই স্মরণ করিতে পারিল না। এই সমস্ত ঘটনা কিরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে? বেশ বোধগম্য হইল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেও মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ বেশ জাগ্রত থাকে এবং সেই সেই অংশের ক্রিয়াশীলতাও অব্যাহত থাকে। অতএব আমরা নিদ্রিত হইলেই সমস্ত মস্তিষ্ক নিদ্রিত হয় না, ইহার কয়েকটি উপাদান বা অংশ মাত্র বিশ্রাম লাভ করে।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

চিংড়ি মাছ।

আমাদের দেশে পুষ্করিণী কিম্বা নদীতে সচরাচর চিংড়ি মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহা সাগরে ও উপসাগরেও দেখা যায়। প্রাণিতত্ত্বে চিংড়িমাছকে 'দশপদী জলচর' (Crustacea decapoda) বলে। দেশী পুষ্করিণী জাত চিংড়িকে ইংরাজিতে fresh water prawn এবং বিলাতি সমুদ্রের চিংড়িকে lobster বা crayfish বলে। আমরা অনেকে চিংড়িকে মাছ বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু বস্তুতঃ মাছ বলিলে যাহা বুঝি ইহা তাহা নহে, ইহা একটি পোকা বিশেষ। ইহাদিগকে পুকুরের কিম্বা নদীর ঘোলা জলেই খুব বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। চিংড়িকে যদি একটি লাইন ধরিয়া শিরদেশ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ঠিক মধ্যদেশ দিয়া (Sagitally) লম্বাভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার দুই দিকই সমান। চিংড়ির দেহে দুইটি ভাগ—সম্মুখ এবং পশ্চাৎ। প্রত্যেক ভাগেই অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এবং প্রত্যেকটিই উপরে একটি শক্ত খোলা দ্বারা আবৃত। সম্মুখস্থ ভাগে শিরদেশ ও বক্ষস্থল সম্বন্ধীয় এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগে কুক্ষি সম্বন্ধীয় অবয়ব সকল অবস্থিত। সম্মুখস্থ ভাগের শক্ত খোলার নাম Carapace; ইহা একটি আস্ত খোলা; ইহার এক অংশ সম্মুখে করাতের ন্যায় বাহির হইয়াছে, এই বর্দ্ধিতাংশের নাম Rostrum। পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগে সাতটি খোলা পরস্পর জড়িত হইয়া আছে এই গুলিকে 'কুক্ষি সম্বন্ধীয় দেহাংশ বা Abdominal segments বলে। ইহার সপ্তম অংশটি পাখীর ঠোঁটের ন্যায় সরু ইহার নাম Telson। চিংড়ির এই পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগ প্রায়ই বক্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বক্র অংশের খোলাগুলিকে Tergum বলে।

এক্ষণে আমরা চিংড়ির কোন্ ভাগে কি কি অবয়ব আছে তাহা আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিংড়ির দেহের দুইটি ভাগ—সম্মুখ ও পশ্চাৎ। সামনের ভাগটিতে মাথা ও বুকের আবর্জ্জনা সকল থাকে। ইহাতে ১৩টি অংশ আছে ৫টি মাথার এবং ৮টি বক্ষঃস্থলের। সমস্ত আবরণটির নামই Cephalo-thorax; কিন্তু বক্ষদেশের উপর ইহার যে অংশটি আছে তাহার নাম Branchiostegite। চক্ষুদ্বয়, rostrum দুই জোড়া শোঁয়া (2 pairs of Antennæ), দাঁত (mandibles), চোয়াল (2 pairs of maxillæ), এই পাঁচটি হইল শির দেশের আবর্জ্জনা। তৎপরে তিন জোড়া 'হনুস্থিপদ' (3 pairs of maxillipeds) এবং পাঁচ জোড়া দাড়া (legs) এই আটটি বক্ষঃস্থল সম্বন্ধীয় আবর্জ্জনা (appendages of the thorax)। বক্ষদেশে চিংড়ির কানকোরাশি (gill chamber) অবস্থিত।

এখন এই সকল আবর্জ্জনার (appendage) গঠন ও উপকারিতা দেখা যাউক। আমরা চিংড়ির শোঁয়ার কাছে দুই পার্শ্বে দুইটি কাল চক্‌চকে বোঁটার মত পদার্থ ইহার দেহে আকৃষ্ট দেখিতে পাই এই দুইটি চিংড়ির চক্ষুদ্বয়। ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মৌচাকের মত দেখায়। ইহা লম্বা লম্বা পদার্থ দ্বারা গঠিত এই গুলিকে Ommatidia বলে। চক্ষুদ্বয় দ্বারা চিংড়ি খাদ্য দ্রব্য চিনিয়া লয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে Cephalothoraxএর বর্দ্ধিতাংশ Rostrum; ইহা দ্বারা চিংড়ি আত্ম রক্ষা করে। এই Rostrumএর দুই পার্শ্বে চক্ষু থাকে। ইহাতে খুব ধার আছে। চিংড়ির ২ জোড়া শোঁয়া। প্রথম জোড়া শোঁয়ার (1st pair of Antennæ) তলে Otocyst আছে। Otocyst চিংড়ির শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। Ommatidia এবং Otocyst এই দুইটি চিংড়ির চক্ষু ও কর্ণের কার্য্য করে। এই শোঁয়া দ্বারা ইহারা অনুভব করিতে পারে। দ্বিতীয় জোড়া শোঁয়া (2nd pair of Antennæ প্রথম জোড়ার নিম্নেই। ইহা দুইটি অঙ্গে নির্ম্মিত, বাহিরের অঙ্গটি একটী চওড়া কাঁটার ন্যায়, ইহা দ্বারা চিংড়ি জলে balance রাখিতে পারে; দ্বিতীয় অঙ্গটীর শেষে সবুজ মাংস গ্রন্থির (Green gland) ছিদ্র। এই সবুজ মাংসগ্রন্থি চিংড়ির মূত্রাশয় (kidney)। চিংড়িকে চিৎ করিয়া ধরিলে আমরা আবর্জ্জনা গুলি এই ভাবে পাই প্রথমে হনুস্থি-পদ (maxillipeds), তৎপরে চোয়াল (maxillæ) এবং দাঁত (mandibles) চিংড়ির মুখ বিবরের দুই পার্শ্বে দাঁত। চিংড়ির দুইটি দাঁতই খুব শক্ত। চিংড়ির দাঁত দুই প্রকার। মুখের বিবরের ধারে যে দুটী তাহাদের বাহিরের দাঁত বা Outer teeth বলে; অপর দুইটি খাদ্যনলীর (oesophagus) ভিতর এই দুইটিকে ভিতরের দাঁত বা inner teeth বলে। দাঁতের উপরে ও পার্শ্বে পুস্তকের পাতার ন্যায় চোয়াল (maxillæ) এবং হনুস্থি-পদ (maxillipeds) সকল থাকে। চোয়াল দুই জোড়া—প্রথম জোড়াকে 1st pair of maxilla এবং দ্বিতীয় জোড়াকে 2nd pair of

maxilla বলে। প্রথম জোড়াটি দ্বিতীয় জোড়া অপেক্ষা ছোট। দ্বিতীয় জোড়াটি দুই ভাগে বিভক্ত ইহারই বহির্ভাগে একটী সরুকাঁটা থাকে। চিংড়ির বিশ্রাম কালে ইহা কাণকোরাশির ভিতর জল সঞ্চালন করে। এই জল সঞ্চালনকারী সরু কাঁটার নাম Scaphognathite। হনস্থি-পদ তিন জোড়া। চিংড়ির প্রথম দাড়ার অগ্রে একটি সরু দাড়া দেখা যায়, এটি প্রায় মুড়িয়া থাকে, ইহাই তৃতীয় হনস্থি-পদ বা (3rd maxelliped) ইহার পশ্চাতে দ্বিতীয় তৎপরে প্রথম হনস্থি-পদ। প্রত্যেকটির দুইটি ভাগ—একটি ভাগ সাদা সরু আঁশের ন্যায় ইহাকে Exopodite বলে। চিংড়ির দাড়া ও হনস্থি-পদে এই প্রভেদ যে, দাড়ায় এই সাদা সরু আঁশ বা or Exopodite নাই। চোয়াল ও হনস্থি-পদগুলি চিংড়িকে খাদ্য আহরণে সহায়তা করে। চিংড়ির দাড়া পাঁচ জোড়া ; এই দাড়া গুলির সাহায্যে চিংড়ি চলাফেরা করিয়া থাকে এই জন্য ইহাদের walking legs বলে। চিংড়ির প্রথম দুই জোড়া দাড়ার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক দাড়ায় সাতটি অংশ (segment) যথা :—coxa, basis, ischium, merus, carpus, dactyl। প্রথম দুইটি দাড়ার শেষ অংশ (dactyl) দুই ভাগে বিভক্ত এবং করাতের দাঁতের ন্যায়। প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় দাড়ায় ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় দাড়া খুব বড় হয়। ইহার রং নীল এবং স্ত্রীজাতীয় (female) চিংড়িতে এগুলি খুব বড় হয়। ইহা দ্বারা চিংড়ি বৃহৎ খাদ্য দ্রব্য ধরে এবং বিপদের সময় ইহা দ্বারা আত্মরক্ষা করে। তৃতীয় দাড়ার গোড়ায় অর্থাৎ Coxopoditeএর কাছে স্ত্রীজাতীয় চিংড়িব 'জননকারী নালী' আছে, ইহাকে female generative duct বলে। এইরূপ পঞ্চম দাড়ার গোড়ায় পুরুষজাতীয় চিংড়ির "জননকারী নালী" আছে ; ইহাকে male generative duct বা vas deferens বলে। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা সম্মুখস্থ ভাগ সম্বন্ধীয়।

এইবারে কুক্ষি সম্বন্ধীয় অংশের কথা বলিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পশ্চাদ্বর্ত্তি ভাগে সাতটি অংশ (abdominal segments) ; প্রত্যেক অংশতে এক জোড়া আবর্জ্জনা আছে কিন্তু শেষ অংশটিতে (telson) কিছুই নাই। ষষ্ঠ অংশের আবর্জ্জনাটি কিছু ভিন্ন রকমের। ইহা অন্যগুলি অপেক্ষা শক্ত এবং চিংড়ির দুই পার্শ্বে ন্যাজের ন্যায় বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে tail fin কহে। বাকী পাঁচ জোড়া এক রকমের এই গুলিকে সন্তরণ-পদ বা swimmerets বলে, কারণ এইগুলির সহায়তায় চিংড়ি জলে সাঁতার দিতে পারে। এই সন্তরণ পদগুলি পাতার ন্যায় পরস্পরের উপর থাকে।

এইবার ভিতরের শরীর-ব্যবচ্ছেদের (internal anatomy) বিষয় বলিব। আমরা জানি যে মুখ বিবরের দুই পার্শ্বে বহির্ভাগের দাঁত (outer teeth) দুইটি অবস্থিত। মুখ-বিবরটি একটি গর্ত্তের ন্যায় ; ইহার উপরে একটি চতুষ্কোন মাংসপিণ্ড ঢাকনির

স্থায় থাকে ইহার নাম উপরের ঠোঁট, বা Labrum (বা upper lip) এইরূপ তলাতেও একটী মাংসপিণ্ড আছে তাহার নাম নীচের ঠোঁট বা Metastoma (বা lower lip) ; মুখবিবর হইতে খাদ্য দ্রব্য সকল একটি নালী দ্বারা পাকস্থলীতে (stomach) যায়। এই নলীকে œsophagus বা খাদ্য-নলী বলে। ইহার ভিতর আভ্যন্তরিক দন্ত দুইটি (inner teeth) অবস্থিত। প্রধান চর্ব্বন-কার্য্য ইহাদের দ্বারাই সাধিত হয়। তৎপরে পাকস্থলীতে (stomach) যায়। পাকস্থলীর দুইটি অংশ cardiac end এবং pyloric end. ইহাদের মধ্যে pyloric endটি খুব ছোট, ইহা চর্ব্বিত খাদ্যের অন্ত্রে (intestine) যাইবার একটি সংকীর্ণ পথ মাত্র। পাকস্থলীর (cardiac chamber) অথবা বৃহৎ অংশটির নিম্নে চিংড়ির লিভার থাকে। ইহা হলদে রঙের এবং অনেক দূর ব্যাপিয়া থাকে, এমন কি হৃৎপিণ্ড ও জননেন্দ্রিয়েরও অনেক নীচে পর্য্যন্ত যায়। আমরা ইহাকে চিংড়ির "ঘি" বলিয়া থাকি।

চিংড়ির হৃৎপিণ্ড শরীরের ভিতরে থাকে। হৃৎপিণ্ড খুবই একটা দরকারী জিনিষ; চিংড়ি একটি পোকা হইলেও ইহারও হৃৎপিণ্ড আছে এবং আমাদের স্থায় ইহাদের হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া রক্ত চালনা হয়। চিংড়ির হৃৎপিণ্ড একটি আবরণে ঢাকা এই আবরণটিকে pericardium বলে চিংড়ির রক্ত চালনা প্রণালী (Circulatory system) বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ইহারা কান্‌কো-রাশি (gillchamber) হইতে কিরূপে oxygen গ্রহণ করে সে কথা বলা দরকার। চিংড়ির ১৬টি কান্‌কো; প্রত্যেক পার্শ্বে ৮টি। কান্‌কো গুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের চেয়ে বড় সুতরাং সর্ব্বশেষটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু এগুলি মাপে ছোট বড় হইলেও গঠন সমস্ত গুলিরই এক রকম; কানকো রাশির প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা চিংড়ির শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiration) পরিচালনা হয়। এই সাদা কানকো রাশির ভিতর দিয়া রক্ত চালনা হয়। চিংড়ির পিছনের লেজ দ্বারা জলস্রোত কানকো রাশির উপর দিয়া প্লাবিত হইয়া যায়। চিংড়ি যখন সাঁতার দেয় তখন এইরূপে কানকো রাশির উপর পুনঃপুনঃ জলস্রোত বহিয়া যায় এবং বিশ্রাম কালে দ্বিতীয় maxillar নিকটস্থ জল সঞ্চালনকারী সরু কাঁটার দ্বারা এই স্রোত রক্ষিত হয়। চিংড়ির রক্ত আমাদের রক্তের স্থায় লাল নহে। ইহার কোন রং নাই। হৃৎপিণ্ডের আবরণ-কোষ রক্তে পরিপূর্ণ। আবরণের সহিত হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্র সকলের যোগাযোগ আছে। এইরূপ পাঁচটি ছিদ্র আছে। এই গুলিকে Ostia বলে। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত পরিপূর্ণ সাতটি ধমনী (artery) ছোট ছোট শিরার সাহায্যে দেহের সমস্ত অংশে রক্ত চালনা করে। জলপ্লাবিত কানকো রাশি হইতে Oxygen লইয়া দেহের সমস্ত রক্ত পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন শিরার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের আবরণ কোষে সঞ্চিত হয় এখান হইতে ক্ষুদ্র ছিদ্র (ostia) সকলের সাহায্যে রক্ত হৃৎপিণ্ডে যায় এবং এই

হৃৎপিণ্ড হইতে সাতটি ধমণী বহির্গত হইয়া শরীরের রক্ত চালনা করে। ইহাই রক্ত চালনা প্রণালী বা circulatory system। চিংড়ির কুক্ষি মাংস পেশীতে পরিপূর্ণ ইহাতে কোনরূপ কাঁটা নাই। এই মাংস পেশীগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণী দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগকে এমন ভাবে বক্র করা যায় যে লেজ প্রায় সম্মুখে আসে; ইহার নাম সঙ্কোচক মাংসপেশী বা Flexor muscle system; আর এক শ্রেণী দ্বারা চিংড়ির পশ্চাদ্বর্ত্তী বক্র ভাগ সোজা করা যায়; ইহার নাম প্রসারক মাংস-পেশী বা Extensor muscle system. Flexor মাংসপেশী চিংড়ির তলায় থাকে আর Extensor মাংস-পেশী পিছনে থাকে। এক্ষণে চিংড়ির স্নায়ু-মণ্ডলীর বা Nervous systemএর বিষয় আলোচনা করিব। খাদ্য নলীর কিছু উপরে দুইটি মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় স্নায়ু গ্রন্থি আছে ইহাদের নাম Cerebral ganglia; প্রত্যেকটি হইতে তিনটি স্নায়ু বহির্গত হইয়া প্রত্যেক পার্শ্বের চক্ষু এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শোঁয়ার প্রবেশ করে। শোঁয়া গুলিতে স্নায়ু থাকার দরুন ইহা দ্বারা চিংড়ি অনুভব করিতে পারে। মাথা হইতে লেজ অবধি একটি গ্রন্থি যুক্ত স্নায়ু মণ্ডলী আছে ইহাকে ganglionated ventral nerve chord বলে।

চিংড়ির জননেন্দ্রিয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; চিংড়ি স্ত্রীজাতীয় হইলে ইহার তৃতীয় দাড়ার গোড়ায় এবং পুংজাতীয় হইলে পঞ্চম দাড়ারগোড়ায় ইহাদের জননেন্দ্রিয়ের বহিশ্ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালেই প্রায় 'ডিমওলা' চিংড়ি পাওয়া যায়। বিলাতি সমুদ্রের চিংড়ির বা Lobsterএর বর্ষাকালেই ডিম হয়।

"Lobsters breed only once in two years, usually in July or August, when each female will produce as many as 160,000 eggs! These are carried by the female on her swimmerets for ten or eleven months, and during this time the trapping of such lobsters (said technically to be "in berry") is forbidden by law.*"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বিলাতী চিংড়ীর ডিম কিরূপ প্রচুর পরিমানে হয়। প্রত্যেক চিংড়ী প্রায় ১৬০,০০০ ডিম পাড়ে; এই গুলি মাতার সন্তরণ-পদে বা swimmeretsএ জড়িত থাকে। চিংড়ী যখন এইরূপ গর্ভাবস্থায় থাকে তখন ইহাদিগকে ভক্ষণের জন্য ধরা আইন-বিরুদ্ধ। আমাদের দেশে এরূপ কিছু নিয়ম নাই তাহা না হইলে চিংড়ী আরও প্রচুর পরিমানে হইত। ডিম হইতে যখন ছানা নির্গত হয় তখন চিংড়ীর সহিত ছানার আকৃতিতে বিশেষ তফাৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না। চিংড়ী স্বেচ্ছামত ইহার আবর্জ্জনা গুলি রাখিতে পারে আবশ্যক হইলে একটি ছিঁড়িয়া ফেলিতেও পারে। যদি চিংড়ির কোন দাড়া ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে ইহা আবার

* Lulham's Introduction to Zoology (Invertebrates).

পুনর্গঠিত হয়। এইরূপে চিংড়ি দরকার হইলে ইহার আবর্জ্জনা মেরামৎ করিয়া লয়। আমরা চিংড়ির সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ইহা যে একটি ব্যাবসোপযোগী জিনিষ তাহাও জানা উচিত। কিছুকাল হইল আমাদের দেশে মাছের ব্যাবসা আরম্ভ হইয়াছে। চিংড়ি মাছের ব্যাবসা করিলেও লাভ হইতে পারে ইহা নিম্নলিখিত কয়েক লাইন হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়ঃ—

What the prawn-fisheries of Indian might be worth, it is difficult to say; but a statement published in Kishinouye, in the Journal of fisheries Bureau of Tokyo for the year 1900 States that the dried prawns annually exported from Japan to China are valued at 200,000 yen (or a little over £20,000) shows that there must be possibilities in them."*

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে।

ধূমপানের অপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ডাঃ জে লিগুলার্ড বলেন—যে ধূমপানে যাবতীয় স্নায়বিক রোগ ঘটিতে পারে। তাঁহার মতে ইহা দ্বারা ভীরুতা, অগ্নিমান্দ্য, কম্পন, কান ও মাথা ভোঁ ভোঁ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অমোনযোগীতা, প্রভৃতি আসিয়া জুঠে। তিনি আরও বলেন যে ইহা ব্যবহারে সময়ে সময়ে arteriosclerosis ও উন্মত্ততা হইতে দেখা যায়।

ডাঃ কর্নি বলেন যে ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টএর তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় সেখানে তাঁহারা তামাক হইতে nicotine বাহির করিয়া লন। কাজেই ইহা হইতে ততটা অপকার হয় না। তিনি ইহার অপকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য কতকটা দোক্তার ভিজা জল একটা খরগোসের শিরার মধ্যে inject করিয়া দেন। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যে খরগোসটি কালগ্রাসে পতিত হয়। মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে খরগোস sclerosis of the aorta হইয়া মারা গিয়াছে। তিনি অপর একটি খরগোসে নিকোটিন হীন তামাকের পাতার জলীয় সার (liquid

* Extracts from The Catalogue of the Indian Decapod Crustacea in the Collection of the Indian. Part III By Lt. Col. A. Alcock, L. M. S., L. L. D., F. R. S., C. W. E.

extract) inject করিয়া দেন। তাহাতে খরগোসটির বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নাই। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে তামাকে nicotineএর মাত্রা বেশী তাহাতে ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে অল্প মূল্যের তামাক বা সিগারেট বা অন্য কোনও প্রকারের ধূমপানে ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। আমার "তামাকের চাষ" প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে অল্প মূল্যের তামাকেই নিকোটিন নামক বিষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তামাকে হৃদ্‌যন্ত্রের সমধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; অনেকে এসব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহাদের ইহা "বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে"। কিন্তু তখন ফল বড় গুরুতর হইয়া উঠিবে। সকলেই জানেন যে Prevention is better than cure; কিন্তু কয়জন এ কথা মনে রাখেন? আমাদের রোগ বহুল ভারতবর্ষের লোকে যদি উক্ত উপদেশটি মনে রাখেন তাহা হইলে মৃত্যুর তালিকার শত করা দশ জন অতি অল্প দিনের মধ্যেই কমিয়া যাইবে। এ কথায় হাসিবার কিছুই নাই। একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই এ বিষয় বেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। Vaso motor systemএর উপর তামাকের কার্য্যকারিতা আছে ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বলিতেছি যে তাঁহারা ধূমপানের পূর্ব্বে ও পর যেন নিজ নিজ নাড়ীর (pulse) বেগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তখন বুঝিবেন যে নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দ্রুত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। নাড়ীতে আমরা কি দেখি? যন্ত্র কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাই দেখি। প্রত্যেকবার হৃদ্‌যন্ত্রের চাপের সহিত ধমণীতে একটি আঘাত বা beat পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাড়ী দ্রুত বহিলে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যও দ্রুত বেগে চলিতেছে। কিন্তু সকলেই জানেন এই কার্য্যের জন্য অনেক শক্তি ব্যয়িত হয়। তামাক খাইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক হৃদ্‌যন্ত্রকে অধিক কার্য্য করান হয় কাজেই শেষে ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সেনাবিভাগের কাগজপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শতকরা ৮০ জন লোককে tobacco hearts বলিয়া Army Dept. এ লওয়া হয় না। উক্ত দেশের লোকই যখন সেনা বিভাগের কার্য্যের অনুপযোগী তখন তাঁহারা যে কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিবেন এবং তাঁহাদের বংশধরের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনুমেয়।

তামাকের দ্বারা রক্তপ্রণালী ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে। আমাদের সকলেই জানেন যে রক্তপ্রণালী আবশ্যকমত বাড়িতে ও কমিতে পারে (স্থিতি স্থাপক)। যদি কোনওরূপে ইহার এই গুণ নষ্ট হয় তখন অল্প কারণেই ইহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া glandular degeneration of artery নামক রোগও অনেক সময় ধূমপান জনিত। ধূমপায়ির বংশধরের অনেক সময় এই রোগ হইয়া থাকে আবার যদি এই কু-অভ্যাস ত্যাগ না করিয়া এই বংশধরও অবাধে ধূমপান করেন, তাহা হইলে

তাহার পুত্র এই রোগে আরও অধিক ভুগিয়া থাকেন। ডাক্তার T. H. Kellogg বলেন—"Tobacco habit is the worst vice of civilisation"। বিখ্যাত ইংরাজ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার Abernethy বলেন তামাকে বুদ্ধি ও সদ্‌গুণের লোপ হইয়া থাকে; আবার Kuleyর মতে ক্ষুধা মান্দ্যের জন্য ইহা লোককে অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার মত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"Tobacco enfeebles digestion, produces emaciation and general debility; it lays the foundation of every nervous disorder now common to the American people, it produces colour blindness, partial or total loss of vision, various forms of insanity, epilepsy, bronchitis, rheumatism, asthma, dyspepsia, catarrh, tobacco heart and cancer of the stomach."

বাঙ্গালী যুবকগণ একবার দেখুন ধূমপানের কি বিষময় ফল। আমাদের এই চির দারিদ্র্য পূর্ণ দেশে রোগের অন্ত নাই, তাহার উপর আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক পয়সা দিয়া কি ব্যাধি না ক্রয় করিতেছেন? ইহা আমার কথা নহে—এ পাগলের প্রলাপ নহে। বিজ্ঞানের সেবায় ও লোকের সেবায় যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহারা অপরের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিতেছেন দেখুন! আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাস্থ্য চিরজন্মের জন্য ভারত হইতে তাড়াইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন কেন? আজ ভারতের কিছুই নাই এমন কি স্বাস্থ্যও নাই; তাহার উপর যেটুকু আছে তাহা আপনারা তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? আপনারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানে বুক ফুলাইয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ান কিন্তু আপনাদের শিক্ষা কোথায়? আপনারা কোথায় আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহা না করিয়া আপনারা তাহাদের কাছে অবাধে ধূম পান করিতেছেন? তাহারা আর কি শিখিবে? চিরকালই জগতে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে সহরবাসীর দেখিয়া গ্রামবাসী শিখিবে, জ্ঞানীর দেখিয়া অজ্ঞানী বা মূর্খ শিখিবে, কিন্তু হায়, আপনারা কি শিক্ষাই আপনাদের দেশবাসীকে দিতেছেন।

আমি অনেকবার দেখিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত লোকে জানিয়া তাঁহার পুত্রকে ও আত্মীয় পরিজনবর্গকে ধূমপান করিতে দেন। কলিকাতায় অনেক সাহেবী মতাবলম্বী লোকে পিতা পুত্রে এক সঙ্গে ধূম পান করেন। একেই বলে সভ্যতা!! ইংরেজজাতের গুণ গুলা লইতে পারিলে না কিন্তু দোষটি ঠিক লইয়াছ ত? তাহাতে কোনও প্রকার লজ্জা নাই। বীরত্ব, স্বদেশ প্রেমিকতা, অধ্যবসায়, কর্ম্মে আসক্তি, জ্ঞান লিপ্সা কত পরিমাণে নিজস্ব করিয়া লইয়াছ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শুধু

গভর্ণমেণ্টের নিকট স্বাস্থ্যের জন্য আবেদন চলিতেছে। দেশে বড়ই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে একটা commisson বসুক ইত্যাদি মন্তব্য প্রায় কাগজে দেখিতে পাই, কিন্তু তোমরা নিজেরা কি করিতেছ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? স্বাস্থ্য বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা ত অনেক বড় কথা হইল, তাহা ত করিবেই না বরং দেশে কিসে রোগ হইবে তাহারই নানা প্রকার প্রণালী বাহির করিয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে। অনেক কথা বলিলাম ইচ্ছা হইলে মার্জ্জনা করিবেন।

লণ্ডনের চক্ষুর বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার জর্জ্জ ক্রিট্‌চেট্‌ বলেন যে, তিনি অসংখ্য লোককে কেবল ধূমপান জনিত অন্ধতার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা করিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের ম্যাস্যাচুসেট্‌স্‌ প্রদেশের পাগলাগারদের ডাক্তার উড্‌ওয়ার্ড্‌ বলেন যে ধূমপানে যে লোক পাগল হয় সে কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। উক্ত প্রদেশের বিখ্যাত ডাক্তার স্থাথান বলেন যে, ধূমপানে মানুষের অধঃপতন হয়, মানুষের বিবেক ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পাশবিক ভাবটা মানুষের অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোস্টন নগরের ডাক্তার ও, এম, ষ্টোন বলেন যে ধূমপায়ী যখন কোন malignant রোগে ভুগিতে থাকে তখন তাহার আরোগ্য লাভের আশা শতকরা ৫০ ভাগ কম বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। ডাক্তার কাওএন আবার এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন—

"* * * Next to transmitted tendencies, the use of tobacco is the great cause of both moderate and excessive alcohol drinking" ডাক্তার উইলার্ড পার্কেরও মত এই।

মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলেন যে, তাঁহাদের বিশ্বাস যে মদ্য অপেক্ষা ধূমপানে অনিষ্ট বেশী হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত যে ধূমপানে যত শীঘ্র যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদের শরীর পতন হয় এত শীঘ্র সুরাতে হয় না। তাঁহারাও বলেন যে এই কু অভ্যাস ক্রমে পানদোষে পরিণত হয়। Middle west প্রদেশের নগরের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের কথা শুনুন ঃ—

"The effect of cigarette is greatly injurious to the body, deranging the stomach, reducing the vitality, unsettling and weakening the nerves causing palpitation of the heart, checking the growth. It injures the mind, dulling the powers of observation and reflection producing a weak and treacherous memory, benumbing the sensibilities, always destroying the finer feelings and greatly enfeebling the will. It injures

the morals tending distinctly to make the boy untruthful and in many instances these boys become petty thieves."

পাঠক! একবার শুনিলেন যে বালকদের ধূমপানের কি ফল! ইহা কি শুধু কাগজে কলমে লেখা? না কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেন নাই? ইহার প্রমাণ দেখিতে কোথাও যাইতে হইবে না প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর উপরোক্ত উক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। বাড়ীর অল্পবয়স্ক বালকদের ধূমপান হইতে বিরত করুন, দেখিবেন বালক আবার পড়া শুনায় মন দিয়াছে, তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার চক্ষের জ্যোতি ফিরিয়া আসিয়াছে, সে আবার বাধ্য হইয়াছে, আবার সত্য কথা বলিতেছে। তখন আর সেই বালককে লইয়া গৃহস্থকে পাগল হইতে হইবে না। তখন বালককে পড়াইবার জন্য বাড়ীতে আর কোনও গণ্ডগোল থাকিবে না। অল্প বয়সে ধূমপান করিলে মনের স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের তেজ, সুন্দর মুখমণ্ডল, পাঠে আশক্তি, কর্ম্মে অধ্যবসায়, সবই দূরে পলায়। বালক যাহাতে ধূমপান না করে সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই নজর রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়জন এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন? বালকই ভবিষ্যতের রাজা ও রাণী। তাহাদের অধঃপতন যেন কেহ না ইচ্ছা করিয়া টানিয়া আনেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। ধূমপানের বিষময় ফল বালকের মস্তিষ্কে যদি নিরন্তর প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। এই "বিজ্ঞান" সংখ্যা সকল বালকের পাঠ করা উচিত। স্কুলের শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞানের এই অংশটুকু নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রের নিকট পড়িয়া শুনাইতে পারেন তাহাতে অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ করিতে কি কেহ রাজি আছেন? খবরের কাগজে নাম জাহির হয় না এমন কাজ করিতে বাঙ্গালী বড়ই অপটু বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমরা কাগজে লিখিতে, মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে বড়ই মজবুত, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, যত সামান্যই হউক, অবতীর্ণ হইতে কেহ বড় রাজি হই না কেন? এ দোষটা তাড়াইতেই হইবে। আমার সবিনয় অনুরোধ যে, যিনি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন অনুগ্রহ করিয়া যেন অপরকে পাঠ করিতে দেন। ইহাতে তিনি অনেক উপকার করিবেন। এটুকু উপকার কি আমরা "বিজ্ঞানের" পাঠকের নিকট আশা করিতে পারি না?

সিগারেট সম্বন্ধে Tennesseeর Supreme Court এর মাননীয় বিচারপতি বলিয়াছেন যে, সিগারেটের ব্যবসা অবৈধ (not legitimate) কেননা ইহাতে শরীরের যথেষ্টই হানী হয়; ইহা ব্যবহারে অপকার ব্যতীত কোনও উপকার কোনওকালে হয় না। They possess no virtue but inherently bad, and bad only. তাহাছাড়া ইহা হইতে শরীরের ও মনের পুষ্টির ব্যঘাত জন্মে"। অনেকে দেশেই সিগারেটের

ব্যবসার উপর একটা কড়াকড়ি আইন আছে। আমাদের দেশে আপততঃ তাহা নাই। কিন্তু আইন নাই বলিয়া যে পাপ জানিয়াও অবাধে কিছু করিয়া যাইব এবং লোককে করিতে দিব এ বড় সঙ্গত নহে। আমরা যদি দেখাই যে বাস্তবিকই আমরা সিগারেটের বিরুদ্ধবাদী তাহা হইলে আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই একটা আইন করিয়া দিবেন। কাজেই আমাদের এ সম্বন্ধে আন্দোলন চাই। আমরা সকলেই চেষ্টা করিব যে যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকগণ ধূমপান না করে। তাহা হইলে এ বিষয়ে আমরা অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

Paris Medical Academyর সভাপতি Orfila বলেন যে prussic acid ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোনও বিষ এত তীব্র বলিয়া জানা নাই।

Basel Univeristyর অধ্যাপক G. von Bunge বলেন যে পৃথিবীর অনেক উর্ব্বরা জমি এই তীব্র বিষ উৎপাদনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীতে রোগের মাত্রা খুবই বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"The real reason of all this disgusting slavery to smoking is simply thoughtless imitation, worth of monkeys, not of men."

ডাক্তার T. D. Crothers M. D. বলেন:—"আমি অনেক দিনই তামাকের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। এক্ষনে আমি এই বিষ সম্বন্ধে যে মত স্থির করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধূমপানের বিষময় ফল প্রথমেই মুখমণ্ডলের উপর একটা রেখাপাত করে। ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয় ও মুখশ্রী নষ্ট হয়। গণ্ডস্থলের মাংস টান হইয়া যায়। চক্ষু কোটরাগত হয়। মুখে রক্তহীনতা বেশ লক্ষিত হয়। যেন কতকাল রোগে ভুগিতেছে। চক্ষের ও কর্ণের দোষ প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর হইয়া থাকে; ঘ্রাণ, স্পর্শন, স্বাদের অনেক ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; তবে শেষোক্ত পীড়ায় যাহারা সিগারেট না খাইয়া সিগার খান তাঁহারাই বেশী ভুগিয়া থাকেন" আমি নিজে দেখিয়াছি যে মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণ ঔষধাদির আঘ্রাণ লইয়া পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া নস্ত লওয়া ও ধূমপান পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেন; যাঁহারা নস্ত ব্যবহার করেন তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে আরও কোনও শক্তি থাকে না। অতি তীব্র গন্ধ না হইলে তাঁহারা কোনও বিষয়ের গন্ধ পান না।

তিনিও আরও লিখিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম কার্য্য তখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন কি ধূমপায়ী কোনও বিষয়ের সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করিতে পারেন না। তিনি কোনও বিষয় বর্ণনা করিলে তাহা বেশ প্রাঞ্জল হয় না। তখন সত্যের অপলাপ একটা দূষণীয় ব্যাপার তাহা তাঁহাদের আদৌ মনে হয় না। আসল কথা এই যে, সকলেরই যে ঠিক এইরূপ হয় তাহা নহে তবে অল্পবিস্তর এরূপ হইয়া থাকে। মানুষের স্নায়বিক

কার্য্যের, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের ব্যতিক্রম যে ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে এ সমস্ত কথাগুলা বাজে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ধূমপানের মধ্যে সিগারেটেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক সে বিষয় আর সন্দেহ নাই; ইহার কারণ এই যে, সিগারেট হইতে ধূম একেবারে মুখগহ্বরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈবাল।

শৈবাল শব্দের প্রচলিত প্রতিবাক্য শেওলা। বর্ষাকালে ইহা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি পথে আসে। উদ্ভিদ্ রাজত্বের ক্ষুদ্রতম ঐশ্ব কারুকার্য্যে ইহা মনোরমভাবে বিজ্ঞানবিৎ সুধিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানালোক বিবর্জ্জিত সাধারণ মনুষ্য চক্ষু সে সুখ সম্ভোগে চিরবঞ্চিত। আমরা দেখি হরিৎবর্ণ এক গুচ্ছ ধীরে ধীরে হিমানি সিক্ত শৈত্য ভূমির উপর আপনার অস্তিত্ব জাগরিত করে। পুরাতন ইষ্টক প্রাচীর গাত্রে, পুষ্করণীর তীরে ও শৈল শিখরের সিক্ত প্রদেশে, গুচ্ছে গুচ্ছে এই হরিৎবর্ণ উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়।

শৈবাল আকারে অতি ক্ষুদ্র। ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত। এই উদ্ভিদ্‌কে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়ঃ—প্রথমতঃ কাণ্ড, দ্বিতীয়তঃ পত্র। প্রকৃত শিকড় ইহার নাই। এই উদ্ভিদের তলদেশ কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণবর্ণ প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক পিঙ্গলবর্ণ শাখা বা ফিঁকড়ি বহির্গত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে; ইহাদিগকে Rhizoids কহে। এই শিকড়রূপ সূক্ষ্ম শাখাই শৈবালকে আপনার স্থানে সগর্ব্বে দাঁড়াইবার শক্তি প্রদান করে। ইহার পত্র সকল সরল ও অণ্ডাকৃতি (ovate)। ইহাদের মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের মত এক পরিষ্কার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পত্র গুলির নিম্ন হইতে অতি ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা, মুক্ত বায়ু সেবন মানসে, বিরাট নীলিমার দিকে উত্থিত হয়। সূর্য্যের আলোক, অবাধ প্রসার পবন প্রবাহ, হিমানির স্নেহাশীষ, অপরাপর উদ্ভিদাদির মত শৈলবালকে পোষণ করিয়া থাকে। এই উদ্ভিদ্‌কে Gametophyte—অর্থাৎ স্ত্রী পুং ভাবাপন্ন শক্তির একত্র সম্মিলনোপযোগী উদ্ভিদ্—কহে। স্ত্রী-ভাবাপন্ন শক্তির নাম Archegonia।

ইহারা কাণ্ডের বর্দ্ধমান প্রদেশে জন্মিয়া থাকে, এবং প্রায়ই অগ্রভাগস্থিত পত্রের দ্বারায় আচ্ছাদিত থাকে। পত্রে ঢাকা থাকিলেও ইহাদের উপস্থিতি নির্দ্দেশ করা অতি সহজ। পুং ভাবাপন্ন শক্তির আচ্ছাদন পত্র বিস্তৃত হইয়া এক অভিনব

সৌন্দর্য্যের সৃজন করিয়া থাকে। এই পত্রের মধ্যভাগ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। যে কাণ্ডের অগ্রভাগ হইতে Antheridia (পুং বীজ) আবির্ভূত হয়, তাহারই তলদেশ হইতে Archegonia (স্ত্রী বীজ) প্রকাশিত হইয়া থাকে।

Archegonia দেখিতে লম্বা মুদ্গর সদৃশ। ইহার ভিতরে বহুসংখ্যক গহ্বর (cells) আছে। তাহাদের প্রত্যেকটীকে mother cell কিংবা Spermatocyte কহে। এই গর্ভের মধ্যে Spermatozoid আছে, ইহার পশ্চাদ্‌ভাগ লাঙ্গুলাকার বিশিষ্ট। বর্ষার স্নিগ্ধ মধুর বারিধারা যখন পত্র গুচ্ছের মধ্য দিয়া মোহন সুন্দরভাবে মৃদুল কর সঞ্চালনে Antheridiaর কুটীর দ্বারে আসিয়া করাঘাত করে, তখন জীবন-সুহৃদের অদর্শনে কাতর বিহ্বল প্রাণে Antheridia তাহার সাদর অভ্যর্থনে আপন ভৃত্য Spermatozoidকে বাহির দ্বারে পাঠাইয়া দেয়। আপনার অস্তিত্ব প্রচারিত করিবার মানসে ইহা গুরু গম্ভীর ভাবে ইতস্ততঃ বারি সাগরে বিচরণ করে।

Archegonia (স্ত্রী-ভাবাপন্ন শক্তি) এই সময়ে পরিপুষ্ট হয়। যথা সময়ে এই Archegonia আপন অভ্যন্তর হইতে চিনির ন্যায় এক প্রকার মিষ্ট পদার্থ উপরিস্থিত বারি রাশির সহিত মিশাইয়া দেয়। এই মিষ্ট পদার্থের সুস্নিগ্ধ সুবাস Spermatozoidএর মনহরণ করে এবং সে সেইখানে উপস্থিত হয়। সেই মিষ্ট পদার্থের লোভে আকৃষ্ট হইয়া সে Archegoniaর অভ্যন্তরে গমন করে। তাহাদের এ নীরব মিলনে এক সন্তান উৎপন্ন হয়। এই সন্তানের নাম Oospore।

এই Oospore ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যথা সময়ে এই Oospore হইতে এক কাণ্ড ঊর্দ্ধে পত্রগুচ্ছের উপরিভাগে উদিত হয়। উদ্ভিদের এই অবস্থাকে Sporophyte অবস্থা কহে। এই অবস্থা হইতেও উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সূক্ষ্ম কাণ্ড মস্তকে স্থাপিত ভার লইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় তাহার নাম Seta ; যে স্থান হইতে এই কাণ্ডের উদ্ভব তাহাকে Foot কহে। এই কাণ্ডের মস্তকে স্থাপিত ভারের নাম Capsule। ইহা একটী আবরণে রক্ষিত। সেই আবরণের নাম Operculum। এই Capsuleকে ছেদন করিলে একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই গহ্বরের নাম Columella ; ইহার ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ আছে। এই গোলাকার পদার্থের নাম Spore। যথাকালে এই Capsule সম্যক্‌রূপ পরিবর্দ্ধিত হয়। উত্তাল উচ্ছাসে যখন পবনদেব মরণের হাহাকারের সহিত বজ্রের হাহাকার মিশ্রিত করিয়া পৃথিবী দলিত করিয়া চলিয়া যায়, তখন এই Capsule গুরু-ভারে আপন দেহভার লীন করিয়া দেয়। এবং Spore সকল মুক্ত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে লুকাইয়া যায়। যথা সময়ে উপযুক্ত স্থান হইতে নূতন শৈবাল উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্ব কথিত Rhizoid হইতেও নূতন উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Vegitative reproduction কহে।

শৈবাল আপন কাণ্ড ও পত্র হইতে আপনার জীবন রক্ষা করিয়া থাকে এবং উত্তোরত্তর লোক লোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র মহিমা মানব গোচরে প্রকাশিত করে। মৃত্তিকার সুস্বাদু ক্ষার শৈবালের জীবন বন্ধু।

ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ বলিয়া শৈবাল ঘৃণ্য নহে। আমাদের অবিরাম নিশ্বাস প্রশ্বাসে চারিধারের বায়ু যখন দূষিত হইয়া উঠে, পরহিতে ত্যাগী এই উদ্ভিদ্ আপনার ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষমতানুসারে বায়ু নির্ম্মল ও নিশ্বাসের উপযোগী করিয়া দেয়; প্রতিদানে সে মানবের উপেক্ষাই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

জীবন সমস্যা।

যত দিন কাটিতেছে, জগতে মনুষ্য সংখ্যা ততই বাড়িতেছে। যদিও বড় বড় যুদ্ধে, মহামারী, বন্যা ইত্যাদিতে বহু লোক কালগ্রস্থ হয়, কিন্তু তত্রাচ মোটের উপর লোক সংখ্যা যে বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বহুকাল পূর্ব্বে যে স্থান সামান্য নিস্তব্ধ পল্লী ছিল তাহা এখন বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়া ঘোড়া, গাড়ী, ট্রাম, মোটারকার ইত্যাদির শব্দে প্রতিধ্বনিত। যে স্থান পূর্ব্বে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস ভূমি, ঘোর অরণ্য ছিল, তাহা এখন লোকালয়ে পরিণত হইতেছে। যতদিন যায় মনুষ্যের সংখ্যা ততই বাড়ে। সেইজন্য বন্য স্থান ক্রমে মনুষ্যের বাসভূমি হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কেহ বলিতে পারেন, মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্তুর সংখ্যাও ত বাড়িতেছে, তবে লোকালয়গুলি বনে পরিবর্ত্তিত হয় না কেন? "Survival of the fittest" বলিয়া একটা কথা আছে। বিশ্ব জগতের মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট, কীটাণু সমস্তই এই নিয়ম অনুসারে চলিতেছে। অভাব পড়িলেই সবল দুর্ব্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। ইহাই বিশ্বের নিয়ম। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু মাত্র নাই। কেহ হয় ত বলিবেন, "আমার অপেক্ষা যে সবল সে আমার যথা-সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে? তাহার নামে নালিশ করিব না?" সুসভ্য লোকালয়ে থাকিয়া তিনি অবশ্যই এরূপ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি একবার বেশ করিয়া তলাইয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে, বিশ্ব জগতের নিয়ম এইরূপ এবং তিনিও এই

নিয়মের বাহিরে নন। বন জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যে লোকালয়ে পরিণত হইতেছে তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য অন্য জন্তু অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এই ক্ষমতা শারীরিক বলে নহে, ইহা মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি। এই বুদ্ধিশক্তির প্রভাবেই মানুষ অন্যান্য জন্তুকে তাড়াইয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এইত গেল মনুষ্যের অন্যান্য জন্তুদিগের প্রতি ব্যবহার। এখন মনুষ্য তাহার প্রতিবেশীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা যাউক। আমরা সর্ব্বদাই এই কথা শুনিয়া থাকি "Man is a rational animal"। মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি, নৈতিক জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি তাহাকে পশু হইতে পৃথক করে। মনুষ্যের "সমাজ", "আইন", "দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন", "বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বলের রক্ষণ" ইত্যাদি অনেক কথাই শুনি। তবে মনুষ্যের পক্ষে "Survival of the fittest" কথাটা খাটে কৈ? মনুষ্যের পক্ষে খাটে কিনা দেখিতে হইলে একটু ইতিহাসের দিকে দেখা যাউক।

অতি পূর্ব্ব কালের—আমাদের সেই মুনি ঋষিদিগের আর্য্য জাতি, যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণের কথা আর্য্য নাম শুনিলেই মনে উদয় হয়, তাঁহারা এই পবিত্র ভারত ভূমিতে কিরূপে প্রথম পদার্পণ করেন? তাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মধ্য এসিয়ায় অথবা ঐরূপ কোনও স্থানে ছিলেন। সেখানেই নিশ্চয় তাঁহাদের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে অন্যান্য স্থানে বসবাস না করা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য উপায় ছিল না। তখন তাঁহারা বর্ব্বর জাতিদিগকে নিহত অথবা বিদূরিত করিয়া ভারতবর্ষে বাস আরম্ভ করিলেন। ইহার কারণ কি? বর্ব্বর জাতির কি লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতে ছিল? তাহা নহে। তবে আর্য্য এবং বর্ব্বর এই দুই জাতিরই সংখ্যা যখন বাড়িতে ছিল এবং আর্য্যদিগের থাকিবার মত স্থানের অসুবিধা হওয়াতে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বর্ব্বরদিগকে সরাইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। আবার মুসলমানেরাও ঠিক ঐরূপে তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল আর্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া এখানে রাজ্য বিস্তার করিলেন। আমেরিকার দশাও ঐরূপ। ইংলণ্ড, হলণ্ড, প্রভৃতি দেশ আয়তনে কম হইলেও লোক সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিল না। তাহাদিগের নানারূপ অসুবিধা হইতে লাগিল। কাজেই তাহারা দলে দলে তাহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল আমেরিকার Red Indian দিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইহার অনন্ত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে দুর্ব্বলের স্থান নাই। তুমি যদি দুর্ব্বল হও ত হয় সবল হইতে চেষ্টা কর নচেৎ সবলের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া সরিয়া যাও।

যতই দিন কাটিতেছে, জীবন ধারণ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আরও যত দিন যাইবে এই জীবন সংগ্রাম ততই কঠিন হইয়া উঠিবে। কাজেই জগতের উন্নতির স্রোতে সকলকেই চলিতে হইবে, যে পিছাইয়া পড়িবে সেই মরিবে।

যতই দিন কাটিতেছে, মনুষ্য ততই বলবান হইবার চেষ্টা করিতেছে; কিরূপে নিজের উন্নতি করিবে, নিজস্ব রক্ষা করিবে এবং অভাব হইলেই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। এই বলবান হইবার চেষ্টাকেই লোকে সাধারণ ভাষায় উন্নতি বলে। জগতে বাঁচিতে হইলে উঠিতে হইবে। অপর সকলের সহিত সমান পদবিক্ষেপে সমান জোরে চলিতে হইবে। একটা মেলায় যেমন সকলেই সমান অধিকারের জন্য ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে থাকে এবং যাহার পায়ে বল নাই তাহাকে যেমন ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, জগতেও ঠিক সেইরূপ জাতিতে জাতিতে ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। এই ভীষণ জাতি-সংঘর্ষণে পড়িয়া কত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আবার কত জাতি একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে।

জগতে সকলেই এইরূপ অগ্রসর হইবার জন্য ব্যস্ত। এখন দেখিতে হইবে আমরাও কি সকলেরই মত চলিতেছি। আমরাও কি তাহাদের মত সমান বেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছি? ব্যবসা বাণিজ্য কি উহাদেরই মত উন্নতি সাধন করিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক। এখন মনে হয় তবে কি আমরা চিরকালই এইরূপ ভাবে পিছাইয়া পড়িয়া ভবিষ্যতে লোপ পাইব? মহাকবি মিল্টনের একটা ছত্র আছে "Arise awake or be forever fallen" আমাদের এই মহাবাক্যটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। হয় আমাদের উঠিতে হইবে না হয় জগতে লোপ পাইতে হইবে। জগতে কুড়ে অকেজোর স্থান নাই।

আজকাল হইতেছে বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত উন্নতি সাধন অসম্ভব। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বিজ্ঞানচর্চ্চা ব্যতীত অপর সকল চর্চ্চাই বৃথা। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি কিছুই অগ্রাহ্য করিবার নয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের দেশে নাই বলিয়া ঐ দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। তবে কি না ঐ যে ইউরোপে মহা সমর বাধিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই যাহাদের যত বেশী বিজ্ঞান চর্চ্চা তাহারাই তত প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বলবান হইয়াছে। এই বিজ্ঞানই অধিকাংশ উন্নতির মূল। গোলাগুলি, বন্দুক, কামান রণতরী, টর্পেডো, Submarine, Aeroplane সমস্তই বিজ্ঞানের ফল। এ সমস্ত ছাড়া বাণিজ্য জগতের উন্নতি ও সম্বল বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বৈজ্ঞানিক

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে আশা ও উদ্যম দান করিতে হইবে, তাহারা যে মানুষ, উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে তাহারাও যে ঐ পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় জাতির মত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে এই জিনিষটা তাহাদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

এই ত গেল আমাদের আশার কথা। এখন দেখি আমরা কি করিতেছি। আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা কিরূপ চলিতেছে? দেশের স্কুল কলেজে তাহার উন্নতি দেখিয়াছি। মাননীয় ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ আমাদের একটী গৌরব স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুই একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কারখানায় আমাদের দেশের বিজ্ঞানবিদ্ লোকেরা কার্য্যের তদারক করিয়া থাকেন। যে সমস্ত ঔষধের জন্য আমরা বিদেশের পানে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় দ্রব্যে প্রস্তুত হইতেছে। মহামতি তাতা'র লৌহ কারখানা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের দেশের মধ্যে যে কত বড় সদনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ করা যায় না। এ সমস্ত দেখিয়া কি আমাদের আশা হয় না? ভারতবর্ষের বনে, পর্ব্বতে কত অর্থ ছড়ান আছে তাহা কে জানে? দেশের অনেক স্থান এখনও অজ্ঞাত। কোথায় কি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কোথায় কিসের কারখানা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালাইলে কিরূপ উন্নতি সাধন হয় তাহা এখন আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এ সমস্ত করিতে গেলে প্রথম আবশ্যক বিজ্ঞানের প্রচার। দুই শত বা চার শত ছাত্রের বিজ্ঞান শিক্ষা হইলেই হইল না, সাধারণ লোকের মধ্যেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের আবশ্যক। Bengal chemical বা তাতা'র Iron works আমাদের খুব আশা দিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের যত অভাব তাহার অতি অল্পমাত্রই পূর্ণ হইয়াছে বাণিজ্য জগতে প্রবেশের দ্বার এখনও অনেক দূরে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার কাজটী অতি বৃহৎ প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের কিছুই করিলেন না। গোখলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন আমরা কতদূর কি করিতে পারি ইহাই দেখিতে হইবে। কিরূপে সাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা পরে আলোচ্য। এখন বিজ্ঞান শিক্ষা কিরূপ আকারে দিতে হইবে?

আজ কাল কলেজে আমরা যে বিজ্ঞান শিক্ষা পাই তাহাতে যে যথেষ্ট উপকার আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এ কথাও বলিতে হইবে যে, এই সঙ্কটের সময়ে আমাদের যেরূপ ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল, ঠিক তেমনটী পাই বলিয়া মনে হয় না।

সেই দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদের বিশেষ উদ্যম করিয়া ওই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি যখন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য তখন ছাত্রদিগকে এমন ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহারা সেই শিক্ষা কাজে লাগাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক Laboratoryর সঙ্গে কারখানা স্থাপন করা উচিত। বাণিজ্যের অভাবে দেশ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে বৈজ্ঞানিক ছাত্রগণ কতকগুলি compounds of Scientific value আবিষ্কার না করিয়া তাঁহাদিগের অমূল্য সময় যদি অর্থকরী compoundএ লাগাইতে পারিতেন ত অনেক ভাল হইত। অনেকে হয়ত বলিবেন, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্যই শিক্ষা করা উচিত। এরূপ না করিলে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। ঐ যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনির এত ব্যবসা, সে সকল দেশে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক কেবল বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন। আমাদেরও ঐ পথে চলিতে চলিতে ঐরূপ উন্নতি হইবে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে খুব মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহারা দেশের উন্নতি কল্পে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে গিয়া এখন দেশকে ভুলিয়া বিজ্ঞানময় হইয়া উঠিয়াছেন। এখন দেশের বাণিজ্যের উন্নতির বিষয় না ভাবিয়া, তাঁহারা বেশী ভাবেন কিরূপে বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহাদের দেশের নাম বাহির হইবে। অবশ্য ইহাতে দেশের গৌরব বৰ্দ্ধিত হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে আমাদের গরীব দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না। আর জগতে এমন খুব অল্প লোকই আছে যাহারা অর্থ চাহে না। আমাদের গরীব দেশের ত কথাই নাই। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞান অর্থের জন্য না হইয়া বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা বেশী লোকের দ্বারা হইবে না। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য অথবা শিক্ষক বা Demonstratorএর জন্য হইয়া থাকিলে দেশে এ শিক্ষা যে বেশী দিন টিকিবে তাহাও মনে হয় না। ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে ঐ শ্রেণীর লোক দু'দশ জন থাকিলে কিছু আসিয়া যায় না, কেন না তাহাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট এবং এ ছাড়া তাহাদের দেশের অনেক লোককে ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে একে অল্প লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন, তাহার উপর যাঁহারা করেন তাঁহাদের কেহই যদি দেশীয় শিল্প এবং ব্যবসার দিকে না দেখেন ত আমাদের আশা কোথায়?

শ্রীসতীশচন্দ্র দে, বি এস্‌সি।

বিবিধ।

পৃথিবী শীতল হইবে কবে।—Stefan's Law অনুসারে ২০,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ৮০° ল্যাটিচিউডে ৯০ উত্তাপে ছিল। তখন সূর্য্য পরিধি দেড়গুণ বেশী ছিল। এই অনুসারে আর ২০,০০,০০০ বৎসরে এমন কি বিষুব রেখা পর্য্যন্ত ০° ডিগ্রিতে নামিবে। তখন কি জীব জগতে থাকিবে?

ট্রান্সফার পেপারের উপাদান প্রস্তুত প্রণালী।—একখানি পরিষ্কার করা এনামেল পাত্রে ৪০০ ভাগ বৃষ্টির জল বা পরিশ্রুত জলের সহিত ১০০ ভাগ গমের উৎকৃষ্ট শ্বেত-সার মিশাইয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকে। ইহাতে গ্যাম্বোজ পরিশ্রুত বা বৃষ্টির জলে গুলিয়া বা ঘষিয়া মিশাইতে পার, অথবা অন্য কোনও য়্যানিলিন রংও মিশাইতে পার। অন্য একটি এনামেল করা পাত্রে ১,০০০ ভাগ বৃষ্টির জল বা পরিশ্রুত জল অগ্নিতে ফুটাইতে থাক। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে কাঠি দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ২৫ ভাগ সাধারণ লবণ, ১০ ভাগ গ্লিসারিণ, ৫০ ভাগ উৎকৃষ্ট শিরিষ (জান্তব) এবং ২৫ ভাগ কোলা গুড় একটির পর একটি মিশাইয়া দাও। শিরিষ যেন পূর্ব্বেই পরিশ্রুত বা বৃষ্টির জলে উৎকৃষ্ট রূপে ভিজান থাকে। যখন সমস্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইবে তখন ধীরে ধীরে এবং অল্পে অল্পে পূর্ব্বোক্ত শ্বেত-সার বেশ নাড়িয়া মিশাইয়া দাও; অতঃপর আরও অল্পক্ষণ ফুটাইয়া লও। এক্ষণে ইহাকে উনান হইতে নামাইয়া যতক্ষণ না শীতল হইয়া যায় ততক্ষণ নাড়িতে থাক। শেষে একখানি পরিষ্কার, শুভ্র, কাপড়ে ছাঁকিয়া একটি পরিষ্কার পাত্রে ইহাকে ঢালিয়া ফেল।

তাম্রের তড়িতসঞ্চালনী শক্তি।

বিশুদ্ধ তাম্র খণ্ডে যে ভাবে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া থাকে অশুদ্ধ তাম্রে সেইরূপে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হয় না। তাম্রে যত পরিমাণে বাজে জিনিষ (impurities) থাকিবে সেই পরিমাণে তাহার তড়িত-সঞ্চালনী-শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

তাম্রের এই তড়িত-সঞ্চালনী-শক্তির পরিমাণ দেখিয়া সেই তাম্র বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ হইলে কতখানি অশুদ্ধি তাহার মধ্যে আছে তাহা জানিতে পারা যায়। একখণ্ড তাম্রে কোনরূপ অশুদ্ধি আছে কি না যদি কোন উপায়ে বা রাসায়নিক বিশ্লেষ-

ণের দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত না হয়, তাহা হইলে তাহার তড়িত-সঞ্চালনী-শক্তি কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহা নির্দ্ধারিত হইবেই হইবে। সুতরাং তাম্রে যতই সামান্ত অশুদ্ধি থাকুক না কেন তাহার তড়িত-সঞ্চালনী-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহা ধরা যায়।

এই নিয়ম কেবলমাত্র তাম্রে প্রযোজ্য কি সকল ধাতুতেই তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

ডিম্বরক্ষণ প্রণালী।—আমাদের দেশে অনেকেই ডিম্ব খাইয়া থাকেন। কাজেই এই ডিম্বের ব্যবসা লাভ জনক। একটা কিছুর ব্যবসা করিতে হইলে তাহার জনন, রক্ষণ, চালন প্রভৃতির সর্ব্ব-বিষয়জ্ঞ হওয়া দরকার। আমাদের দেশের সবই মামুলী প্রথায় চলিয়া থাকে। আমরা এই ডিম্বরক্ষণ প্রণালীও মামুলী ধরণেই চালাইয়া আসিতেছি ফলে অনেক ডিম্বই নষ্ট হয় কাজেই ব্যবসায় ততটা লাভ হয় না। ডিম্বগুলিকে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া গরম জলে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, পরে উহার উপর একভাগ Commercial water glass (দ্রব Sodium Salicyate) এর সহিত ১০ ভাগ জল মিশাইয়া রাখিলে ছয়মাস বা ততোধিক কাল বেশ সুস্বাদু ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সিদ্ধ করিবার সময় ডিম্বগুলি প্রায়ই ফাটিয়া যায় ইহা নিবারণ করিবার জন্য ডিম্বের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত ভোঁদা সেই দিকটায় একটা পিন দিয়া ছাঁদা করিয়া দিতে হয়। ব্যবসাটা মন্দ নহে অথচ এদেশে নূতন। ভদ্রসন্তানগণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? বেশী খরচ হইবার ভয় নাই।

নূতন রেলওয়ে।—সম্প্রতি ভারতের হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। South Indian Railway কোম্পানির চেষ্টায় এই লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। ভারত হইতে রামেশ্বর দ্বীপ পর্য্যন্ত পক্ প্রণালীর উপর দিয়া একটি প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩য় বর্ষ।)　　　অক্টোবর, ১৯১৪।　　　১০ম সংখ্যা।)

পৃথিবীর ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির মৌলিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতগণ স্বতঃই পার্থিব নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। মূলতঃ সেই সমস্ত আবিষ্কার গ্রহণ করিয়া ভূতত্ত্বশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। অতএব ভূতত্ত্বশাস্ত্র নামতঃ নূতন হইলেও বস্তুতঃ অতি পুরাতন। ভূস্তরানুশীলনবিদ্যা বা ভূবিদ্যার ন্যায় ভূতত্ত্বশাস্ত্র কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ নহে। ভূতত্ত্বশাস্ত্র বলিলে ইহাই বুঝায় যে, এই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের সত্যানুসন্ধান এবং পার্থিব নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহের একের সহিত অন্যের কি সম্পর্ক তাহা এই শাস্ত্রে বিশেষরূপে অনুশীলিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, স্ফটিক-বিজ্ঞান, রাসায়নিক-পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতি-র্বিজ্ঞান, বা যাবতীয় বিজ্ঞান অংশতঃ বা পূর্ণতঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত। আমেরি-কার ওয়াশিংটন নগরে মহামতি কার্ণেজি প্রতিষ্ঠিত কার্ণেজি ইন্‌সটিটিউসনের ভূতত্ত্ববিজ্ঞানাগারে (Geophysical Laboratory) প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর ব্যাপার সম্বন্ধে যে যে শাস্ত্রে যেরূপ গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। প্রস্তর এবং ধাতব পদার্থ কোন্ কোন্ অবস্থায় গঠিত হইতে পারে এবং তাহাদের ভৌতিক ধর্ম্মাবলী কিরূপ তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধানে তাঁহারা আজকাল বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই ভূতত্ত্ববিজ্ঞানা-গারের অন্যতম শাখা পার্থিব চৌম্বক বিজ্ঞানাগারে পণ্ডিতগণ পৃথিবীর চৌম্বকত্বের

অনুশীলন করিতেছেন। জার্ম্মান রাজ্যের অন্তর্গত ভিটিঞ্জেন নগরের ভূতত্ব বিজ্ঞানাগারে ভূকম্প সম্বন্ধে অনুশীলন চলিতেছে। এরূপ আশা করা যায়, অতি শীঘ্রই অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দেশেও এইরূপ বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইবে।

আমরা বর্ত্তমান কালে প্রস্তর বা ধাতব পদার্থ যেরূপ ভাবে দেখিতেছি, তাহাকে সেইরূপ ভাবে লইয়াই পরীক্ষা করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান গঠনের ও প্রকৃতির ধাতব পদার্থ বা প্রস্তর একবারেই উৎপাদিত হয় নাই। যে যে শক্তি বলে মৌলিক কোন এক পদার্থ বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানকালে প্রাপ্তব্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে, সেই সেই শক্তির অধিকাংশ একবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই কিরূপে একটা কঠিন প্রস্তর বা ধাতব তাল উৎপাদিত হইতে পারে বা কোন্ কোন্ শক্তি বলে তাহারা উৎপাদিত হইয়াছিল, সেই সেই শক্তির ক্রিয়ার একটা প্রতিকৃতি আমরা মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লই। কিন্তু যিনি প্রকৃত ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের তত্ত্ববিৎ তিনি এরূপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি ভাবেন—"আমরা এই বিজ্ঞানাগারে একটা ক্ষুদ্র আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপাদন করিতে পারি না? এই বিজ্ঞানাগারে এমন চুল্লী কি বিনির্ম্মিত হয় না যে, তদ্দ্বারা যে যে অবস্থায় কঠিন প্রস্তর উৎপাদিত হইয়াছিল, সেই সেই অবস্থা উপস্থিত করিয়া তাহাদের নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারি?" তিনি অত্যধিক তাপমাত্রা পরিমাণ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইতে থাকেন, পরীক্ষা স্থলের বায়ু-চাপ মাপিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করেন, সেই বায়ুতে কতটুকু জলীয় বাষ্প রহিয়াছে, তাহার নির্ভুল পরিমাণ করিবার জন্য সূক্ষ্ম হিসাব লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে থাকেন। তাঁহার কার্য্য কলাপে যে যে দ্রব্য প্রযুক্ত হয়, সেগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হয়, তাহার জন্য উৎপাদকগণকে বিধিমত উপদেশ দেন, যাহাতে তাঁহার কার্য্যে কোনও রূপে ভুল ভ্রান্তি না হয়, বা যাহাতে তাঁহার দ্রব্যগুলি কোনওরূপে দূষিত হইতে না পায়, তাহার জন্য তিনি রীতিমত সাবধান থাকেন। এইরূপ নানা উপায়ে ভূতত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাঁহার ক্ষুদ্র প্রস্তর উৎপাদক শিল্পশালায় বসিয়া প্রত্যেক কারণের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রয়াস পান।

এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে:—যে অসহনীয় উত্তাপে ধাতব পদার্থ উৎপাদিত ও গঠিত হয় সেই অসহনীয় উত্তাপে তিনি কি এরূপ ভাবে তাহার কার্য্য-কলাপের কারণসমূহ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবেন? দেখা যাউক এ প্রশ্নের কোনও রূপ সন্তোষজনক উত্তর হইতে পারে কি না। আমাদের দিন দিন বিভিন্ন কার্য্যের বিভিন্ন তাপমাত্রায় পদার্থের তেজঃ, ঘনতা, দ্রাবণ শক্তি, ইত্যাদির পরস্পরের

সহিত যে সমস্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহা পদার্থ তাপস্তত্র হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে পারে কি না তাহা সন্দেহস্থল। এতদ্ভিন্ন রসায়নশাস্ত্রবেত্তা এবং পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ যে যে দ্রব্যের সহিত সুপরিচিত, সেগুলি পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে প্রযুক্ত দ্রব্যের অনুরূপ বা সমান নহে। সাধারণ ধাতু, জলীয় দ্রাবণ, সহজ দ্রব লবণাদির পরিবর্ত্তে বালুকা, সহসা অপরিবর্ত্তনীয় অক্সাইড, ইত্যাদি লইয়া ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রবেত্তাকে কার্য্য করিতে হইবে। তাহাদের মিলন শক্তির একান্ত অভাব, অথচ তাহারা অত্যন্ত জটীল মিশ্রিত পদার্থ রাশির সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে। অতএব পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পরিসর এতটা বৃদ্ধি করা আবশ্যক যেন তাহা পৃথিবীর পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে যে রাসায়নিক অবস্থান্তর হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে। এক্ষণে বস্তুতঃ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিলে কিরূপ হইতে পারে দেখা যাউক ঃ—

প্রথমতঃ উপযুক্ত তাপ প্রয়োজন। স্পষ্টই, বুঝিতে পারা যাইতেছে, সাধারণ "মুচি" বা ইষ্টক নির্ম্মিত চুল্লীর দ্বারা এ কার্য্য কখনই সম্ভবপর নহে। কেননা এই সমস্ত উপাদান ধাতব পদার্থের সমাবেশে নির্ম্মিত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্ল্যাটিনাম ধাতু বিনির্ম্মিত "মুচি" এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া নির্ম্মিত চুল্লী-নলের মধ্যে প্ল্যাটিনাম তারের কুণ্ডলী রক্ষা করিয়া তাহাকে তড়িৎ প্রবাহে উত্তপ্ত করিলে তদ্দ্বারা এমন এক নূতন চুল্লী নির্ম্মিত হইতে পারে যে, সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ধাতব-পদার্থ লইয়া রীতিমত পরীক্ষা করা সম্ভবপর। ইহার তাপমাত্রা ১,৬০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উঠিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে এই তাপমাত্রা কতিপয় দিবস ধরিয়া রক্ষা করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা যে যে রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করা হইবে, তাহাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইবে, এবং ইহার ইচ্ছানুরূপ তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও সম্ভবপর। প্ল্যাটিনামের পরিবর্ত্তে ইরিডিয়াম নামক ধাতুও ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং এতদ্দ্বারা ২,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। চুল্লীর অন্তরায় বিদূরিত হইল বটে কিন্তু প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যের নিতান্তই অভাব। যদি স্বাভাবিক কোন ধাতব পদার্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে অন্যবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, এই অন্যবিধ পদার্থ সংমিশ্রিত হইলে ধাতব পদার্থের কি কি ক্রিয়া হইতে পারে তাহা রাসায়নিকের জানা নাই। যাহা হউক যে পরীক্ষক এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র এইটুকু লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, এইরূপ অজ্ঞাত-ধর্ম্ম পদার্থের সংখ্যা গৃহীত ধাতব পদার্থে যত অল্প হয়, ততই ভাল। এইরূপে গৃহীত ধাতব পদার্থ ক্রমশঃ এরূপ করিয়া লওয়া সম্ভবপর যে, ইহাতে যে যে দ্রব্য মিশ্রিত আছে তাহাদের ধর্ম্ম পরীক্ষকের

অবিদিত না থাকে। মূলতঃ যাহাতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ খনিজ পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহার জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে। অতঃপর খনিজ-পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অণুবীক্ষণ সহকারে, রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে এই নব উৎপাদিত পদার্থের সহিত স্বভাবজ সেই পদার্থ লইয়া, নব উৎপাদিত পদার্থে অন্য পদার্থের সমাবেশে কি কি অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা অনায়াসে অনুধাবন করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রকৃত অনুসন্ধানকারীকে সর্ব্ব প্রথমে রাসায়নিকের আশ্রয় লইতে হইবে, কেননা রাসায়নিক ব্যতীত কেহই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ধাতব পদার্থ উৎপাদন করিতে সক্ষম নহে, পরে তাঁহাকে পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সাহায্য লইতে হইবে ; ইনি যে যে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যকে পাতিত করা হইয়াছে, সেই সেই অবস্থার পরিমাণ করিতে সক্ষম। সর্ব্বশেষে খনিজপদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্বাভাবিক খনিজ পদার্থের সহিত নব উৎপাদিত কৃত্রিম পদার্থের সামঞ্জস্য কতটুকু, অন্য অন্য পদার্থ মিশ্রিত হওয়ায় স্বাভাবিক পদার্থ হইতে এই কৃত্রিম পদার্থ কতটুকু পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, ইত্যাদি আরও নানাবিধ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন যে, পৃথিবী কোন্ কোন্ অবস্থা অতিক্রম করায় এবম্বিধ খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হইতে পারে।

এইরূপ স্ফটিকাকারের বিশুদ্ধ ধাতব পদার্থ উৎপাদিত হইবার পর, এবং তাহার স্ফটিকত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পর্য্যাপ্ত জ্ঞান থাকিলে এই বিশেষ স্ফটিক পৃথিবীর গঠনে বিভিন্ন তাপমাত্রায় কিরূপ বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারি। ইহাকে উত্তপ্ত করিলে যতবিধ স্ফটিকাকারে এই ধাতব পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহাও অনুধাবন করিতে পারি। যে তাপমাত্রায় ইহা স্ফটিকাকারে থাকিতে পারে তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব। অতঃপর ইহাকে প্রচুর উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া ইহার দ্রবীভূত হইবার তাপমাত্রা ও পুনরায় কঠিন হইবার তাপমাত্রা নিরূপণ করা যাইতে পারে। এইরূপে অন্য একটি ধাতব পদার্থ উৎপাদন করিয়া তৎসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ভাবে গবেষণা করাও সম্ভবপর। অতঃপর এই দুই পদার্থের নানাবিধ পর্য্যাবেক্ষণ অনায়াসে পরস্পরের সহিত তুলিত হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ ধাতব পদার্থ উৎপাদন করিয়া তাহাদের সমালোচনা সম্ভবপর। এইরূপ হইলে একটা সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করা অসম্ভব নহে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর গঠনে পৃথিবী কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহারও একটা মীমাংসা সম্ভবপর। আবার এইরূপ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ পরস্পরের সহিত কিরূপ ক্রিয়া করে, তাহাও অনায়াসে লক্ষ্য করা যাইত পারে। হয়ত কোন কোনটি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। এই মিলনের সময় কতটুকু তাপমাত্রা

শোষিত হয় বা কতটুকু তাপমাত্রা উদ্ভূত হয়, তাহা আমরা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারি।

যাহা হউক উপরিলিখিত দৃষ্টান্তকে আরও জটীল না করিয়া একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর ঐতিহাসিক কেবল নানাবিধ উপায়ে ও নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্ত কল্পনা না করিয়া, স্বীয় পরীক্ষাগারে বাস্তবিকই কিরূপে প্রস্তর গঠিত হইয়াছিল তাহা অনায়াসে অনেকটা নির্ণয় করিতে পারেন। এইরূপে পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় উপনীত হইতে কত তাপ-মাত্রা আবশ্যক করিয়াছিল, তাহা স্থিরীকৃত হইলে, আমরা একটি পার্থিব তাপমানের হিসাব করিতে পারি। যাঁহারা ভূতত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে, ভূগর্ভে প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সংস্থানের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পৃথিবী গঠনের যুগ-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ স্ফটিকাদি বিভিন্ন তাপমাত্রায় কিরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইলে, তাহাদের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া একটি পার্থিব তাপমানের হিসাব করা অসম্ভব নহে। কোয়ার্টজ্ (quartz) প্রস্তর কিরূপ, তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এই কোয়ার্টজ্ দুই বিভিন্ন তাপমাত্রায় দুই বিভিন্ন আকার ধারণ করে। একটি ৫৭৫ ডিগ্রি ও একটি ৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। যাঁহারা প্রস্তর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাঁহারা যে কোন পর্ব্বতগাত্র হইতে সামান্য কোয়ার্টজ খণ্ড কেবলমাত্র দর্শন করিয়াই অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, ইহা কত তাপমাত্রায় উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে যদি প্রত্যেক স্ফটিক উৎপাদনের তাপমাত্রা নির্ণয় করিতে পারি, তাহা ভূগর্ভের বা ভূপৃষ্ঠের যে স্থানেই সংস্থিত হউক না কেন, তদৃষ্টে আমরা অনায়াসে স্থির করিতে পারি যে পৃথিবী গঠিত হইবার সময় নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে তাহার তাপমাত্রা সেই স্ফটিক গঠনের তাপমাত্রার অনুরূপ ছিল। অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাস এক দিনে বা এক বৎসরে নির্ণীত হইতে পারে না, বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টার ফলে এই অদ্ভুত ইতিহাস বিরচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ও মানবের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রচুর প্রভেদ রহিয়াছে। প্রকৃতি পর্য্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহা-দিগকে সংমিশ্রিত ও সম্মিলিত করিবার জন্য প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি সহায় হইয়াছিল, এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতি ধীরে ধীরে স্ফটিক উৎপাদন করিয়াছিল, কাজেই কোনও স্ফটিকের দীর্ঘায়তনে আমরা বিস্মিত হইয়া পড়ি। আর মানবের দ্রব্য সামগ্রী অত্যল্প, শক্তি নগণ্য ও সময় সীমাবদ্ধ। যাহাই হউক আমাদের পরীক্ষাগারে উদ্ভূত স্ফটিক আণুবীক্ষণিক হইতে পারে, তথাপি তাহার সহিত যদি প্রাকৃতিক স্ফটিকের

সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলেই মানবের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক স্ফটিকের যে সমুজ্জ্বল বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ প্রকৃতি সময় ও সুবিধামত সেই বিশেষ স্ফটিকে এমন একটি অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে যে, তাহারই কারণে তাহার বর্ণ দীপ্তিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। কত মূল্যবান প্রস্তরের সৌন্দর্য্যে আমরা প্রকৃতির অসাধারণ কলা নিপুণতা দেখিতে পাই। মানব কিন্তু এরূপে অবিশুদ্ধ পদার্থ প্রয়োগে সাহসী হয় না। কেননা তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। অতএব মানবের পরীক্ষাগারে উদ্ভূত যাবতীয় ধাতব স্ফটিক নির্ম্মল ও বর্ণ হীন।

এইরূপ পরীক্ষার ও চেষ্টার যে বাণিজ্যগত কোনও মূল্য নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান কালে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের বাণিজ্য কিরূপ ভাবে চলিতেছে তাহা প্রত্যেক লোকেই অবগত আছেন। ব্যবসায়িগণ এইটুকু মাত্র অবগত আছেন যে কতকগুলি খনিজ পদার্থ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে লইয়া কোনও বিশেষ চুল্লীতে উত্তপ্ত করিয়া লইলে, যে পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত জল মিশাইলে প্রস্তরের ন্যায় একরূপ কৃত্রিম প্রস্তর উৎপাদিত হইতে পারে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণ হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টে চূণ, য়্যালিউমিনা, বালুকা, ও সামান্য লৌহ ও ম্যাগ্‌নেসিয়া আছে। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থের পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক, অর্থাৎ ইহাদের কোন্ পদার্থটি অত্যাবশ্যক এবং কোন্‌টি মাত্র দৈবাৎ মিলিত হইয়াছে, এবং কোন্ উপাদানের পরিমাণ ঠিক কতটুকু হওয়া আবশ্যক তাহা ঠিক নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিব যে চূণ, য়্যালুমিনিয়া, ম্যাগনেসিয়া মিলিত হইয়া কি স্থায়ী পদার্থ উদ্ভূত হইতে পারে, তখন আমরা পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট উৎপাদনের একটা নির্দ্দিষ্ট উপাদান তালিকাও প্রস্তুত করিতে পারিব। এখন ব্যবসায়িগণ যাঁহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করিতেছেন, ফলে কোনও সিমেণ্ট উৎকৃষ্ট আবার কোনওটি বা অপকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে সিমেণ্টের নির্ভুল উপাদান তালিকা প্রস্তুত করিতে যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, পৃথিবীর প্রস্তর গঠনের উপাদান তালিকা স্থির করিয়া কৃত্রিম প্রস্তর উৎপাদন করিবার জন্যও সেই সেই উপায় অবলম্বন আবশ্যক। অতএব যদি পৃথিবীর ঐতিহাসিক কোনও দিন চেষ্টা করিয়া প্রস্তর নির্ম্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালীও উদ্ভাবিত হইতে পারে। এইরূপে নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য ও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ পৃথিবীর ঐতিহাসিকের চেষ্টায় উৎপাদিত হওয়া অসম্ভব নহে।

পৃথিবী এক সময়ে বাষ্পময় ছিল, ক্রমশঃ শীতল হইয়া এইরূপ হইয়াছে। ইহার অধিক আমরা পৃথিবীর বিষয় আর কিছুই জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি

পৃথিবীর ইতিহাস বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত চেষ্টায় সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তখন আমরা জানিতে পারিব যে, কিরূপে সমগ্র মিশ্রিত পদার্থ হইতে পদার্থরাশি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, কিরূপেই বা তাহারা পৃথিবীর স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তখন আমরা জানিতে পারিব মৃদু উত্তাপেও যে মর্ম্মর শতধা চূর্ণ হইয়া যায়, সেই মর্ম্মর কিরূপে অসহনীয় উত্তাপের মধ্য হইতে এক এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, অথবা কিরূপেই বা ভূগর্ভে সুবর্ণ, রজত, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুপুঞ্জ পৃথকীকৃত হইয়াছিল।

নিদ্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশ নিদ্রা সুখভোগে সক্ষম?—এই বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ নিদ্রার নানাবিধ উপপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত উপপত্তির মধ্যে স্নায়ুঘটিত, রাসায়নিক, সূক্ষ্ম-শারীর-যন্ত্র সম্বন্ধীয়, মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ও প্রাণবিজ্ঞান সম্মত উপপত্তিগুলিই প্রধান।

স্নায়ু ঘটিত উপপত্তি।—এই উপপত্তি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের পূর্ব্বার্দ্ধে রক্ত সঞ্চালনের পরিবর্ত্তনই নিদ্রার কারণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বহু পণ্ডিত সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্কের শোণিতহীনতা উপস্থিত হয়। ফ্লেমিং নামক জনৈক চিকিৎসক ক্যারটিড নামক এক প্রকার রক্তবহা নাড়ীকে রীতিমত চাপিয়া অতি শীঘ্র নিদ্রা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে সমস্ত কারণে লোকের উৎকট নিদ্রাহীনতা রোগ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে অতিরিক্ত শোণিতচাপ প্রধান। ডাক্তার সাজুর (Sajous) অভিমত উদ্ধৃত হইল :—

Sleep is brought about by the sympathetic centre in the posterior pituitary, which governs the function of the thyroadrenal system; the effect is a diminution of the internal secretion of these glands, and thus a lowered metabolic activity, which permits general Vaso-dilatation. The blood accumulates in the splanchnic area and the large trunks, cerebral anemia being the result.

রাসায়নিক উপপত্তি।—এই উপপত্তি অনুসারে, জীব শরীরে অবসাদজনক নানাবিধ পদার্থের সঞ্চয়ই নিদ্রার কারণ। লোকে যত পরিশ্রম করিতে থাকে, ততই এই

সমস্ত পদার্থ দেহে উৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং সঞ্চয়ের মাত্রা যখন এত অধিক হয় যে পরিশ্রম অসাধ্য হইয়া উঠে তখনই নিদ্রা আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পদার্থ বিষাক্ত, এবং পেশী ও স্নায়ুর অনবরত ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই বিষ নিদ্রার উত্তেজক এবং ইহার ক্রিয়া নার্কটিকের (narcotic) অনুরূপ। এই বিষ মূলতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে অত্যন্ত ক্রিয়া করে, এবং পরিমাণ অধিক হইলে লোকে প্রথমে ঝিমাইতে থাকে এবং অবশেষে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রজনীতে বা নিদ্রাকালে এই বিষ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবার পথে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং যখন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া যায়, তখন সামান্য উত্তেজনাতেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। সেইজন্য "কাঁচা ঘুম" ভাঙ্গাইলে শরীর অবশ হইয়া থাকে, লোকের কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করা অতিশয় কষ্টকর।

শারীর-যন্ত্র-মূলক উপপত্তি—আণুবীক্ষণিক স্নায়বিক কোষসমূহ প্রলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রলম্বমান অংশের নাম ডেণ্ড্রাইট্‌স্। এক কোষের ডেণ্ড্রাইট্ অপর কোষের ডেণ্ড্রাইট্‌কে স্পর্শ করিয়া থাকে। ফলে একরূপ স্নায়বিক স্রোত কোষ হইতে কোষান্তরে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত ডেণ্ড্রাইটের প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। যাঁহারা জন্তুবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা য়্যামিবা নামক এক কোষ বিশিষ্ট অতি মৌলিক জীবের বিষয় অবগত আছেন। এই একটি মাত্র কোষের কোন অংশ কখনও লম্বিত হয়, কখনও বা সঙ্কুচিত হয়। এই লম্বমান অংশকে পণ্ডিতগণ য়্যামিবার "কল্পিত পদ" (pseudopodia) বলে। ডেণ্ড্রাইট গুলিও এইরূপ নানা কারণে বা নানা শক্তিতে সঙ্কুচিত ও সংপ্রসারিত হয়। যখন ডেণ্ড্রাইটগুলি সঙ্কুচিত হয়, তখন পূর্ব্ব কথিত স্নায়বিক স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। এই স্রোত অব্যাহত না থাকিলে জীব জাগ্রত থাকিতে পারে না। কাজেই প্রবাহ ভঙ্গে জীব নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এই উপপত্তি নিশ্চয়ই অতি চমৎকার বটে, কিন্তু অধিকাংশই কল্পিত।

ভ্যাসোমোটর উপপত্তি অনুসারে মস্তিষ্কের রক্তহীনতা যে নিদ্রার প্রধান কারণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আহারান্তে নিদ্রাকর্ষণের প্রধান কারণ এই যে পাকস্থলীর অতিরিক্ত ক্রিয়ার জন্য শোণিত স্রোত পাকস্থলী অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, মস্তিষ্কে আংশিক রক্ত হীনতা উপস্থিত হয়, অমনই নিদ্রা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে নিদ্রা আকর্ষণে বিলম্ব হইলে মস্তকে সামান্য জল দিয়া পদদ্বয় মোজা দ্বারা বা অন্য উপায়ে বেশ গরম করিয়া তুলিলে নিদ্রা আকৃষ্ট হয়। ইহার কারণ উত্তপ্ত অংশে শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু এই রক্তহীনতাই যে নিদ্রার একমাত্র কারণ এরূপ কখনই হইতে পারে না। রাসায়নিক উপপত্তিও সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না। কেননা ক্লান্তির সম্পূর্ণ অভাবেও বেশ নিদ্রা উপভোগ করা যাইতে পারে। অনেকের দিবা নিদ্রার অভ্যাস আছে। দারুণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা যে সময়

নিদ্রিত হয়েন, কিছুমাত্র পরিশ্রম না করিয়াও তাঁহারা ঠিক সেই সময়ে নিদ্রিত হইয়া থাকেন। যদি এইরূপ পরিশ্রম অভাবের দিনেও তাঁহারা নিদ্রা ভোগ না করেন, তবে তাঁহাদের কষ্টের অবধি থাকে না। অনেকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হয়েন।

মনে করুন কোনও লোক প্রভাতে ৫ ঘটিকার সময় জাগরিত হয়েন। তিনি সন্ধ্যার প্রাকালে শয়ন করিয়াও ৫ টার সময় শয্যাত্যাগ করেন, আবার রাত্রি ৪ টার সময় শয়ন করিয়াও ঠিক ৫ টার সময়েই গাত্রোত্থান করেন। অনেকে অবগত আছেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উঠিবার মানস করিয়া শয়ন করিলে ঠিক সেই সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা প্রদান কালে রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে শয়ন করিবার সময় স্থির করিয়া রাখে যে, প্রভাতে ঠিক ৪ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিবে, আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই সময়েই তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, প্রত্যেক মানবের জীবনেই একাধিকবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাত্রোত্থান করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন মস্তিষ্কের নিভৃত প্রদেশে গোপনে অবস্থান করে, এবং ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইলেই, প্রকাশিত হইয়া বলপূর্ব্বক নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। জননীর নিদ্রা অত্যদ্ভুত। আমি স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছি, বাহিরের তুমুল কোলাহল, বাদ্যভাণ্ড যে গভীর নিদ্রা ভঙ্গে সমর্থ হয় নাই, সন্তানের সামান্য অঙ্গচালনে স্নেহময়ী জননীর গাঢ় নিদ্রা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

মনস্তত্ত্বমূলক উপপত্তি—ম্যানাশিন্ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিকের অভিমত এই যে জ্ঞানের বিশ্রামই নিদ্রা। শিশুগণের জ্ঞান পরিপক্ক নহে, কাজেই নিদ্রা অধিক। আবার পূর্ণ বয়স্কগণের মধ্যেও যাহার জ্ঞান বুদ্ধি তত প্রখর নহে, যে অধিক কার্য্যকুশল নহে, যাহার কার্য্য সাধন শক্তি অল্প, তাহার নিদ্রার পরিমাণও তত অধিক। অশিক্ষিত, মূর্খ, বন্য মানব, কাণ্ডজ্ঞানহীন, "বোকা" ইত্যাদি লোকে অধিক কাল নিদ্রামগ্ন থাকে। লোকে যত বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই তাহার জ্ঞান বুদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে, কর্ম্ম শক্তি হীন হইতে থাকে, কাজেই তাহাদের নিদ্রাও বালকের ন্যায় অধিকতর হয়। কিন্তু যে অশীতিপর বৃদ্ধের কর্ম্ম শক্তি যুবার ন্যায় অক্ষুন্ন, জ্ঞান ও বুদ্ধি সমভাবাপন্ন, তাহার নিদ্রার পরিমাণও অল্প, বরং এই সমস্ত বৃদ্ধ সময়ে সময়ে নিদ্রাহীনতা ব্যাধিতে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। যাঁহারা জগৎ প্রসিদ্ধ লোকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে এই সমস্ত মহাপুরুষ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা কর্ম্ম চঞ্চল ছিলেন, তাঁহাদের যৌবনোচিত শক্তি সর্ব্বদা একরূপ ছিল, কাজেই তাঁহারা চিরকাল সামান্য সময় মাত্র নিদ্রা ভোগ করাই পর্য্যাপ্ত মনে করিতেন। হামবোল্ড, নেপোলিয়ন, বর্ত্তমান কালে মহামতি এডিসন্ ইত্যাদির নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য।

প্রাণবিজ্ঞানমূলক উপপত্তি—ক্ল্যাপারিড এবং সিডিস্ নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিদ্রা বিষয়ক প্রাণবিজ্ঞানমূলক উপপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশেষে ইহার, জীবের ক্রমবিকাশমূলক ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ক্ল্যাপারিড বলেন যে প্রাণসৃষ্টির প্রথমে নিদ্রা বলিয়া কোন নৈসর্গিক ব্যাপারের অস্তিত্ব ছিলনা, অর্থাৎ সর্ব্বকালে নিদ্রার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে, এবং জীবন বা প্রাণের উপলব্ধির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। অতি নিকৃষ্ট ইতর প্রাণবিশিষ্ট জীব, যেমন মাইক্রোব, ইন্‌ফিউসোরিয়া ইত্যাদির নিদ্রা নাই বা নিদ্রার স্থায় তাহাদের অবস্থান্তরের কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্বীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্ত উৎকৃষ্ট জীবসমূহের যখন ঘোরতর জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই নিদ্রার বিকাশ হইয়াছে। কেননা এইরূপ বিশ্রাম লাভ করিয়া পেশীসমূহ দ্বিগুণ শক্তিতে কার্য্য করিয়া জীবসমূহকে সংগ্রামে জয়ী করিবার উপযুক্ত করিয়াছিল।

এই উপপত্তি অনুসারে ক্লান্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিদ্রা একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। অথবা ইহা জীবের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়-পরিচালন, জনন ইচ্ছা ইত্যাদি যেরূপ জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি নিদ্রাও সেইরূপ। আমরা নিদ্রিত হই তাহার কারণ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলি বিষদুষ্ট বা ক্লান্ত হইয়া উঠে তাহা নহে; কিন্তু আমরা না ঘুমাইলে, নিদ্রা উপভোগ করিয়া যাহারা অধিকতর বলশালী হইয়াছে, তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব না, এই জন্ত নিদ্রা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অবশেষে বংশানুবর্ত্তী ধর্ম্মের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

উপরি লিখিত নানাবিধ আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোন পণ্ডিতই নিদ্রার সঠিক সমাধান করিতে সক্ষম হয়েন নাই। একে অন্তের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া যে মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, তাহাই আবার অন্তে ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই নিদ্রা কি প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্ন শুনিয়া অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন। নিদ্রার প্রয়োজনীয়তায় সন্দিহান হওয়া নিতান্ত ভ্রান্তের কার্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তৎসম্বন্ধে বহুবার বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মবীর জিরভো প্রকাশ করিয়াছেন নিদ্রা নিতান্ত অনাবশুক, মূর্খের প্রয়োজনীয় অত্যন্ত কদর্য্য অভ্যাস মাত্র। মহামতি এডিসন বলেন নিদ্রা মানবের যুগ যুগান্তের কদভ্যাস। এইরূপে প্রায় অধিকাংশ কর্ম্মবীরই নিদ্রার নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আমরা নিদ্রা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারি না। খাদ্যের অভাবে মানব যত কষ্ট পায়, নিদ্রার অভাবে ততোধিক

কষ্ট পাইয়া থাকে। নিদ্রাহীন মানব ও আশাহীন মানব উভয়েই অতিশয় হতভাগ্য।

এই বৈজ্ঞানিকযুগে কত কি অভিনব ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে। তার বিহীন তড়িতবার্ত্তা, এইরোপ্লেন ইত্যাদি আবিষ্কারে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। হয়ত এমন দিন আসিবে নিদ্রারূপ বদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াও মানব স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারিবে, এরূপ কোন পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু যত দিন এরূপ আবিষ্ক্রিয়া সম্ভবপর না হইতেছে, তত দিন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার জন্য ও স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিবার জন্য, এবং জীবনকে মানবোচিত কর্ম্ম গুণে বিভূষিত করিবার জন্য আমাদিগকে অবশ্যই ঘুমাইতে হইবে। কেননা অবসাদ বিনাশ করিতে, নিরুৎসাহ মনে উৎসাহ সন্দীপিত করিতে, নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে এমন ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। তাই আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত বলিতে হয়:—

> "Without thee what is all the morning's wealth ?
>
> *　*　*　*　*　*
>
> Dear Mother of fresh thoughts and joyous health!"

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

ইউরোপের যুদ্ধে আমাদের লাভালাভ।

ইউরোপে যে মহা সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে তাহার যে কি ফল হইবে তাহা বলা বাস্তবিকই দুরূহ। কেহ কেহ বলিতেছেন যে ইহাতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; আবার কেহ কেহ বা বলিতেছেন আপাততঃ ক্ষতি হইলেও ইহাতে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে। কথাটা হইতেছে এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন্তব্য এমন ভাবে প্রচার করিতেছেন যেন তিনি নিজেই সেই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। কতকগুলা লোকে দৈনিক, মাসিক প্রভৃতি সংবাদপত্র পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিতেছেন যে এই যুদ্ধে আমরা যথেষ্ট লাভ করিব—"It is a blessing in disguise" কিন্তু কেন যে blessing তাহা বলা দুষ্কর।

যুদ্ধে আমাদের কিছু লাভ হইবে কি না পরে বিবেচ্য; আমরা এখন কিন্তু দেখিতেছি আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। আমি এখন যে কথাটা বলিতেছি সেটা বিশেষ নূতন নহে; পাঠক বোধ হয় তাহা শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন;

কথাটা এই যে পাটের বাজার একেবারে নরম পড়ায় দরিদ্র প্রজা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে বাঙ্গালায় আজকাল পাটের চাষ প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। অন্য অন্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পাটের চাষ যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাজারে ক্রেতা নাই। কাজেই অতি অল্প দরে পাট বিক্রয় হইতেছে। আবার কোনও কোনও স্থলে একেবারেই পাট বিক্রয় হইতেছে না, কাজেই দরিদ্র চাষা আজ "হা অন্ন হা অন্ন" বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এখন উপায় কি ?

অনেকে বলিতেছেন যে লোকের শিক্ষা হউক যে ধানের চাষ না করিয়া পাটের চাষ করিলে ফল এইরূপই হয়। এখন শিক্ষা দিবার সময় নয়। পাটের চাষ একটা পাপ বা করা উচিত নয় এ কথা অজ্ঞের মুখেই শোভা পায়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে অনেক সময় কৃষককে বাধ্য হইয়া পাটের চাষ করিতে হয়। তবে সে কথার অবতারণা এখানে আজ করিব না।

ভারতের অধিকাংশ লোকই চাষের উপর নির্ভর করে। ভারতের রপ্তানির অধিকাংশ জিনিষই কৃষিজাত; ইহাকে ইংরাজিতে raw material বলে। রপ্তানি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে কাজেই অর্থাগমের একটি প্রধান দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। একারণে অধিকাংশ লোকই যে কষ্টে পড়িয়াছে সে কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশের কৃষককুলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অন্নের সংস্থান তাহাদের নাই। আপাততঃ কথাটা প্রধান ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের কষ্টের লাঘব হইবে বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয়।

ক্ষতি যে যথেষ্ট হইয়াছে ও হইবে সে বিষয় বলিতে হইবে না। এখন ইহা নিবারণ করিবার পন্থা চাই। একে আমাদের দেশ রোগে উজাড় হইয়া যাইতেছে তাহার উপর অনশন আসিয়া জুটিলে কত লোক যে মরিবে তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন ?

এখন লাভের কথা বলি। কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা একটা কিছু শুনিবা মাত্রই লাফাইয়া উঠেন। সব দেশেই এরূপ লোক আছে তবে আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। এই সমস্ত লোকের ধারণা এই যে, ইউরোপ হইতে আমদানী যখন বন্ধ হইয়াছে তখন কাজেই প্রতিযোগিতা আর নাই। এইবার আমরা ব্যবসা করিলেই লাভবান হইব—আমাদের ব্যবসা টেঁকিয়া যাইবে। তাঁহারা ভবিষ্যত ভারতের উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। বাস্তবিকই আনন্দে বিভোর হইবার কথা, কিন্তু সেই উদ্যোগ—সেই উৎসাহ কোথায় ? সে ত্যাগ—কর্ম্মে সে আসক্তি কোথায় ?

"শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে"—কোথায়—কবে—কিরূপে—কেহ ভাবিয়াছেন কি? বহুকাল হইতে "হইবে" শুনিয়া আসিতেছি। হইয়াছে কয়টা? আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় বড় বড় কারখানা আছে কয়টা? অবশ্য বড় বড় নামওলা factory—manufactury প্রভৃতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের খোঁজ খবর করজন রাখিয়াছেন? যাহা কিছু আছে তাহাদেরও অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়!! ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের নিজেদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে যে বিদেশী আসিয়া কি করিয়া সহজে ব্যবসাটা হাত করিয়া ফেলে আর আমরা দেশে বসিয়া কিছু করিতে পারি না!

প্রথম কথা মূলধনের অভাব। যাঁহার টাকা আছে তিনি "কোম্পানির কাগজ" কিনিয়াছেন। কে ব্যবসায়ে টাকা দিয়া মাথা ঘামাইবে? নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া যথা সময়ে সুদ পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশের লোক কি বাস্তবিকই এত স্বার্থপর, না ইহার মধ্যে আরও কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে? লোক চরিত্র অল্প বিস্তর সব দেশেই সমান, তবে আমাদের দেশের এই বৈচিত্রের কারণ কি? আমাদের নিজেদের দোষেই অনেক সময় মূলধন পাই না। আমরা একটা বড় লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রস্তাবনা করিলাম, তাহার পর হয় মোটে কার্য্য আরম্ভই করিলাম না, আর না হয় দুই দশ দিন কার্য্য করিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কারবার যে আমাদের দেশে নূতন তাহা নহে। অন্য দেশে এ ঘটনা হয় না আর আমাদের দেশেই কেবল এই সৃষ্টিছাড়া ঘটনা ঘটে এ কথাও ঠিক নহে। তবে আমাদের দেশে এই ব্যাপারটা এতই বেশী হইয়াছে যে, আমরা মহাজনদের বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাঁহারা এখন আর যাহার তাহার হাতে টাকা ছাড়িয়া দিতে আদৌ রাজি নহেন। দোষটা তাঁহাদের নয়। দোষটা অনভিজ্ঞ ব্যবসাদারের। আমাদের দেশের লোকে বিলাতী (বা সাহেবী) কোম্পানির সেয়ার বা অংশ কিনিতেছেন কিন্তু তাঁহারা যে সে কোম্পানির সেয়ার কিনিতে নারাজ।

প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে যে, নামজাদা লোক ব্যবসায়ে না নামিলে আর কেহ টাকা দিবে না। লোকে সাহস করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় নামজাদা কারখানার সেয়ার বা অংশ কিনিতে পারে কিন্তু নূতন একটা কিছুর সেয়ার কিনিতে আর প্রস্তুত নহে। কাজেই এক্ষণে ব্যবসা চালাইতে হইলে বা নূতন শিল্পাদির কারবার প্রতিষ্ঠান করিতে হইলে নামজাদা ব্যবসাজ্ঞ লোক কাজে নামা চাই; তবেই ব্যবসা চলিবে। মুখে অনেক কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু কাজে দেখান বড় শক্ত। দুইটা M. A. থাকিলে লোকে ভুলিবে না, সেকাল এখন গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অথচ মূলধন আছে এমন লোক চাই। এখন একবার দেখুন যে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান কি ভয়ঙ্কর শক্ত কথা!!

তৃতীয় কথা হইতেছে যে লোকের অভাব দেখিতে হইবে। স্বদেশীর যুগে "ছাই ভস্ম" স্বদেশী বলিলেই লোকে কিনিত কিন্তু এখন আর কিনিবে না। আমাদের দেশের অনেক কারবারেরই জিনিস এখনও একটুও উন্নত হয় নাই। ক্রমাগত চেষ্টা করিতে হইবে যে কিসে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এরূপ না করায় অনেক কারবার নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা পুঁথিগত বিভার ব্যবসা চালাইতে গিয়া মাটি করিয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন। নিজেদের Trade Secret রাখিতে হইবে। এ জিনিসটা কেহ কাহাকেও শিখায় না। এইটা মাথা ঘামাইয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার উপর কথা হইতেছে যে একদেশে যাহাতে লাভ হয়, হয়ত আমাদের দেশে তাহাতে হইবে না। কাজেই বিশেষজ্ঞদের দিবারাত্রই এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মনি, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকে আমাদের দেশে ব্যবসায়ে কি করিয়া প্রতিপত্তি করিয়াছে? তাহারা দেশের লোকের অভাব, রুচি প্রভৃতি প্রত্যহ খোঁজ লইয়াছে। লোকে কি চায় ব্যবসাদারকে তাহা জানিতে হইবে। যে জিনিসটা ব্যবসাদারের মনোমত, তাহা লোকের মনোমত বা রুচি সঙ্গত নাও হইতে পারে। বিলাতী বড় বড় কোম্পানির লোক এদেশে বসিয়া এ দেশবাসীর রুচি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে সে কথা কেহ কি জানেন? এই সব লোক মেলায়, হাটে, ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা জানিয়া লয় এবং প্রতি সপ্তাহে ৩০ পৃষ্ঠা ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী পত্র প্রেরণ করে। লোকের রুচি অনুযায়ী নমুনা প্রেরণ করে। এই সব লোক এখানে দুই হাজার তিন হাজার করিয়া মাহিনা পায়।

ইঁহারা এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়া লোকের রুচি জানিয়া লন বলিয়া আজ বিলাত হইতে পাছা পাড়ের কাপড় আসিতেছে। তাই আজ জার্মনী হইতে কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতির পট বা ছবি বাজারে হাটে দোকানে বিক্রয় হইতেছে। তাই জার্মনী এদেশের রুচি অনুযায়ী খেলনা পুতুল বিক্রয় করিয়া কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে। তাই বাজারে দেশলাইএর উপর ভারতীয় ছবি দিয়া সুইডেন অষ্ট্রীয়া কত পয়সা লইয়া যাইতেছে। জাপান আজ কত রকম জিনিস পাঠাইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

লোকের রুচিই ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। লোকে কি চায়? আমি নিজের মত জিনিস করিব আর লোকে কিনিতে থাকিবে একথা অচল হোতা পায়। এদেশের থালা ঘটি বাটী সব রকম নমুনা জার্মনি, বেলজিয়াম, অষ্ট্রীয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার উপর অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তবেই না আজ এখানে তাহারা ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। কত পয়সা তাহারা

করিয়াছে ভাবুন—প্রত্যেক নমুনা সংগ্রহকারীকে মাসে দুই হাজার তিন হাজার টাকা মাহিনা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বড় বড় নগরে এইরূপ এক একজন লোক থাকেন। ব্যবসাটা কত সহজ একবার দেখুন !!

জাপান ইহার মধ্যেই রাশিকৃত জিনিস আনিয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকাও এদখকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ভাবিয়াছিলেন তাঁহারা দেখুন। ৩রা অক্টোবর তারিখের Scientific American সম্পাদকীয় অংশে যাহা লিখিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্ত তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"We have heard so much of the opportunity that beckons the American manufacturer and merchant in foreign markets, now that all Europe is embroiled in war that it occured to the Editors of the Scientific American to obtain from our representative business men their views on the possibility of expanding our export trade. * * * * * *

After we had read these admirable presentations of competent authorities, we are impressed with the fact that our more prominent manufacturers regard our foreign opportunity not as a small boy contemplates an unguarded apple orchard, but as a great commercial problem which must be thoroughly studied before it can be attacked with success. With one or two exceptions the letters are distinctly optimistic in tone. The writers, for the most part, realize that Germany and England have been successful in foreign markets because they have ascertained the needs of those whom they wish to serve and because they have established adequate banking facilities. * * * * * *

Considered thus the problem is one with which we ought to be able to cope successfully. The scientific study of our home market began not more than a decade ago, and the establishment of an elastic home credit system, which would aid our business man in financial crises dates back only a few weeks. If the same systematic study is conducted in foreign markets if the same consideration is shown for the banking requirements of foreigners as for Americans there can be no reason why we should not

gain a permanent foothold in markets which have been hitherto close to us."

আমেরিকা এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা ভারতে ব্যবসা করিবে। জাপানের চারিদিকেও ভারতে ব্যবসা করিবার জন্ত হৈ হৈ রব উঠিয়াছে। আর দরিদ্র ভারত নিজ গর্ব্বেই মত্ত! এখন সময় আসিয়াছে—আমরা পারি বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আর বৃথা জল্পনা কল্পনায় কাল কাটাইলে চলিবে না। কার্য্যে তৎপর না হইলে শেষে আবার হাত কামড়াইতে হইবে সে কথা যেন মনে থাকে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অবশ্য প্রস্তুত আছেন, কেন না এখন ইংলণ্ড সমস্ত দেশের অভাব মোচন করিতে পারিবে না। এখন কি করিব বলিয়াও ভাবিতে হইবে না। অসংখ্য দ্বার মুক্ত হইয়াছে হেলায় সময় হারাইলে বড় সুবিধা হইবে না।

এক জার্ম্মনী হইতে ভারতে কি না আসিত? এক পয়সা মূল্যের ছুঁচ, সুতা, নিব, কলম হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ টাকা দামের কল কারখানা আসিয়াছে। যাহার যাহা সুবিধা সে সেই ব্যবসা লইয়া উঠিয়া পড়। তবে লোকের অভাব ও রুচির দিকে নজর রাখিতে হইবে। জিনিস কিসে উৎকর্ষ লাভ করিবে নিয়তই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। লোকে আর বাজে কথায় ভুলিবে না কিছু দিন লোকে স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া লোককে ঠকাইলে চলিবে না। লোকে যদি দেখে যে একটি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সে আরও স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবে; কিন্তু ফাঁকা আওয়াজে চলিবে না।

এক্ষণে চতুর্থ কথা বলা যাউক। কথাটা এই যে কোনও জিনিসের কাট্‌তি করিতে হইলে বিজ্ঞাপন দরকার। অনেকেই বিজ্ঞাপন অর্থে সংবাদ পত্রে, মাসিক পত্রিকায়, দেওয়ালের গায়ে হ্যাণ্ডবিল বুঝেন। ইহা যে বিজ্ঞাপন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, হাটে, মেলায়, তীর্থে জিনিস লইয়া ঘুরিতে হইবে, সকলের দ্বারের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। অনেক স্থলে ব্যবহার করিবার জন্ত বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করিতে হইবে। দোকানে দোকানে প্রথমে বিনামূল্যে জিনিস দিতে হইবে। তাহার পর বিক্রয় হইলে দাম লইবার প্রথা প্রচলন করিতে হইবে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া জার্ম্মনী এতটা উন্নতির মার্গে উঠিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন প্রথা সেরূপ চলন নাই। এখানে বিজ্ঞাপন কথাটা Canvasing অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অনেক লোককে মাহিনা দিয়া রাখিতে হইবে; তাহারা কেবল দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিসের অবস্থা দেখিবে। লোকে কি চায় তাহা দেখিবে। তবে যথাযথ অভাব দূর করিবে।

সমস্ত জায়গায় যাহাতে অতি অল্প আয়াসে জিনিস পাওয়া যায় তাহা দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যবসায়িদের মতামত উদ্ধৃত হইল :—

Fred'k S. Fish, President of the Stude baker Corporation লিখিয়াছেন :—

First, learn the people, their characteristics, their methods and being properly introduced and accredited observe their conventionalities.

Second, give them the goods they want, as they want them, and in quality as representated.

W. A. Marble, President, The Merchants' Association of New York বলেন :—

"* * * * But in order to accomplish this, it will be very necessary for the American manufacturers to "go after" the business in a systematic way and send their representatives to visit the merchants in those states and those representatives should be able to speak the local language and thus come in personal contact with those whose trade they are seeking."

William C. Breed, Member of Breed, Abbott and Morgan, Attorneys and Counsellors বলেন :—

"No better method can be adopted to secure and develop South American trade than has been successfully employed by Germany, Great Britain and France. For example Germany's method has been to send a specially fitted representative to South America, make purchases of the prouduct in actual use and demand, ascertaining selling costs, and then to manufacture these products, in the style, size and character demanded, and at a price which will enable successful compitition with existing trade."

একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যবসা করিতে হইলে লোকের পছন্দের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের দেশের ব্যবসা কত দূরদেশের লোকে আসিয়া করিতেছে, আর আমরা করিতে পারিব না ইহা বড়ই লজ্জার কথা!! আমেরিকা এখন দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী। ভারতে আসিতে তাহাকে অনেক টাকা, জাহাজ খরচ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা যে আমেরিকা এখনও ভারতে আসিতে মনস্থ করে নাই। তবে ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য জাপান বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মাহেন্দ্র সুযোগ আসিয়াছে।

জাপান লড়াই করিতেছে নাম মাত্র। সমস্ত জাতিই এখন নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে ভারতে জাপানী দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন নিশ্চেষ্ট থাকিলে জাপান অতি শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লাভ কি হইয়াছে এইবার বুঝুন। আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কল কারখানা স্থাপনের, নিজেদের ব্যবসা চালাইবার মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এইবার Theoritical বিদ্যা ছাড়িয়া একেবারে হাতে কলমে লাগিয়া যান। আমাদের দেশে গুণী লোক যথেষ্ট আছেন। "আমাদের দেশে নাই" একথা বলা চলে না। এখন অধ্যবসায়, উত্তেজনা, স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মে আসক্তি চাই। এখন বঙ্গের যুবকগণ! আপনারা লাগিয়া যান। দেশের বিখ্যাত গণ্যমান্য নেতাদেব লইয়া পরামর্শ করিয়া কল কারখানা স্থাপন করুন। ইহাতে আমাদের সহৃদয়, কারুণ্য-রত্নাকর, প্রজাবৎসল সম্রাট সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভারতবাসীর বহু ভাগ্যফল যে, এ হেন দেবোপম ধর্ম্মরূপী সম্রাট তাহাদিগের শাসনকর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। তবে ভারতবাসীর আর কিসের ভাবনা—কিসের ভয়? ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে যে সকল কল কারখানা আছে তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। প্রথমেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারিবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এখন দশগুণ বর্দ্ধিত করা হউক। দেশের রাসায়নশাস্ত্রবিৎ যুবকগণকে একত্রিত করিয়া ইহাতে দিবারাত্র কার্য্য করিতে দেওয়া হউক। জার্ম্মনী হইতে আর ঔষধ আসিবে না, কোনও chemicals বা রাসায়নিক দ্রব্য আসিবে না। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে লাগিয়া যাউন। ইঁহারা নূতন নূতন বিভাগ খুলিয়া পুনরায় সেয়ার বিক্রয় করিয়া বা অন্য উপায়ে দেশকে বিদেশীর হাত হইতে রক্ষা করুন।

শুধু-যে বেঙ্গল কেমিক্যালকেই এরূপ করিতে হইবে তাহা নয়। আমাদের দেশের সমস্ত কল কারখানা দশগুণ হিসাবে বাড়াইয়া উপযুক্ত লোক গ্রহণ করিয়া দিনের পর দিন কার্য্য করুন; এদেশে industry বা শিল্পোন্নতি কিছুই নাই। সমস্ত কারখানার উন্নতি না হইলে একটার উন্নতি হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে এক সাল্‌ফিউরিক য়্যাসিড্ (Sulphuric acid) যে কত হাজার টন ব্যবহৃত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই দ্রব্যের বিক্রয় নাই। এমন শিল্প নাই যাহাতে Sulphuric acid ব্যবহৃত হয় না। এই দ্রব্যের দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির অনুমান করা যাইতে পারে। আমি ডাক্তার পি সি রায়ের কোন ছাত্রের নিকট শুনিয়াছি যে আমাদের দেশে এই acidএর বিক্রয় এত অল্প যে অনেক সময় খরচে কুলাইয়া উঠে না। আমাদের দেশে সরবৎ সোডাওয়ালাদের কাছে বা বিক্রয়

হয়!! এই কথাগুলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে একের উন্নতি অপরের উপর নির্ভর করে।

এইবার পঞ্চম প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। সকলেই জানেন আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। কাজেই এখানে সস্তা দামের জিনিস করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিসে অল্প মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। দুই চারি পয়সার পার্থক্য আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যধিক। দামী জিনিস করিলে তাহা সাধারণের ব্যবহারের আয়ত্তের মধ্যে আসিবে না। সর্ব্ব সাধারণে না কিনিলে জিনিসের কাটুতি হইবে না কাজেই ব্যবসা উঠিয়া যাইবে। এই দোষে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯টি কারবার উঠিয়া গিয়াছে; নূতন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় যাহাতে এ ভুল না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে জাপানী জিনিসের এত শীঘ্র এত কাট্‌তি হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, জিনিসগুলি অতি সস্তা। তাহা বলিয়া ক্ষতিকর কার্য্যে জিনিস দিলে চলিবে না। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইবে। আমাদের দেশের অনেকগুলি কারখানা আজিও এ দোষে দূষিত। ইহা বাস্তবিকই আক্ষেপের বিষয়। The cheapest and the best হইতে পারে না বলিয়া অনেক লোকের ধারণা কিন্তু কারবারের কর্ত্তৃপক্ষগণের এ ধারণা নিতান্তই সর্ব্বনাশের মূল জনক। একথা ভুল। জার্ম্মনীর জিনিস গুলা কিরূপ তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না অথচ অপেক্ষাকৃত অনেক সস্তা। এই কারণেই এই ইংরাজ শাসিত দূর ভারত প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেও জার্ম্মন দ্রব্য অসংখ্য পরিমাণে আছে।

জাপানী জিনিসগুলিও মনোহর অথচ সস্তা, তাই জাপান ধীরে ধীরে ভারতের বাজার অধিকার করিতে বসিয়াছে। সস্তায় জিনিস দিতে হইলে raw material কোথায় সস্তায় পাওয়া যায় দেখা দরকার। এজন্যও লোক নিয়োগ আবশ্যক। কারবার করিতে হইলে দস্তুর মত খাটিতে হয়, খুঁজিয়া দেখিতে হয় তবে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ব্যবসা স্বাধীন কাজ তাহা বলিয়া না খাটিলে বড় কিছু হয় না। কোথায় কি অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে এবং তাহা কিরূপে ব্যবহার করিলে সস্তায় কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি হইবে তাহাই অনেক সময়ে ব্যবসায়ীর প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

এখানে আরও একটি কথা বলিতে হইবে। সস্তায় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার প্রায় সকল জিনিসই আমাদের দেশে বর্ত্তমান। এক্ষণে উপযুক্ত ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিব। জাপান প্রায় ৫০ বৎসরে জগতে উন্নতি করিয়াছে। ৪৪ বৎসরে জার্ম্মানী যে উন্নতি করিয়াছে তাহাতে জগত স্তম্ভিত। কাজেই আমরা যে ২৫ বৎসরে উন্নতি করিত পারিব না সে কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইচ্ছা করিলে সবই হইতে

পারে। কর্ম্মে আসক্তি, একান্ত অধ্যবসায় এবং স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি চাই। উন্নতি করিতে কয়দিন লাগে? বিশেষতঃ ভারতের মত সংযমী দেশে উন্নতির পথ প্রশস্ত। সাধুতাই সাফল্যের সহায়। এই ভারতের উচ্চতর হইতে নিম্নস্তরের সকল লোকেই সাধু। আমাদের দেশের মুটে মজুর যথেষ্ট সংযমী পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। অথচ তাহাদের অতি অল্প দিয়াই সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। এ গুণ গুলী আছে বলিয়া আজ ভারতবাসী আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইতেছে। অল্প মূল্য পরিশ্রম (labour) পাইলে অতি সস্তায় কারবার চালান যাইতে পারে সে কথা যাহারা কারবার সম্বন্ধে ক, খ, শিক্ষা করিয়াছেন তাহারাও বলিবেন। আমাদের লোক মিতাচারী কাজেই যথা সময়ে কাজে পাওয়া যাইবে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দেশে নাই। কারবারের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা মঙ্গল।

আমি অনেকবার অনেক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ দেখিয়াছি যে ইউরোপীয় বা আমেরিকার প্রথায় আমাদের দেশকে industrial countryতে পরিণত করিলে দেশে জোর করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনা হইবে, দেশের লোক পাপে মগ্ন হইবে—দেশ উৎসন্ন যাইবে!! কথাগুলার সারবত্ত ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম বলিয়া গুণিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাদের দেশের লোক না খাইতে পাইয়া, প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া দেশের যে কি উন্নতি সাধন হইতেছে বুঝিতে পারি না—আর সত্য কথা বলিতে কি বুঝিতে চাই না। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে মিতাচারী লোক বিরল বলিয়া তাহাদের গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে সত্য কিন্তু শিল্পোন্নতির (industry) সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ বলিতে পারি না। সেটা তাহাদের শিক্ষার দোষ, দেশের পারিপার্শ্বিক উত্তেজনার (surrounding envilonments) দোষ; সেটা কারবারের দোষ দিলে চলিবে না।

অতি অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকই কলে-কাজ করিতে আইসে, তাহার উপর তাহাদের দেশের "সভ্যতা" (?) ইত্যাদি প্রভাব থাকে কাজেই লোকে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। দেশে industry বা শিল্পের উন্নতি করিলে দেশে নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি কলুষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না বা করিতে বাধ্য নহি। এ সম্বন্ধে জাপানের দিকে দেখুন। এক্ষণে জাপানে যথেষ্ট কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু জাপানের লোকের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে বা হইতে চলিতেছে বলা দুষ্কর। লোকের চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে খাইতে পাওয়া চাই। না খাইতে পাইলে লোকের মাথার ঠিক থাকে না তখন দুষ্কর্ম্ম করা স্বতঃ সিদ্ধ; যে খাইতে পাইবে সে দুষ্কর্ম্ম করিবে এ যুক্তির সার কথা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। যেটা বিলাতে ঘটিয়াছে এখানে

সেটা ঘটিবে না; কেন না আমাদের দেশের লোকের স্বভাব সেরূপ নহে। আমাদের দেশের লোকের চরিত্র পাশ্চাত্য দেশের লোকের চরিত্র হইতে একেবারেই ভিন্ন। তাহারা শিক্ষার দোষে যে কুকর্ম্ম করে আমাদের দেশের লোক সে কাজ করিবে না। কাজেই ওসব বাজে কথা বলিয়া লোককে বিরত করা বড় অন্যায়। লোকে খাইতে পাইলে নিশ্চয়ই দুষ্কর্ম্ম ছাড়িবে। স্বদেশী আন্দোলনের পর অনেক বদমাইস লোকের অন্ন জুটিয়াছে; তাহারা বিড়ী তৈয়ারী করিয়া খাইতেছে; কলিকাতার গুণ্ডামি অনেক পরিমাণ কমিয়াছে।

আমাদের দেশে কল কারখানার বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর লেখক আর এক প্রকার অভিনব অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে দেশে কল কারখানা চলিলে চাষ বাসের অত্যন্ত অবনতি হইবে। এ কথা বাস্তবিক অমূলক। কতকগুলি লোক কারখানায় কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইবে সত্য। তবে তাহা বলিয়া সমস্ত দেশবাসী কারখানায় চাকুরি করিবার জন্য লালায়িত হইবে এ কথা কোনও রূপেই অনুমোদন করা যায় না। আমাদের দেশের কত লোক অনাহারে দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেয় সকলেরই বোধ হয় জানা আছে। আবার তাহা ছাড়া খাইতে না পাওয়ায় বা অতি সামান্য খাদ্যে জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত রোগ প্রকোপ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হারায় এবং সে কারণে লক্ষ লক্ষ লোক নানা রোগে মরিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় লোককে খাইতে দিলে তাহাদের কোনরূপ নৈতিক অবনতি হইবে না বলা বাহুল্য।

দেশের industry বা শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে যাহাতে দেশের লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে কাজেই দেশের কৃষির উপর জননায়কদিগকে রীতিমত নজর রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে জার্ম্মনীর একটা উদাহরণ দিই।

" Such a population as 311 per square mile presents a great problem in the feeding of the people. In most European countries where the population is so dense the importation of food products is a necessity * * * * * * Germany has developed her power to feed her people within herself, and has applied the wonderful science of that country to the problem of taking care of the population within her boundries.*

কৃষি ত্যাগ করিয়া কেহ কল কারখানা করিবার কথা বলিবে না। আমাদের দিন দিন যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের কৃষিরও উন্নতি হয়।

---

* Germany as an Industrial Power.

কেননা ভারত হইতে আপাততঃ রপ্তানি করিবার এক মাত্র ভরসা কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য। যতই আমরা এই কৃষির উন্নতি করিব ততই আমাদের লাভ হইবে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে আমাদের অভাব—যন্ত্র, কল ইত্যাদি। আমাদের দেশের লোহার এক মাত্র কল টাটার কারখানায়। ইহাতে যত্তপি পাওয়া যায় ভালই নচেৎ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের নানা প্রকার যন্ত্রাদি আনাইয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

আমাদের দেশের লোককে সংযম, আত্ম মর্য্যাদা ও সততা শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশের লোকের আত্ম মর্য্যাদা ব্যতীত অপর গুণ দুইটি আছে। এ সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আজিকার মত শেষ করা গেল :—

I think every student of industrial problem in Germany will agree in the great advantage which Germany has in her military training. The influence of two things it seems to me is particularly marked in Germany—the German Schoolmaster and the German drill-master * * * * * * * I believe you can see in every man in that country the effect of training in habits of discipline, self-respect and honesty. In that particular Germany has lead over both England and the United States and this probably we will be many years in overcoming, if we ever adopt such a system.*"

* Germany as an Industrial Power.

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ভিদ্ উদ্ভব।

সুশ্যাম সুন্দর বৃক্ষরাজির উদার দান আমরা চিরকাল সচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। একদিনের জন্যও ইহা ভাবি নাই বা তদ্বিষয়ে কোন কল্পনাই আমাদের উচ্চ মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। প্রকৃতির বিরাট ভাণ্ডারে এমন কিছুই নাই, যাহা একটু মাত্র সমস্যা-বিজড়িত নহে। আমরা উদ্ভিদের ক্রমোন্নতিই দেখিয়া আসিতেছি; তাহাদের কার্য্যকলাপ, আহার বিহার এবং জীবন যাপন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণই অন্ধ; আমাদের স্থূল দৃষ্টি এ তত্ত্বের বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত। সেইজন্য যখনই কোন বিজ্ঞানবিৎ দার্শনিক, তাহাদের আশ্চর্য্য জীবন কাহিনী, তাহাদের ক্রমোন্নতির প্রচুর কারণ, মানব গোচরে আনয়ন করেন, তখনই জড় জগতে একটা অলৌকিক অভিনয়ের আয়োজন হইতে থাকে। অভিনব উৎসাহ ঔদাস্তের স্থান অধিকার করে।

এই যে ঘন সন্নিবিত পাদপশ্রেণী মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে, মানবের সন্তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়, এই যে পুষ্পফল সমুন্নত হরিৎবর্ণ পত্রগুচ্ছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনান্তর মানবের মন হরণ করিয়া লয় ইহার লালন পালন একটা জিজ্ঞাস্ত বিষয়। আমাদের দেশের কৃষকবর্গ সে শিক্ষায় বঞ্চিত। সেই জন্য উদ্ভিদ শ্রেণী বর্ত্তমান কালে, জরাজীর্ণ, ফল হীন, সুগন্ধি কুসুম বিবর্জ্জিত। কেমন করিয়া উদ্ভিদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে গার্হস্থ্য জীবনে এ শিক্ষা একটা গৌরবের বিষয়। বর্ত্তমান কালে সকলেই দুঃখ করেন দেশে শস্য প্রচুর জন্মে নাই, খাদ্যাভাব বশতঃ শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে'। সকলের মুখেই এই এক কথা শুনা যায়। প্রকৃত দোষ কাহার? একটু তলাইয়া দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এ দোষ সম্পূর্ণই আমাদের; আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছি ও অদ্যাপি মারিতেছি। একবারও ভাবিনা যে, অতীত কালের স্বল্প আয়াসে সমুৎপন্ন শস্যরাশি মানবের কতদূর উপকার করিত। একবার পশ্চাৎদিকে তাকাইলে, একবার অতীতের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সে কালের আর বর্ত্তমান কালের কি প্রভেদ। তাহারা বুঝিত কিসে উদ্ভিদ সুস্থভাবে জন্মিতে পারে, আমরা বুঝি কিসে সুস্বাদু খাদ্য আমাদের মুখে আসিবে?

এখন জানা আবশ্যক কিসে উদ্ভিদ সরলভাবে জন্মিতে পারে। সকলেই জানেন ও দেখিয়া থাকিবেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ পতিত হইলে, উত্তম বৃক্ষই জন্মিয়া থাকে। এ কথা ধ্রুব সত্য। এখন উপযুক্ত ক্ষেত্র কি? কে কোনপ্রকারে

উদ্ভিদ উত্তমরূপে জন্মিতে পারে না। যে স্থানে বৃক্ষ উত্তম রূপে জন্মে সে স্থানের মৃত্তিকার অনুসন্ধান (analysis) করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নিম্নলিখিত পদার্থগুলি মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত থাকিলে উদ্ভিদ সতেজে জন্মিতে পারে ও মনোমত পুষ্পফলে সুশোভিত হইতে পারে; নতুবা বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

পদার্থ গুলির তালিকা ঃ—

পরিশুদ্ধ জল (distilled water)।
লবনাক্ত ক্ষার (Potassium Nitrate) এক ড্রাম।
সাধারণ লবন (Common Salt or Sodium Chloride) অর্দ্ধ ড্রাম।
ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফেট্ (Calcium Sulphate) অর্দ্ধ ড্রাম।
ম্যাগ নেসিয়াম্ সাল্‌ফেট্ (Magnesium Sulphate) ,,
ক্যাল্‌সিয়াম্ ফস্‌ফেট্ (Calcium Phosphate) ,,
ও কয়েক বিন্দু লৌহ ক্লোরাইড (Ferric Chloride)।

কার্য্যতঃ (experimentally) ইহাও দেখান যায় যে, উপরোক্ত কয়েকটি পদার্থের কোন একটী পদার্থের কিংবা কোন পদার্থের পরিমানে একটু অভাব হইলে, উদ্ভিদ ভাল রকম জন্মিতে পারে না। আরও দেখান যায় যে, যে মৃত্তিকায় কখনও কোন গাছ জন্মে না, সেখানে উপরোল্লিখিত পদার্থ কয়েকটী সেই মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া, সেই চির অনুর্ব্বর স্থানকে উর্ব্বর করা যাইতে পারে। এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমরা শস্য প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। পূর্ব্বে কৃষকগণ মাঝে মাঝে জমিতে সার (manure) দিত। এবং তাহাতে শস্যরাজি সুন্দরভাবে পরিবর্দ্ধিত হইত। সে সব আর কিছুই নহে, উপরোল্লিখিত পদার্থ গুলির একত্র মিলন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্ভিদকে এত যত্ন করার প্রয়োজন কি, এবং এ বিষয়ে আমাদের লাভই বা কি? উদ্ভিদ আমাদের কি উপকার করে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই সহজেই বুঝা যাইবে। বৃক্ষ হইতে মানবের নিত্য আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, এ কথা শত বার স্বীকার্য্য। অসুখ করিলে আমরা ঔষধ খাই; সে ঔষধ কোথা হইতে আসিল? আমরা নিশ্বাসে বিশুদ্ধ oxygen বাষ্প গ্রহণ করি; এ বিশুদ্ধতা কে প্রদান করিল? নিশ্বাস বহির্গত হইলে যে দূষিত বাষ্প (Carbon-dioxide) আমাদের শরীরাভ্যন্তর হইতে বহির্জগতে আসিল, তাহা কোথায় যাইল? এসব কার্য্য বৃক্ষের। উদ্ভিদ না থাকিলে মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিলিত না। এক কথায় বলিতে হইলে ইহা বলা যায় যে, উদ্ভিদ ব্যতীত মানব এক দিবস বাঁচিত না। উত্তমরূপে জন্মিতে হইলে, যেমন উদ্ভিদের উপযুক্ত ক্ষেত্র আবশ্যক সেইমত উপযুক্ত খাদ্যও প্রয়োজনীয়। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য কি? জীবন ধারণ করিতে হইলে

খাদ্যের প্রয়োজন সে খাদ্য, মানবের মত, উদ্ভিদ কোথায় পায় এবং কিরূপেই বা তাহারা ভক্ষণ করে, ইহা একটী জিজ্ঞাস্য বিষয়।

মানবের ন্যায় উদ্ভিদের নানা প্রকার খাদ্য আছে। তাহাদের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতেছে Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Sulphur, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, এবং Iron। জলীয় পদার্থ উদ্ভিদের সম্ভোগের সামগ্রী। কপি, সালগাম প্রভৃতি, অনেক গাছে, জলীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য কেমন করিয়া উদ্ভিদ্ আপন দেহাভ্যন্তরে আনয়ন করে? মানবের হস্ত যেমন আহার বিষয়ে তাহার প্রধান সহায়, উদ্ভিদের শিকড়ও সেইরূপ। হরিৎবর্ণ পত্রের দ্বারাও কথঞ্চিৎ খাদ্য সংগৃহীত হয়। যথাকালে ঐ সকল খাদ্য শিকড়ের দ্বারা উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে গমন করে এবং উদ্ভিদের গঠন ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সেই সকল অবয়বগুলি আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে থাকে। মানবের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ আপন আপন কর্ম্ম করে, উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও সেইমত কার্য্য করিয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, শিকড় মাটীর নীচে থাকিয়া কেমন করিয়া আহার সংগ্রহ করে এবং ঐ আহার্য্য পদার্থগুলিই বা কোথায় থাকে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলির কিয়দংশ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিহিত থাকে এবং প্রকৃতির বিশাল বায়ুমণ্ডল-ভাণ্ডার লুটিয়াও উদ্ভিদ কিয়ৎ পরিমাণে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করে; এ কার্য্য হরিৎ পত্রের দ্বারা সাধিত হয়। যেমন কোন স্বাদহীন খাদ্য দ্রব্য কাপড়ে বাঁধিয়া চিনির সরবতের মধ্যে স্থাপিত করিলে, ক্ষণপরে সেই অমিষ্ট পদার্থ ক্রমে ক্রমে মিষ্টত্ব লাভ করে, সেই প্রকারে শিকড়ের উপরিস্থিত ত্বক্ মৃত্তিকায় জলীয় পদার্থের সংস্রবে থাকিয়া শিকড়ের আভ্যন্তরিক আণুবীক্ষণিক কোষ (cell) মধ্যে সেই জলীয় পদার্থ আনয়ন করে এবং সেই খাদ্য ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের সকল স্থানে পুষ্টিসাধনের জন্য প্রেরিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম অস্‌মোসিস্ (Osmosis)। যতদিন উদ্ভিদ জীবিত থাকে, ততদিন এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে।

এই সকল জলীয় খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদের দেহের মধ্যে কি কি কার্য্য করে তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানবের প্রশ্বাসে বহির্গত দূষিত বাষ্প (Carbon dioxide) এবং বাতাসে উপস্থিত যে Carbon dioxide তাহা উদ্ভিদগণ গ্রহণ করে, এবং মনুষ্যের নিশ্বাসোপযোগী বাষ্প অর্থাৎ Oxygen প্রদান করে। ইহাতে উদ্ভিদের গঠন কার্য্য সাধিত হয়। এখন বিবেচনা করা যাইতে পারে কেমন করিয়া বৃক্ষগণ সেই দূষিত বাষ্প (Carbon dioxide) গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের মধ্যে ইহার কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়? সূর্য্যের আলোক এ বিষয়ে যথেষ্ট

সহায়তা করে। আলোকের বর্ত্তমানে এবং উপযুক্ত উত্তাপ সংগ্রহণে বৃক্ষের সবুজবর্ণ পত্ররাশি বাতাসে সংমিশ্রিত Carbon dioxide গ্রহণ করে। এই বাষ্প (Carbon dioxide) পত্রগুচ্ছ সন্নিবেশিত সূক্ষ্ম ছিদ্রের (Stomata) মধ্য দিয়া আণুবীক্ষণিক কোষের মধ্যগত স্থানে (intercellular space) প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে ইহা তথায় ছড়াইয়া পড়ে। বৃক্ষপত্রগুলি যে পদার্থের বর্ত্তমানে হরিৎবর্ণ হয়, তাহার নাম পত্র-হরিৎ বা Chlorophyll। এই Chlorophyll সূর্য্যের আলোক সংগ্রহ করে এবং অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে ইহার অভ্যন্তরে এক শক্তির সঞ্চার হয়। এই শক্তির সাহায্যে দূষিত বাষ্প অর্থাৎ কারবন ডাইঅক্সাইড্ (Carbon dioxide) পত্রের অভ্যন্তরে Carbon ও Oxygen এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই শক্তির সাহায্যে আবার উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ হইতে Hydrogen নামক বাষ্প ও Oxygen বাষ্প বহির্গত হয়। এই Hydrogen বাষ্প Carbonএর সহিত মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের জীবন ধারণের সহায়তা করে। আর এই মুক্ত Oxygen বাষ্প বহির্জগতে আসে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা ইহা সম্যকপ্রকারে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণীর ন্যায়, উদ্ভিদগণেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে। এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রাণিগণ যেরূপ Oxygen বাষ্প নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করে, উদ্ভিদগণও পত্রগাত্রে ও বৃক্ষকাণ্ডে সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের দ্বারা Carbon dioxide বাষ্প গ্রহণ করে, এবং Oxygen বাষ্প বহির্জগতে মিশাইয়া দেয়। এই সকল বিবরণ কার্য্যতঃ পরীক্ষা দ্বারা (by experiment) দেখান যাইতে পারে। যখন উদ্ভিদগণ Oxygen বাষ্প পরিত্যাগ করে তখন তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে Carbon গ্রহণ করতঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় অধিক Carbon বাহির হইয়া যায় এবং উদ্ভিদগণ জীর্ণ হইতে থাকে। যখন উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে Carbon গ্রহণ করিতে পারে না তখনই শুকাইতে আরম্ভ করে।

নূতন উদ্ভিদ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়, আমরা এখনও সে বিষয়ে কোনও কথাই কহি নাই। উদ্ভিদ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—প্রথমতঃ ফুলহীন উদ্ভিদ (Cryptogams); দ্বিতীয়তঃ ফুলশালী অর্থাৎ পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদ (Phanerogams)। প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদ (Cryptogam) তিন প্রকারে উৎপন্ন হয় :—(১) Sexual (স্ত্রী পুংশক্তির সম্মিলনে) (২) Asexual (বীজ হইতে) (৩) Vegetative (উদ্ভিদের আপন দেহ হইতে)। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদ (Phanerogam) দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়।—(১) by Seed (বীজ হইতে) (২) by Vegetative Reproduction (উদ্ভিদের আপন দেহ হইতে)।

প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদের (Cryptogams) উৎপত্তি বিবরণ আমরা ৯ম সংখ্যার শৈবালের বিষয় বর্ণনা করিবার সময় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদ (Phanerogams) আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সকলই জানেন ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, গাছের ডাল মৃত্তিকায় রাখিয়া দিলে বা "কলম" করিলে সেই শ্রেণীর নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। শিকড় হইতেও সময়ে সময়ে নূতন গাছ জন্মিতে দেখা যায় ইহাকে Vegetative Reproduction কহে।

এক্ষণে বীজ দ্বারা (by seed) কেমন করিয়া উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, তাহা দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর প্রত্যেক বৃক্ষই পুষ্পপ্রসূ। এই সকল পুষ্পের মধ্যে কোনটী স্ত্রী পুষ্প (female flower), কোনটী পুং পুষ্প (male flower) এবং কোন কোনটিতে স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের সম্মিলন হইলেই বীজ (seed) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুং পুষ্পের পরাগ, স্ত্রী পুষ্পের গর্ভকেশর শীর্ষে মিলিত হইলে স্ত্রী পুষ্পের গর্ভে বীজ উৎপাদিত হয়। নানাবিধ উপায়ে এই মিলন সম্পাদিত হইতে পারে। যখন মৃদুমন্দ ভাবে বাতাস বহিতে থাকে তখন ফুল ঈষৎ হেলিতে দুলিতে কখন কখন পরস্পরে মিলিত হয়। অধিকাংশ স্থলে মধুলোভে আকৃষ্ট মক্ষিকার দ্বারা ইহাদের মিলন ঘটিয়া বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ (seed) বাতাসের সহায়তায় আপনার আধার হইতে বহির্গত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হয় এবং তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাহার খাদ্যের উপর এবং আলোক ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে।

বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

খাদ্য সংরক্ষণ।

মানুষ সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই রক্ষিত খাদ্যের (preserved food) প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া আসিতেছে। নিজ নিজ প্রয়োজন বশতঃ তাহারা ঋতু বিশেষের কোনও কোনও দ্রব্য ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য পচন বা অন্য কোনও উপায়ে নষ্ট না হওয়ার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মাছ শুকাইয়া বা নুন মাখাইয়া রাখা, তেলের ভিতর করিয়া খাদ্য দ্রব্য বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ বহুদিন হইতে প্রচলিত। নিজ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিতে হইতেছে। একটি আম স্বাভাবিক নিয়মে পাকে, পরে আরও কিছুদিন থাকিলে ক্রমে পচিতে থাকে। মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে সেই আমকে বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত উহার স্বাভাবিক স্বাদ ও সরসতা রাখিতে পারে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের উপকারিতা সম্বন্ধে এক্ষণে কেহই সন্দিহান নহেন।

এখন দেখা যাক খাদ্যদ্রব্য কি কি কারণে নষ্ট হইতে পারে; ঐ সকল কারণ দূর করিতে পারিলেই খাদ্যদ্রব্য আমাদের ইচ্ছামত স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যাইতে পারে।

নিজ হইতে খুব কম জিনিষই পচিয়া থাকে। প্রায়ই বাতাস হইতে জীবাণু আসিয়া খাদ্য দ্রব্যের পচন বা অন্য কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটায়; এবং ইহাতেই খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ ও গুণ দূর হয়। অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে, অথবা ঐ খাদ্যের ভিতর জন্মিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা নষ্ট না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কাজে কাজেই খাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে আমাদিগকে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১ম) যাহাতে জীবাণু খাদ্য দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে না পারে। (২য়) যাহাতে খাদ্যের ভিতর ঐ প্রকার অনিষ্টকারী জীবাণু জন্মিতে না পারে এবং জীবাণু থাকিলে তাহাদিগকে যাহাতে বিনষ্ট করা হয়। এখন দেখা যাক কি কি উপায় দ্বারা খাদ্য দ্রব্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

উত্তাপ প্রয়োগে রক্ষা—ফুটন্ত জলে প্রায় সকল প্রকার জীবাণুই মরিয়া যায় কিন্তু কতকগুলি আবার প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। প্রায় সকল প্রকার পূর্ণাবয়ব জীবাণুই ৭৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত জলে মরিয়া যায়। ক্ষারগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য অপেক্ষা অম্লগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যে জীবাণু শীঘ্র ধ্বংস পায়। কাজেই অম্লাস্বাদ ফলরক্ষণ

অপেক্ষাকৃত সহজ। সভ্য জগতে খাদ্য দ্রব্য জ্বাল দিয়া সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়াই প্রথা —ইহাতে উক্ত দ্রব্যের ভিতর যে সকল জীবাণু থাকে তাহারা মরিয়া যায়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর এক দল জীবাণু বাতাস বা অন্য কোনও প্রকার বাহকের সাহায্যে খাদ্যের সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ উহা বেশ ভাল থাকে। সুসিদ্ধ খাদ্য দ্রব্য প্রায় ৮।৯ ঘণ্টা অন্তর আগুনের তাপে ফুটাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত রাখা যায়। খাদ্য দ্রব্যের ভিতর যে সমস্ত জীবাণু থাকে উত্তমরূপে সিদ্ধ হওয়ার পর তাহারা মরিয়া যায়; কিন্তু তৎপর অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য উত্তমরূপে উহা ঢাকিয়া রাখা উচিত। কিন্তু commercial scaleএ ব্যবসায়ের জন্য কি উপায়ে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা যায়?

এই ব্যাপারে সাধারণতঃ টিনের কৌটায় খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। প্রায় সমুদায় জান্তব ও উদ্ভিজ্জ্য পদার্থের অন্তঃস্থিত অম্লরসে টিন আক্রান্ত হইয়া থাকে। সৌভাগ্য-বশতঃ উহাদের সংযোগে কোনও প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। সংরক্ষণীয় দ্রব্য প্রথমতঃ টিনের কৌটার ভিতর উত্তমরূপে ভরিয়া কৌটার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মুখ বন্ধ করিবার জন্য রাং দ্বারা solder করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কৌটার মুখের উপর বাষ্প নির্গমের জন্য একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়। তৎপর উহা-দিগকে জীবাণু শূন্য (sterilisation) করিবার জন্য কৌটাগুলিকে Pressure chamberএ লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় ১২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত জলীয় বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। এই সকল কৌটার ভিতরস্থ সমস্ত বাতাস বাহির হইয়া যায় এবং রক্ষিত খাদ্যের বাষ্প দ্বারা কৌটা পূর্ণ হয় তখন কিছু রাং দিয়া কৌটার ছোট ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এ প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা কৌটার ভিতর বাতাসের লেশমাত্র থাকে না; কাজেই পচন প্রভৃতি পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব। ১৮১০ খৃঃ Francis Appert নামক একজন ফরাসী উক্তরূপ সংরক্ষণ প্রণালী প্রচলনের জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর পারিতোষিক পান। আজ কাল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই এই প্রথা প্রচলিত।

অধ্যাপক Tomlinson বলেন, "As a precautionary measure, however, the tins are placed in a testing house, which is heated to about 100°F. Should putrifaction take place in consequence of a minute portion of oxygen left in the case and not combined with animal and vegetable matter, the generated gases will burst the canisters, those however which withstand this test will preserve the provisions for many years; for as each vessel is hermetically sealed and all access of air prevented, it may be sent to any climate without any fear of putrifaction. The

delicate food of one country can thus be eaten in its original perfection in a distant region many months or even years after its preparation. Of a quantity of foodstuff thus preserved taken by Dr. Nash to India not one canister was spoiled and one which he brought back contained beef in the highest state of perfection and preservation after having been carried upwards of 35,000 miles in the warmest climates."

এই প্রকার সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; আমরা নিম্নে একটির চিত্র ও কার্য্যবিবরণী দিলাম—
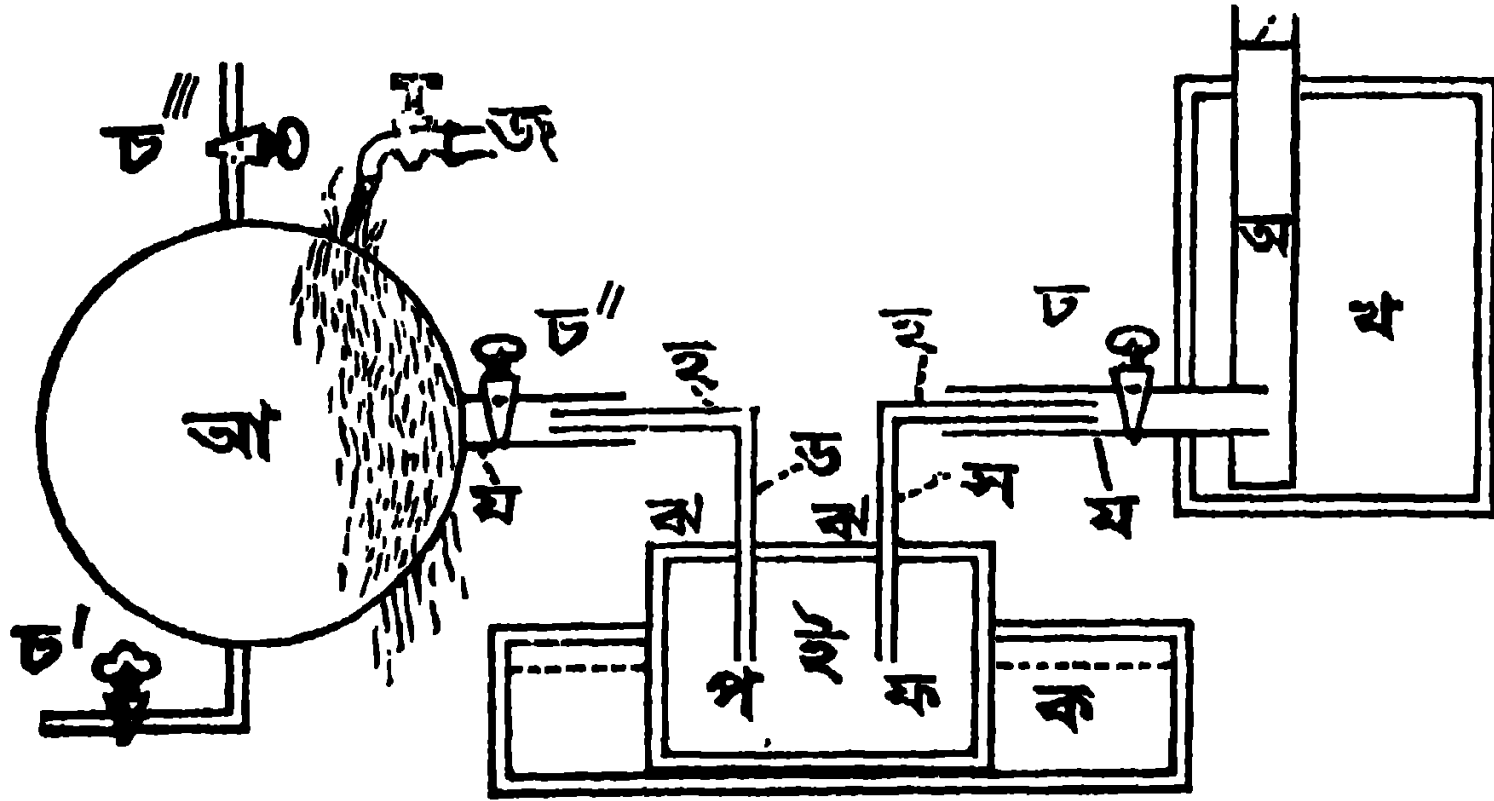
(অ) একটি পাত্র ইহার উপরের মুখ খোলা এবং (ঙ) দাগ পর্য্যন্ত দ্রব gelatineএ পূর্ণ। এই পাত্রটির নিম্ন হইতে (য) নামক একটি নল বাহির হইয়াছে এবং ইহার সহিত একটি পেঁচ stopcock (চ) দৃঢ়রূপে যুক্ত আছে। (আ) একটি গোলাকার ধাতব পাত্র। প্রথমতঃ (চ') এবং (চ''') নামক যে দুইটি পেঁচযুক্ত নল ইহার সহিত যুক্ত আছে তাহাদের পেঁচ (stopcock) খুলিতে হইবে; পরে (চ') নল দ্বারা বাষ্প (আ) পাত্রের ভিতর দিতে হইবে। (আ)র ভিতরস্থ সমস্ত বাতাস ক্রমে (চ''') নল দ্বারা বাহির হইয়া যাইবে। তৎপর উক্ত নল দুটির পেঁচ (stopcock) বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। (আ)র ভিতর এখন বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নাই। (জ) কল হইতে জলধারা (আ) পাত্রের উপর পড়িলে ঠাণ্ডার প্রভাবে বাষ্প জলে পরিণত হইবে এবং (আ) বায়ুশূন্য (vacuum) হইবে। সংরক্ষণীয় খাদ্যদ্রব্য (ই) নামক পাত্রে রাখা হয়। ইহা টিনের তৈয়ারী এবং দেখিতে চোঙ্গার ন্যায়। ইহার মুখ বেশ করিয়া রাং দিয়া ঝালা (solder) হইয়াছে কিন্তু (ড) এবং (স) নামক দুইটি ধাতবীয় নল প্রবেশের জন্য দুইটি ছিদ্র আছে। (ড) এবং (স) নল (ই) কৌটার ভিতর (প) এবং

(ক) পর্য্যন্ত এমন ভাবে প্রবিষ্ট আছে যে উহার ভিতর দিয়া কোনও প্রকারে বাতাস প্রবেশ না করিতে পারে। এই দুইটি নলের অপর দুই মুখ (হ, হ) এবং (য,য) এ শেষ হইয়াছে। (ই) কৌটাটি তৎপর ১২০ ডিগ্রি উত্তপ্ত জলপূর্ণ একটি পাত্রের (ক) মধ্যে রাখা হয়। (চ″) নামক পেঁচ (stopcock) খুলিবামাত্র (ই)র অন্তঃস্থ সমস্ত বাতাস (আ)র ভিতর চলিয়া যায়। টিনের ভিতর বায়ুবীয় চাপ না থাকায় উহার ভিতরস্থ খাদ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য ১২০ ডিগ্রি উত্তাপই যথেষ্ট। এইরূপ উপায়ে একটি মুরগী প্রায় ১৫ মিনিটের ভিতর রান্না হইয়া যায়। তৎপর (চ) নামক পেঁচ (stopcock) খুলিলে (অ) পাত্রের ভিতর যে gelatin দ্রব অবস্থায় আছে তাহা (য) এবং (স) নল বাহিয়া (ই) পাত্রে আসিয়া পড়ে। Gelatin কে দ্রব রাখিবার নিমিত্ত (অ) পাত্রকে (খ) নামক গরম জলের পাত্রে রাখা হইয়াছে। তৎপর (ই) কৌটা হইতে (ড) এবং (স) নামক নল তুলিয়া ফেলিয়া (ঝ,ঝ) স্থানে উত্তমরূপে রাং দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

ফল, সবজী প্রভৃতি সংরক্ষণও য়্যাপার্টের (Appert) প্রথায় হইতে পারে। ইহাদিগকে পূর্ব্বে সিদ্ধ করিবার কোনও দরকার নাই। একটি বড় মুখওয়ালা কাচের বোতল লইয়া তাহার ভিতরে ফল রাখিতে হয়। পরে উত্তমরূপে উহার ছিপি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঐ ছিপির স্থানে পুনরায় ময়দা ও চুণ মিশাইয়া লেপিয়া দিতে হয়। তৎপরে একটি জলপূর্ণ পাত্রে বোতলটি রাখিয়া জল গরম করিতে হইবে। জল ফুটিলে উহাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। ফল, সবজী প্রভৃতি এইরূপে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে সংরক্ষণ—সাধারণতঃ লবণ ও তাহার সহিত কাঠের ধুঁয়া দ্বারা দ্রব্য সংরক্ষণ অতি প্রাচীনকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে। কাষ্ঠ ধূমের ভিতর সামান্য ক্রিওজোট (Creosote) ও ফ্যারম্যাল্‌ডিহাইড (Formaldehyde) থাকাতেই উহার সংরক্ষণ শক্তি রহিয়াছে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে লবণ দ্বারা সংরক্ষণ খুব কম খরচে হইতে পারে তথাপি উক্ত উপায় দ্বারা সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ প্রীতিকর ও সুস্বাদু হয় না, লবণের তীব্র স্বাদই ইহার প্রধান কারণ। লবণ খাদ্য দ্রব্য হইতে জল শোষণ করিয়া তাহাকে পচন হইতে রক্ষা করে। চিনিও এই কারণে রক্ষণশীল। গুড়ের ভিতরে রাখিয়া মাংস রক্ষা য়ুরোপে বেশ প্রচলিত আছে। চিনির রসে অনেক ফল রক্ষিত হইয়া থাকে। চিনির রস বেশী পাতলা হইলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় আবার বেশী গাঢ় হইলে চিনি শীঘ্র দানাতে পরিণত হয়। খুব পরিষ্কার চিনি লইয়া, ২ ভাগ চিনির সহিত ১ ভাগ চিনির রস করিয়া বেশ পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ফল রক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে! এই প্রকার চিনির রস শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং শীঘ্র দানাও বাঁধে না। আজকাল ইংলণ্ডের

অনেক স্থানে সোহাগা (Borax) বা Boric acid ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে formaldehyde vapour দ্বারা মাংস রক্ষণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত যে formaldehyde অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ এবং পাকস্থলীর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুরা, vineger, এবং অন্যান্য অম্ল অনেক সময় ফল রক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আম, কমলালেবু, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের marmalade, jam, jelly প্রায়ই vineger ও চিনির রসের সাহায্য দ্বারা প্রস্তুত হয়।

শুকাইয়া সংরক্ষণ—যে সকল খাদ্যের ভিতর জলের ভাগ কম, প্রায় শতকরা ৮ ভাগ, তাহারা খুব কমই নষ্ট হয়। রৌদ্রে শুকাইয়া সংরক্ষণ প্রথা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত—আম শুকাইয়া আমসত্ত, আমসী, আঙ্গুর শুকাইয়া কিসমিস, মনেক্কা, আদা শুকাইয়া শুঁট ইত্যাদি করা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত। আলু, শালগম, কপি প্রভৃতিও শুকাইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত রাখা যায়। আজকাল M. Masson কর্ত্তৃক এক প্রকার সংরক্ষণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আলু, কপি, আপেল বা অন্য কোনও প্রকার সবজি প্রথমতঃ উনানের উপর এরূপ ভাবে শুকাইতে হইবে যে, উহাদের ভিতর হইতে শতকরা ৭।৮ ভাগ জল শুকাইয়া যায়। এইরূপে শুকাইয়া ইহাদিগকে অবশেষে চাপ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ষণ কার্য্য শেষ করিতে হয়। এইরূপে সংরক্ষিত হইলে ইহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

অত্যধিক ঠাণ্ডা প্রয়োগে সংরক্ষণ—প্রায় সমস্ত জীবাণুই জলের বরফ হইবার তাপমাত্রায় (freezing temperature) নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে পারে না, এমন কি অনেকগুলি মরিয়াও যায়। কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে, অন্য কোনও প্রকার দ্রব্যের সাহায্য না লইয়া [illegible]ত্র হিম করিয়া রাখিলে দ্রব্যাদি বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ষিত থাকে। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে এই প্রথার খুব প্রচলন আছে। য়ুরোপে বড় বড় জাহাজে খাদ্য দ্রব্য রক্ষণের জন্য শৈত্যাগার (cold chamber) আছে। ঐ ঘরের ভিতর খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হয় এবং আবশ্যক মত ব্যবহারের জন্য বাহির করা হয়। আমাদের দেশেও বিশেষতঃ কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় সহরে বরফের ভিতর রাখিয়া মাছ বহুদূর হইতে আনা হয় এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত রাখাও যায়। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সদ্যঃ ধৃত মৎস্যের স্বাদ বরফ রক্ষিত মৎস্যের স্বাদ অপেক্ষা অনেক মধুর। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রকার হিম করিয়া রক্ষিত মাংস আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আইসে। মাংস সংরক্ষণের জন্য ১০ ডিগ্রি মাত্র উত্তাপ দরকার। ফল, শাক, সবজি প্রায় ২৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতে হয়।

যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য রক্ষিত হয়, আমরা তাহা সমস্তই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা কেবল theoretical knowledge। কার্য্যে পরিণত করিবার সময় নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন আসিয়া আমাদের কৃতকার্য্যতার পথে দাঁড়াইবে। কখনও বা খাদ্য দ্রব্য জাল দিতে দিতে একটু বেশী দিয়া তাহাকে অখাদ্যে পরিণত করিবে, কখনও বা চিনির রস অপেক্ষাকৃত পাতলা বা ঘন হইয়া পড়িবে ইত্যাদি নিত্য নূতন বিঘ্ন দেখা যাইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে একদিনে কোনও ভাল কাজ হইয়া উঠে না, এবং অকৃতকার্য্যতা হইলেই আমরা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকি। অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম-পরায়ণতা থাকিলে কৃতকার্য্যতা নিশ্চয়ই আমাদের করতলগত হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সূর্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

গত সংখ্যায় আমরা সূর্য্যের আলোকচক্রের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আলোকচক্র সম্বন্ধীয় একটি বিষয় সুবিশেষরূপে বর্ণনা করা হয় নাই। সূর্য্যের আলোকচক্রের উপর মাঝে মাঝে সৌর-কলঙ্ক (Sun-Spots) দৃষ্ট হয়। ইহারা সময় সময় এতাদৃশ বৃহদাকার হইয়া থাকে যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র একখণ্ড "ভূষা-পড়ান" কাচের দ্বারাও ইহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই "ভূষা-পড়ান" কাচের সহায়তা লইবার কারণ এই যে, সূর্য্য এতাদৃশ দীপ্তিশালী যে, তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ত করা যায়ই না উপরন্তু অতিমাত্র অত্যুজ্জল সূর্য্যের আলোকচক্র কৃষ্ণকান্তি সৌর-কলঙ্ক গুলিকে সম্যক প্রকারে প্রকটিত হইতে দেয় না। "ভূষাপড়ান" কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া দেখিলে, সূর্য্যালোকের প্রাখর্য্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়; সেই কারণে, সৌর-কলঙ্কগুলি অতি সহজেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর ইহারা এতই ক্ষুদ্রাকার হয় যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগের দর্শন অসম্ভব। নির্ম্মল শ্বেতাভ আলোকচক্রের উপরিস্থিত এই যে কৃষ্ণবর্ণের বিন্দুগুলি, ইহারা কি, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের ব্যগ্রতা দূর করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে, যেহেতু আজ পর্য্যন্ত উহারা যে কি বা কিরূপে উহারা সৃষ্ট হয়, তাহার সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই।

সৌর-কলঙ্ক।
(Sun-Spots.)

সুতরাং নানা বুধবর্গের নানা প্রকার মতামত কহিতে হইলে কিঞ্চিৎ সময় প্রয়োজন এবং সেই কারণেই আলোকচক্র সম্বন্ধে আন্দোলন কালে এই বিষয় সে স্থানে বিশেষরূপে আলোচিত না হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যদি অধিক সময় অতিবাহিত হয় তাহা হইলে ধৈর্য্যশীল পাঠক প্রবন্ধের গুরুত্ব, ভাষার সংকীর্ণতা এবং লেখকের অপরিসর লেখনীর কথা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাদিগকে সূর্য্যের আলোকচক্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের বিন্দুর মত দেখায়, কিন্তু অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণের দ্বারা দেখিলে ইহাদিগকে বৃহত্তর দেখায় এবং আরও দেখা যায় যে, ইহাদিগের মধ্যদেশ এবং প্রান্তদেশে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। ইহাদের প্রান্তদেশ অপেক্ষা মধ্যদেশ অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। সৌর-কলঙ্কের অধিকতর কৃষ্ণকান্তি সমন্বিত মধ্যদেশকে অম্ব্রা (Umbra) এবং প্রান্তদেশকে পেনাম্ব্রা (Penumbra) বলে। সাধারণতঃ পেনাম্ব্রাকে ধূসরবর্ণের দেখায় কিন্তু উৎকৃষ্ট শক্তিশালী দূরবীক্ষণের দ্বারা শান্ত বায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া দেখিলে এই ধূসরবর্ণের প্রান্তদেশটিকে Striated অর্থাৎ রাশি রাশি রেখা সমাকুল দেখায়। একটি "খড়ের" ঘরের ছাদ ভিতর হইতে যেরূপ দেখায় সৌর-কলঙ্কের ধূসরবর্ণের প্রান্তদেশটিকেও অবিকল সেইরূপ দেখায়।

ইহারা কিরূপ?

সৌর-কলঙ্কের নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রকার আকার নাই, এবং আয়তনেও সকলে সমান হয় না। কেহ অতি বৃহৎ কেহ বা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং কেহ বা মাঝারি। কখনও কখন দুই চারিটি ক্ষুদ্রাকার কলঙ্ক মিলিত হইয়া একটি বৃহদাকার কলঙ্ক নির্ম্মিত হয়। আবার কখনও কখন একটি বৃহৎ কলঙ্ক হইতে দুই চারিটি ক্ষুদ্রাকার কলঙ্ক সৃষ্ট হইয়া থাকে। সৌর-কলঙ্কের আকার বা আয়তনের যেরূপ কিছু একটা স্থিরতা নাই সেইরূপ সূর্য্যের আলোকচক্রের উপর ইহাদিগের অবস্থিতিরও কোনওরূপ স্থিরতা নাই। কোনওটি হয়ত সূর্য্যের আলোক-চক্রের উপর আবির্ভূত হইয়া কিছু দিবস মাত্র অবস্থান করে, আবার কোনওটি হয় ত কয়েক মাসাবধি অবস্থান করিয়াও বিলীন হয় না।

সূর্য্যের জ্যোতিশালী আলোক-চক্রের উপর এই যে কৃষ্ণকান্তি বিন্দুগুলি মাঝে মাঝে কলঙ্ক স্বরূপ দৃষ্ট হয়, ইহারা কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য অনেকেই বহুকাল হইতে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। বহু পূর্ব্বে এই সৌর-কলঙ্ক সম্বন্ধে একটি ধারণা এই ছিল যে, "গুড়" জাল দিলে যেমন গুড়ের উপরিভাগে "গাদি" ভাসে ইহাও সেই প্রকার কোন এক বস্তু। অত্যধিক উষ্ণতাপ্রযুক্ত সূর্য্যের উপরিদেশ সর্ব্বদা আলোড়িত হইতেছে;

ইহাদিগের সম্বন্ধে নানা মত।

এই কলঙ্কগুলি "গুড়ের গাদির" মত মাঝে মাঝে সূর্যের আলোড়িত বক্ষে ভাসমান হইয়া উঠে। কিন্তু প্রায় দেড়শত বৎসর হইল এই ভ্রমসূচক ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। উইলসন্ (Wilson) নামক স্কটল্যাণ্ড দেশীয় একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা সর্ব্বপ্রথম দেখেন যে, এই সৌর কলঙ্কগুলি বাস্তবিক গহ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধূসরবর্ণের প্রান্তভাগটি এই গহ্বরের পার্শ্বদেশ এবং মধ্যভাগটি এই বিরাট গহ্বরের তলদেশ। গহ্বরের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণের দেখায় তাহার কারণ এই যে, এই গহ্বরের মধ্যদেশ অদৃশ্য। সৌরকলঙ্কগুলি যে গহ্বর তাহার অনেকগুলি সন্তোষজনক প্রমান উইল্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও একটি কলঙ্ক যতই সূর্য্যের আলোক-চক্রের প্রান্তদেশে যাইতে থাকে ততই তাহার আলোক-চক্রের মধ্যবিন্দুর সন্নিকটস্থ পেনাম্ব্রা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, ইহা তখন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর কোনে (angle) দৃষ্ট হয়। ইহার ব্যাখ্যা অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যয়োৎপাদক। যদি একটি "খুরি" বা "সরা"র মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহা ঠিক চক্ষুর সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে সেই বৃত্তাকার চিহ্ন ঠিক মধ্যস্থলে এবং চিহ্ন হইতে সরাটির প্রান্তভাগ সমান দূরে অবস্থিত দেখায়। কিন্তু যদি সরাটিকে কিছু বাঁকাইয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যদেশের চিহ্ন হইতে তাহার চক্ষের সন্নিকটবর্ত্তী প্রান্তদেশের দূরতা কিছু অল্প দেখায়; এইরূপে যতই সরাটিকে বাঁকাইয়া ধরা যায় ততই এই দূরতা কমিতে থাকে; অবশেষে চক্ষের সন্নিকটবর্ত্তী প্রান্তভাগের দ্বারা সরার মধ্যস্থলের চিহ্নটি একেবারে আচ্ছাদিত হয়। ইহা কেবল মাত্র গহ্বর-বিশিষ্ট আধারেরই সম্ভব। সমতল স্থানে বা উচ্চ স্থানে এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সুতরাং সূর্য্যের এই কলঙ্কগুলি যে বিরাট গহ্বর তাহার এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইহা অপেক্ষা আরও একটি সন্তোষজনক প্রমান আছে যে, যখন একটি সৌর-কলঙ্ক আলোক-চক্রের ঠিক প্রান্তভাগে আইসে তখন আলোক-চক্রের সেই স্থানটি অল্পবিস্তর কর্ত্তিত দেখায় অর্থাৎ আলোক-চক্রের বৃত্তাকার এই স্থানে নষ্ট হইয়া যায়। উইল্‌সন্ সাহেবের এই নূতন আবিস্কার পরে হারশেল্ নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা কর্ত্তৃক সুবিশেষ রূপে আলোচিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; সেইজন্য তাঁহারই আবিস্কৃত বলিয়া এই নূতন তথ্য অভিহিত হইয়া থাকে।

এই খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের অভিমতে সূর্য্যের অন্তঃস্থল শীতল ও কৃষ্ণবর্ণের একটি বস্তু বিশেষ; এই শীতল ও কৃষ্ণবর্ণের অন্তঃস্থলের উপরিভাগ* দুইটি স্তরের দুই প্রকার মেঘ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত। বহির্দ্দেশের মেঘমালা সাতিশয় উজ্জ্বল ও উষ্ণ ইহাই সূর্য্যের আলোক-চক্র। তন্নিম্নে যে মেঘমালা আছে তাহা উপরিভাগের মেঘমালার ন্যায় তত উজ্জ্বল ও জ্যোতিশালী নহে তবে কতকটা উজ্জ্বল ও জ্যোতিশালী

বটে। ইহারাই সৌর-কলঙ্কের পেনাম্ব্রা (Penumbra) নামে অভিহিত। সৌর-কলঙ্কের যাহাকে অম্ব্রা কহে তাহা আর কিছুই নহে, সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশের এই দুই প্রকার মেঘমণ্ডলের ছিদ্রের মধ্য দিয়া দৃষ্ট সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণের অন্তঃস্থল মাত্র। ইঁহারা বলেন যে, অত্যন্ত উষ্ণতাবশতঃ মাঝে মাঝে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উপরিভাগের দুই স্তর মেঘমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং আভ্যন্তরিক কৃষ্ণবর্ণ, আবরণ মুক্ত হইয়া দৃষ্টি পথে আইসে। ভূমণ্ডলবাসী ভূমণ্ডলে বসিয়া মার্ত্তণ্ডের এই তাণ্ডব কাণ্ড সূর্য্যের কলঙ্ক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। উইল্‌সন্ সাহেবের পূর্ব্বে ল্যাল্যাণ্ড (Lalande) নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ও গণিতশাস্ত্রবিৎ এই সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে এই সৌর-কলঙ্কগুলি জন্মিবার প্রধান কারণ এই যে, সূর্য্যের-মধ্যজাত উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি মধ্যে মধ্যে উপরিভাগস্থিত জ্যোতিশালী মেঘমালাকে সরাইয়া দিয়া সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশে জাগিয়া উঠে। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি কৃষ্ণকায় সেইজন্য আলোক-চক্রের মধ্যগত এইগুলি বেশ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। শৃঙ্গের শিরদেশ কৃষ্ণবর্ণ—ইহাই কলঙ্কের অম্ব্রা, এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ মেঘমালার প্রতিফলিত আলোক প্রাপ্ত হয় বলিয়া তত কৃষ্ণবর্ণ না দেখাইয়া ধূসর বর্ণের দেখায় —ইহাই কলঙ্কের পেনাম্ব্রা।

কিন্তু উইল্‌সন্ ও হার্সেল্ সাহেবের তথ্য প্রচারাবশেষে ল্যাল্যাণ্ড সাহেবের তথ্য একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া যাইল। উইল্‌সন্ সাহেব প্রমান করিয়াছিলেন যে, এই কলঙ্কগুলা গহ্বর ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

সৌর-কলঙ্ক সম্বন্ধে অনেকে আজকাল এই ভাবিয়া থাকেন যে, সূর্য্যের উপরিদেশে উল্কাপিণ্ড রাশি পতিত হইয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু এ ধারণাও নিতান্ত অভ্রান্ত নহে, যেহেতু ইহা দেখা গিয়াছে যে, সৌর-কলঙ্কগুলি সূর্য্যের উপরিদেশে সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ইহাদিগকে দৃষ্ট হয়; অন্য অন্য স্থানে তাহাদিগের দেখা যায় না। ইহার কি কারণ হইতে পারে? উল্কাপিণ্ডরাশি সূর্য্য পৃষ্ঠে পতিত হইয়া সৌর-কলঙ্কের সৃষ্টি করে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা সূর্য্যের কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট অংশে পতিত হইবে কেন? সূর্য্য চতুর্দ্দিকে সমানভাবে আকর্ষণ করে; তাহা হইলে উল্কাপিণ্ডগুলি সূর্য্যপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকেই পতিত হইবে।

১৯১৩ খৃঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বরে রাজকীয় জ্যোতিশাস্ত্র সংক্রান্ত সভার (Royal Astronomical Society) সম্মিলনীতে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার স্যাভিলিয়ান্ (Savilian) অধ্যাপক * টারনার সাহেব সৌর-কলঙ্কের এক অভিনব ব্যাখ্যা

* কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে "পালিত অধ্যাপক" যে অর্থে অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে "স্যাভিলিয়ান অধ্যাপক" ও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার ব্যাখ্যা শুনিলেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে টারনার সাহেব জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বহুতর গবেষণা ও আলোচনা করতঃ এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কথিত বাক্য একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না, এবং তজ্জন্য অপরাপর জ্যোতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর্গকেও তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শ্রবণান্তর বিস্মিত হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

টারনার সাহেব যেরূপে তাঁহার এই নূতন ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তার জানা আছে যে, সূর্য্যের কলঙ্কগুলি কোন নিয়মিত সময় ব্যবধানে সূর্য্যপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ইহারা যে যখন তখন সূর্য্যের পৃষ্ঠ-দেশে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। বহুদিবসাবধি নিরীক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তাবৃন্দ স্থির করিয়া-ছিলেন যে একাদশ বৎসর অন্তর সৌর-কলঙ্কগুলি প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যপৃষ্ঠে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধ্যাপক শুষ্টার (Schuster) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন যে, কতক-গুলি কলঙ্ক আবার পাঁচ, ছয় বৎসর অন্তরও সূর্য্যপৃষ্ঠে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিষয় লইয়া টারনার সাহেব যখন পুনরালোচনা করিতেছিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে ১৭৬৬, ১৮০০, ১৮৩৩, ১৮৬৬, ও ১৯০০ খৃঃ অব্দে প্রচুর পরিমাণে সৌর-কলঙ্ক দৃষ্ট হইবার কথা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় নাই, উপরন্তু সেই সকল বৎসরে লিওনাইডিস্ নামক উল্কারাশি (Meteors) প্রভূত সংখ্যায় ধরণীপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। এই দেখিয়া টারনার সাহেব স্থির করিলেন যে, লিওনাইডিস্ নামক উল্কারাশির সহিত সৌর-কলঙ্কের বোধ হয় কোনওরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

কিন্তু লিওনাইডিস্ কখন সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী হয় না যাহাতে তাহারা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা সূর্য্যপৃষ্ঠে আকৃষ্ট হইতে পারে ; সুতরাং ইহার মধ্যে অপর এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা এই উল্কারাশি পথ-ভ্রষ্ট ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে শক্তি কোথা হইতে উপজিত হয় ? লিওনাইডিস্ যখন কোনও প্রকারে সূর্য্যের এত নিকট-বর্ত্তী হইতে পারে না যাহাতে তাহা হইতে চ্যুত হইয়া উল্কাপিণ্ড সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে তখন এ সকল উল্কাপিণ্ড—যাহা সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হইয়া সৌর-কলঙ্কের সৃষ্টি করে বলিয়া টারনার সাহেব অনুমান করেন—কোথা হইতে আইসে? টারনার সাহেব স্থির করিলেন যে লিওনাইডিস্ হইতে উল্কাপিণ্ডগুলি একেবারে (directly) আসিয়া সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হয় না ; তিনি বলেন যে আর কতকগুলি উল্কাপুঞ্জ আছে যাহারা সূর্য্যের নিকট-বর্ত্তী হইলে প্রায় সূর্য্যের অঙ্গ স্পর্শ করে আবার ওদিকে লিওনাইডিসের কক্ষের (Orbit) এত সন্নিকটবর্ত্তী হয় যে, লিওনাইডিসের উল্কাপুঞ্জ যদি ঘটনা ক্রমে সেই স্থানে সেই সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে এই উল্কাপুঞ্জ লিওনাই-

ডিসের উল্কাপুঞ্জের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিশৃঙ্খল হইতে পারে। সুতরাং এই সহকারী উল্কাপুঞ্জের কক্ষ একদিকে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ ও অপর দিকে লিওনাইডিসের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া আছে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে এই সহকারী উল্কাপুঞ্জের কয়েকটি উল্কাপিণ্ড, সূর্য্যের ভয়ঙ্কর আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট সুতরাং নিজ কক্ষচ্যুত হইয়া সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হইয়া সৌর-কলঙ্কের সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এই যে সহকারী উল্কাপুঞ্জের কথা বলা হইতেছে, ইহারা কোথা হইতে আসিল ?

টারনার সাহেব বলেন যে বহু দিন পুর্ব্বে যখন লিওনাইডিস্ ও শনিগ্রহ (Saturn) একত্রিত হইয়াছিল তখনই হয় ত এই সহকারী উল্কারাশির সৃষ্টি হইয়াছিল। পৃথিবী যেমন উল্কারাশ আকর্ষণী করে সেইরূপ নিজ আকর্ষণীশক্তির বলে শনিগ্রহও নিজ বক্ষদেশে লিওনাইডিসের কতকগুলি উল্কাপিণ্ডকে ধারণ করিয়া ছিল ; আবার কতকগুলি উল্কাপিণ্ড ভীম বেগে ধাবিত হইয়া শনির চক্রের মূলীভূত অংশগুলিতে (component parts) লাগিয়া এরূপ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছিল যদ্দ্বারা কতকগুলি উল্কাপিণ্ড এবং শনির চক্রের কতকগুলি মূলীভূত অংশ "ছিটকাইয়া" শনিগ্রহের আকর্ষণীশক্তির বহির্ভূত হইয়াছিল এবং সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অপর এক দল উল্কাপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কথা পাঠকবর্গের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল কি না বুঝিতে পারিলাম না। এই উপপত্তি যাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষরূপে বোধগম্য হয় সেইজন্য পুনরায় চেষ্টা করিব।

সৌরজগতে সূর্য্যই সর্ব্বপেক্ষা বৃহৎ ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং অপরাপর গ্রহাদির অপেক্ষা সৌর জগতে সূর্য্যেরই আকর্ষণী শক্তি অধিক ইহা বুঝিতে কোনওরূপ গোলোযোগ হইবে না। জগতে সমস্ত বস্তু পরস্পরের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা এরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ বা কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অপর পথে গমন করে না। প্রত্যেক তারকা, প্রত্যেক নক্ষত্র, প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড এই জগতে নিজ নিজ পথেই পরিভ্রমন করিয়া থাকে। ভগবানের বন্দবস্ত, সুতরাং তাহা বিশৃঙ্খল হইবার নহে ; তাহা যদি হইত তাহা হইলে এই জগতে প্রত্যহ কত শত প্রলয় কাণ্ড হইত তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পদার্থের কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পৃথিবীর কথা বলিব। আমরা জানি যে পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৪,০০০ মাইল এবং পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন প্রায় ২৪ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ একবার নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল লাগিয়া থাকে। আমরা প্রত্যহই ইহার প্রমান পাইয়া থাকি। তাহা হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত যাবতীয় পদার্থ, কি জড়, কি জীবিত, সকলেই প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১,০০০ মাইল দুর ভ্রমণ করিতেছে ; ইহা বড় সাধারণ কথা নহে। আবার

নিজ কক্ষে পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় ২০,০০০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করে। ইহা শুনিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না কিন্তু বাস্তবিকই ইহার এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। তাহা হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত যাবতীয় পদার্থের দুই প্রকার গতি আছে। এক্ষণে এই ভয়ানক গতিতে ধাবমান পৃথিবী যদি এইরূপ, কি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক গতিতে ধাবমান অপর এক গ্রহ বা উপগ্রহ বা নক্ষত্রাদির সহিত সংঘর্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যে কিরূপ হয় তাহা ধারণাশক্তির বহির্ভূত। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ডও ঘটিয়া থাকে; তাহার ফলে নূতন শ্রেণীর জগত সৃষ্ট বা পুরাতন কোন জ্যোতিষ্ক পদার্থের ধ্বংস হইয়া থাকে বা অন্য কোন প্রকার স্থানীয় বিশৃঙ্খলতা জাত হয়।

শনি নামক গ্রহের কক্ষ এবং লিওনাইডিস্ নামক উল্কাপুঞ্জের কক্ষ শূন্যমার্গে এক জায়গায় অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এমন কি যদি এই স্থানে দুইটিতে যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বৃহদাকার শনিগ্রহ ক্ষুদ্রাকার উল্কাপিণ্ডগুলিকে এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিবে যে, ইহারা যে গতিতে নিজ নিজ পথে ধাবিত হইতেছিল সে গতির কোনওরূপ ক্রিয়া থাকিবে না। কিন্তু যে উল্কাপিণ্ডগুলি শনির পৃষ্ঠদেশে পতিত না হইয়া তাহার চক্রের (ring) সহিত সংঘর্ষিত হইবে তাহারা বেগাতিশয্যে শনিচক্রের মূলীভূত ক্ষুদ্রাংশগুলিকে লইয়া শূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, এমন কি কতকগুলি এতদূরে গিয়া পড়িবে যে ততদূরে শনিগ্রহের আকর্ষণী শক্তি পঁহুছে না। কিন্তু সেগুলির অবস্থা কি হইবে? শনির আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাহারা সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবে। কতকগুলি সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হইবে এবং কতকগুলি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে।

টারনার সাহেব বলেন যে, বাস্তবিকই শনির সহিত লিওনাইডিসের এইরূপ সংঘর্ষণ পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে এবং এখনও—যখন তাহারা নিকটবর্ত্তী হয়—ঘটিয়া থাকে; তাহার ফলে এইরূপ নূতন শ্রেণীর (System) উল্কাপুঞ্জ তৈয়ারি হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সূর্য্যের উপর যাইয়া পড়ে এবং কতকগুলি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

কোন্ কোন্ সময় শনিগ্রহ ও লিওনাইডিস্ নিকটবর্ত্তী হইবে বা হইয়াছিল তাহা জানা আছে; এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ইহারা একত্রিত হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যের অঙ্গে যেরূপ সৌর-কলঙ্কগুলি দৃষ্ট হয় ইহারা একত্রিত হইবার পর সৌর-কলঙ্কগুলি সংখ্যায় তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে শনি ও লিওনাইডিসের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সেই বৎসরের মার্চ্চ মাসে গ্রীনউইচের মানমন্দির হইতে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ লক্ষ্য করেন যে, শনিগ্রহের চক্রের * আভ্যন্তরিক অল্প-রশ্মি-শালী চক্রটি সমধিক রশ্মিশালী দেখাইতে-

* শনি প্রভৃতি গ্রহগুলির বৃত্তান্ত বিজ্ঞানে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ছিল, এমন কি ঔজ্জ্বল্যে ইহা মধ্যবর্ত্তী এবং বহিস্থিত চক্রের সমতুল্য হইয়াছিল। টারনার সাহেব বলেন যে, এই জ্যোতির্ব্বিদ্ বোধ হয় সেই সময় শনি ও লিওনাইডিসের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। অত্যধিক সংঘর্ষণে শনির আভ্যন্তরিক চক্রের মূলীভূত পদার্থগুলি সাতিশয় দীপ্তিশালী হইয়াছিল বলিয়াই এই চক্রকে তাদৃশ উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল ইহাই টারনার সাহেবের বিশ্বাস। তাহা যাহাই হউক ১৮৭০ খৃঃ অব্দে সূর্য্য-পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে সৌর-কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়াছিল। আর ইহাও দেখা গিয়াছিল যে সেই সময়ে শনি নিজ কক্ষ হইতে সামান্য ভাবে বিচলিত হইয়াছিল। যদি লিওনাইডিসের সংঘর্ষণে শনিকে কক্ষ হইতে বিচলিত হইতে হয় তাহা হইলে যে সকল উল্কাপিণ্ড লইয়া ইহা সৃষ্ট, তাহারা আয়তনে যে অত্যন্ত বৃহৎ হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের পৃষ্ঠ দেশে পড়িয়া যে এক একটি সৌর-কলঙ্ক সৃষ্টি করিবে ইহা আর কি বিচিত্র কথা ?

কিন্তু ইহার দুইটি প্রধান জিজ্ঞাস্য আছে বলিয়া টারনার সাহেবের সৌর-কলঙ্ক সম্বন্ধীয় এই উপপত্তি নিঃসঙ্কোচে গ্রাহ্য হয় নাই। প্রথমতঃ—এই উল্কাপিণ্ড সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে না পতিত হইয়া কেবল একটি স্থানে পতিত হয় কেন? দ্বিতীয়তঃ—যদি শূন্যে এত বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড অবস্থান করে তাহা হইলে তাহারা মাঝে মাঝে পৃথিবীর উপরেও আসিয়া পড়ে না কেন ? টারনার সাহেব এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কি উত্তর দিবেন বলিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথ লাল সরকার, বিএ।

ভ্রম-সংশোধন।

গত সংখ্যার "বিবিধ"র মধ্যে "ডিম্বরক্ষণ প্রণালী" নামক প্রবন্ধে অন্যান্য উপকরণাদির মধ্যে Water-glassএর নাম করা হইয়াছিল ; Water-glassএর অর্থাবগম করিবার উদ্দেশে তাহার রাসায়নিক নাম ভুল করিয়া Sodium Salicyate দেওয়া হইয়াছিল ; অনেকেই হয়ত ইহা Sodium Salicylate ভাবিয়াছেন ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা Sodium Silicate হইবে।

"বিজ্ঞানের" পরম হিতৈষী রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস, মহাশয় আমাদের এই ভ্রম প্রদর্শন করাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম।

৩য় বর্ষ।)　　নভেম্বর, ১৯১৪।　　(১১শ সংখ্যা।

অক্সিজেন।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অক্সিজেন কি তাহা অবগত আছেন; এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুগ্রহে আজকাল অনেক ছাত্র বাস্তবিকই কিরূপে অক্সিজেন উৎপাদন করিতে হয় বা ইহা দেখিতে কিরূপ, ইহার ধর্ম্ম কি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে অক্সিজেনের রাসায়নিক তত্ত্ব লিখিত হইল।

বিশুদ্ধ অক্সিজেন একরূপ বায়বীয় পদার্থ। প্রকৃতিতে ইহা বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং অন্যের সহিত মিলিত না হইয়া অর্থাৎ অযৌগিকভাবে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস গ্রহণ করি, তাহার ৫ ভাগের ১ ভাগ বিশুদ্ধ অযৌগিক অক্সিজেন। জগতে যতবিধ মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সকলেরই সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া যৌগিক উৎপাদন করে; কেবল ফ্লোরিনের সহিত ইহার কোনও যৌগিক অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যে জল আমরা পান করি, ভার হিসাবে তাহার ৯ ভাগের ৮ ভাগ অক্সিজেন। পৃথিবীর উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ প্রায় অক্সিজেন। অক্সিজেন সমগ্র জগৎকে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। অক্সিজেন ব্যতীত জীবজন্তু বৃক্ষাদি জীবিত থাকিতে পারিত না, পৃথিবী প্রাণশূন্য হইত। অতএব অক্সিজেনকে জগতের প্রাণ-বায়ু বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অতি প্রাচীন কালে অক্সিজেন পণ্ডিতগণের অবিদিত ছিল। অতি অল্পদিন হইল, এই বায়বীয় পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—মহামতি

লাভইশিয়ার (Lavoisier) ইহার আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু অনেকের মতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে বারমিংহাম নগরের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রিষ্টলে (Priestley) প্রথমে ইহাকে আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথমতঃ লক্ষ্য করিলেন যে, পারদকে সাধারণ বায়ু সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে, পারদের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি একটি কাচ পাত্রে পারদ লইয়া পারদের স্ফুটন তাপ মাত্রায় তাহাকে কতিপয় দিবস ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পারদের উপরিভাগে লোহিত শল্কবৎ পদার্থ সঞ্জাত হইয়াছে.—ইহা আর কিছুই নহে পারদ-অক্সাইড, অর্থাৎ পারদ ও বায়ুস্থিত অক্সিজেনের যৌগিক। পারদের বৈজ্ঞানিক নাম হাইড্রারজিরাম (hydrargyrum) এবং অক্সিজেনের বৈজ্ঞানিক নাম অক্সিজেন (Oxygen)। যদি hydrargyrum এই কথাটি Hg দ্বারা ও oxygen—O দ্বারা সূচিত করা যায়, তাহা হইলে পারদ উত্তপ্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলস্থিত অক্সিজেনের সহিত কিরূপ যৌগিক উৎপাদন করিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে :—

$$2Hg + O_2 = 2HgO.$$
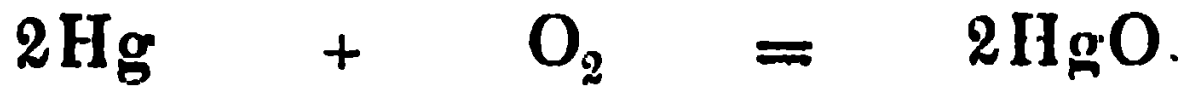
পারদ অক্সিজেন পারদ অক্সাইড।

এই লোহিত শল্কগুলিকে অর্থাৎ পারদ-অক্সাইডকে পারদ হইতে পৃথক করিয়া পুনরায় উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বহির্গত হয় :—

$$2HgO = 2Hg + O_2$$
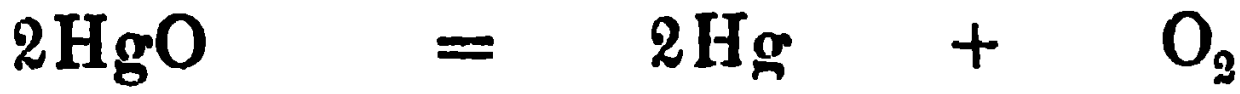
পারদ অক্সাইড পারদ অক্সিজেন

প্রিষ্টলে এই উপায়ে প্রথম এই বায়বীয় পদার্থের ক্রিয়া লক্ষ্য করেন এবং ইহাকে পৃথক করিতে সক্ষম হন।

এক্ষণে কিরূপে অক্সিজেন উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার একটি প্রণালী বুঝিতে পারা গেল। পারদ-অক্সাইড স্বভাবতঃ প্রচুর পাওয়া যায়, তাহাকে উত্তপ্ত করিলেই অক্সিজেন নির্গত হয় এবং নির্ম্মল পারদ পড়িয়া থাকে। অক্সিজেন বায়ু অপেক্ষা সামান্য ভারী এবং জলে অধিক দ্রবণীয় নহে, কাজেই ইহাকে সঞ্চয় করিতে হইলে যে পাত্রে সঞ্চয় করিতে হইবে, তাহাকে জলে পূর্ণ করিয়া ও পরে অন্য জল পূর্ণ পাত্রে উপুড় করিয়া সঞ্চয় করিবার পাত্রের মুখে অক্সিজেন বাহী রবারের নল লাগাইয়া দিলে, অক্সিজেন পাত্রস্থ জল অপসারিত করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে।

রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অক্সিজেন অন্য উপায়ে উৎপাদিত হয়। পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক অক্সিজেন, পোটাসিয়াম, ও ক্লোরিন নামক দ্রব্যত্রয়ের সম্মিলনে এক প্রকার যৌগিক উৎপাদিত হয়। বালকেরা দেওয়ালীর সময় পটকা তৈয়ারি করিবার জন্য বাজার হইতে যে শাদা গুঁড়া ক্রয় করে, তাহাই পোটাসিয়াম-ক্লোরেট। এই পদার্থটিকে উত্তপ্ত করিলেই অক্সিজেন নির্গত হয়, ও পোটাসিয়াম ক্লোরাইড

অবশিষ্ট থাকে; এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অক্সিজেন সঞ্চয় করা যাইতে পারে। পোটাসিয়ামের নির্দ্দেশক চিহ্ন K, সেইরূপ ক্লোরিনের Cl, এবং অক্সিজেনের O। ইহার ক্রিয়া এইরূপে সূচিত হইতে পারে :—

$2KClO_3 = 2KCl + O_2$

পোটাসিয়াম ক্লোরেট পোটাসিয়াম ক্লোরাইড অক্সিজেন।
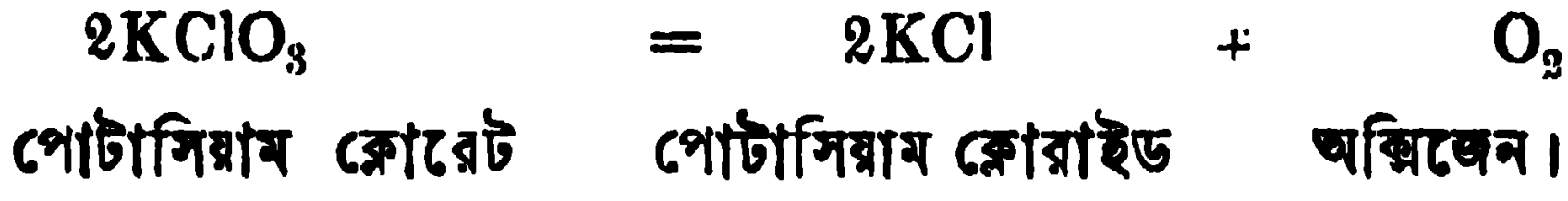
পোটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিয়া যে অক্সিজেন পাওয়া যায়, তাহা অতি বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু ইহাতে অধিক পরিমাণে তাপ প্রয়োগ না করিলে অক্সিজেন নির্গত হয় না। ইহাতে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নামক অন্য এক প্রকার ধাতব যৌগিক মিশ্রিত করিলে অল্প উত্তাপ প্রয়োগেই অক্সিজেন নির্গত হয়; অথচ ক্রিয়াবশানে দেখা যায় যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। এইরূপ মিশ্রণে কেন অল্প উত্তাপে ক্রিয়া সাধিত হয় অথচ মিশ্রেয় পদার্থ অবিকৃত থাকে, তাহা অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়াছে। পোটাসিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া অক্সিজেন সংগৃহীত হইত। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড—ম্যাঙ্গানিজ নামক ধাতু ও অক্সিজেনের যৌগিক। Mn এই অক্ষরদ্বয় দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ সূচিত হয়। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডএ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে :—

$3\,MnO_2 = Mn_3O_4 + O_2$

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ টেট্রক্সাইড অক্সিজেন।
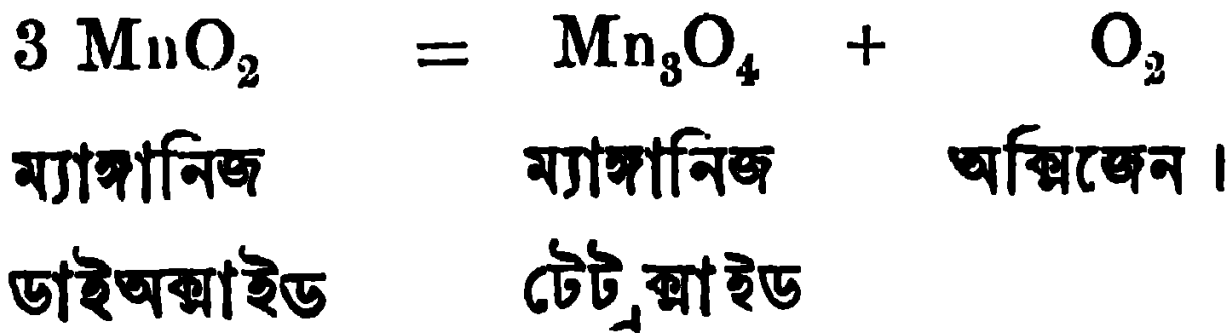
একটা এক মুখ বদ্ধ লৌহ নলের ভিতর ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড পুরিয়া অন্য মুখে অক্সিজেন নিঃসারিত হইবার জন্য রবারের নল লাগাইয়া ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড-পূর্ণ নলটিকে উত্তপ্ত করিলেই নল বাহিয়া অক্সিজেন নির্গত হইতে থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অক্সিজেন সঞ্চিত করা যাইতে পারে।

জল—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়। জলে তড়িৎ স্রোত প্রয়োগ করিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়। হাইড্রোজেন H ও অক্সিজেন O দ্বারা সূচিত হইলে জল H_2O দ্বারা সূচিত হয়। ইহাতে তড়িৎ প্রয়োগ করিলে এইরূপ ক্রিয়া হয় :—

$2H_2O = 2H_2 + O_2$

জল হাইড্রোজেন অক্সিজেন।
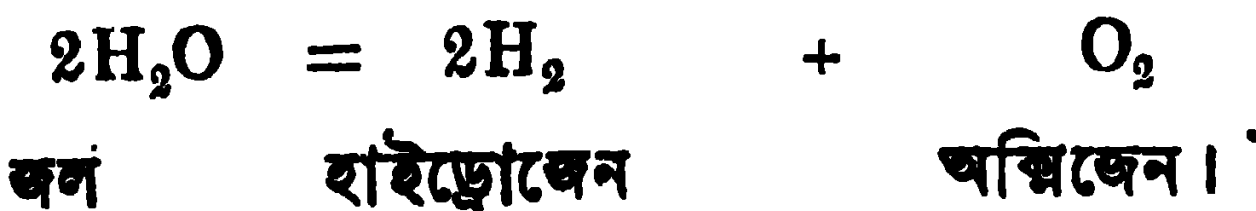
যাহা হউক এইরূপ নানা উপায়ে রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অক্সিজেন উৎপাদিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যবসায়ের নিমিত্ত অক্সিজেন উৎপাদন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত কোনও উপায়েই অক্সিজেন উৎপাদিত হইতে পারে না, কেননা উপরের সমস্ত প্রথাই বহু ব্যয় সাধ্য এবং ইহাতে দ্রব্যাদির বহু অপচয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি এক নূতন উপায়ে ব্যবসায়ের উপযোগী অক্সিজেন উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডল হইতে সুবিধামত উপায়ে অক্সিজেন গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে যাইয়া এই নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেরিয়াম অক্সাইড নামক এক প্রকার ধাতব যৌগিক আছে ইহা বেরিয়াম নামক এক প্রকার ধাতু ও অক্সিজেনের সম্মিলনে উৎপাদিত হয়। অতএব বেরিয়াম Ba এই অক্ষর দ্বয় দ্বারা সূচিত হইলে বেরিয়াম অক্সাইডের চিহ্ন BaO এইরূপ হয়। এই বেরিয়াম অক্সাইডকে মুক্ত বাতাসে উত্তাপ প্রয়োগে লোহিত করিলে ইহা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন শোষণ করিয়া বেরিয়াম পারঅক্সাইড বা BaO_2তে পরিণত হয়। এই BaO_2কে অধিক উত্তাপে শুভ্র করিলে শোষিত অক্সিজেন নির্গত হইয়া পুনরায় BaOতে পরিণত হয়। ইহাদের ক্রিয়া এইরূপে লেখা যাইতে পারে ঃ—

(১ম) $2BaO + O_2 = 2BaO_2$

বেরিয়াম অক্সাইড + অক্সিজেন (বায়ুমণ্ডল স্থিত) = বেরিয়াম পারঅক্সাইড

(২য়) $2BaO_2 = 2BaO + O_2$

বেরিয়াম পারঅক্সাইড = বেরিয়াম অক্সাইড + অক্সিজেন।
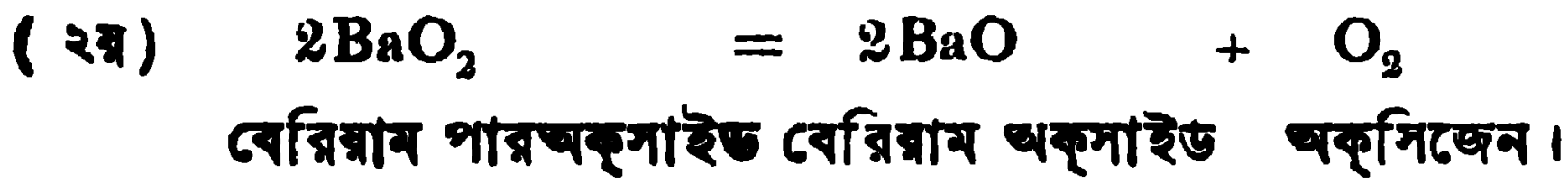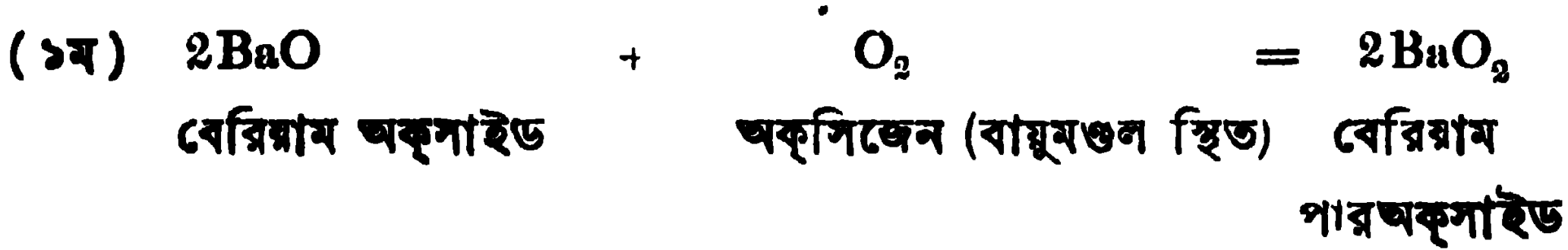
এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদন সম্ভব, ইহাতে কোন দ্রব্যের অপচয় হইতে পারে না। কেবল সময়ান্তরে তাপ প্রয়োগের অল্পাধিক্য মাত্র।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাপ পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি আবশ্যক হয় না। বিলাতে "Brim's Oxygen Company"র কারখানায় উপযুক্ত পাত্রে বেরিয়াম অক্সাইড উত্তপ্ত হইতে থাকে, সেই পাত্রে অত্যধিক চাপ প্রয়োগে বাতাসকে প্রবিষ্ট করান হয়। এই বাতাসের অক্সিজেন ধীরে ধীরে উত্তাপ লোহিত বেরিয়াম অক্সাইড কর্ত্তৃক শোষিত হইতে থাকে। যখন বেরিয়াম অক্সাইড পূর্ণ মাত্রায় অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয়, তখন অবশিষ্ট নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য বায়বীয় পদার্থকে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর পাম্প সহযোগে বেরিয়াম অক্সাইড শোষিত অক্সিজেনকে আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই উপায়ে ক্রমাগত অক্সিজেন উৎপাদিত হইয়া থাকে।

পণ্ডিতগণ এই গ্যাস আবিষ্কৃত হইবার পর লক্ষ্য করিলেন যে, তৎকাল প্রচলিত যাবতীয় দ্রাবকে অর্থাৎ য়্যাসিডে (acid) এই গ্যাস রাসায়নিক ভাবে সম্মিলিত রহিয়াছে, অর্থাৎ এই গ্যাস ব্যতীত দ্রাবক বা অম্ল উৎপাদিত হইতে পারে না।

এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহারা এই নবাবিষ্কৃত গ্যাসের নাম— "Oxygen" বা অম্ল উৎপাদক রক্ষা করিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী রাসায়নিকগণ লক্ষ্য করিলেন যে, এরূপ অনেক দ্রাবক রহিয়াছে যে, তাহাতে এই গ্যাসের কোনও সংশ্রব নাই। বরং হাইড্রোজেন নামক অন্যবিধ একটি গ্যাস ব্যতীত দ্রাবক উৎপাদিত হইতে পারে না। যাহাহউক পরবর্ত্তী রাসায়নিকগণ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ভ্রম নিকাশ করিলেন বটে, কিন্তু এই গ্যাসের নাম অক্সিজেনের কোনও পরিবর্ত্তন করিলেন না। বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও এই জন্য ইহার নাম অম্লজান গ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্লজানের পরিবর্ত্তে এই গ্যাসকে অক্সিজেন বলাই সুবিধাজনক। কেননা এইরূপ হইলে বৈজ্ঞানিক নামের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া উঠিবে, অধিকন্তু বৈদেশিক শব্দের সাহায্যে আমাদের ভাষাও পরিপুষ্ট হইবে অথচ বঙ্গ ভাষায় নূতন বৈজ্ঞানিক নাম আবিষ্কার করিয়া ভাষাকে কটমট ও পদার্থকে দুরধিগম্য করা হইবে না। এই জন্যই এই গ্যাসকে অম্লজান না বলিয়া অক্সিজেন বলিয়াই এই প্রবন্ধে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অক্সিজেন বায়বীয় পদার্থ অর্থাৎ গ্যাস (gas)। ইহার বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, স্বাদ নাই। ইহা ক্ষার অথবা অম্ল-ধর্ম্মাক্রান্ত নহে; ইহা প্রজ্বলিত হয় না। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহাকে কেহই তরল করিতে পারেন নাই, কিন্তু ঐ খৃষ্টাব্দে শৈত্য ও চাপ প্রয়োগে ইহাকে তরল করা হইয়াছে। ইহা বাতাস অপেক্ষা অতি অল্প ভারী, জলে অতি অল্প দ্রবণীয়। ফুটন্ত জলে অক্সিজেন আদৌ দ্রবীভূত হয় না। কয়েকটি ধাতু দ্রবীভূত হইয়া তরল হইলে অক্সিজেন সম্মিশ্রিত হয়। বিগলিত রৌপ্যে প্রচুর অক্সিজেন মিশিয়া থাকে, এবং রৌপ্য যেমনই কঠিন হইতে থাকে অক্সিজেনও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। অক্সিজেন ব্যতীত অন্য কোন বাষ্পেই জীবের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতে পারে না। এই উপায় দ্বারা অক্সিজেনকে অন্য বায়বীয় পদার্থ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ক্রিয়া অতিশয় তীব্র; কাজেই তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সুচারুরূপে চলিতে পারে না। এই অসুবিধা হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের সহিত প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন নামক গ্যাস সংমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। অক্সিজেন জলে সামান্য দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু এই দ্রবীভূত সামান্য অক্সিজেনই মৎস্যাদি জলচর জীবের প্রাণ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অক্সিজেন দাহন ক্রিয়ার সহায়তা করে। ইহা ব্যতীত কোন পদার্থই দগ্ধ হইতে পারে না। অক্সিজেন নিজে দগ্ধ হয় না বটে, কিন্তু অন্য পদার্থকে দগ্ধ করে। বাতি জ্বলিতেছে বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে বাতির সহিত অক্সিজেন সম্মিলিত হইতেছে। ঝড়ে বাতি নির্ব্বাপিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঝড়ের শক্তি বাতিকে উপযুক্ত

পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে দিতেছে না। যদি বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন না থাকিত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে বর্ত্তিকাদি দগ্ধ হইয়া যাইত। যে পদার্থ বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ নাইট্রোজেন মিশ্রিত অক্সিজেনে ধীরে ধীরে দগ্ধ হয় বা মৃদু আলোক উৎপাদন করে, তাহাই বিশুদ্ধ অক্সিজেনে তীব্র তেজে দগ্ধ হয় বা অত্যুজ্জ্বল আলোক উৎপাদন করে। একটি অগ্নিমুখ কাষ্ঠখণ্ডকে বিশুদ্ধ অক্সিজেনে লইয়া আসিলে সহসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সেইরূপ গন্ধক, ফস্ফরাস্ অঙ্গার, এমন কি সুকঠিন ইস্পাত পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেনে তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠে।

অক্সিজেন দ্বিবিধ অবস্থায় থাকিতে পারে। সাধারণ অক্সিজেনের অণু (molecule) দুইটি পরমাণুর (atom) দ্বারা গঠিত অর্থাৎ অক্সিজেন O_2। কিন্তু এই O_2 সময়ে সময়ে O_3 অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তখন অণু, দুইটি পরমাণুর দ্বারা গঠিত না হইয়া তিনটি পরমাণুর দ্বারা গঠিত হয়। যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন অক্সিজেনকে ওজোন (ozone) বলে।

সংক্ষেপে ইহাই অক্সিজেনের রাসায়নিকতত্ত্ব। অতঃপর অক্সিজেন ব্যবসা বাণিজ্যে বা মানব জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় তাহাই আলোচিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগ (Liebig) প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "Letters on Chemistry" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"Since the discovery of oxygen the civilized works has undergone revolution in manners & customs ... ... The successful pursuit of ennumerable manufactures and trades, and the separation of the metals from their ores stand in the closest connection with this fact. It may well be stated that the material prosperity of the world has increased many times in this period, and that the fortune of every individual has been augmented in proportion."

অক্সিজেন আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে সভ্য জগতের আচার ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বহুবিধ কারখানায় ও নানাবিধ ব্যবসায় লোকের সাফল্য এবং খনিজতাল হইতে বিশুদ্ধ ধাতুর নিষ্কাশন হইতেই উল্লিখিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে জগতের লক্ষ্মীশ্রী বহুগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সেই অনুপাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরও ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিবিগ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। তাহার পরে শিল্পে এবং কলাবিদ্যায় অক্সিজেন প্রভূত ব্যবহৃত হইতেছে।

যে সময় হইতে অক্সিজেন আবিষ্কৃত হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতেই অক্সিজেন চিকিৎসাকার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে। প্রিষ্টলে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়া-

ছিলেন যে, একটা মূষিক মুক্ত বাতাসে যতকাল জীবিত থাকিতে পারে, সীমাবদ্ধ অক্সিজেনে তদপেক্ষা দুইগুণ অধিকতর সময় জীবিত থাকিতে পারে। বর্ত্তমান কালে চিকিৎসায় এবং অস্ত্রোপচার কার্য্যে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আজকাল অক্সিজেন প্রয়োগে যে সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণ প্রশমিত হইতেছে বা ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে পীড়িত মুক্ত হইতেছে, তন্মধ্যে য্যাজমা, ক্রুপ, নিউমোনিয়া, ডিসপ্নিয়া, যক্ষ্মা, রক্তহীনতা, ডিস্পেপ্সিয়া, বহুমূত্র, য্যাল্‌বুমিনিউ-রিয়া, পক্ষাঘাত, নিদ্রাহীনতা, ইত্যাদি প্রধান। প্রধানতঃ পীড়িত ব্যক্তি নিশ্বাস দ্বারাই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আজকাল চিকিৎসকগণ ইন্জেকশন (injection) ইনফিউসন্ (infusion) কিম্বা শরীরাভ্যন্তরস্থ কোটরাদিতে প্রবেশ করাইয়াও অক্সিজেন ব্যবহার করিতে-ছেন। রক্তে দুই প্রকার কণিকা রহিয়াছে—শ্বেত ও লোহিত। এই দুই প্রকার কণিকাই জীবন রক্ষার জন্য প্রভূত প্রয়োজনীয়। নিশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করিলে শোণিতের লোহিত কণিকা বৃদ্ধি পায়, এবং শোণিত পরিষ্কৃত হয়। নিউমো-নিয়া ইত্যাদি কঠিন পীড়ার শেষভাগে এইরূপে অক্সিজেন গ্রহণ বিশেষ ফলদায়ক, কেননা এই সময়ে শোণিত উপযুক্ত ভাবে বায়ু মিশ্রিত হইতে না পাওয়ায় রোগীর প্রাণ সংশয়স্থল হইয়া উঠে; এইরূপ বৃদ্ধগণের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে অথবা ক্ষয়-রোগে অক্সিজেনের শ্বাস গ্রহণ বিশেষ উপকারী। যে সমস্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধি চিকিৎসার দুঃসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও অক্সিজেন প্রয়োগে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। অক্সিজেন শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পাতলা চর্ম্মপেটিকাকে উত্তেজিত করে, নাড়ীর বেগ ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত করে, এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রকে প্রশান্ত করিয়া তুলে। টাইফয়েড পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হইবার পর অক্সিজেনের শ্বাস গ্রহণ করিলে অতি শীঘ্র সবল হইয়া কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। ক্লোরোসিস্, ইউরিমিয়া, উদরী, ডায়াবিটিক কোমা, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যা-দিতে এই গ্যাস প্রভূত উপকারী। স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় ও রমণীজনোচিত শারীরিক যন্ত্রাদির জটীল পচন নিবারণে এবং নিরাময়ে অক্সিজেন প্রভূত ফলদায়ক। অন্ত্রে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবেশ করাইতে পারিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং লিভারের যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। যে যে ব্যাধিতে শোণিত রীতিমত অক্সিডাইজড্ অর্থাৎ অক্সিজেন দ্বারা বিশোধিত হইতে পায় না (যেমন কটীবাত পৃষ্ঠব্রণ বা উরুস্তম্ভাদি বিস্ফোটক, প্লুরিসি, কঠিন রক্তহীনতা, যক্ষ্মা কাশ ইত্যাদি) সেই সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন্ দ্বারা অক্সিজেন প্রবিষ্ট করা হইলে রীতিমত ফল পাওয়া যায়। অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে অজ্ঞান করিবার কালে সংজ্ঞাবিলোপক আরকাদিতে (যেমন, ইথার, ক্লোরোফরম, ইথিল

ক্লোরাইড, বিশেষতঃ নাইট্রিক অক্‌সাইড) এই গ্যাস সংমিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়; এরূপ করিলে অনেকক্ষণ রোগীকে অজ্ঞান করিয়া রাখা যায় ও সায়ানোসিস্ হইতে রোগী রক্ষা পায়। এইরূপ আরক প্রয়োগে অনেক সময়ে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্র আর কার্য্য করে না, ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু আরকের সহিত অক্‌সিজেন প্রয়োগে সে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। নাইট্রাস অকসাইডের সহিত শতকরা ১০ বা ১৫ ভাগ অকসিজেন মিশাইলে ইহার সংজ্ঞাবিলোপন শক্তি আদৌ নষ্ট হয় না, অথচ ইহা প্রভূত কার্য্যকর হয়।

নিউইয়র্ক নগরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৪০,০০০ রোগীকে নাইট্রাস্ অক্‌সাইড ও অক্‌সিজেন প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, কোন ক্ষেত্রেই রোগীর বিপদ উপস্থিত হয় নাই। সংজ্ঞাবিলোপক আরক প্রয়োগের পর রোগীর বমন প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হয় এবং রোগী বমন করিতে থাকে, ইহাতে অনেক সময়ে বিপদ উপস্থিত হয়। অস্ত্রোপচারিত স্থান পুনরায় ফাটিয়া রক্ত পাত হইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ জটিলতা উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অক্‌সিজেন মিশ্রিত করিয়া আরক প্রয়োগ করিলে এই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি হয়। নব উৎপাদিত অক্‌সিজেন (nascent oxygen) অতি শক্তিশালী পচন নিবারক। হাইড্রোজেন পারঅক্‌সাইড নামক এক প্রকার যৌগিক তরল পদার্থ রহিয়াছে, উৎপাদনের কিয়ৎকাল পরেই ইহার হাইড্রোজেন অংশতঃ অবক্ষত হয়; এরূপ হইলে অক্‌সিজেনের অংশ অধিক হইয়া পড়ে; তখন জল অক্‌সিজেনে অনুসিক্ত হইয়া উঠে। এই অক্‌সিজেন অনুসিক্ত জল পান করিলে দীর্ঘকালস্থায়ী ডিসপেপ্‌সিয়া, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ধরা ইত্যাদির উপশম হইয়া থাকে। ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর পারঅক্‌সাইডও এই সমস্ত পীড়ায় গৃহীত হয়; এই ঔষধ গৃহীত হইলে ইহার অক্‌সিজেন পাকস্থলীর পাচক রস সংযোগে পৃথক হইয়া যায় এবং পৃথকীকৃত অক্‌সিজেন রোগের উপশমে নিযুক্ত হইয়া থাকে। জিঙ্ক পারঅক্‌সাইড ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিয়া ক্ষত বন্ধন করা হয়। পূর্ব্বোক্ত হাইড্রোজেন পারঅক্‌সাইড দ্বারা গলিত ক্ষত, বিস্ফোটক, ইত্যাদি ধাবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কেননা ইহার পচন নিবারণী শক্তি অত্যধিক। মুখে ক্ষত হইলে বা মুখ হইতে খাদ্য বা প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের কুঁচি অপসারিত করিতে হইলে জল মিশ্রিত হাইড্রোজেন পারঅক্‌সাইডের কুল্লী বিশেষ ফলপ্রদ। সোডিয়াম পারঅক্‌সাইড বা পারবোরেট জলে ফেলিয়া দিলে উক্ত পদার্থে যে অক্‌সিজেন অস্থায়ীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা নির্ম্মুক্ত হয় এবং জলে নব উদ্ভাবিত অক্‌সিজেন মিশ্রিত হইয়া যায়, এই জলে স্নান করিলে শরীরে শোণিত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, সায়ানোসিস, ডিস্‌প্‌নিয়া ইত্যাদি পীড়া অতি শীঘ্র অন্তর্হিত হয়। কুস্তিগির, পালোয়ান ইত্যাদির ব্যায়াম প্রদর্শন কালে, অক্‌সিজেন গৃহীত হইলে, শরীরে

অভূতপূর্ব বলাধান হয়, এবং কর্ম্ম শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য বিলাতে আজকাল কুস্তিগির মাত্রেই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কুস্তি করিতে বা শারীরিক শক্তি প্রদর্শনে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কোন বিষাক্ত বায়বীয় পদার্থের শ্বাস গ্রহণে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা দূর করিতে অক্সিজেনের তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। কারবন মনক্সাইড, কারবন ডাইঅক্সাইড, ইত্যাদি গ্যাসে শ্বাস অবরুদ্ধ হইলে শোণিতের অক্সিজেন বহন করিবার ক্ষমতা রুদ্ধ হইয়া উঠে, এই সময়ে অক্সিজেনের শ্বাসগ্রহণ মাত্র সমস্ত ব্যাধি দূরীভূত হয়, এবং শারীরিক যন্ত্র, রক্ত স্রোত পুনরায় কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কার্য্য করিতে লোকে নানা সময়ে নানারূপ বিষাক্ত গ্যাসের শ্বাস গ্রহণ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন, ইহার মধ্যে কয়লার গ্যাস, বেনজিন বাষ্প, ক্লোরোফরম, ইথার, য়্যামোনিয়া, ক্লোরিণ, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, য়্যাসিটিলিন ইত্যাদি প্রধান। অগ্নিকাণ্ডের সময় বহুলোক ধূমের শ্বাস গ্রহণে অচেতন হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটির লোক নর্দ্দামায় অবতরণ করিয়া কার্য্য করিতে করিতে নর্দ্দামার গ্যাস শ্বাস গ্রহণে অচেতন হইয়া পড়ে; কয়লার খনিতে একরূপ গ্যাস উদ্ভূত হয়, সেই গ্যাস আলোক বা উপযুক্ত উত্তাপ সংস্পর্শে মহাশব্দে বিস্ফোটিত হইয়া দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত করে; এই গ্যাস বিস্ফোটিত হইবার সময় চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া খনির অধিকাংশ স্থান অক্সিজেন শূন্য করিয়া ফেলে। যে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই স্থানে লোক সমূহ তৎক্ষণাৎ হত হয়। আবার দূরবর্ত্তী লোক সমূহ সহসা অক্সিজেন অভাবে মৃতকল্প হয় বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই সমস্ত গ্যাসের বিপদে বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার একমাত্র অমোঘ ঔষধ বিশুদ্ধ অক্সিজেন। আজকাল আফিম্, বেলেডোনা, ক্লোরাল ইত্যাদি বিষ ভক্ষণ দ্বারা আত্মহত্যাকারীকে অক্সিজেন প্রয়োগে নিরাময় করা হইতেছে। জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির সামান্য প্রাণশক্তি থাকিলে, তাহাকে অক্সিজেন প্রভাবে পুনঃ সঞ্জীবিত করা যাইতে পারে। আজকাল বিলাতাদি বৈজ্ঞানিক দেশে যে সমস্ত সাধারণ মন্দিরে বহু লোকের সমাগম হয়, তাহার বায়ু মধ্যে মধ্যে অক্সিজেন প্রবাহ দ্বারা বিশোধিত করিবার আলোচনা উদ্যোগ ও পরীক্ষা চলিতেছে। সিকাগো নগরে "Public Library" নামক সাধারণের পাঠ মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত "ওজনের" সহিত বায়ু মিশ্রিত করিয়া প্রবাহিত করা হইতেছে। ওজোন বা অক্সিজেনের রূপান্তর অতি শক্তিশালী ব্যাক্‌টিরিয়া এবং রোগ বীজ নাশক। ইহা বায়ুমণ্ডল বিশোধিত করে; কলেরা, টাইফাস, য়্যানথ্‌াক্স ইত্যাদির বীজাণু একবারে সমূলে নাশ করে। গলিত ক্ষতে প্রবাহিত হইলে ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইতে থাকে। পানীয় জলে অনুসিক্ত হইলে জল সম্পূর্ণ রোগবীজাণু শূন্য হয়। এইরূপে শত শত রোগ নিরাকরণে আজ কাল

অক্‌সিজেন ব্যবহৃত হইতেছে। এখন বৈজ্ঞানিক দেশের প্রতি হাসপাতালে রাশি-রাশি অক্‌সিজেন সঞ্চিত থাকে। এই অক্‌সিজেনকে বায়বীয় আকারে রাখা হয় না। কেননা তাহা হইলে দীর্ঘায়তন স্থান আবশুক। ইহাকে তরল করিয়া লৌহ পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

মশক ধ্বংসের উপায়।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ভারতের কত লোক যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হই-তেছে তাহা একটু আলোচনা করিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়! এই ভীষণ রোগের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া কতগ্রাম যে জনশূন্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দায়!! এই সকল কারণে আজকাল অনেকে চেষ্টা করিতেছেন যে দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে বিদূরিত করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস ম্যালেরিয়ার ন্যায় রোগকে দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত করি-বার চেষ্টা কেবল আকাশকুসুম রচনা মাত্র; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? না তাহা নহে। সকলকে যদি ম্যালেরিয়ার কারণ এবং কিরূপে ইহার বিস্তার বন্ধ করা যাইতে পারে বেশ বুঝাইয়া দেওয়া যায় এবং সকলে যদি স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য্য করেন তাহা হইলে এই রোগকে বিতাড়িত করা যায়।

নিম্নলিখিত কারণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে চেষ্টা করিলে আমরা দেশকে ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত করিতে পারি।

আজকাল অনেকেই জানেন যে ম্যালেরিয়ার বীজ মশকই বহন করিয়া থাকে। এই মশককুল ধ্বংশ করিতে পারিলে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

(ক) প্রথমেই সুখের বিষয় এই যে সমস্ত মশকই যে ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করে এমন নহে। মশক জাতির মধ্যে এনোফেলিস্ বলিয়া যে মশক আছে কেবল তাহারাই ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করে।

(খ) দ্বিতীয় কথা সব এনোফেলিসেই যে উক্ত রোগের বীজ থাকিবে তাহার কোনও মানে নাই। এই শ্রেণীর যে সমস্ত মশক ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত শোষণ করিয়াছে কেবল তাহাদের শরীরেই এই বীজ আছে এবং যখন এই মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে কেবল তখনই এই বীজ সুস্থ ব্যক্তির শরীরের মধ্যে

প্রবেশ লাভ করে। তাহার পর বহুপ্রকার জীবনের আবর্ত্তনের পর ম্যালেরিয়ারূপে প্রকাশ পায়।

(গ) যে সমস্ত মশকের শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ আছে তাহাদের বংশধর মশকের শরীরে এই বীজ থাকে না। এ কথা অনেক শিক্ষিত লোকেও ভুল করিয়া থাকেন। "ম্যালেরিয়ার বীজ মশকের বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়" ইহা অতি ভুল ধারণা।

(ঘ) আর একটি বিশেষ কথা এই যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও জন্তুর ম্যালেরিয়া হয় না। ইহাতে সুবিধা এই যে এই রোগের বীজ সংক্রামক হইবার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বুঝিতে হইবে। পক্ষিজাতির মধ্যে ম্যালেরিয়ার ন্যায় এক প্রকার রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই রোগের বীজ কিউলেক্স্ (Culex) নামক মশকের দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে। যতদূর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে তাহাতে ইহার বীজে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না। সেইরূপে মানুষের ম্যালেরিয়ার বীজেও অপর কোনও জন্তুর ক্ষতি হয় না।

(ঙ) সমস্ত এনোফেলিস মশক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শোষণ করিতে পারে না আবার যাহারা শোষণ করিতে পায় তাহাদের মধ্যে সকলেই যে পুনরায় মানুষের রক্ত শোষণ করিতে পাইবে তাহারও কোনও স্থিরতা নাই।

(চ) তাহা ছাড়া এনোফেলিস মশকের ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শোষণের উপায়ও অনেক পরিমাণে রোধ করা যাইতে পারে। রোগীকে মশারির মধ্যে রাখিলে অতি অল্প চেষ্টায় এই রোগের আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

(ছ) মশক ছাড়া এই রোগের বীজ অন্য কোনও প্রকারে সংক্রমিত হইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণ হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়াকে লোকে সাধারণতঃ যে ভাবে দেখে ইহা ততটা ভয়ঙ্কর নহে। আমরা যদি কোনও প্রকারে এই এনোফেলিস মশককুল ধ্বংস করিতে পারি তবে অতি সহজেই এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক কি উপায়ে আমরা এই এনোফেলিসের বংশ ধ্বংস করিতে পারি।

আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে পল্লীগ্রামে খানা, ডোবা, নালা, "পুকুর" প্রভৃতিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা একবার ডুবিতেছে আবার উঠিতেছে। ইহাদের দেখিতে অনেকটা কমার (,) মত। ইহারা মশকের বংশধর (Mosquito larvæ) ; অনেকের মত, আমরা যদি এই সকল জলে কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিই তাহা হইলে এই সকল মশকশাবক মরিয়া যাইবে। কারণ জলে তৈলের

একটা আবরণ (Coating) পড়ে, তাহাতে এই মশকশাবকদের শ্বাস প্রশ্বাস লইবার অসুবিধা হয়।

এই কেরসিন তৈলের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে প্রথমে Sir Roland & Dr E. S. Edie (স্যার রোলাণ্ড এবং ডাক্তার এডি) সন্দেহ করেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে প্রায় শতকরা ৯০ স্থলে ইহা সম্পূর্ণ কার্য্যের অনুপযোগী। তাঁহারা এ কথা প্রচার করিবামাত্র অনেক বৈজ্ঞানিক এবং জীবতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং ফলে সকলেই দেখিলেন যে স্যার রোলাণ্ড এবং ডাক্তার এডি যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহাই যথার্থ। তাঁহারা দেখিলেন যে কেরসিন তৈলের প্রধান দোষ এই যে বায়ু সঞ্চালনে উহা সমস্ত জলের উপর সূক্ষ্ম সরের আবরণের (film) ন্যায় থাকে না। মধ্যে মধ্যে ফাঁক (broken) হইয়া যায়। ফলে মশকশাবকগণ ঐ স্থানে আসিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহা ছাড়া এরূপও দেখা যায় যে জলের উপর সম্পূর্ণ রূপে সূক্ষ্ম আবরণ আছে (film) কিন্তু জলে দুই চারিটা পাতা কুটা কুটি ভাসিতেছে। একক্ষেত্রে মশক শাবকগণ এই কুটা অবলম্বন করিয়া তৈলের উপরে মাথা বাহির করিয়া দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পাদন করে। কাজেই এইরূপ তৈলের আবরণ ইহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। আমাদের দেশে মশক যে জলে অণ্ড প্রসব করে সেখানে পাতা বা কুটার অভাব নাই। কাজেই এক্ষণে কেরসিন তৈল দ্বারা মশক ধ্বংসের চেষ্টা না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মে বা জুন মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে Surgeon Captain Fredrick F. MacCabe, M. D. মহোদয় এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইনি Messrs Bird and Co. Jute millএর চিকিৎসক। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে কেরসিন তৈলের দ্বারা মশকশাবকের বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধিত হয় না। এ বিষয় যিনি ইচ্ছা করেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন অপেক্ষাকৃত ছোট ডোবার (পরীক্ষার জন্য ছোট লইতে বলা হইয়াছে যাঁহার ইচ্ছা বড় ডোবাতেও পরীক্ষা করিতে পারেন) এক অংশে একটা লম্বা কাট বা বাঁশ দিয়া আড়াল করিয়া দিন এবং অপর অংশে কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ মশকশাবক যে অংশে তৈলের আবরণ (film) নাই সেই অংশে পালাইয়া আসিবে। অতি অল্প সংখ্যক মারা যাইবে। ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কেরসিন তৈল দ্বারা মশকের ধ্বংস সম্ভবপর নহে। ইহাতে অনর্থক অর্থ নষ্ট হয়, তাহা ছাড়া মৎস্যাদি শামুক প্রভৃতি অন্যান্য জলজ জন্তু মারা পড়ে। অন্য কোনও উপায়ে এই মশককুল ধ্বংস করা যাইতে পারে কি না দেখা যাউক।

Sir Roland এবং Dr. Edie এ সম্বন্ধে নানা প্রকার রাসায়নিক লবণাদি (Soluble salts) ব্যবহার করিয়া এই সমস্ত মশক শাবক ধ্বংস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের মত যদি ৩ গ্রেণ পরিমিত পোটাসিয়াম সাইয়ানাইড (Potassium Cyanide) ১২ গেলন জলে গুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এই মশককুল অতি সহজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই Potassium Cyanide ব্যবহারে দুইটি বিশেষ বাধা আছে। প্রথম :—ইহা অতি মারাত্মক বিষ; ইহার ন্যায় মারাত্মক বিষ অতি অল্পই আছে, কাজেই ইহা মানুষের ব্যবহার্য্য জলে দেওয়া কোনওরূপে যুক্তিসঙ্গত নহে; তাহা ছাড়া এইরূপ মারাত্মক বিষ লইয়া এ বিষয়ে অজ্ঞ লোককে (laymen) কার্য্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার দ্বারা যে কেবল মশক ধ্বংস হইবে তাহা নহে যাবতীয় জলজ জন্তু দেহত্যাগ করিবে। ডোবা, পুকুরে এইরূপ হওয়া অনেকে ইচ্ছা করেন না। তবে ইহা অবাধে জলাভূমি যথা ধান্যক্ষেত্রে, পাটপচাইবার ডোবায়, নালায়, বাগানের চারিধারের "পগারে" ব্যবহার করা যাইতে পারে, কেন না এই সমস্ত জলে যে জীব থাকে তাহাদের অধিকাংশই মানুষের অপকারী আর এ স্থলে গরু মহিষাদি গৃহপালিত পশুদেরও জলপান করিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় :—এক্ষণে কথা হইতেছে যে Potassium Cyanide অনেকের পক্ষেই দুষ্প্রাপ্য। এই লবণ যদি মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করান তবে ইহার দ্বারা কোন সুফল আশা করা যাইতে পারে। আর যদি এরূপ কোনও বন্দবস্ত করেন যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বা মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া যথাস্থানে গিয়া জলে গুলিয়া দিয়া আসিবেন তবে ইহা কার্য্যকারী হয়। নচেৎ Sir Roland এবং Dr. Edieর এই আবিষ্কারের দ্বারা জগতের কোনও উপকার সাধিত হইবে না।

ইহা ছাড়া Sanitas okol দ্বারাও এই ধ্বংস কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ইহার একভাগ ১০,০০০ ভাগ জলে ব্যবহার করিলে বহুসংখ্যক মশকশাবক মরিয়া থাকে। ইহার আরও একটি বিশেষগুণ যে ইহার দ্বারা মনুষ্যের এবং গৃহপালিত পশুর কোন অনিষ্ট হয় না। Sanitas দ্বারা অল্প আয়াসে অনেক কাজ হয়। কিছু "টারপিন তৈল" দূষিত জলে ঢালিয়া দিলে অনেক কাজ হয়। এই পরীক্ষাটি সকলে করিয়া দেখিতে পারেন।

অন্যান্য বিষাক্ত লবণ (Chemical salts) দ্বারা বিশেষ কোনও উপকার হয় না। Dr. MacCabe মহোদয় বলেন যে বিষাক্ত পারদ, সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির লবণ দ্বারা এই মশককুলের অনিষ্ট সাধন করা যায় না। এমন কি তুঁতিয়ার জল এবং মারকিউরিক-ক্লোরাইড (Mercuric

chloride) যাহা মানুষের পক্ষেও অত্যন্ত বিষাক্ত, এই ক্ষুদ্র মশককুল ধ্বংস করিতে অপারগ।

Chloride of lime—Bleaching powder—দ্বারাও ইহাদের বহুসংখ্যক মারা যায় না। কুইনিন্, ইক্লিপ্টস (oil of Eucalyptus) এবং নানা প্রকার আইওডিনের লবণ (Salts of Iodine) ইহাদের পক্ষে মারত্মক নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষের পক্ষে মারত্মক দ্রবনীয় বিষাক্ত লবণের জলে ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকে !!

Surgeon Captain MacCabe বহু পরীক্ষার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদি আমরা chloride of lime বা Bleaching Powderএর সহিত Paraffin oil বা Kerosine oil ব্যবহার করি তাহা হইলে জল অত্যন্ত বিষাক্ত না হইয়াই মশকশাবকদের ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে। তিনি আরও বলেন যে ইহার উগ্র গন্ধে মশকেরা সেই জলে আর ডিম্ব প্রসব করে না। ইহার আরও দোষ এই যে, ইহাতে মৎস্য শম্বুকাদি যাবতীয় জল জন্তু মারা পড়িবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে কেবলমাত্র কেরসিন তৈলে মশক শাবক মরে না তবে অন্যান্য যাবতীয় জলজন্তু মারা পড়ে কিন্তু ইহাতে মশককুলও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। MacCabe সাহেব বলেন যে তিনি স্বয়ং Landsdowneএর চতুষ্পার্শস্থ জলাভূমিতে ডোবাতে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন। এক্ষণে আমরা MacCabe আবিষ্কৃত নূতন মশক সংহারক Mosquito Larvæcide ব্যবহার করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিতে পারি। এ বিষয়ে দেশের ধনিবর্গ জমিদার, মিউনিসিপালিটির প্রথমে হস্তক্ষেপ করা উচিত। বাস্তবিক যদি ইহা কার্য্যকারী হয় তবে একটি সুখের বিষয়। ইহা ছাড়া MacCabe সাহেব আর একটি উপায়ে মশক বংশ ধ্বংস করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকে তিনি electrocution বলিয়াছেন অর্থাৎ electric currentএর সাহায্যে ধ্বংস কার্য্য সম্পাদন করা। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "A high frequency current giving spark of four inches discharged in water containing mosquito-larvæ only seemed to make them a little bit unsettled. But with a low tension current of two hundred and twenty volts some of them at once died and others after a few kick lay quite. An examination showed that their heads and tails were badly burnt and all these died in the night."

কিন্তু ইহাতেও মৎস্যাদি জলজন্তু মারা যায় তবে ইহাতে জলে কোনও প্রকার তীব্র দুর্গন্ধ হয় না এবং কোন প্রকারে বিষাক্তও হয় না। তাহা ছাড়া Chloride of

Lime ও Paraffin oil ব্যবহারের ন্যায় কোনও গন্ধ না থাকায় স্ত্রীজাতীয় মশক পুনঃ পুনঃ এই জলে ডিম পাড়ে এবং পুনঃ পুনঃ নষ্ট করা যায়।

Surgeon Captain MacCabe বলেন যদি এই প্রথা অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ মশক জন্মিতে পারিবে না। ২।১ বৎসরের মধ্যে দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে। এই Electrocution প্রথা অবলম্বন করিয়া কেহ কি কোনও পরীক্ষা করিবেন? যদি পরীক্ষার ফলাফল জানান বিশেষ বাধিত হইব।

এতক্ষণ নানা প্রকার বিষ প্রয়োগ করিয়া কি উপায়ে মশক মারা যাইতে পারে তাহারই কথা বলা হইল। এক্ষণে অন্য কি উপায়ে মশক মারা যাইতে পারে তদ্‌বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক। MacCabe সাহেবের মতে আমাদের দেশের পুকুর গুলিতে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুক আছে তাহারা মশক শাবক খাইয়া থাকে। এই শম্বুকগুলি Limæ Stagnalis নামে অভিহিত হয়। তিনি এই জাতীয় শামুক সমস্ত পুকুরে ডোবায় দুই চারিটি করিয়া "ছাড়িতে" উপদেশ দিয়াছেন। এই শম্বুকগুলি অতি অল্পকালে বহুপরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জলে এক ডেলা চর্ব্বি দিলে নাকি ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মশক শাবক ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া দেয়। কেরাসিন তৈল বা Chloride of Limeএর সংস্পর্শে এই সকল প্রাণী জীবন হারায় সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

নানা প্রকার মৎস্যও এই মশক শাবক খাইয়া থাকে। ১৯১০ সালে Dr. Nichollas নামক (St. Lucia, West Indies) একজন জীবতত্ত্ববিৎ একটি প্রবন্ধ লেখেন যে বারবেড্‌স প্রদেশের Millions নামক এক প্রকার মৎস্য মশকশাবক সংহারক রূপে ভারতে আনিত হউক; তাহা হইলে ভারতে ম্যালেরিয়া বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এই সময় হইতে আমাদের Indian Muesum এর Asst. Superintendent মাননীয় B. L. Chowdhuri ভারতীয় মৎস্যের শক্তির বিষয় পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল Indian Fishes of proved utility as Mosquito destroyer নামক পুস্তিকায় চৌধুরী মহাশয় এবং কলিকাতা মেডিকাল কলেজের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক R. B. Seymour Sewell কর্ত্তৃক অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত চিকিৎসক এবং জনসাধারণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে Barbadoes প্রদেশের Millionsএর ক্ষমতা আমাদের দেশের কয়েকটি মাছের তুলনায় অতি অল্প। যে সমস্ত মৎস্য এইরূপ মশকশাবক ভক্ষণ করে তাহাদের দুই একটির নাম করা গেল—যেমন তেচোক, পাঁচচোক

খলিলা, ভেদো, কৈ। যাঁহারা এই সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছুক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত পুস্তক খানি Indian Muesum হইতে আনাইয়া পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন দাম আট আনা মাত্র।

প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রধান প্রধান নগরে সাধারণতঃ "কলের" জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত হয়, কাজেই এরূপ জলপানে একমাত্র তৃষ্ণা নিবারণ ভিন্ন স্বাস্থ্যের অন্য কোনরূপ উপকার হয় না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে এরূপে পরিশোধিত জল পাওয়া দুষ্কর। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুষ্করিণী, কূপ, নদী ইত্যাদি হইতে ব্যবহার্য্য ও পানীয় জল গৃহীত হয়। কিন্তু বৃষ্টির জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে সমস্ত দেশ পর্ব্বত সান্নিধ্যে অবস্থিত, তথায় ভূগর্ভে নল প্রোথিত করিয়া জল উত্তোলন করা যাইতে পারে, এই জলও ব্যবহার্য্য।

বৃষ্টির জল।—বর্ষায় প্রচুর বারিপাতের সময় এই জল ধরিয়া প্রকাণ্ডায়তন পাত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে জলাশয় নদ নদীর এত বাহুল্য যে এরূপ ভাবে জল ধরিয়া কাজে লাগাইবার কোনও প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ বৃষ্টির জল ধরিয়া পানার্থে সাধারণতঃ কচিৎ ব্যবহৃত হয়। তবে স্থানে স্থানে বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য এই জল প্রচুর সঞ্চিত ও ব্যবহৃত হয়; কেননা ইহার ন্যায় কোমল জল আর দ্বিতীয় নাই। পানার্থে ব্যবহার করিবার জন্য সঞ্চয় করিতে হইলে, প্রথম এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর সংগ্রহ করিতে হয়। প্রথম বারিপাতে বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় দূষিত পদার্থ ধৌত হইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়; অতঃপর সঞ্চয় করিলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া সম্ভব।

নদ নদী ও হ্রদের জল।—আমাদের দেশে অধিকাংশ নগর ও গ্রামে নদীর জল ব্যবহৃত হয়। যাহাতে নদীর জলে গ্রাম বা নগরের কোনরূপ আবর্জ্জনা আসিয়া না পড়ে, তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বৎসর বৎসর নগরে যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল কারখানার বাহুল্য হইতেছে, তাহাতে সর্ব্বলোকের সর্ব্বদা তীব্র দৃষ্টি

স্বত্বেও সময়ে সময়ে নদীর জল বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই আবর্জ্জনা নগর পাদ-মূলস্থ নদীখণ্ড অতিক্রম করিয়া পল্লী অঞ্চলেও নীত হইতে পারে। কাজেই নদীর জল ফিল্টার বা বিশোধন না করিয়া ব্যবহার করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গঙ্গার জল অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। যদি জল ঘোলাটে না হয়, বা ঘোলাটে হইলেও তাহাকে নির্ম্মল করিয়া লইলে, গঙ্গাজলে কোনওরূপ ব্যাধির বীজ উৎপাদিত হইতে পারে না। কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও এক মাসিক পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম যে, গঙ্গার জলে রোগ বীজাণু বর্দ্ধিত হইতে পায় না। আরও দেখা যায় যে, পরিশ্রুত জলও কিছুদিন কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহাতে কীট উৎপন্ন হয়। কিন্তু বহু পুরাতন গঙ্গাজল কোনওরূপে মলিন হয় না। তবে গঙ্গাতীরে বড় বড় নগর স্থাপিত হওয়ায় এবং ইহার জলে সহরের আবর্জ্জনা ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহার জল ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য গঙ্গাজলও বিশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। সকল জলই রীতিমত উত্তপ্ত করিয়া ফিল্টার করিয়া লইলেই পানার্থে একরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। উত্তাপে প্রায় সমস্ত রোগবীজাণু বা আবর্জ্জনা দোষ নষ্ট হয়।

কূপের জল।—ভারতে নদ নদী ও তড়াগের যেরূপ প্রাচুর্য্য, কূপেরও বাহুল্য সেইরূপ। এক বঙ্গদেশ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই সুবৃহৎ ও সুগভীর কূপের জল ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশেও বহুস্থানে তড়াগাদি স্বত্বেও কূপের জলই প্রচলিত। কূপ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইলে এবং উপযুক্ত ভূমিতে খনিত হইলে, ইহার জল উৎকৃষ্ট পানীয় হইতে পারে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কূপের জল অতি উৎকৃষ্ট, কেননা এই সমস্ত কূপ সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে খনিত হয়। কাজেই লোকালয়ের ব্যবহৃত মলিন জল কোনরূপে ভূগর্ভ বাহিত হইয়া আসিয়া কূপজলে মিশিতে পায় না। কূপের চতুষ্পার্শ্ব যদি বেশ স্বাস্থ্যকর থাকে, কোনওরূপে দূষিত জল ইহার জলে পতিত বা মিলিত না হয়, যদি কূপ বেশ গভীর হয় এবং পার্শ্বদেশ উৎকৃষ্টরূপে পাটা দিয়া বাঁধান থাকে, তাহা হইলে কূপের জলই সর্ব্বথা ব্যবহার্য্য। কূপের জল দুইটি বিভিন্ন উপায়ে দূষিত হয়। প্রথমতঃ যদি ইহা গৃহের ব্যবহৃত দূষিত জলপ্রবাহের সান্নিধ্যে খনিত হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ভূমিতে কূপ খনিত হইলেও অল্পকাল পরেই জল দূষিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কূপের মুখ উৎকৃষ্টরূপে আবদ্ধ না থাকিলে মূষিক, বিড়াল ইত্যাদি নানাবিধ জীবজন্তু পড়িয়া জলে গলিত হইতে পারে। আমাদের দেশের কূপের মুখ সাধারণতঃ খোলা থাকে, এরূপ হইলে জল সহসা দূষিত হইয়া উঠিতে পারে। এই দুই দোষ হইতে কূপকে নির্ম্মুক্ত রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের অতি কর্ত্তব্য। কূপের উপরিভাগ হইতে ১৬।১৭ ফিট গভীরতা পর্য্যন্ত রীতিমত বাঁধাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ

৬ ইঞ্চ উৎকৃষ্ট করিয়া গাঁথাইয়া দেওয়া উচিত। কূপের চতুষ্পার্শ্বে অন্ততঃ ১০০ হাত দূরতা অবধি কোনরূপ জঞ্জাল আবর্জ্জনাস্তূপ বা দূষিত জল নির্গমপ্রণালী থাকা উচিত নহে। এই ভূমিখণ্ড তৃণপূর্ণ থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি বালুকাময় ভূমিতে কূপ খনিত হয়, তাহা হইলে জল ফিল্টার হইয়া কূপে সঞ্চিত হয় এবং নানাবিধ রোগবীজাণু অকসিডাইজড হইয়া ধ্বংশ হয়। এরূপ ভূমিতেই কূপ খনন করা উচিত। অন্যত্রও কূপ খনিত হইতে পারে, কিন্তু কূপ গভীর হওয়া আবশ্যক, কূপের গাত্র বহুদূর পর্য্যন্ত রীতিমত গাঁথাইয়া দেওয়া উচিত, এবং সর্ব্বকূপেরই মুখ রীতিমত বন্ধ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ কূপের জল বেশ নির্ম্মল এবং পান করিলে বেশ তৃপ্তি হইয়া থাকে।

পর্ব্বত সান্নিধ্যে যে সমস্ত দেশ রহিয়াছে, তথায় ভূগর্ভে নল প্রোথিত করিয়া অনেক স্থানে পানীয় জল উত্তোলিত করা হয়। কিন্তু এজলও যে সর্ব্বথা নিরাপদ তাহাও নহে, তদ্ব্যতীত আমাদের দেশে এরূপ নল বাহিয়া জল উত্তোলন প্রথা কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব এ সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধের পুনরালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) অকোমল জল অর্থাৎ যে জলে খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, এবং যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপাদিত হয় না, সেই জলপানে স্বাস্থ্যের কোনও রূপ হানি হইতে পারে কি না? কোন কোন পণ্ডিত ও চিকিৎসকের মতে এরূপ জল পানে পাথুরী ইত্যাদি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যে সমস্ত নগরে এইরূপ অকোমল জল ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে জলে চূণ ঘটিত পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, সেই জল ব্যবহারেও স্থানীয় বহুলোকের কোনওরূপ পীড়ার কথা শুনা যায় না। মানব নিজকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার এরূপ উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, এবং মানব প্রকৃতি এরূপ সহনশীল যে এরূপ জল পান অল্পদিনেই তাহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত হইয়া উঠে, এবং জলের যাবতীয় দোষ মানব প্রকৃতি কোনও না কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলে। বাঙ্গলায় একটা প্রবাদ আছে—"শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সওয়াইবে, তাই সয়"। বাস্তবিকই আমরা যেরূপ অবস্থাতেই উপনীত হই না কেন এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যত উৎকৃষ্ট বা যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন, আমাদের শরীর বা প্রকৃতি অল্প দিনেই তদুপযোগী হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে এবং এই দুই স্থানের জলের উপাদানগত বিভিন্নতা থাকিলে শরীরের নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত

হয়; কিন্তু এরূপ অসুস্থতা অতীব সাময়িক। অকোমল জলের প্রধান উপাদান চূণ ঘটিত পদার্থ। এই চূণ ঘটিত পদার্থ শরীর রক্ষায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। কেননা অস্থি পঞ্জর গঠনে এবং পেশীর শক্তি সংরক্ষণে চূণ ঘটিত পদার্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীর খাদ্য ও পানীয় হইতে এই পদার্থ গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত খাদ্যস্থ চূণ ঘটিত পদার্থ যেরূপ অনায়াসে শরীর গ্রহণ করিতে পারে, জলস্থ ঐ পদার্থও যে সেইরূপ অনায়াসে গৃহীত হয় না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যবিৎগণের মত এই যে, যদি জলে উপযুক্ত পরিমাণে চূণ ঘটিত পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, বা অন্য স্বাস্থ্যের অনুকূল উপাদানের অভাব না হয়, তাহা হইলে সেই জলই শরীর রক্ষার্থ ও তৃষ্ণা নিবারণার্থ সর্ব্বথা উপযোগী। অবশ্য এরূপ জল যেন অন্য কোনওরূপে দূষিত না হয়, তাহা লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অকোমল জলপান নিতান্ত অশুভকর ও স্বাস্থ্যহানিকর নহে।

(২) পরিস্রুত জল পান স্বাস্থ্যের অনুকূল কিনা? পরিস্রুত জল অর্থে ইহাই বুঝায় যে ইহাতে কোনও ধাতব পদার্থ বিগলিত নাই। ইহা রাসায়নিকের H_2O। কাজেই শরীর গঠনে যে খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, বা শরীর ক্ষয় পরিপূরণের জন্য যে সমস্ত ধাতব পদার্থ একান্ত আবশ্যক, এইরূপ জল পানে তাহাদের অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ তর্ক করা যাইতে পারে যে, আমরা প্রত্যহ যে খাদ্য ভোজন করি, তাহাতে শরীর গঠনের ও প্রাত্যহিক শরীরের ক্ষয় পরিপূরণের জন্য প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকে, অতএব জলে খনিজ পদার্থের অভাব হইলে কিছুই ক্ষতি নাই। এই হিসাবে পরিস্রুত জল (distilled water) উৎকৃষ্ট পানীয়, কেননা ইহাতে কোনওরূপ রোগবীজাণু প্রবেশলাভ করিতে পারে না।

(৩) কি উপায় অবলম্বনে গৃহস্থ দূষিত জল বা সন্দেহপূর্ণ জল বিশুদ্ধ অর্থাৎ নিরাপদ করিয়া লইতে পারেন? রোগবীজাণুই জল দূষিত করে, রোগবীজাণু জীবিত পদার্থ, অতএব তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিলেই জল নিরাপদ হইতে পারে। কিরূপে তাহাদিগকে হত্যা করা সম্ভব? উত্তাপে ধ্বংশ হয় না এরূপ জীব অতি বিরল। অতএব জলকে উত্তপ্ত করিয়া লইলে রোগবীজাণু নিশ্চয়ই ধ্বংশ হইয়া যায়। যদি কোনও জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় বা বস্তুতঃই যদি জল দূষিত হয়, এবং দেশে কোন মহামারী বা সংক্রামক পীড়া পরিব্যাপ্ত হইলে ও পীড়ার বীজাণু জল দ্বারা বাহিত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা থাকিলে, জল ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করা একান্ত উচিত এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ। জল ১০।১৫ মিনিট ফুটাইয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। এরূপে ফুটন্ত জলের আস্বাদ তত তৃপ্তিকর নহে। জলের তৃপ্তিকর আস্বাদের একমাত্র কারণ তাহাতে বায়ু মিশ্রিত

থাকে। যদি ফুটন্ত জলকে রীতিমত ঢালাঢালি বা অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ানাড়ি করিয়া রাখিয়া এবং অন্তকার উত্তপ্ত জল আগামী কল্য ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে জলের আস্বাদ অনেকটা তৃপ্তিকর হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস জল ফিল্টার করিয়া লইলে অর্থাৎ ছাঁকিয়া লইলেই পরিষ্কার পানীয় হইতে পারে। কিন্তু ফিল্টার করিলে জলে যে সমস্ত অদ্রবীভূত স্থূল পদার্থ থাকে, তাহাই অপসারিত হয়। রোগবীজাণুর ন্যায় আণুবীক্ষণিক পদার্থ ফিল্টার বাহিয়া আসিয়া পানীয় জলে পড়িতে পারে। অতএব ফিল্টার দূষিত অর্থাৎ রোগবীজাণু সমন্বিত জলের পরিশোধনার্থে পর্য্যাপ্ত নহে। তবে যদি কেহ জল প্রথমে ফুটাইয়া পরে ফিল্টার করিয়া লইতে পারেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বঙ্গদেশের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জলের এত প্রাচুর্য্য আর নাই। এবং এরূপ বিশুদ্ধ জলের দেশও জগতে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। যে দেশে ভাগিরথী প্রবাহিতা, সে দেশে কল্যাণপ্রদ জলের অভাব হইতেই পারে না। কেবল আমরা সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে অনায়াসে নানা বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

আলোক।

(ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আলোক বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য ঘটনার ব্যাখ্যায় অবয়ব ঘটিত সমীকরণ অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই সমস্ত সমীকরণের মধ্যে বোসিনে যেগুলিকে প্রস্তাবিত করিয়াছে, তাহাই সবিশেষ ধর্ত্তব্য। কিন্তু এই সমস্ত সমীকরণ দ্বারাও সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে,—আলোকের প্রবাহণ কালে ইথার স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে,—এইরূপ অনুমান করিয়া লইয়াও, আলোকের ধর্ম্ম হইতে ইথারের ধর্ম্মের কিরূপ পার্থক্য তাহা স্থির করিয়া লওয়ার জন্য যে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে তাহা আংশিক ভাবে মাত্র সফল হইয়াছে। কেননা যে কোন উপপত্তি দ্বারাই আলোকের নৈসর্গিক ব্যপার সমূহ ব্যাখ্যাত হউক না কেন, কিরূপে ইথারের ঘনত্ব এবং কাঠিন্য সঞ্জাত হইতে পারে, এবং বস্তু ও ইথারের

মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে শক্তি সঞ্জাত হয়, তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি কিরূপ তাহার মীমাংসা অবিসংবাদিতরূপে হইয়া উঠে না। তবে যদি ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ক্ষেত্রকেই আলোক সম্বন্ধীয় উপপত্তির ইথার ঘটিত আশ্রয় ধরিয়া লওয়া হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কতকটা মীমাংসিত হইতে পারে। ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের অভিমত উল্লিখিত হইতেছে :—

Although to fill all space with a new medium, whenever any phenomenon is to be explained, is by no means philosophical, if the study of two different branches has independently suggested the idea of medium and if the properties which must be attributed to the medium in order to account for electromagnetic phenomena are of the same kind as of those which we attribute to the luminiferous medium, in order to account for the phenomena of light, the evidence for the physical existence of the medium will be considerably strengthened.

এক্ষণে আলোক ঘটিত নৈসর্গিক ব্যাপারের এই ইথার সম্বন্ধীয় অবলম্বন, আলোকের তরঙ্গ মূলক উপপত্তি অনুসারে, নিশ্চয়ই একটি শক্তির আধার হইয়া পড়ে। অতএব প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন এই যে, ইলেক্‌টো-ম্যাগনেটিক্ নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহের যে অবলম্বন তাহাও শক্তির আধার কি না?

ফ্যারাডে এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিকের আশ্রয়ও শক্তির আধার, এবং স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, তড়িৎ ও চুম্বকের শক্তি পরিচালন রেখার আদর্শে, ইলেক্‌ট্রোষ্টাটিক ও ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রে একটা টানের অবস্থা উৎপন্ন হয়। ম্যাক্সওয়েল এই সমস্ত ধর্ম্মের গণিত মূলক তথ্যের জন্য গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন যে, ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক বিক্ষোভ আলোকের গতির সহিত সমবেগে পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে যে সমস্ত তড়িৎ মূলক পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে অতি পরিষ্কার সামঞ্জস্য ও ঐক্য ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্ত উপপত্তির যথার্থ নির্দ্ধারণ এখনও হইয়া উঠে নাই। পরে মহামতি হার্জ তাঁহার গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত করিলেন যে, চৌম্বক কম্পন ঠিক আলোকের গতির সহিত সমভাবে ও সমবেগে পরিচালিত হয়। অতএব ম্যাক্সওয়েল দ্বারা প্রস্তাবিত উপপত্তি এই আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এই আবিষ্ক্রিয়াই তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তা প্রেরণ আবিষ্ক্রিয়ার মূল।

অতএব ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের উপপত্তি অনুসারে প্রায় সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাই করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা এখনও কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়া উঠিতেছে না।

ম্যাক্সওয়েল যে গণিতমূলক সমীকরণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, হার্জ তাহাকে আরও একটু সংস্কৃত করিয়া কয়েকটী বিষয় ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কতকগুলি বিষয় এখনও অব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তবে যদি মহামতি লরেঞ্জ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত ইলেক্‌ট্রনএর উপপত্তি অনুমান করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এই ইলেক্‌ট্রনকে করপাস্‌কল্‌ও বলে। ইহারা অতি ক্ষুদ্র,—পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, এবং ইহারা বিসম তড়িন্ময়।

এই ইলেক্‌ট্রন একবারেই কল্পিত নহে, ইহাদের অস্তিত্ব জে, জে, টমসন্‌ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ক্রুক্‌স্‌ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারাই ক্যাথোড্‌ রশ্মি। এই সমস্ত রশ্মি র‍্যাডিয়ো-এ্যাক্‌টিভ পদার্থ হইতে বহির্গত হয়।

অতএব আমরা তিনটি প্রধান পদার্থ পাইতেছি। (১) ইথার, (২) ইলেক্‌ট্রন্‌, (৩) বস্তু (matter)। এই ইলেক্‌ট্রন্‌ সমস্ত ইথার ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং এই ইলেক্‌ট্রন্‌ জটিলতা প্রাপ্ত হইলেই বস্তু বা matter উৎপন্ন হয়। যে নিয়ম অনুসারে এই তিন পদার্থ স্বাধীন ভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে, যে দিন সেই নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে, সেই দিনই কম্পন-শক্তি কিরূপে প্রবাহিত ও পরিচালিত হয়, তাহা সম্যক প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবে; এই কম্পন দ্বারাই আলোক গঠিত হয়।

———

ছাতা।

MUCOR.

ছাতার (umbrella) ন্যায় দেখিতে বলিয়া Mucorএর চলিত নাম ছাতা বা 'বেঙের ছাতা'। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য দুই চারি দিবস কোন একটী আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, তখন আমরা দেখি শাদা শাদা পদার্থ, সেই খাদ্যের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। এই শাদা শাদা পদার্থকে আমরা গার্হস্থ্য ভাষায় 'ছ্যাতারে ধরা' বলি। রন্ধনের পাত্র সমস্ত রজনীব্যাপী বিশ্রামের পর উত্তমরূপে ধৌত করার প্রধান উদ্দেশ্য, এই পদার্থের দূরীকরণ। এই উদ্ভিদ নানা স্থানে নানা প্রকার অবয়ব ধারণ করিয়া থাকে। মোটের উপর সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, কোন না কোন আশ্রয়ে ছাতা (mucor) জন্মিয়া থাকে। আশ্রয় ব্যতীত ইহাদের উদ্ভব অসম্ভব। সেই জন্য এই উদ্ভিদকে গলিতভুক্ (Saprophyte) কহে। অন্যান্য গলিত উদ্ভিদের ন্যায় ইহা আশ্রয়দাতার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে না। ইহার সম্যক বৃদ্ধি কোন ঐন্দ্রিক পদার্থের (organic matteএর) উপরই দেখা যায়। ঘোড়া বা গাভীর বিষ্ঠার উপরও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। সময়ক্রমে এই শাদা শাদা পদার্থ বর্দ্ধিত ও যুক্ত হইয়া যায়। এবং যতই এই উদ্ভিদ বর্দ্ধিত হয়, ততই সরু সরু সুতার ন্যায় শাখা প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই সরু সরু শাখা প্রশাখাগুলির নাম মাইসিলিয়াম (mycilium) এবং প্রত্যেক সরু সুতার ন্যায় শাখার নাম হাইপা (hypha) ইহাদের মধ্যে অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় ছোট ছোট কোষ (cell) নাই। ইহাদের মধ্যে যে শক্তিশালী পদার্থ আছে তাহার নাম প্রটোপেলেসম্ (protoplasm) এই পদার্থের বর্ত্তমানেই উদ্ভিদগণ সম্যক বর্দ্ধিত হয়। আবার ইহার বিনাশ হইলে, উদ্ভিদ সকল শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া যায়। এই শক্তিশালী পদার্থের মধ্যে শূন্য স্থান (vacuoles) ও তৈলময় গোলাকার পদার্থ (oil globules) আছে। যে পদার্থের (chlorophyll) বর্ত্তমানে অন্যান্য উদ্ভিদে পত্র সকল সবুজ বর্ণ হয়, ইহাতে সেই পদার্থ নাই। দুই প্রকারে এই উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বীজ হইতে, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী পুং শক্তির একত্র মিলনে। এক্ষণে আমরা ইহাদের উৎপত্তি লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

যখন এই উদ্ভিদ অতি ক্ষুদ্র থাকে, তখন ইহা নিজের আশ্রয়দাতার উপরেই সরু সরু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। কিন্তু যতই বড় হয়, ততই ইহার নানা প্রকার দৈহিক বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এবং ক্রমে ইহা আকাশের দিকে সরু শাখা লইয়া উত্থিত

হয়। এই শাখাগুলির উপর অংশ গোলাকার। এই গোলাকার অংশকে গনিডেনগিয়াম (gonidangium) কহে। ঊর্দ্ধে উত্থিত শাখার অগ্রভাগ স্ফীত হওয়াতে, এই গোলাকার গনিডেনগিয়াম (gonidangium) উৎপন্ন হয়। এই গোলাকার পদার্থের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ (Gonidia) জন্মে। কয়েক ঘণ্টা পরে এই গোলাকার অংশ বিভিন্নকারী দেওয়ালের (partition wallএর) দ্বারা নিম্নপ্রদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া যায়, এবং উন্মুক্ত ছাতার (umbrellaর) ন্যায় আকার ধারণ করে। যতই এই বিভক্ত গোলাকার অংশ পাকিতে থাকে ততই ইহার রং কাল হইয়া যায় ও ইহার দেওয়াল গাত্রে ক্যালসিয়াম অকজ্যালেট (calcium oxalate) জমিয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে ঐ গোলাকার অংশ ফাটিয়া যায় এবং ছোট ছোট বীজ (Gonidia) বহির্গত হয়। এই মুক্ত বীজ (Gonidia) নলের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং ইহা হইতে নূতন শ্বেতসূত্রবৎ ছাতা (mycilium) উৎপন্ন হয়।

জলাভাব বশতঃ ও অন্যান্য আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনা প্রযুক্ত যখন বীজ হইতে, এই উদ্ভিদের উত্থান সম্ভবপর হইয়া উঠে না, তখনই স্ত্রী ও পুং শক্তির দ্বারা এই উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দুই শক্তি, এই উদ্ভিদের মধ্যেই থাকে। যখন একটী সরু সূতার ন্যায় শাখা (hypha) নিকটবর্ত্তী অপর একটী শাখার অগ্রভাগে আসিয়া মিলিত হয় তখন তাহারা একত্র মিশ্রিত হইয়া যায় এবং তাহাদের মিলনে একটী গোলাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; তাহার নাম জাইগোসপোর (zygospore)। ইহার দুইটী আবরণ আছে। বাহিরের আবরণের নাম একসয়স্পোর (exospore) এবং ভিতরের আবরণের নাম এণ্ডস্পোর, (endospore)। এই ভিতরকার আবরণটী অতিশয় নরম। কয়েক মাস ধরিয়া এই গোলাকার উৎপন্ন পদার্থটী স্থির ভাবে থাকে। অবশেষে ইহা বিকশিত হয়। ইহার বাহিরের আবরণটী (exospore) ফাটিয়া যায় এবং ভিতরের আবরণ (endospore) হইতে সরু শাখা (hypha) বহির্গত হয় এবং ক্রমে বহুসংখ্যক শাদা শাদা শাখা চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে ছাতার বহুল প্রচার হইয়া থাকে।

যদি ছাতার এই শ্বেত শাখা-প্রশাখা কোন বলকারী জলীয় পদার্থের (Tonic Solution) মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে ছোট ছোট কোষ (cell) প্রস্তুত হয়। এই কোষগুলির মধ্যে কখনও কখনও মোটা দেওয়াল থাকে এবং উপযুক্ত অবস্থায় ইহা হইতে নূতন শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, কোষগুলির দেওয়াল সরু হয়। এই ইহা হইতে নূতন শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ফেনযুক্ত মদের ন্যায় শর্করাবৎ জলীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদ্ভিদের এই অবস্থার নাম টরুলা অবস্থা (Torula condition)।

এতক্ষণ আমরা কেবল এই উদ্ভিদের সামান্য জীবন কাহিনী (life history) লইয়াই বিব্রত ছিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, এই উদ্ভিদ বাস্তব জগতে কতদূর উপকার এবং অপকার করিয়া থাকে। সাংসারিক আচরণে এই ছাতা আমাদের খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার আগমনে খাদ্যে লালসার পরিবর্ত্তে যথেষ্ট বিরক্তিই জন্মিয়া থাকে। আবার অন্যান্য ছাতা বাগানের শস্য ও গাছের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণে সুশ্যামসুন্দর বৃক্ষরাজি কৃশ ও বর্ণহীন হইয়া উদ্যানের সৌন্দর্য্য হরণ করে। আমাদের গৃহের কাঠ, কড়ি, বরগায় উৎপন্ন হইয়া, এই ছাতা সেই সকল কাষ্ঠগুলিকে শক্তিহীন করিয়া দেয়! কিন্তু এত অপকার করিয়াও ছাতা (mucor) আমাদের উপেক্ষা লাভ করে না। তাহার প্রধান কারণ ইহা আমাদের খাদ্যরূপে নির্দ্ধারিত হয়। ইহার ডালনা অনেক কুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তির রুচি ফিরাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত মৃত ঐন্দ্রিক পদার্থের (dead organic matterর) উপর জন্মিয়া ইহা সেই অনিষ্টকর পদার্থকে নানা ইষ্টকর বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে কারবণ ডায়কসাইড (carbon dioxide) ও এমোনিয়া (Ammonia) মুক্ত হয়। এইরূপে নানা প্রকার অনিষ্টজনক ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থের উপর জন্মিয়া ছাতা (mucor) বাস্তবজগতে, একটী পরহিতে ব্রতধারী সন্ন্যাসীর কার্য্য করে। যদি এই ছাতার (mucorএর) সৃজন সৃষ্টিকর্ত্তার স্মৃতি এড়াইয়া যাইত, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিক মতে, বোধ হয় অনেক দেশ মহামারি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া এতদিনে জনশূন্য হইয়া যাইত। অনিষ্টকর মৃত ঐন্দ্রিক পদার্থ এইরূপে বিভক্ত হইলে যে কারবণ ডায়কসাইড বাষ্প (carbon dioxide gas) উৎপন্ন হয়; তাহা সবুজ বর্ণ পত্রধারী বৃক্ষ রাজির পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়, এবং সেই সকল উদ্ভিদ হইতে জগতের বহুপ্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

রোগ বীজাণু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ অথবা জন্তু হইতে ভীষণ রোগের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্যই ইহারা বীজাণু বলিয়া খ্যাত হয়। ইহাদের সংখ্যাও পরাশ্রয়ী গণের মত। যন্ত্রের সাহায্য বিনা ইহারা আদৌ প্রত্যক্ষী-ভূত হয় না অর্থাৎ ইহারা সকলেই আনুবীক্ষণিক। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। সুতরাং এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রীতি, প্রকৃতি বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন রোগবীজাণু কোন কোন রোগের উৎপাদক এখন আমরা তাহা সহজেই বলিতে পারি। আশা করা যায় এইরূপ সত্বরই আমাদের জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত হইবে ও আমরা সর্ব্ববিধ রোগের কারণ নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইব।

রোগবীজাণুগুলি কত ক্ষুদ্র সে বিষয়ে ধারণা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। কারণ তাহারা এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। তাহাদের মত—দুই লক্ষ জীব সারি ভাবে রাখিলে তবে এক ইঞ্চি লম্বা হয়। অপরিস্কৃত স্থান হইতে কণা পরিমান ধুলা লইলে দেখা যায় যে তাহার মধ্যে অসংখ্য বীজাণু রহিয়াছে। সুচিভেদ্য ছিদ্র মুখে তাহাদের মত শত জীব একত্রে যাতায়াত করিতে পারে। একটী উদাহরণ দ্বারা আরও পরিস্কৃত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় পোস্তদানা দেখিয়াছেন। একটী পোস্তদানার পরিমাণ সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই অভিজ্ঞতা আছে। এই ক্ষুদ্র বীজাণু প্রায় সহস্রা-ধিক একত্রিত ভূত হইলে তবে একটী পোস্তদানার মত দেখিতে হয়। তবে তাহাদের বড় দুই চারি জাতি আছে। বৃহত্তরগুলিও সামান্য পোস্ত দানার শতাংশের একাংশও নয়। ইহাদের পরস্পরের আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদের অধিকাংশ বায়ু-হীন স্থানে বাস করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র বীজাণুগুলিই ভীষণ রোগের প্রবর্ত্তক। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা অসাধারণ বলশালী (অবশ্য বলশালী বলিতে কেহ যেন মনে না করেন যে তাহারা হেলায় অসাধারণ কার্য্য করিতে পারে)। অতি বিশালকায় হস্তীকে ইহারা সহজে পীড়িত এমন কি মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে পারে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষও ইহাদের কাছে

পরান্ত। তাহারা শরীরে toxin নামক এক প্রকার বিষের সৃষ্টি করে। ইহা রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বা শারীরিক কোন যন্ত্রের উপর কার্য্য করিয়া জীবের জীবিত কোষ অথবা কোষ সমষ্টিকে (tissue) ধ্বংস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত করে।

তাহারা ক্ষত ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন প্রকারের ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষত, চুয়াল ধরা (Lock-Jaw) প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। মুখ দিয়া উদরে প্রবেশ করিয়া ওলাউঠা, বসন্ত, রক্তমাশায়, টাইফয়েড় প্রভৃতি পীড়ার সৃষ্টি করে। বায়ুর সহিত নাসা পথে ও শ্বাস নালীতে প্রবেশ করিয়া শ্বাসবন্ধ (Diptheria) কাশ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

তাহারা কিরূপ ভাবে জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধি করে তাহা জানিবার পূর্ব্বে তাহাদের আকার সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ তাহারা চারি প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বলের মত গোল, কতকগুলি সোজা ও লম্বা, কতকগুলি সোজা ও লম্বা হইলেও তাহাদের শেষভাগ গোল, কতকগুলি স্ক্রুর মত প্যাঁচাল। ইহাদের কতকগুলির লেজ আছে। সম্ভবতঃ সেই লেজ নাড়িয়া ইহারা চলা ফেরা করে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহাদের বংশবৃদ্ধি ও জীবন ধারণের কথা বলা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগবীজাণুগুলি যে কোন জীবিত বা মৃত প্রাণীকে আক্রমণ করে ও তাহাদের দেহ হইতে রস সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অপরিস্কার ধূলা ও ময়লার মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও জান্তব মৃত পদার্থ পড়িয়া থাকে তাহাতে তাহারা বর্ত্তমান থাকে। এমন কি আমাদের পরিত্যক্ত মল ও মূত্র মধ্যে তাহারা বর্ত্তমান থাকিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা প্রত্যহ তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী বহু পদার্থ পরিত্যাগ করি। আমাদের মল মূত্রাদি, আমাদের ঘরের ধূলা ময়লা এবং আমাদের শৌচাদি করার জল প্রভৃতি সকল বস্তুই তাহাদের দ্বারা পূর্ণ থাকে ও এই সকল বস্তু হইতেই তাহারা তাহাদের খাদ্য গ্রহণ করতঃ বংশ বৃদ্ধি করে। সুতরাং এই সমস্তগুলি ধ্বংস না করিলে যে বীজাণুগণ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সময় মত ও সুবিধা পাইলেই আমাদের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা মাটী ও জলে

বাস করে এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বায়ু দ্বারা আমাদের দেহে প্রবেশ লাভ করে। তাহাদের আকৃতিগত ক্ষুদ্রতা মনে করিলেই দেখা যাইবে যে তাহারা কণা মাত্র ধূলার সহিত আবদ্ধ থাকিতে পারে ও বায়ুসহ আমাদের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে ও নানাবিধ রোগের কারণ স্বরূপ হয়। তাহারা দেহ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আহার্য্য পায় ও তৎপরে বংশ বৃদ্ধি করে। অপরিস্কৃত জলের সহিত এইরূপ ভাবে তাহারা আমাদের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে এবং সময়ে সময়ে শরীরের সামান্য ঘায়ের সহিত দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদির কারণ হয়।

তাহারা পূর্ণ মাত্রায় আহার পাইবার পর বংশ বৃদ্ধি আরম্ভ করে। দ্বিবিধ উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হয়। কতকগুলি স্বতঃই দ্বিভক্ত হয় ইহরা দুইটী জীবরূপে পরিগণিত হয়। তাহারা আবার সত্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ও দ্বিভক্ত হয়, এইরূপে বংশবৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিভক্ত সুতরাং ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে কত শীঘ্র তাহারা বংশবৃদ্ধি করিয়া অসংখ্যে পরিণত হয় ও কত শীঘ্র তাহারা কার্য্যকারী হয়। কারণ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটী হইতে দুটী হয়, এক ঘণ্টা পরে দুটী হইতে চারটী ও দুই ঘণ্টা পরে চারটী হইতে ষোলটী হয় ও এইরূপে ১২ ঘণ্টা পরে প্রায় চল্লিশ লক্ষে পরিণত হয়। এবং প্রায় অধিকাংশ সময় এই সময়েই লোকে অসুস্থতা বোধ করে। খুব সম্ভবতঃ অনেকগুলি এক সঙ্গে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে ও শরীরকে শীঘ্র পীড়িত ও ক্লান্ত করে। সুতরাং যদি সময় থাকিতে তাহাদিগকে প্রতিরোধ না করা যায় ত অতি অল্প সময়ে অসংখ্য জীবাণু একত্রিত হইয়া রোগকে ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপে পরিবর্ত্তিত করে ও সত্বরই মৃত্যুর পন্থা সরল করিয়া দেয়। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের দেহে তাহাদের ধ্বংসকারী শত্রুও আছে। তাহারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সত্বরই ইহাদিগকে নিঃশেষ করে। কি উপায়ে এই ধ্বংস কার্য্য হয় তাহা পরে বলিব। দ্বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করা এক উপায় দ্বিতীয় উপায়টী এই যে তাহারা ডিম্ব (Spore) উৎপাদিত করে। এই ডিম্বগুলি সত্বর নূতন বীজাণুরূপে পরিগণিত হয় ও বীজাণু গঠনে সাহায্য করে ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে অল্প সময়ের মধ্যে ইহরা অসংখ্যে পরিণত হয়। এবং পূর্ব্বে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহারা সত্বর অধিক পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করে। কতকগুলি বীজাণু আছে যাহারা ডিম্বাবস্থাতেই বংশবৃদ্ধি করে। ইহাদের ডিম্বগুলি সচরাচর এক প্রকার আটার মত বস্তু দ্বারা একত্র সংশ্লিষ্ট থাকে। তাহাদের এ ছাড়া অন্সের অথবা রুদ্রাক্ষের মালার মত বোধ হয়। রোগবীজাণু ভিন্ন অন্য বীজাণুও আছে। ইহারা বহু উপায়ে মানুষের শিল্পে ও জীবিকা নির্ব্বাহের সাহায্য করে। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণী ferment নামে পরিচিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা কয়েকটী ভীষণ ও সংক্রামক রোগের পরিচয় দিব। এই রোগগুলি প্রায়স মনুষ্যকে আক্রমণ করে ও দেখিতে দেখিতে এত সংক্রামক হইয়া পড়ে, যে তখন ইহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। তবে পূর্ব্বে সাবধান হইলে কিরূপে এই ভীষণ ব্যাধিগুলি হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা আমরা এক একটা রোগের সহিত বিবৃত করিব।

কলেরা বা ওলাউঠা

কলেরা কি ভয়ানক রোগ তাহা আমাদের দেশের ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। অতি স্বল্পকাল মধ্যে এই রোগ অতি বলশালী ব্যক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে ও সত্বরই মৃত্যু মুখে পতিত করে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই রোগের বীজাণুগুলি অন্ত্র সমূহকে আক্রমাণ করে ও উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যায়। তরল মল বাহির হইতে থাকে ও রোগী নিজেকে দুর্ব্বল মনে করে। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় ও নাড়ী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। রোগীর রক্ত ঘন হইয়া যায়। শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয় ও স্বর বন্ধ হইয়া যায়। হাতে "খাল" লাগে, ও রোগী অত্যধিক যন্ত্রণা অনুভব করে। রোগের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় তাহা আমরা এখন দেখিব। এই রোগের আক্রান্ত ব্যক্তির মল মূত্রাদি যে সকল পুষ্করণী অথবা জলাশয়ে ধৌত করে রোগ বীজাণুগুলি সকল পুষ্করণী অথবা জলাশয়ে বংশ বৃদ্ধি করে। পাড়াগাঁয়ে প্রায়ই দেখা যায় এক আধটী পুকুরের জল ভাল। মনুষ্য ব্যবহারোপযোগী থাকে। সেই পুকুরের জল এইরূপ ভাবে দুষ্ট হইলে (এবং প্রায়ই দেখা যায় যে লোকে রোগের ও বিস্তৃতির কারণ অনুধাবন না করিয়া যে পুকুরের জল পানীয় অথবা অন্য কারণে ব্যবহার করে সেই পুকুরেই ধৌতাদি করে। প্রায় গ্রামে মহামারী উপস্থিত হয়। সুতরাং রোগীর মল মূত্রাদি ধৌত করণ সম্বন্ধে একটু সাবধান হইলে অনেক সময় রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অপরিষ্কার জলই রোগের কারণ সুতরাং পরিস্কৃত জল ব্যবহার করিলে এই ভীষণ রোগ আর আক্রমণ করিতে পারে না। পরিষ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে দেখা যায় যে কলেরার আক্রমণও কমিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জল ব্যবহারে সাবধানতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিলে কলেরার মত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি রোগের নাম করিব। এই রোগগুলিও অপরিস্কৃত জলে পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি লাভ করে সুতরাং পরিষ্কার জল ব্যবহার করিলে ও ইহাদের সম্বন্ধে ও কতকটা দুর্ভাবনা দূরীভূত হয়। ইহাদের

মধ্যে আন্ত্রিক জ্বর (typhoid fever) উদরাময় (Diarrhœa) এবং রক্তামাশয় (Dysentery) প্রধান।

ধনুষ্টঙ্কার রোগ Tetanus এই রোগের আক্রমণ যে কি ভীষণ তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। রোগীর অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। অথচ অতি সামান্য কারণে এই রোগ আক্রমণ করে। একবার আক্রান্ত হইলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে ও রোগী কিয়ৎকাল অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সত্বরই দেহ রক্ষা করে। এই রোগের বীজাণুগণ দেখিতে নখাংশের ন্যায়। ইহারা মাটীর উপর থাকে ও ডিম্ব প্রসব করে। সর্ব্বত্র অল্প বিস্তর পরিমাণে ব্যপ্ত থাকিলেও অশ্ব অথবা গোশালার মল মূত্রাদি মিশ্রিত মাটীতে অধিক পারিমাণে বিদ্যমান থাকে ও সুবিধা পাইলে মনুষ্য ও অথবা অন্যান্য জীবগণকে আক্রমণ করে। মল মূত্রাদি মিশ্রিত মাটী যখন শুষ্ক হইয়া ধূলায় পরিণত হয় তখন বাতাসে উড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে এই বীজাণু ডিম্বগুলিও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও তদবস্থায় জীব শরীর আক্রমণের অপেক্ষা করে। ক্ষত স্থানই ইহারা প্রথমে আক্রমণ করে। হাতে পায়ে অথবা শরীরের কোন অনাবৃত স্থানে কোনরূপে কাটিয়া ও পুড়িয়া গেলে যদি ক্ষত হয় আর যদি সেই সব স্থান এই কীটাণু দুষ্ট স্থানে সংশ্লিষ্ট হয় তবে এই বীজাণু ডিম্বগুলি তাহাতে লাগিয়া যায় ও সত্বরই ফুটিয়া রোগ বীজাণুতে পরিণত হয়। ক্ষত স্থানে এই সমস্ত বীজাণুগুলি সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও এক প্রকার বিষ (Toxin) উৎপন্ন করে। ঐ বিষ স্নায়ু মণ্ডলীতে ও মস্তিস্কের উপর ক্রিয়াবান হইয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগ উৎপন্ন করে। ধনুষ্টঙ্কার রোগে অতি প্রাক্কালে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া উচিৎ কিন্তু তাহাতেও সকল সময় বিশেষ ফল লাভ হয় না।

কয়েকটী বিষয়ে উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে নিম্ন লিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা যায়:—

১ম। ক্ষত স্থান অনাবৃত থাকিলে কোন না কোন প্রকারে আবর্জ্জনা মিশ্রিত মাটীর সংযোগে আসিতে পারে। সুতরাং ক্ষত স্থান অনাবৃত রাখা উচিত নয়।

২য়। ক্ষত স্থান পরিস্কার রাখাও একান্ত কর্ত্তব্য কারণ ঐ স্থান বীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও পরিস্কার করিবার কালে উহারা মরিয়া অথবা সরিয়া যায়। ফুটন্ত জল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ধৌত করা উচিত কারণ ফুটন্ত জলে কোন বীজাণু জীবিত থাকিতে পারে না। উত্তমরূপে ধৌত হইবার পরে পরিস্কার কাপড় কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা শুখাইয়া বাঁধিয়া রাখা উচিৎ।

৩য়। কাটিয়া গেলে অনেকে একটু ধূলা অথবা একটু ঝুল লাগাইয়া দেন। ক্ষত হইলে অনেকে অপরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখেন। খোস পাচড়া হইলে

অনেকে ধুলা মাটী মিশ্রিত ঔষধ লাগান ও ধুলা মাটীর উপর বসেন। ফোড়া হইয়া ফাটিয়া গেলে পর অনেকে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দেন অথবা সামান্য 'শুখা মলম' ইত্যাদি লাগান। কিন্তু এই প্রথাগুলি অতীব গর্হিত কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহাদ্বারা ধনুষ্টঙ্কার বীজাণুগুলিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়।

৪র্থ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সর্ব্বদা ধুলা, বালি প্রভৃতি ঘর দ্বার হইতে সরাইয়া ফেলিলে রোগের আক্রমণ অনেক অংশে নিরাকৃত হয়।

উপরোক্ত উপায় কয়টী অবলম্বন করিলে কেবল যে ধনুষ্টঙ্কারের ভীষণ ও মারাত্মক রোগ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহা নহে। ইহা দ্বারা ফোড়া, পৃষ্ঠ ব্রণ ইত্যাদি রোগ হইতেও নিস্কৃতি পাওয়া যায়। ফোড়া ইত্যাদি হইলেও ময়লা কাপড় ব্যবহার করা উচিৎ নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না হয় ততক্ষণ ফুটন্ত জল গরম থাকিতে থাকিতে ধুইয়া সিদ্ধ করা কাপড় শুখাইয়া বাঁধিয়া রাখা উচিৎ।

সকালে উঠিয়া প্রত্যেকই বোধ হয় অনুভব করেন যে মুখ বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুখে নিশ্চয়ই কোন কিছু অন্যায় দ্রব্য গঠিত হইয়াছে। মুখ জল দ্বারা ধৌত করিয়া সেই জল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় অসংখ্য বীজাণু ভাসিতেছে। সুতরাং মুখ ধৌত না করিলে শুধু যে দাঁতের অনিষ্ট হয় তাহা নয়। ইহা হইতে অনেক কঠিন পীড়াও আক্রমণ করে। সুতরাং প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে পরিস্কার রূপে দাঁত মাজিয়া মুখ ধোওয়া উচিত ইহাতে শুধু যে দন্তগুলি ভাল থাকে তাহা নয় শরীরও অনেক ভাল থাকে।

উপরোক্ত রোগ ও তাহার বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই রোগবীজাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রধান উপায়।

বিউবনিক প্লেগ Bubonic plague

ইহা যে ভীষণ ব্যাধি তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই আবগত আছেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও পার্শ্বস্থ স্থানগুলি ইহার আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই রোগের আক্রমণে অকালে কাল কবলিত হইয়াছে। ইহার আক্রমণও অতিশয় সাংঘাতিক। অতি অল্পকালের মধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগ সম্বন্ধে অধিক কথা লেখা বাহুল্য মাত্র কারণ সকলেই অল্প বিস্তর এই রোগের প্রকৃতির বিষয় জ্ঞাত আছেন। এই রোগ দুরারোগ্য। তবে অধ্যাপক লাজর ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া ইহার নিরাময়ের উপায় স্থির করিলেও ইহা সর্ব্বথা ফলপ্রদ নহে। আমরা এই রোগের বর্ণনা না করিয়া এই রোগ প্রতিরোধের উপায় কি তাহা জানাইব। আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে "আলাহিদা" করিয়া রাখা উচিৎ। রোগ-দুষ্ট স্থান হইতে আগত ব্যক্তি অথবা জন্তুকে কিছু সময়ের জন্য সম্পূর্ণ আলাহিদা করিয়া রাখা উচিৎ। অবশেষে মূষিকগণকে সংহার করা উচিত কারণ অধিকাংশ

বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে মূষিকগণই এই রোগের বাহন। মূষিকগণ ময়লার মধ্যে বাস হেতু এই রোগে আক্রান্ত হয় পরে মরিয়া যাইলে মাছি প্রভৃতি ইহার উপর বসিয়া মানবের শরীরে রোগবীজাণু সঞ্চালিত করে। কলিকাতায় যখন প্লেগ হয় তখন ইহার সংক্রামকতা যত অধিক ছিল এখন আর তত নাই। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক মূষিক বিনাশ ইহার প্রধান কারণ। প্রায় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা সর্ব্বাগ্রে উচিৎ। এই উপায় অবলম্বিত হওয়ায় প্লেগ কমিয়া গিয়াছে।

কুষ্ঠ Leprosy — ইহা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রী ও গলিত হইয়া পড়ে। কিরূপে ইহা সংক্রামিত হয় তাহা সম্যকরূপে জানা না থাকিলেও বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে আক্রান্ত ব্যক্তির সহিত একত্র বাস এক শয্যায় শয়নই ইহার প্রধান উপায়। ছারপোকার দ্বারাও এই রোগ সংক্রামিত হয়। সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে যে সম্যক পরিচ্ছন্নতাই রোগ নিবারণের উপায়।

বসন্ত Small pox — বসন্তও একটী সংক্রামক ব্যাধি। বসন্ত একবার আরম্ভ হইলে তখন অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে। এই রোগের বীজাণুগুলি এক ব্যক্তির আক্রান্ত চর্ম্ম হইতে অন্য সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। রোগীর সহিত বাস, রোগীর পরিধেয় পরিধান ও রোগীর গাত্রে উপবিষ্ট মক্ষিকাগণ এই রোগ সংক্রামিত করে। আক্রান্ত ব্যক্তি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মরিয়া যায়। কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকল হয়। কখনও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ও নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে বহু ব্যক্তি এই রোগে কালকবলিত হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই ইহার প্রতিবিধানের উপায় হইয়াছে।

টীকা Vaccination — এই উপায়ের নাম "টীকা" দেওয়া। টীকা লইলে অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশেও টীকার প্রচলন ছিল কিন্তু অনেক সময় তাহাতে জীবনের হানি হইত। মনুষ্য বীজ দ্বারা এই টীকা দেওয়া হইত। কিন্তু এখন আইনানুসারে সেই প্রথা রহিত হইয়া গোবীজ টীকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ফলও সুন্দর হয় ও জীবনের আশঙ্কাও অল্প। গোবীজ-টীকা প্রচলিত হইয়া বসন্তের প্রকোপ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

টীকার বীজ প্রস্তুতের উপায় — প্রত্যেক রোগবীজাণুই দেহ মধ্যে বিষের উৎপাদন করে। পরে সেই বিষ অধিক মাত্রায় একত্রিত হইলে আমাদের যন্ত্রগুলিকে আক্রমণ করিয়া নিস্তেজ করিয়া ফেলে। ক্রমশঃ মৃত্যু মুখে পতিত করে। বিভিন্ন প্রকার বীজাণু বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রকে আক্রমণ করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে বীজাণু বিষের রাসায়নিক (Chemicals) করে ও শারীরিক (Physiological) প্রতিষেধক (antitoxin) আছে। এই প্রতিশোধকগুলি আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট

হইয়া বীজাণু বিষকে আক্রমণ করে, শক্তিহীন করিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা করে। এই বীজাণু বিষ-প্রতিশোধক দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করানর নাম টীকা লওয়া। টীকা তৈয়ারী করিতে হইলে রোগ বীজাণু লইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত দ্রব্যের মধ্যে রাখিয়া বংশবৃদ্ধি (Culture medium) করিতে দিতে হয়। সেই বীজাণুগণ সেখানে রোগের সৃষ্টি করে। যে বস্তুতে রোগের সৃষ্টি হয় সেই মিশ্রিত বীজাণুগুলিকে টীকার বীজ (vaccine lymph) বলে। অনেক স্থলে এই বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করা হয় ও পরে এই বীজাণু লইয়া শরীরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে প্রথমতঃ খুব সামান্য ভাবে পীড়া হইলেও পরে আর রোগ জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুদিগকে অতি বাল্যে টীকা দেওয়া উচিৎ ও পরে প্রত্যেক ৫ অথবা ১০ বৎসর অন্তর টীকা লইলে আর বসন্তের ভয় থাকে না। একবার এক রোগের টীকা লইলে আর সচরাচর তাহা আক্রমণ করিতে পারে না বা আক্রমণ করিলেও ভয়ানক ভাব ধারণ করে না। সুতরাং সকলেরই টীকা লওয়া উচিৎ ও যাহাতে টীকার সহজ প্রচলন হয় তাহার উপায় করা উচিৎ।

ক্ষয়কাশ Consumption ইহাও একটী ভীষণ ব্যাধি। এই বীজাণু বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া আমাদের শ্বাস যন্ত্রের মধ্যে নীত হয় ও শ্বাস যন্ত্রকে আক্রমণ করে। কাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বীজ উঠে; পরে অন্যান্য লোককেও আক্রমণ করে।

পূর্ব্বোক্ত রোগগুলি যে স্থানে চিরকাল হয় তথায় ইহার সংক্রামকতা কমিয়া আসে, কিন্তু কোন নূতন স্থানে সংক্রামিত হইলে বড় সাংঘাতিক হইয়া উঠে সুতরাং আমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহাতে এক স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে রোগ প্রসারিত ও ব্যাপ্ত না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিৎ।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যদি আমরা আমাদের আহারে বিহারে, শয়নে, পরিধানে, ব্যায়ামে ও পানে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করি তাহা হইলে আমাদিগের রোগাশঙ্কা কমিয়া যায়। সম্যকরূপে পরিচ্ছন্ন ও পরিস্কার থাকিলে রোগাক্রমণের ভয়ও থাকে না। আরও কথা এই যে যদি আমরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল মূত্রাদি, পরিধেয় বসনাদি ও শয্যাদি সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সম্যকরূপে আলাহিদা রাখি তাহা হইলেও রোগের সংক্রামকতা কমিয়া যায়। আশা করি, আমাদিগের দেশের ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

অনাথ জীবন বসু।

উদ্ভিদ-বান্ধব।

বন্ধুত্বের আদর্শ আশীষ ধারা দেবতার বরের মত মানবের সন্তাপিত প্রাণ সুশীতল করিয়া দেয়। সংসার-মরিচিকার বিরাট কুহকে পড়িয়া, মানব যখন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারা হইয়া, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে, বন্ধুত্বের চির উজ্জ্বল, চিরস্নিগ্ধ, চির অভিনব পথ তাহাকে মোহিনী আশা-রাজত্বের দুয়ার দেখাইয়া দেয়। এই ত গেল বাস্তব জগতের কথা। সংসর্গ গুণে মানবের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু মনে রাখা উচিত, সে সংসর্গ বিমল ও সাধু। আজকাল এমন বন্ধু মেলে যাহা মানবের বহির্চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার স্থূলবুদ্ধির অজ্ঞাতসারে তাহাকে চির অন্ধ, চির উষ্ণ চির ঘৃণ্য নরকের পথে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দেয়।

উদ্ভিদের সম্বন্ধেও এই কথাগুলি যথাযথ ভাবে মিলিয়া যায়। যদি পার্শ্বচরের আনুকুল্য লাভ উদ্ভিদের অদৃষ্টে না ঘটিত, তাহা হইলে বোধ হয় এতদিন উদ্ভিদ রাজত্বের অতুল বৈভব অতীতের ভীষণ বিস্মৃতির গর্ভে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া যাইত। তাহা হইলে এখন দেখা যাউক, মানবের ন্যায় কিরূপে উদ্ভিদের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ বিষয়ে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, প্রাণিগণের বা উদ্ভিদগণের মধ্যে যে শক্তিশালী পদার্থ আছে, তাহারই ক্ষয় নিবন্ধন প্রাণী বা উদ্ভিদ রুগ্ন, শুষ্ক ও কালে মৃত হইয়া থাকে। আবার সেই শক্তিশালী পদার্থের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মহীরুহ বিরাট মূর্ত্তিতে জন্মভূমির অপরিসীম শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে; সেই শক্তিশালী পদার্থের নাম প্রোটোপ্লেসম (Protoplasm)। এই শক্তিশালী পদার্থের (Protoplasm) সাহায্যেই উদ্ভিদ নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে বর্দ্ধিত হয়। উপযুক্ত উত্তাপ, খাদ্য ও জলীয় পদার্থের বর্ত্তমান, এই শক্তিশালী পদার্থের তেজস্বিতার প্রধান কারণ। উদ্ভিদের বর্দ্ধমান প্রদেশে (apical region) এই Protoplasm-এর উজ্জ্বল তেজস্বিতা সম্যকরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন মকরধ্বজ বা অন্য কোন তেজকারী (Stimulant) ঔষধ পান করিয়া দুস্থ দুর্ব্বল মানবের চিরমলিন অধর প্রান্তে আবার সবলের সরল হাসি জাগিয়া উঠে, সেই মত ঐ সকল পদার্থের একত্র সমবায়ে উদ্ভিদগণ, পবন হিল্লোলে সবুজ রঙের লহরী লীলা প্রদর্শন করে। এই ত গেল উদ্ভিদের প্রথম বন্ধুর কথা।

উদ্ভিদের দ্বিতীয় বন্ধু আলোক। দিনের আলোক শক্তিশালী পদার্থের সংমিশ্রণে আসিয়া উদ্ভিদের জীবনী শক্তির সহায়তা করে। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে

উন্মুক্ত প্রভৃতির সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধনে নিযুক্ত উদ্ভিদ সূর্য্যের আলোক লাভে সক্ষম। আবার কোন একটী উদ্ভিদকে দুই এক দিন আলোক অন্তরালে রাখিলে, উদ্ভিদ হরিৎ আভা বিবর্জ্জিত, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে কেবল আলোকেই উদ্ভিদের উত্থান হইয়া থাকে এমন নহে; আলোকে আবার ইহার ধ্বংসও হইতে পারে। উদ্ভিদের আপন আপন প্রয়োজনোপযোগী আলোক আবশ্যক; ইহার ব্যতিক্রম হইলেই উদ্ভিদ জগতে একটা হাহাকার পড়িয়া যায়। অত্যধিক আলোক—অত্যাচার উদ্ভিদ নীরবে সহ্য করিতে পারে না। যখন উদ্ভিদ আপন প্রয়োজনোপযোগী আলোক গ্রহণ করে, তখন ইহা সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়; অর্থাৎ ইহার গঠন ক্রিয়া বাড়িতে থাকে। এই প্রকার আলোকের নাম প্যারাটোনিক ইনফ্লুয়েন্স অফ লাইট (paratonic influence of light) অন্ধকারে যেমন ইহারা শক্তিহীন হয়. অত্যধিক আলোক শাসনেও ইহারা শক্তিহীন ও নির্জ্জীব হইয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। ইহা গঠন ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে নিধন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কারণ পত্র-হরিৎ বা chloropyll (অর্থাৎ যে পদার্থের বর্ত্তমানে বৃক্ষ পত্রগুলি হরিৎ বর্ণ হয়) অত্যধিক উত্তাপে, আপনার কার্য্য করিতে অক্ষম হয় এবং যে শক্তির উদ্বোধনে উদ্ভিদের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে শক্তি আর জন্মিতে পারে না।

আলোকে কেবল যে উদ্ভিদের গঠন বা নিধন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এমন নহে; ইহাতে ইহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। অনেকের মনে হয় ত এরূপ ধারণা আছে যে বৃক্ষকাণ্ড শাখা প্রশাখা লইয়া উর্দ্ধে আলোকের দিকে উত্থিত হয় আর শিকড়গুলি অলসে অবাধে মৃত্তিকাগাত্রে গা ঢালিয়া দেয়, ইহার তাৎপর্য্য কি? কেনই বা শিকড়গুলি পত্র বা কাণ্ডের মত উর্দ্ধে না উঠিয়া মৃত্তিকার মধ্যে নামিয়া যায় ইহা একটী জিজ্ঞাস্য বিষয়। সূর্য্যের আলোক যখন তির্য্যক্ গতিতে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বের পানে ধাবিত হয়, তখন প্রায়ই দেখা যায় বৃক্ষের হরিৎ-পত্রগুলি যেন সেই আলোক রাশি পান করিবার মানসে তাহার দিকে চাহিয়া রয়। এই জন্যই বৃক্ষের পত্রগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—উপরিভাগ (upper surface) অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক আকর্ষণে শীর্ষ পত্র) ও নিম্নভাগস্থ (Lower surface) পত্র।

উদ্ভিদের যে অংশ আলোক গ্রহণেচ্ছু সেই অংশকে postive heliotroplasm কহে। আবার যে অংশ আলোক অন্তরালে জীবন যাপনের সুবিধা খুঁজিয়া লয়, সেই অংশকে Negative heliotroplasm কহে। ইহা কার্য্যতঃ (experiment) লোক লোচনের সমক্ষে স্থাপিত করা যাইতে পারে। কোন গাছকে জানালার গরাদে

বাঁধিয়া দিলে তাহার পত্রগুচ্ছ সমুন্নত শাখা প্রশাখা আলোক পানে হেলিয়া দুলিয়া ছুটিয়া যায় আর শিকড়গুলি আলোক হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য আঁধার প্রদেশে নামিতে থাকে। ক্রমে ইহা সম্যক বিবৃত হইতে পারে। কেন উদ্ভিদের শিকড়গুলি মৃত্তিকা নিম্নে যায় এবং একই বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া শাখা ও শিকড় বিভিন্ন দিকে গতি পরিবর্ত্তন করে। এইরূপে ঊর্দ্ধে উত্থিত শাখা উদ্ভিদের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং শিকড় উদ্ভিদের গঠনোপযোগী আহার্য্য জলীয় পদার্থের মধ্য দিয়া আপনার অভ্যন্তরে আনায়ন করে। তাহা হইলে ইহাও বুঝা যায় যে প্রকৃতির অদ্ভুত রাজত্বে সেই স্থান হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন পথাবলম্বী দুই শাখা বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে অথচ সেই দুই বিভিন্ন কার্য্যের একত্র মিলন উদ্ভিদের গঠন ও বর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পাদনের প্রধান কারণ। অতএব শাখা ও শিকড় পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে (interdependant)।

উদ্ভিদগণ এইরূপে আলোকের সাহায্যে অনন্ত ঊর্দ্ধের পানে উঠিতে থাকে। ক্রমে তাহারা এরূপ স্থানে উপস্থিত হয় যেখান হইতে তাহাদের নিয়মিত আলোক গ্রহণের জন্য আর উপরে উঠিতে পারে না, যখন ঊর্দ্ধে উঠা উদ্ভিদের আবশ্যক হয় না তখন তাহারা পার্শ্বে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে সকল আলোক উদ্ভিদের শক্তিবিধানার্থ নিয়োজিত হয় তাহাদের বর্ণ নীল ও গোলাপী।

উদ্ভিদের তৃতীয় বন্ধু মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উদ্ভিদ উদ্ভব বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। এই শক্তির আকর্ষণে শিকড়গুলি আকৃষ্ট হইয়া মাটির দিকে নামিয়া যায় এবং শাখা প্রশাখা সমুন্নত বৃক্ষরাশি সগর্ব্বে মৃত্তিকার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। একটী বিকসিত বীজকে আঁধার আলোকের মধ্যে রাখিলে দেখা যায় যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি প্রভাবে এক অংশ আঁধারের দিকে যায় আর অপর অংশ আলোকের দকিে বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রথমোল্লিখিত অংশটী শিকড়রূপে ও শেষের অংশটী কাণ্ডরূপে পরিণত হয়। শিকড়ের মৃত্তিকা মধ্যে বাস, জলের প্রতি তাহার প্রবল লালসার জন্য। উদ্ভিদের স্বাস্থ্যোপযোগী জলীয় পদার্থ মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত সেই জন্য শিকড়ের অগ্রভাগ জলীয় গ্রহণ বিষয়ে উদ্ভিদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা জলীয় পদার্থের বর্ত্তমান উদ্ভিদের উত্থান সম্বন্ধে অতীব প্রয়োজনীয়।

কোনও পদার্থের স্পর্শ হেতু উদ্ভিদের উত্থান হইতে পারে। কোন স্রোতস্বতী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইলে যদি ক্ষণিকের জন্য কোনও স্থানে স্তব্ধ গতি হইয়া যায় তাহা হইলে সে যেমন সেই স্থান বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী দুর্ব্বল স্থান ভগ্ন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চারিদিক ছাপাইয়া চলিয়া যায় সেইরূপ উদ্ভিদের বর্দ্ধমান প্রদেশ কোন

পদার্থের বর্ত্তমানে সম্যকরূপে বর্দ্ধিত হইতে না পারিলে অতিশয় প্রবল ভাবে অন্য স্থান হইতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অন্যান্য বস্তুর ন্যায় উত্তাপও উদ্ভিদের গঠন-বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। অনুপযুক্ত উত্তাপে (temperature) উদ্ভিদের শক্তিশালী পদার্থের (protoplasm) তেজস্বিতা কমিয়া যায় এবং জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে। উদ্ভিদের প্রত্যেক কার্য্যে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে পত্র হরিৎ প্রস্তুত বিষয়ে একটা পরিমিত উত্তাপ আছে যাহাতে সে সকল কার্য্যগুলি নিরাপদে চলিতে থাকে। সেই মিতাচারের বিরুদ্ধতা আসিলেই উদ্ভিদের বিপদ ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ ০° হইতে ৫০° পর্য্যন্ত উত্তাপ (temp) উদ্ভিদের আবশ্যক হয়। কখনও কখনও কোন কোন স্থানে অভাব ২৫° হইতে ৩০° পর্য্যন্ত উত্তাপ প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত বস্তুগণের একত্র সমাবায়ে উদ্ভিদের মধ্যে বীর্য্যশালী পদার্থের (protoplasm) পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং সেই পরিবর্ত্তন হেতু উদ্ভিদের উন্নতি হয়। মিত্রাকারে অত্যাধিক উত্তাপ, আগাছা ইত্যাদি উদ্ভিদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

মুসলমান স্থাপত্যবিদ্যা।

বিভিন্ন দেশে বাসগৃহ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, স্থানীয় জল বায়ু, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক অবস্থা ও লোকের সামাজিক রীতি নীতি সর্ব্বদেশে একরূপ নহে। শীত প্রধান দেশে গৃহ কিছুতেই আফ্রিকার ন্যায় তাপ প্রধান দেশের উপযুক্ত নহে, অথবা ভূমিকম্প প্রবল, জাপানদেশের আবাস ইংলণ্ডের আবাসের ন্যায় হইতেই পারে না। আবার একই দেশবাসী হিন্দু মুসলমানের বাসগৃহ একরূপ হওয়া অসম্ভব, কেননা একের রীতিনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার ক্রিয়া কলাপ অন্যের অনুরূপ নহে।

অতএব সকল জাতিরই বাসগৃহ নির্ম্মাণে মৌলিকতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রাজনীতিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই মৌলিকত্ব বিকৃত বা অপরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া অন্যরূপ হইয়া উঠে। হিন্দুর বাসগৃহ হিন্দু রাজত্বকালে যেরূপ ছিল, ভারতে মুসলমান অভ্যুদয়ে সেরূপ থাকিতে পারে নাই; কেননা লোকের স্বভাব এই বা রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের পরিণাম এই যে, রাজার জাতি যেরূপে থাকে, প্রজা সেই আদর্শ অবলম্বন

করে। বিদেশী রাজাও আবার স্থানীয় অধিবাসীর গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী সেই দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ভাবিয়া স্বীয় মৌলিক প্রণালীকে বিকৃত করিয়া তুলেন।

এইজন্য ভারতে তিন প্রকার স্থাপত্য কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; এক (১) মৌলিক হিন্দু-স্থাপত্য এবং (২) প্রকৃত মুসলমান-স্থাপত্য (৩) মুসলমান ও হিন্দুর সম্বন্ধীয় এক বিকৃত বা অভিনব স্থাপত্য। যাহা প্রকৃত, তাহা লইয়া কোনওরূপ গোলমাল নাই। কিন্তু যাহা দুই এর সমন্বয়ে উৎপন্ন তাহাতে কোন্‌টির প্রাবল্য অধিক তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের বহু মতভেদ রহিয়াছে।

হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতির দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ অন্য ভূভাগ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিচ্ছিন্ন; উত্তরে দুর্গম হিমালয়, আর তিন দিকে অপার জলধি। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মাত্রেই স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, হিন্দুর যাবতীয় ব্যাপার,—ধর্ম্ম, দর্শন, নীতি, স্থাপত্য ইত্যাদির সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির সংশ্রব নাই। কিন্তু ইতিহাস ও প্রাচীন পুরাণাদি পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে প্রকৃতির প্রাচীর দ্বারা ভারত সর্ব্বথা অবরুদ্ধ থাকিলেও, ইহার অধিবাসিগণ একবারে অবরুদ্ধ ছিলেন না, বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রাচীন হিন্দুগণ এসিয়া আফ্রিকার বহুস্থানে গমনাগমন করিতেন। তাঁহাদের সমুদ্র গতায়াত অবারিত ছিল।

হিন্দুর রীতিনীতি সমাজবন্ধন ধর্ম্ম ইত্যাদি অন্য জাতির রীতিনীতি ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবার কারণ এই যে হিন্দু রীতিনীতি প্রবর্ত্তক মুনি ঋষি কচিৎ অন্য ভূভাগে গমন করিতেন, কাজেই তাঁহারা অন্য দেশের সু ও কু দর্শন করিবার অবসর না পাইয়া, স্বাধীন ভাবে হিন্দুর উপযোগী সর্ব্বজাতি হইতে বিভিন্ন রীতিনীতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাণিজ্য ব্যপদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিতেন, তাঁহারাও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কাজেই অন্য দেশের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে কখনই পরাঙ্মুখ বা বীতরাগ ছিলেন না। অতএব হিন্দুর স্থাপত্য অবশ্যই সর্ব্বজাতির স্থাপত্যের উপর আদর্শ লইয়াই গঠিত বলিয়া মনে হয়। এক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এইরূপ প্রজ্ঞাশালী ব্যবসায়িগণ হিন্দুর রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তনেও সহায়তা করিতে পারিতেন। আমার মনে হয় যে, তাঁহারা তদ্বিষয়েও লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং স্বদেশের রীতি নীতির পরিবর্ত্তনেও অল্প বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পরবর্ত্তী কালে হিন্দুর সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ এই ঋষি অনুশাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। শান্তিপ্রিয় হিন্দু সমাজ রীতি নীতির বৈষম্য ঘটাইয়া সামাজিক বিপ্লব আনিয়া অশান্তি উৎপাদনের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই। অথচ পরদেশগামী ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই ভিন্ন দেশের রীতি নীতির স্বদেশেও অনুকরণ সামাজিক বিপ্লব উৎপাদিত করিতে পারে কাজেই হিন্দুর সমুদ্র গমন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

যাহা হউক অবান্তর আলোচনা না করিয়া হিন্দুর স্থাপত্য কিরূপ দেখা যাউক। হিন্দুর ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত যুগে হিন্দুর অবাধ বানিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব সেই সময়ে যে স্থাপত্য নির্মাণ প্রণালী ছিল, তাহা বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অজন্তা গিরিগৃহ, পুরীর মন্দির ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, যে হিন্দুর মৌলিক স্থাপত্য অতি কারুকার্য্যময় বহু ব্যয়সাধ্য এবং সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাঁহারা একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন না। এই সমস্ত মন্দির বা গিরিগৃহ আবাসের আদর্শ নহে; কোন আড়ম্বরপ্রিয় নরপতি বা নরপতি বংশধরের কীর্ত্তি মন্দির। হিন্দুর বাসগৃহ কিরূপ ছিল, তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে, হিন্দুর ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত, এবং সামাজিক গ্রন্থ পুরাণাদি পাঠ আবশ্যক। সে সমস্ত পাঠে মনে হয় না যে আবাস গৃহ ঐরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় বহু ব্যয়সাধ্য এবং নির্ম্মাণ সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ছিল। তবে অল্প কারুকার্য্যময় যে ছিল না তাহা নহে; আর কোন দেশের স্থাপত্য সম্পূর্ণ কারুকার্য্য বিহীন? প্রাচীন কালের যে সমস্ত আবাসগৃহ আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিবরণাদি পাঠে ও হিন্দুর প্রাচীন কালের বাসগৃহের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে প্রাচীন হিন্দুর গৃহ সর্ব্বজাতিরই উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন হিন্দু স্থপতি প্রাচীন কালের অন্য সমস্ত দেশের বাসভবনের যাবতীয় সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া স্থান জলবায়ু আচার সঙ্গত করিয়া হিন্দুর জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিত। অতএব হিন্দুর স্থাপত্য সর্ব্বজনীন।

ভারতে মুসলমান অভ্যুদয়ে মুসলমানগণ যে মৌলিক স্থাপত্য শিল্প আনয়ন করিলেন, তাঁহার সহিত সার্ব্বজনীন হিন্দু স্থাপত্য সম্মিলিত হইয়া যে অভিনব স্থাপত্য উদ্ভাবিত করিলেন, তাহাতে হিন্দু স্থাপত্যের বিশেষত্ব ও প্রধানত্ব নিশ্চয়ই ছিল। অতএব যে সমস্ত পণ্ডিত মুসলমান স্থাপত্যকে হিন্দু স্থাপত্যের শাখা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যে একবারে ভ্রান্ত একথা কখনই স্বীকার্য্য নহে।

সম্প্রতি ভারতের নবরাজধানী দিল্লী নগরীতে পুনরায় ভারতের মধ্য যুগের স্থাপত্যের আদর্শে অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। কেননা ইঞ্জিনিয়ারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এদেশে মধ্যযুগে যেরূপ গৃহাদি ছিল, তাহাই এদেশের উপযোগী; সেইরূপ অট্টালিকাই ভারতের জল বায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে পারে। এক্ষণে এই স্থাপত্যবিদ্যা হিন্দুর কিম্বা মুসলমানের মৌলিক সম্পত্তি তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মতভেদ হইতেছে। যাহা হউক আমরা এ মতভেদের সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইতেছি না। ৬০০ বৎসর মুসলমান ভারতে রাজত্ব করিয়াছেন, মুসলমানগণ একসময়ে অদ্বিতীয় শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইয়াছেন, এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা খণ্ডে এমন দেশ ছিল না, যাহা এক সময়ে মুসলমানের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে কম্পিত হইত না।

কাজেই তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নিশ্চয়ই এক সময়ে অত্যুৎকৃষ্ট ছিল, সেই বিদ্যা বুদ্ধি লইয়াই তাঁহারা ভারতে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ৬০০ বৎসরের হিন্দুর মৌলিকত্ব ও মুসলমানের মৌলিকত্ব সম্মিলিত হইয়া জাতীয় অভিনব মৌলিকত্ব উদ্ভাবন করিয়াছে। যদি দিল্লী নগরীতে মুসলমানের আদর্শে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, বা প্রাচ্য প্রতীচ্য স্থাপত্যের সমন্বয়ে নূতন আদর্শে ভবনাদি নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি হিন্দু কি মুসলমান জাতীয় আদর্শ বলিয়াই স্বীকার লইবে।

বিবিধ।

বায়ু ও ইথার।—অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে গত আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ য্যাসোশিয়েসনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ কয়েকটি অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইথার একটি নিরবচ্ছিন্ন পদার্থ, এরূপ বৃহদায়তন পদার্থ জগতে কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। ইথার সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিকতম ঘন, এবং অসঙ্কোচনশীল। পার্থিব সমস্ত বস্তু ভেদ করিয়া সর্ব্বত্র ইথার বর্ত্তমান, কিন্তু ইহাতে গতি সঞ্জাত করা অসম্ভব। বস্তুতঃই বস্তু এবং ইথারের ইহাই পার্থক্য যে বস্তুতে গতি সঞ্জাত করা যায় কিন্তু ইথার সম্পূর্ণ অচল। ঘুড়ী উড়াইয়া মেঘকে তড়িন্ময় করা সম্ভব। যে দিন আকাশ মেঘ পূর্ণ থাকে, অথচ বৃষ্টি বর্ষিত হয় না, সেই দিনে ঘুড়ী উড়াইয়া মেঘকে তড়িন্ময় করিলে প্রচুর বারিপাত হইতে পারে। ইত্যাদি।

৩য় বর্ষ) ডিসেম্বর, ১৯১৪। (১২শ সংখ্যা।

বয়সের পরিণতি ও বার্দ্ধক্য।

জীব মাত্রেরই প্রাণ শক্তির মূলে একটী পদার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা খাদ্য। কিরূপ খাদ্য গ্রহণে আমাদের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, শরীরের বৃদ্ধির কাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে শরীর বৃদ্ধি পাইতে পারে, স্বাস্থ্য কোনওরূপে বিকৃত না হইতে পারে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানবের যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইতে পারে, তাহার যথাযথ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক আলোচনা আজকাল সমস্ত সভ্য দেশেই রীতিমত চলিতেছে, কাজেই খাদ্য গ্রহণের ত্রুটিতে আমাদের কোনরূপ বিকৃতি ঘটা ততটা সম্ভবপর নহে। কেননা এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কয়টি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যিনি, ইচ্ছা করিয়া অনায়াসে কুখাদ্যরূপ বিষ গলাধঃকরণ করিতে স্বীকৃত হয়েন? কাজেই বয়সের পরিণতি ও বার্দ্ধক্যের সহিত খাদ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না।

বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা জগৎ আজকাল শিশু সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের যথার্থ নির্দ্ধারণে অতিমাত্র ব্যস্ত রহিয়াছেন। এই ব্যস্ততার ও চেষ্টার ফলে মানব সম্বন্ধে শিশু সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বালজীবনের অনেক নৈসর্গিক ব্যাপারের আমরা কারণ ও ফল জানিতে পারিয়াছি। কি উপায় অবলম্বনে শিশুর স্বাস্থ্য গৃহে, বিদ্যালয়ে, ক্রীড়া প্রাঙ্গণে, অব্যাহত থাকিবে, কি খাদ্য প্রদানে শিশু রীতিমত পুষ্ট ও বলশালী হইতে পারে, সমাজ কি প্রথা অবলম্বন করিলে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে, তাহা এখন অনেকে রীতিমত বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, বিকলাঙ্গ শিশুর

সংখ্যাও অল্প হইয়াছে এবং প্রধানতঃ মানব মাত্রেরই পরমায়ু কাল যেন কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমস্ত শিশু পূর্ব্বে শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহারা চিররুগ্ন হইয়াও জীবিত আছে, এবং যে সমস্ত শিশু চিররুগ্ন থাকিত, তাহারা এখন সবল, বলিষ্ঠ কর্ম্মক্ষম ও সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। অতএব মানবের জীবনের প্রারম্ভ প্রাপ্ত শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছে।

কিন্তু জীবনের শেষ প্রাপ্ত অর্থাৎ বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে অতি অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিই চিন্তা করিয়াছেন, অথবা চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া তাঁহারা কোনও দিন মনেও করেন নাই। মানবের জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি সদগুণ পরিণত বয়সে পূর্ণতা লাভ করে, এই পরিণত অবস্থা ঠিক বার্দ্ধক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমরা যে বয়সকে প্রৌঢ় বয়স বলি, তাহাই ঠিক মানবের মানবত্ব পরিণতির সময়। এই সময়ে যৌবনের চাঞ্চল্য থাকে না, অথচ প্রকৃত বার্দ্ধক্যের নির্জীবতাও দেখা দেয় না। এই সময়ে মানবের সমস্ত কার্য্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। পুরুষই হউন আর রমণীই হউন, যাঁহার এই বয়সে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি বেশ তীক্ষ্ণ যাঁহার বিচার ক্ষমতার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না, অন্তঃকরণ কারুণ্যপূর্ণ, মন প্রফুল্ল, অন্তর উদার, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, প্রজ্ঞা সূচক, হৃদয় অদম্য তেজঃপূর্ণ তিনি মানব জাতির ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানবের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি ভাজন হয়েন। আবার যে মানব এই বয়সে অতিরুগ্ন, সদা কর্কশ ভাষী, সদা সন্দিগ্ধ চেতা, অবিশ্বাসী ও অবিশ্বাস্য সে সকলেরই কি দারুণ ঘৃণার পাত্র! এই শেষোক্ত মানবের ক্ষমতা আরও দিন দিন হ্রাস পায়, তাহার স্বাস্থ্য এরূপ ভঙ্গুর হইয়া উঠে যে তাহার কিছুই সহ্য হয় না। সে অল্প কার্য্যেই একান্ত ক্লান্ত হইয়া উঠে। কোন কিছু কার্য্যে সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, তাহার মস্তিষ্ক ক্রমশঃ ধারণা-শক্তি-হীন হয়। ক্রমশঃ তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ পায় এ সমস্ত শক্তির অপচয় বরং সহ্য হয় এবং সমাজের বা পরিবারের বা বিশেষ কোন নরনারীর ততটা কষ্টদায়ক হয় না। কিন্তু তাহার নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী এবং আরও ভয়ঙ্কর।

এইরূপ লোক হয় ত প্রৌঢ়াবস্থা বা বার্দ্ধক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চরিত্রবান সৎপুরুষ ছিলেন, সমাজ প্রিয়, জন প্রিয়, ধর্ম্মপত্নীতে একান্ত প্রীত, বাৎসল্যময় জনক, অতি ধর্ম্মতত্ত্ব পিপাসু ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার সমস্ত সৎগুণ ভোজবাজীর ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি চরিত্র-হীনতায়, কামুকতায় নিজ জীবনকে পূতিগন্ধময় করিয়া তুলেন। অধিকাংশই ভাগ্যক্রমে ধরা পড়েন না, কিন্তু দুই এক জনের চরিত্রই লোক সমাজে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত লোকের মৃত্যুও প্রায় অস্বাভাবিক; প্রায়ই কেহ ভোজনে উপবেশন করিয়া ম্যাপোপ্লেক্সিতে, অথবা কোন গণিকালয়ে, অথবা পথে ঘাটে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এই

সমস্ত লোকের পরিবারের হঠাৎ কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা ধারণা করা যায় না। মুহূর্ত্তে স্ত্রী পথের ভিখারিণী হইতে পারেন, পুত্র কন্যার সৎশিক্ষা চিররুদ্ধ হইতে পারে! পূর্ব্বোক্ত এই দুই অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন মানবে কেন উপস্থিত হয়, দুইটি সচ্চরিত্র লোকের একটির প্রৌঢ় অবস্থা নিতান্ত উন্মাদের ন্যায়, এবং বার্দ্ধক্য দুঃখময় এরূপ পার্থক্য হয় কেন? প্রথমোক্ত প্রৌঢ় ক্রমশঃ জরাবশতঃ বার্দ্ধক্যে শারীরিক শক্তিহীন হইতে থাকেন বটে, কিন্তু হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতে থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রখরতর হইতে থাকে, পৃথিবীর সীমা হইতে মহাপ্রস্থানের দিন পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বজনের ভক্তিভাজন হইয়া থাকেন। এরূপ বিভিন্নতা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। বয়সের পরিণত অবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যের নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহের সম্যক আলোচনা করা উচিত, এবং এই সমস্ত হইতে কি দোষে একজন নষ্ট হইয়া যায় তাহার কারণ নির্ণয় করা উচিত।

আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা ও গবেষণা করিতে হইলে এক খণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে; এতৎ প্রবন্ধে সেরূপ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন অভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক অথচ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্যতীত এরূপ দুরূহ বিষয়ের সম্যক গবেষণাও অসম্ভব। তবে সাধারণতঃ যেরূপ কার্য্য ও ব্যাপার দেখা যায়, সমাজে যে সমস্ত উৎপাত হইয়া থাকে, তাহারই যথাযথ আলোচনা করিয়া বার্দ্ধক্যে কামুকতা বা অন্য দুর্ব্বলতাতে লোকের কেন বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়, তাহার কারণ সিদ্ধান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধ বিরচিত হইয়াছে।

প্রকৃত বার্দ্ধক্য বলিলে কি বুঝায়?- শারীরিক, মানসিক, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সমস্ত শক্তির হ্রাস বুঝায়, কিন্তু নীতিশক্তির হ্রাস বা প্রজ্ঞার হ্রাস বা মনুষ্যত্বের হ্রাস বুঝায় না। বঙ্গদেশে ৫৫।৬০ বৎসর বয়স হইতেই প্রকৃত বার্দ্ধক্যের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যাঁহার অল্প বয়সেই বার্দ্ধক্যের লক্ষণ উপস্থিত হয় তাঁহার অকাল বার্দ্ধক্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সকল বার্দ্ধক্যেই ধমনী বা রক্তবহা নাড়ীর কাঠিন্য হইতে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে arteriosclerosis বলে। যৌবনে বা যৌবনের পূর্ব্ববর্ত্তী বয়সে ধমনী কোমল সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধিশীল থাকে। ক্রমশঃ এই কোমলতা, সম্প্রসারণ শীলতা নষ্ট হইয়াও ধমনীর আয়তন বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আকারের হইয়া উঠে, তাহার পরে অল্পেঅল্পে ধমনী কঠিন হইতে থাকে, এবং মানবের বার্দ্ধক্যও সূচিত হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব এতৎ প্রবন্ধে বার্দ্ধক্যে ধমনীর কাঠিন্য ও সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি বিনাশক ইন্দ্রিয় লালসার বিকৃতি এই দুইটি বিষয় আলোচিত হইবে।

ধমনীর কাঠিন্যের বিবরণ সম্বন্ধে জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসকের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল:—

"It begins with hyperplasia of the connective tissue of the inner coat, with stiffing of the vessel, thickening of the inner coat, and diminution of calibre. The circulation in the arteries themselves is impaired and their nutrition interfered with and degeneration follows. Later changes consist of waste of muscle fibres, hardening of the outer coat, calcareous deposits in the middle and outer coats, ending in calcification."

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রকৃত বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃই রক্তবহা নাড়ীর অর্থাৎ ধমনীর কাঠিন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বেই যদি ধমনী কঠিন হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এরূপ কাঠিন্য অস্বাভাবিক।

ধমনী যেমনই কঠিন হইতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে শোণিত চাপও অধিক হইয়া উঠে। এই শোণিত চাপ সম্বন্ধে আলোচনাই আবশ্যক, কেননা ধমনী বয়সের গতিতে কঠিন হইবেই, কিন্তু শোণিত চাপের অনুপাত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইলে নানাবিধ কঠিন পীড়া এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব। শোণিত চাপ এবং ধমনী-কাঠিন্য একার্থ বোধক নহে। শোণিত চাপ অধিক না হইলেও ধমনী কঠিন হইতে পারে। আবার ধমনীর কাঠিন্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, অথচ শোণিত চাপ অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। অতএব শোণিত চাপের আধিক্য ২ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ; ১ম—ধমনীতে শরীরগত ও যন্ত্রগত পরিবর্ত্তনের জন্য অর্থাৎ প্রকৃত ধমনী কাঠিন্যের জন্য শোণিত চাপের আধিক্য ; ২য়—ধমনী কাঠিন্য ব্যতীতও শোণিত চাপের আধিক্য, শারীরিক বা শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কোন বিশৃঙ্খলা নানাবিধ গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির অস্বাভাবিক বিকৃতি ইত্যাদির জন্যই এরূপ শোণিত চাপের আধিক্য হইয়া থাকে ; কোন কোনও স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শরীরের কোন যন্ত্রে কোন বিশৃঙ্খল নাই, বা শরীরে কোনও রূপ পীড়া নাই, তথাপি শোণিত চাপ অধিক হইয়া উঠিয়াছে।

আবার প্রকৃত ধমনী-কাঠিন্যও দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) যে কাঠিন্যে মূত্রাশয় (kidney) বা হৃদ্‌যন্ত্রের (heart) কোন পীড়া নাই, (২) যে কাঠিন্যে মূত্রাশয় বা হৃদ্‌যন্ত্র বা উভয়ই পীড়াগ্রস্ত।

শোণিত চাপের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য একরূপ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার নাম শোণিত চাপমান যন্ত্র বা sphygmomanometer.

চিকিৎসকগণ শোণিত চাপের আধিক্য হেতু নানাবিধ বিষাদের বর্ণনা করিয়াছেন। হয় ত এ সম্বন্ধে বিষাদের বিবরণ সামান্য অতিরঞ্জিত হইতে পারে। কিন্তু কোন রোগীকে তাহার শোণিত চাপের আধিক্য জানিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। রোগীর বয়ঃক্রম ৫০।৬০ বৎসর হইলে বিশেষতঃ পীড়িতা রমণী হইলে এ কথা তাহাকে

জানিতে দেওয়া একবারে অনুচিত। ইহাতে পীড়িত বা পীড়িতার মনে যে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার শোণিত চাপের আধিক্য আরও বাড়িয়া উঠে।

প্রৌঢ়াবস্থায় বা প্রকৃত বার্দ্ধক্যে কি পরিমাণ শোণিত চাপ স্বাভাবিক তাহা আজও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন, কোনও ব্যক্তির বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তখনও তাহার ধমনী বেশ কোমল এবং নমনীয় অথচ তাহার শোণিত চাপ ১৮০, ২০০ বা তদপেক্ষাও অধিকতর। এরূপ ঘটনা অনন্য সাধারণ। কিন্তু যে সমস্ত চিকিৎসক শোণিত চাপের পরিমাণ করেন, বা শোণিত চাপের অবস্থায় অভিজ্ঞ, তাঁহারা বলেন যে এরূপ অনন্য সাধারণ উদাহরণ অপ্রতুল নহে।

এক্ষণে কোন্ বয়সে কিরূপ শোণিত চাপ হওয়া সম্ভব। জনৈক অতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, যে ব্যক্তির যত বয়স, তাহাতে ১০০ যোগ করিলে যে সংখ্যা হয়, তাহাই সেই ব্যক্তির সেই বয়সে স্বাভাবিক শোণিত চাপ হইয়া থাকে। ২০ বৎসর বয়সে শোণিত চাপ ১২০, ৩০ বৎসরে ১৩০, ৪০ বৎসরে ১৪০, ৫০ বৎসরে ১৫০, ৬০ বৎসরে ১৬০, ৭০ বৎসরে ১৭০। যে কোনও বয়সেই হউক না কেন ১৭০ অপেক্ষা শোণিত চাপ অধিক হইলে বুঝিবে বিপদের সূত্রপাত হইতেছে। তবে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কোন কোন অনন্য সাধারণ ক্ষেত্রে ২০০ পরিমাণ শোণিত চাপ সত্ত্বেও কোনও পীড়া বা বিপদের চিহ্নও পর্য্যন্ত থাকে না। যদি হৃদযন্ত্রের বা মূত্রাশয়ের কোন-রূপ পীড়া, কার্য্যগত বিশৃঙ্খলা বা বিকৃতি না থাকে তবে উপরে যে বয়সের অনুপাতে শোণিত চাপের হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে এইটি মনে রাখিতে হইবে যে যদিও ধমনীর কাঠিন্য থাকেনা, তথাপি শোণিত চাপ অধিক হইলে ধমনী কঠিন হইতে থাকে, কেননা ধমনী কঠিন হইবার যতবিধ কারণ রহিয়াছে, রক্ত চাপের আধিক্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

চাপ অধিক হইলেই রক্তের গতি অধিক হয়, রক্ত ধমনী অভ্যন্তর প্রাচীর চাপিয়া ধরে, ফলে রক্ত ও প্রাচীরের ঘর্ষণ উপস্থিত হয় এবং ধমনী কঠিন হইতে থাকে। অতএব রক্ত চাপ অধিক হইলেই বিপদ হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই কিন্তু চিকিৎসকগণের কর্ত্তব্য যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে রক্ত চাপ অধিক হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া চাপাধিক্যের মূল উচ্ছেদ করেন। রোগের সূত্রপাতে শোণিত চাপাধিক্যের প্রথমাবস্থায় মস্তকে যেন চাপ বা ভার চাপান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সমস্তই যেন গোলমাল হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। সময়ে সময়ে মাথা ভার হয় এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। হৃদযন্ত্রের আঘাত সর্ব্ব শরীরে অনুভব করা যায়, এবং পরিশ্রম করিলে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়।

প্রকৃত বার্দ্ধক্যের বয়ঃক্রমে যদি ধমনী, অস্থিতিস্থাপক, ভঙ্গুর, বা ক্যালকেরিয়াস অর্থাৎ চূর্ণ ঘটিত পদার্থময় হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোনও ভয়ের কারণ থাকে না; এরূপ বৃদ্ধ সুস্থ শরীরে, মনের সুখে অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া পরলোক গমন করেন। এক্ষেত্রে শোণিত চাপও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, অথচ বিপদ উপস্থিত হয় না। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থার বয়সে, যখন ধমনী স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়, তখন রক্ত চাপ অধিক হইলে সহসা মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই বয়সে আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ কর্ম্মময় বন্ধুর রক্ত চাপ অধিক হইয়াছিল, বহুচেষ্টাতেও তাঁহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় নাই।

ধমনীর কাঠিন্য ও শোণিত চাপের আধিক্য—এই দুইটির প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে চিকিৎসকগণ বলেন, মদ্যপান প্রধানতম কারণ। কিন্তু বিখ্যাত চিকিৎসক ক্যাবট নানা অনুসন্ধান করিয়া এই অভিমত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে অত্যধিক ভোজন, বিশেষতঃ জান্তব খাদ্যই ইহার প্রধান কারণ। বঙ্গদেশে একটি দুরবস্থা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে সঙ্গতিপন্ন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র। যাঁহারা সঙ্গতিশালী, তাঁহারা বাল্যকালে যেরূপ খাদ্য প্রয়োজন, তাহা পাইতে পারেন, তাঁহাদের যৌবনে যৌবনোচিত এবং বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধজনোচিত খাদ্যের অভাব হয় না। দরিদ্রের খাদ্য প্রায় একভাবেই থাকে। খাদ্যের সময়োচিত পরিবর্ত্তন তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এই দুই জাতীয় ব্যক্তি বঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

ধনবানের অকাল মৃত্যুর কারণ অন্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচার; খাদ্যের জন্য তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার কোনও কারণ থাকে না। দরিদ্রের অকাল মৃত্যু প্রায়ই হয় না। বরং বার্দ্ধক্যে যৌবনোচিত কর্ম্মক্ষম, বলশালী দরিদ্রের অভাব নাই। যত বিপদ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের। মানব শরীর যন্ত্র, অস্থি পঞ্জরাদি ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কাজেই ৩০ বৎসর মানবের এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যে তদ্দ্বারা তাহার শরীর বৃদ্ধি পায়, অথচ যৌবনোচিত কর্ম্মবাহুল্যে শরীর প্রত্যহ যতটুকু ক্ষয় হয়, তাহা পরিপূরিত হইতে পারে। শরীর বৃদ্ধি অস্থি পঞ্জরের বৃদ্ধি স্থগিত হইলে এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যে তদ্দ্বারা কেবল মাত্র শরীর-ক্ষয় পূর্ণ হইতে পারে। আমাদের দন্তের জীবনেতিহাস হইতে আমরা এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। শৈশবে দন্তোদ্গম না হইবার প্রধান কারণ এই যে, যে খাদ্য গ্রহণে দন্তের সাহায্য আবশ্যক, তাহা ভোজনে শিশুর জীবন সঙ্কটময় হইয়া উঠিতে পারে। কাজেই শিশু দন্তহীন। দন্তোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া দন্তমূল শিথিল হইবার সময় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বা প্রৌঢ়াবস্থা

পর্য্যন্ত আমাদের খাদ্যে চর্ব্বনোপযোগী উপাদান অধিক হওয়াই উচিত। বার্দ্ধক্যে পুনরায় দন্তের অভাব হয়, এ সময়ে লঘু পথ্য ও শিশুজনোচিত খাদ্য শরীর রক্ষার উপযোগী। এ সময়ে যে খাদ্যে দন্তের নিষ্পেষণ প্রয়োজন তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

যাহা হউক বয়স ভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা নিতান্ত প্রয়োজন। বাল্যে লঘু খাদ্য, যৌবনে পুষ্টিকর, গুরু খাদ্য, এবং বার্দ্ধক্যে পুনরায় লঘু খাদ্যের প্রয়োজন। এবং শৈশব হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রচুর পুষ্টিকর ও গুরু খাদ্য একান্ত আবশ্যক। অতঃপর বঙ্গ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অধিকাংশ লোকেই দারিদ্র্য এবং অপ্রতুলতা বশতঃ বাল্যে উপযুক্ত খাদ্য পান না, পাঠ্যাবস্থায় নিতান্ত কষ্টে পাঠ্য ব্যয় সংস্থান করিতে হয়..কাজেই উপযুক্ত খাদ্যের নিতান্ত অভাব, অতঃপর অর্থোপার্জ্জনের প্রথমাবস্থায় সেরূপ অর্থ প্রাচুর্য্য হয় না যে প্রতিদিন সুপ্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান হয়; এইরূপে বঙ্গ মধ্যবিত্ত লোকের ৩০ বৎসর প্রায় অখাদ্যেই অতিবাহিত হয়। ৩০ বৎসরের পরে অর্থের প্রাচুর্য্য হওয়া সম্ভব; সে সময়ে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকি। যে খাদ্য ২০ বৎসর বয়সে আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল তাহাই আমারা ৩০ বা ৩৩ বৎসর বয়সে খাইতে আরম্ভ করি, ফলে আমাদের পীড়িত হইয়া পড়া অসম্ভব নহে। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, এই বয়সের অনুপযুক্ত অতি পুষ্টিকর খাদ্য-বাহুল্যই ধমনীর কাঠিন্য আনয়ন করে। ধমনীর কাঠিন্য অর্থে বার্দ্ধক্য; অতএব আমাদের প্রৌঢ়াবস্থায় যুবাজনোচিত খাদ্য গ্রহণ আমাদের অকাল বার্দ্ধক্যের একটী কারণ। অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে সক্ষম হয়েন যে দারিদ্র্যে খাদ্যের অভাব হইয়াছিল বলিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় যুবাজনোচিত খাদ্য কখনই ভোজন করা উচিত নহে। এই জন্য খাদ্যের পুষ্টিকর অংশ শরীর শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, কাজেই পেশীতে চর্ব্বি বা মেদ সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং খাদ্যের অন্যান্য উপাদান শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া শরীরে সঞ্চিত হয় এবং বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে থাকে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে যে কি ঘোরতর জীবন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। ইউরোপ আমেরিকা আদি ধনাঢ্য দেশেই লোকে জীবন রক্ষার্থে অন্ন সংস্থানার্থে স্বেদ প্লুত কলেবরে অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। আমাদের দরিদ্রদেশে যে জীবন সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অতএব দারুণ পরিশ্রমে আমাদিগকে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়; তাহার উপর দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যতের দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মানসিক ব্যাকুলতা, সামাজিক শাসনে সামাজিকতা রক্ষা করিবার দুর্ভাবনায় আমরা প্রতিনিয়তই জর্জ্জরিত হইতেছি। প্রথমতঃ খাদ্য, দ্বিতীয়তঃ পরিশ্রম, তৃতীয়তঃ মানসিক কষ্ট আমাদের অকাল বার্দ্ধক্যের পথ মসৃণ

করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর সিফিলিস, বাত, ইত্যাদি নানা রোগেরও প্রাদুর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে মধ্যবিত্তের অবস্থাও দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতেছে। আমাদের দেশে রমণীর অবস্থা অনেকটা উৎকৃষ্ট। জীবন সংগ্রামে তাঁহাদিগকে এতটা ব্যাকুল হইতে হয় না। স্বামী বা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা সমস্ত কষ্ট বা যন্ত্রণা ভুলিতে বাল্যাবধি শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের খাদ্যেরও সহসা কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পায় না। কাজেই আমাদের দেশে বা প্রায় সর্ব্বদেশেই রমণী অনেকটা সুস্থচিত্তে জীবনযাপন করিতে অবসর পাইয়া থাকেন। বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহে বিধবা রমণীর সংখ্যাধিক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কত লোক অল্প বয়সে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। সেন্সাস্ গণনায় রমণীর সংখ্যা পুরুষাপেক্ষা অল্প, কিন্তু যদি কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের লোক সংখ্যা গৃহীত হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে বঙ্গে বিধবার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং বৃদ্ধা রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধ পুরুষাপেক্ষা অনেক অধিক।

শোণিত চাপাধিক্যের চিকিৎসা এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে এক মাত্র উপায় এই যে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিলে, শোণিত চাপ হ্রাস হইতে পারে। বিশেষতঃ মাংস একবারে বন্ধ করা উচিত। কফি, মদ্য ইত্যাদি পানীয় সর্ব্বথা পরিহার্য্য। প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন যাহাতে মনে শান্তি স্থাপিত হয়, দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয়, সংসারের জন্য ব্যাকুলতা মন্দীভূত হয়, তাহা করা একান্ত আবশ্যক। কর্ম্মশীলতা হ্রাস করিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

অন্য জাতির অবস্থা হইতে আমাদের অবস্থার কি প্রভেদ তাহা আমরা জানিবার অবসর পাইনা। কিন্তু ইংরাজের সহিত একই স্থানে বসবাস হেতু তাহাদের সর্ব্বকালের শারীরিক অবস্থার সহিত আমাদের শারীরিক অবস্থার তুলনা করা অতি সহজ। বাঙ্গালী শিশু ও ইংরাজ শিশুর প্রভেদ যথেষ্ট, বাঙ্গালী শিশু ভীরু, দুর্ব্বলদেহ শীর্ণ ও কর্ম্মে অক্ষম, ইংরাজ শিশু দুর্দ্দান্ত, দৃঢ়কায়, স্থূল ও সর্ব্বদা চঞ্চল। ইংরাজ যুবক বল দৃপ্ত, পরিশ্রমে অকাতর, অনায়াসে বিপদের সম্মুখীন হইতে সাহসী, বাঙ্গালা যুবক নিস্তেজ, ফাঁকি দিতে পারিলে আর কাজ করিতে চাহেন না, বিপদের সহস্র হস্ত দূর দিয়া গমন করেন। ইংরাজ বৃদ্ধ বিশাল উরস্ক, স্ফীত বক্ষে পদচারণা করে, সাইকেল চড়ে, দ্রুতগতি ট্রামে অনায়াসে আরোহণ করে, বাঙ্গালী বৃদ্ধ কুব্জপৃষ্ঠ, নিতান্ত জড়ভরত। এরূপ প্রভেদের কারণ হঠাৎ মনে হয় খাদ্যের তারতম্য। অবশ্য খাদ্যের পার্থক্য যে একটা কারণ নহে, তাহা নহে, কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত ইংরাজ বৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বৃদ্ধ লইয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে একই ফল হয়। অন্যান্য কারণ ব্যতীত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম আমাদিগকে অকালে বৃদ্ধ করিয়া তুলে। আমরা

মস্তিষ্ককে এক দিনও বিশ্রাম করিবার অবসর দিই না। সপ্তাহের ৬ দিন উদরান্নের জন্য পরার্থে মস্তিষ্ক দারুণ পরিশ্রম করে, এবং ৭ম দিন নিজার্থে একইরূপ দারুণ পরিশ্রম করে। কাজেই মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিবার অবসর পায়। যদি আমরা ৬ দিন নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের অকাল বার্দ্ধক্য এত শীঘ্র উপস্থিত হয় না। কিন্তু তাহা করিতে আমরা শিক্ষা করি নাই। বাল্যে বিদ্যা শিক্ষার্থ মস্তিষ্কের পরিশ্রম, যৌবনে অন্ন সংস্থাপনার্থে দারুণ পরিশ্রম, কাজেই বার্দ্ধক্য ত্বরিত গতিতে উপস্থিত হয়, এই অমানুষিক পরিশ্রমের জন্যই ৪০ বৎসর বয়সে আমরা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই।

অকাল বার্দ্ধক্য ও প্রকৃত বার্দ্ধক্যের কারণ কি তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যদি প্রথম হইতেই লোকে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে তিনি অকাল বার্দ্ধক্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, আবশ্যক মত শারীরিক ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের বিশ্রাম প্রদান যথা সম্ভব মানসিক ব্যাকুলতার হ্রাস ইত্যাদি অকাল বার্দ্ধক্যের প্রতিবন্ধক। ইউরোপের মধ্যবিত্ত জনসাধারণ "গাধার ন্যায় খাটে রাজার হালে থাকে।" আমাদের অবস্থা ঠিক অনুরূপ নহে। আমরা গাধার ন্যায় পরিশ্রম করি, অথচ গাধার ন্যায় দুরবস্থাতেই থাকি। আমরা ইচ্ছা করিলে বিলাসিতা বৃদ্ধি না করিয়া অল্প ব্যয়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করিতে পারি। সরল পুষ্টিকর খাদ্য অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি। গৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিলে মন কখনই অপ্রসন্ন থাকিতে পারে না। একখণ্ড মলিন বস্ত্র পরিধানে মন যতটুকু ক্ষুন্ন হয়, ধৌত বস্ত্র পরিধানে ঠিক সেই পরিমাণে মন প্রফুল্ল হয়। এইরূপ কদর্য্য স্থানে বাস আমাদের মানসিক শান্তি নষ্ট করে, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থানে সজ্জিত গৃহে বাস মন স্বতঃই শান্ত ও চিত্ত স্থির করিয়া রাখে। এই সমস্ত করা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ব নহে, একথা স্বীকার্য্য নহে।

অতঃপর বার্দ্ধক্যের অন্য এক ধারার আলোচনা করিব। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে মানবের স্বভাব চরিত্র চারিবার মন্দ হইতে পারে। বাল্যে ৮।৯ বৎসরের সময়, যৌবনে ২০।২১ বৎসরের সময়, প্রৌঢ়ে ৪০।৪২ বৎসরের সময় এবং বার্দ্ধক্যে ৫৫।৫৬ বৎসরের সময় মানব সহসা কুক্রিয়াশক্ত হইয়া উঠিতে পারে। বাল্যাবস্থায় পিতামাতার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বালক রক্ষা পাইতে পারে, যৌবনে সৎসঙ্গে, উপযুক্ত কর্ম্ম চঞ্চলতায় এবং অভিভাবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবক পরিত্রাণ পাইতে পারে, প্রৌঢ়ে যুবতী পত্নীর আদর যত্নে ও পুত্র কন্যার কমণীয় স্নেহে প্রৌঢ় রক্ষা পায়, কিন্তু বার্দ্ধক্যে রক্ষা করিবার কেহই থাকে না। বৃদ্ধের পিতামাতার ভয় নাই, বৃদ্ধ কর্ম্মে অশক্ত, কাজেই তাহার কর্ম্ম-চঞ্চলতা নাই; পুত্র উপার্জ্জন-ক্ষম; কন্যাদায় অন্তর্হিত, কাজেই বৃদ্ধ কুক্রিয়াশক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে নিবৃত্ত করা অন্যের

অসাধ্য। এইরূপ অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় লালসার কি কারণ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

যদি কোন বৃদ্ধ ইন্দ্রিয় লালসায় কুক্রিয়াশক্ত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তিনি যে জীবনের মধ্যাহ্নেও কুক্রিয়াশক্ত ছিলেন এরূপ নাও হইতে পারে বরং অধিকাংশ স্থলে অন্যরূপ দেখা যায়। মনে করুন কোনও লোক সুখে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সংসারে মন প্রাণ সংযোগ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, একদিনও মনে কদর্য্য ইন্দ্রিয় লালসা উদিত হয় নাই, বরং এরূপ লালসাকে জঘন্য ও ঘৃণ্য মনে করিতেন। অবস্থা গতিকেই হউক, সৎপ্রবৃত্তি বশতঃই হউক তাহাকে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব ছিল, বা যদিও মনে কখনও এরূপ দুস্প্রবৃত্তি উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ মানসিক বলে সে প্রবৃত্তি দমন করিতেন। এইরূপ লোক প্রকৃত বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়া, অর্থাৎ ৫৫ বা ৬০ বৎসর বয়সে প্রথম ইন্দ্রিয় লালসায় কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। বঙ্গদেশে এরূপ লোকের উদাহরণ বিরল নহে। কত "সোণার" সংসার এই কারণে অশান্তির শ্মশান হইয়াছে। স্নেহময়ী দয়িতার হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়া, যুবক পুত্রের মনে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়া শিশু পুত্র কন্যার নিকট নিজকে এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকায় আবৃত করিয়া, আত্মীয় স্বজনের নিকট নিজের পাপাশক্তিকে কোনওরূপে নৈতিক আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া কত বৃদ্ধ উৎসন্ন যাইতেছেন।

আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কেননা ভারতে বিবাহের সহিত ধর্ম্মের এরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, যে কি রমণী কি পুরুষ সকলেরই বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করেন; অধিকন্তু রমণী জানেন যে বিবাহিত জীবনে স্বামীর সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গৃহ ও স্বামী পরিচর্য্যাই রমণী ধর্ম্ম। কাজেই আমাদের বিবাহ ব্যয়সাধ্য হইলেও, বিবাহিত জীবন সেরূপ ব্যয় বহুল নহে। বরং বুঝিয়া চলিতে পারিলে, বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। আমাদের দেশে সন্ন্যাস ধর্ম্মের জন্য বিবাহ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এরূপ চিরকুমারের জীবন সর্ব্বথা নীতিময়, কাজেই ইহাদের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এক ভারত ভিন্ন অন্য দেশে বহু চিরকুমার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অনেকে ধর্ম্ম যাজক, শিক্ষক ইত্যাদি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত। এই সমস্ত লোকেরও কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে নানাবিধ পাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক বিবাহিতই হউক, বা অবিবাহিতই হউক আত্মসংযম কি তাহা আদৌ অবগত নহে।

আমি কঠিন, আমার এই প্রবন্ধ অতিশয় নীরস, এবং অশ্লীল; কিন্তু যে সমস্ত অশুভ কর্ম্মে স্থবির পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মের নিরাকরণ করা যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য তাহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। যদি

এই প্রবন্ধ পাঠে কোনও স্থবির সাবধান হন, তাহা হইলে বুঝিব আমার রচনা সার্থক হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এরূপ হইবার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান জীবনের প্রাপ্ত সীমায় বৃথা। জীবনের প্রারম্ভে বার্দ্ধক্যের এই অমঙ্গলের কারণ নিহিত রহিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে প্রথম ৯ বৎসর মানব জীবনের ভয়ানক সময়। এই নয় বৎসরে সমস্ত জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে। এই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় অতিশয় কর্ম্মশীল থাকে, এরূপ কর্ম্মশীলতা আর কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন যে যন্ত্রে ইন্দ্রিয় লব্ধ অভিজ্ঞতা অঙ্কিত হইতে থাকে, তাহা এরূপ কোমল, নমনীয় এবং অনায়াসে অঙ্কন গ্রহণ প্রবণ থাকে যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্মের, সকল ব্যাপারের যাবতীয় চিহ্ন অতি সহজে অঙ্কিত হইয়া যায়, সে অঙ্কন আর মুছিয়া যায় না। কোটী কোটী বিষয় প্রতিদিন নয়ন সমক্ষে ঘটিলেও তাহা বিষয়ের গুরুত্বেরও কৌতুহল উদ্দীপনা শক্তির অনুপাতে গভীর ভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী জীবনে অনেক বিষয়ের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদের কোনও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের চিহ্ন নষ্ট হয় না; চিহ্ন সমান গভীর থাকে, এবং পরবর্ত্তী জীবনে যদি সেই ঘটনার সহিত সম্পর্ক আছে, এমন কোনও কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের অজ্ঞাতসারে তখন এই চিহ্ন অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অতিশয় প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে। অথবা যে সমস্ত ব্যাপারের অঙ্কন চিহ্ন গভীর হয়, সেই সমস্ত ব্যাপার শুভই হউক বা অশুভই হউক পরবর্ত্তী জীবনে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলে। যাহা হউক ৯ বৎসর বয়সের মধ্যে যাবতীয় ঘটনার চিত্র আমাদের মস্তিষ্ক পটে অঙ্কিত হইয়া যায়।

অন্য দেশের ব্যবস্থা কিরূপ জানিনা, কিন্তু বঙ্গ গৃহস্থে একটি অতি জঘন্য নিয়ম আছে। জনক জননী ও ৪।৫ বৎসর বয়স্ক শিশু এক শয্যায় শয়ন করেন। ইহার ফল কখনই ভাল নহে। গৃহান্তরে না হইলেও এক গৃহে এক শয্যায় জনক ও অন্য শয্যায় জননী ও বালকের শয়ন অতিশয় কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী জীবনে যে সমস্ত কদর্য্য ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলে, তাহার সূত্রপাত ৯ বৎসর বয়সেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের ও প্রত্যেক জনক জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য যেন তাঁহারা সন্তানের ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতি সাবধানে অগ্রসর হয়েন, তাহার অন্তঃকরণে যেন কোনওরূপে অসন্তোষের বা অসত্যের বীজ বপন না করেন। চাণক্যের "দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ" এ নীতি বোধ হয় সর্ব্ববিষয়ে সত্য নহে চাণক্য বোধ হয় পঠন কার্য্যেই এই নীতির অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যদি ৯ বৎসরে বালকের জীবন মঙ্গলময় করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত জীবন নিশ্চয়ই মঙ্গলময় থাকিবে।

শিশুর খাদ্য।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মাতৃস্তন্যই শিশুর একমাত্র শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ভগবান শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই এই খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা আমাদের দৈনিক খাদ্য হইতে যে সকল প্রধান প্রধান উপাদান জীবনধারণ ও শরীর গঠনের জন্য প্রাপ্ত হই তৎসমুদয়ই নারী দুগ্ধে শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হতভাগ্য মাতৃহীন শিশু জগতে বিরল নহে। আবার ইহাও অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় যে মাতা এমন স্বাস্থ্যহীনা ও ব্যাধিগ্রস্থা যে তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব সন্তান স্তন্য দ্বারা প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। অনেক মাতা তাঁহাদের দুর্ব্বল রুগ্ন শরীর স্বত্তেও সন্তান প্রতিপালন করিতে গিয়া আজীবন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের সন্তানগণ হৃষ্টপুষ্ট সবল সুস্থ হওয়া দূরের কথা বরং তাঁহাদের জীবন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। মনুষ্য জাতির সভ্যতায় ক্রমবিকাশ শিশুদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সবল সুস্থ শরীরে সম্পূর্ণ মানসিক বিকাশ না হইতেও পারে কিন্তু শরীর ও মনের মধ্যে যে একটা নিকটতম সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রথমতঃ শিশুর আদর্শ স্বাভাবিক খাদ্য—নারী দুগ্ধের গুণাগুণ এবং আহার করাইবার প্রণালী সম্বন্ধে দ্বিতীয়তঃ যখন স্বাভাবিক খাদ্য সহজ-লভ্য নহে তখনই বা কি কি খাদ্য শিশুর শরীর গঠনের পক্ষে প্রয়োজ্য তাহাই আলোচনা করিব।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতৃস্তন হইতে ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত এক প্রকার শ্বেতবর্ণ জলীয়পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, তাহা প্রকৃত মাতৃদুগ্ধ হইতে বিভিন্ন। উহাকে "গজারী দুগ্ধ" বা "Colostrum" কহে। ইহাতে প্রকৃত নারীদুগ্ধ হইতে অন্নসার (Proteid) জাতীয় পদার্থ অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় এবং তৈলময় (Fat) এবং শর্করা (Sugar) অপেক্ষাকৃত স্বল্প মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। যদিচ এই দুগ্ধ স্বল্প পরিমাণে নিসৃত হয় তথাপি এই বয়সের শিশুর পক্ষে উহাই যথেষ্ট পুষ্টি সাধনে সক্ষম ;

গজারীদুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আধুনিক গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে গজারী দুগ্ধ যে কেবলমাত্র শিশুর শরীর গঠন ও পুষ্টি সাধনে সক্ষম তাহা নহে ইহা শিশুর রক্তের মধ্যে একটা ব্যধি প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাইয়া দেয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার ২।৩ দিবস পরে মাতৃস্তনে প্রকৃত দুগ্ধ দৃষ্ট হয়। ইহাই শিশুর আদর্শ খাদ্য। এই দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিলে আমরা ১। অন্নসার জাতীয় পদার্থ বা Proteid ২। তৈলময় পদার্থ বা Fat ৩। শর্করা বা Sugar ৪। লবণময়, খনিজ পদার্থ বা Salt ৫। জল বা Water প্রাপ্ত হই। অন্যান্য দুগ্ধের ন্যায় নারীদুগ্ধেও অন্নসার জাতীয় পদার্থ দুই প্রকার পাওয়া যায় যথা (ক) পনীরময় পদার্থ বা Casein (খ) দুগ্ধলাল পদার্থ বা Lactalbumen। নিম্নে উপাদানগুলির শতকরা হার দেওয়া গেল।

অন্নসার Proteid	পনীরময় Casein	.৬	২.০ ভাগ
	দুগ্ধলাল Lactalbumen ...	১.৪	
তৈলময় পদার্থ Fat			৩.৫ ভাগ
শর্করা Sugar			৭.০ ভাগ
লবণময় বা ধাতব পদার্থ বা Salt			.২ ভাগ
জল বা Water			৮৭.৩ ভাগ
			১০০.০ ভাগ

রাসায়ণিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে নারীদুগ্ধে দুগ্ধলাল জাতীয় (Lactalbumen) পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে। ইহা অম্ল দ্বারা পৃথকীকৃত হয় না অপরন্তু ইহা উত্তাপ দ্বারা জমাট বাধে। এই জাতীয় Proteid শিশু অতি সহজেই পরিপাক করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার Proteid-casein পরিপাক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের আবশ্যক হয়। ইহাকে অম্ল দ্বারা পৃথক করা যায়। ইহা পাকস্থলীতে প্রবেশ মাত্র পাচনরসস্থিত অম্ল রস ও Rennet সংযোগে এক প্রকার সুক্ষ সুক্ষ তুলার আঁশের ন্যায় পাতলা ছানাকাটে। তাহা আবার Pepsin সংযোগে দ্রবীভূত হওতঃ জীর্ণ হইয়া যায়। গাভী দুগ্ধে পনীরময় পদার্থ বা casein অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া উহা অম্ল সংযোগে শক্ত ছানা কাটে। কাজেই শিশুর পাচন-রসস্থিত Pepsin উহাকে সহজে জীর্ণ করাইতে সক্ষম হয় না। উক্ত দুই প্রকার Proteidই শিশুর শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহে তন্তু সকল (tissue) গঠন ও জীর্ণ সংস্কারে ব্যবহৃত হয়। এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্বারা শরীরের উত্তাপ সংরক্ষিত হয়।

অন্যান্য দুগ্ধের ন্যায় নারীদুগ্ধেও তৈলময় পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কনিকা বিভক্ত হইয়া ভাসমান অবস্থাতে বিদ্যমান। ইহা দুগ্ধের অন্যান্য ভাগ হইতে centrifugal

machine বা কেন্দ্র-পসারণ যন্ত্র বা মন্থন দণ্ড দ্বারা পৃথক করা যায়। এই তৈলময় পদার্থ ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থিত ক্লোমরস ও পিত্ত রসের সংযোগে পরিপাক কার্য্য সমাহিত হয়। দুগ্ধের এই তৈলময় পদার্থ দ্বারা শিশুর স্নায়ু ও মস্তিষ্ক পোষিত হয়। এবং ইহা হইতেই শরীরস্থ মেদ প্রস্তুত হয়। শরীরে উত্তাপ সংরক্ষনার্থ তৈলময় পদার্থের বিশেষ আবশ্যক।

দুগ্ধে যে শর্করা দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে দুগ্ধ শর্করা Lactose বা milk sugar বলে। ইহা অন্যান্য শর্করা অপেক্ষা সহজে রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমাদের শরীরে অম্লজান বা oxygen সংযোগে সর্ব্বদাই একটা দহন কার্য্য চলিতেছে ;—শর্করা এবং তৈলময় পদার্থ তাহার ইন্ধন যোগায় এবং শরীরের উত্তাপ সংরক্ষণ করে। শর্করা হইতে শরীরের মেদময় তন্তু সকল গঠিত হয়।

নারীদুগ্ধে যে লবণময় বা খনিজময় পদার্থ বিদ্যমান আছে তদ্দ্বারা শিশুর শরীরের অস্থি ও শরীরস্থ অন্যান্য তন্তু সকল গঠন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা শরীরের উত্তাপ রক্ষার্থেও প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত নারীদুগ্ধের একটী প্রধান গুণ এই যে ইহা সাধারণতঃ ব্যাধি জীবাণু বর্জ্জিত। সুতরাং ইহা শিশুর পক্ষে কতদূর নিরাপদ তাহা বলাই বাহুল্য।

সাধারণতঃ সুস্থ মাতা প্রসবের দুই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় আর্দ্ধেক হইতে $\frac{৩}{৪}$ পাইট ও এক মাস পরে দৈনিক গড়ে দুই পাইট বা ৪০ আউন্স দুগ্ধ নিঃসরণ করেন। এই পরিমাণ দুগ্ধ শিশুর দেহ পুষ্টির জন্য যথেষ্ট। মাতাগণের খাদ্যাখাদ্যের তারতম্যের উপর তাঁহাদিগের দুগ্ধের পরিমাণ নির্ভর করে। মাতার স্বাস্থ্যের বৈষম্য ঘটিলে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। মানসিক বিকারগ্রস্থ অত্যধিক পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন মাতাদিগের স্তন্য শিশুদিগের অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় মাতা তাঁহার খাদ্য পরিবর্ত্তন দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়েন। দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মাতাদিগের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর পুনরায় নিয়মিত পরিমাণে দুগ্ধ দৃষ্ট হয়। দুগ্ধ অত্যন্ত হ্রাস হইলে Extract of malt অনেক সময় অভিষ্ট ফল প্রদান করে। অনেকে বলেন যে এইরূপে Powdered cotton seed extract অথবা Lactogol বিশেষ উপকারী। যদি প্রাকৃতিক নিয়মে দোষ সংশোধিত হয় তবে কদাচ ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করা বিধেয় নহে। মাতাদিগের সর্ব্বদাই খাদ্যাখাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাছ, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা দুগ্ধের protein অম্লসার ও fatty or তৈলময় অংশ পরিবর্ত্তন করা যায়। দুগ্ধ প্রদান অবস্থায় মাতাদিগের কদাচ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ও মানসিক বিকার-গ্রস্থ হওয়া উচিত নহে। পাতলা অল্প পরিমাণ দুগ্ধ শিশুদিগের পরিপোষণ করা

আবার অনেক দূরের কথা বরং পেট ফাঁপা ইত্যাদি ব্যাধি আনয়ন করে আর ইহাও দেখা যায় যে মাতা নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী দুগ্ধ নিঃসরণ করেন এবং শিশুও অধিক মাত্রায় পান করে। তাহার ফলে শিশু উদরাময় অজীর্ণ ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হয়। এইরূপ স্থলে মাতাদিগের একটু শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক এবং সাময়িক উপবাস দ্বারা পরিমাণ হ্রাস করান যাইতে পারে। যে কোন প্রকারেই দুগ্ধের বিকার উপস্থিত হউক না কেন তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতীকার বিধান করা কর্ত্তব্য। যদি সকল উপায়ই অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ে তখন অবশ্যই কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা শিশুর পুষ্টি সাধন করিতে হইবে। ৬ মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগের একমাত্র খাদ্য মাতৃস্তন্য। দুগ্ধের পরিমাণ অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও ৬ মাসের পূর্ব্বে শিশুদিগকে কদাচ দুগ্ধ ছাড়ান উচিত নহে। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে অনেক সময় স্তন্যপান করান, শিশু এবং মাতা উভয়ের পক্ষেই স্বাস্থ্য হানিকর। সাতিশয় দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্তা মাতা, কদাচ শিশুকে স্তন্যদান করিবেন না। যক্ষা বা ক্ষয় রোগগ্রস্ত মাতাদিগের স্তন্যদান কদাচ বিধেয় নহে। গর্ভাবস্থায় মাতাদিগের কোন মতেই স্তন্যদান করা উচিত নহে। এইরূপ স্থলে গর্ভস্রাব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ঐরূপ ক্ষেত্রে স্তন্যদান করিলে মাতার শরীর পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে এবং তৎসঙ্গে গর্ভস্থ শিশুসন্তানের দেহ পোষণের ব্যাঘাত ঘটে এবং শিশুর (Ricket) অস্থিগত ব্যাধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এখন কিরূপ নিয়মে শিশুদিগকে স্তন্য পান করান দরকার আলোচনা করা যাক্। শৈশবকালে উত্তরোত্তর শরীর যত দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে থাকে এমন কোন সময়েই দেখা যায় না। সবল সুস্থ শিশুকে নিয়মিত স্তন্য পান করাইলে এবং পাকস্থলীর কোন বৈষম্য না ঘটিলে দৈনিক এক আউন্স করিয়া ভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনিয়মিত আহার, বহু আহার বা স্বল্প আহার আমাদিগের দেহ পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটায় এবং নানা প্রকার ব্যধি আনয়ন করে। ভগবান আমাদিগের শরীরের মধ্যে এক প্রকার ব্যধি প্রতিষেধক ক্ষমতা দিয়াছেন। এই ক্ষমতা আমরা নিয়মিত আহারাদি দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারি আবার অনিয়মিত পান ভোজন দ্বারা এই ক্ষমতাকে খর্ব্ব করাও অসম্ভব নহে। সবল সুস্থ যুবক যতটা দেহের উপর অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারে একটী দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলী এমন উত্তেজিত অবস্থায় থাকে যে তখন আহারাদির ও পুষ্টির সামান্য বৈষম্য ঘটিলেই দেহস্থ তন্তু সকল গঠন ও শারীরিক যন্ত্র সমূহ ও ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ব্যধির প্রকোপও অনিবার্য্য। জীর্ণ শীর্ণ অজীর্ণ রোগগ্রস্ত শিশু দৃষ্টি গোচর হয় তাহার প্রকৃত কারণ মাতাদিগের শিশুদিগের প্রতি অবহেলা অথবা শিশু পালন বিষয়ে অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে। মাতা তাঁহাদের

স্বঃবঃ শিশুদিগকে নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানে ঔদাস্ত প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে ব্যধি কবল হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব হইবে সন্দেহ নাই।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার প্রথম দিবস দিনে তিন বার এবং দ্বিতীয় দিবস চারি ঘণ্টা অন্তর স্তন্য পান করান কর্ত্তব্য। উপরোক্ত দুই দিবস শিশু গজ্জারী দুগ্ধ Colestrum হইতেই পুষ্টি প্রাপ্ত হইবে। প্রথম ৫।৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুদিগের অনেক বার আহারের প্রয়োজন হয়। কারণ তখন মাতৃস্তন হইতে অতি মাত্রায় দুগ্ধ নিঃসরণ হয় না। মাতৃস্তনে যখন প্রকৃত দুগ্ধ দৃষ্ট হইবে, তখন হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশু প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য পান করিবে। ক্রমে ক্রমে অন্তর বাড়াইতে হইবে এবং পরিশেষে ৩ ঘণ্টা অন্তর নিয়মিত স্তন্য পান করান যাইতে পারে। সবল সুস্থ শিশুদিগের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু প্রথম ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুদিগের রাত্রিতে অনেকবার আহারের আবশ্যক হয়। এমন কি মাসাধিক বয়স পর্য্যন্তও শিশুদিগের মধ্যে রাত্রে একবার আহার করান দরকার। সাধারণতঃ সুস্থ শিশুদিগের পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে অধিকক্ষণ উপবাস স্বাস্থ্যহানিকর সন্দেহ নাই।

শিশুদিগের নিয়মিত সময় মত আহার করান দরকার। নিয়ম ভঙ্গ কদাচ উচিত নহে। মানব মাত্রেই অভ্যাসের দাস, বিশেষতঃ শিশুদিগকে যখন যাহা অভ্যাস করান যাইবে তাহারা সেই ভাবেই যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইবে। শিশুদিগকে মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্থ করানও কষ্টকর নহে। অনেক মাতা শিশুদিগের ক্রন্দন নিবারণের জন্য স্তন্য দান করিয়া থাকেন। শিশু যতবারই ক্রন্দন করে মাতা তাহাকে ততবারই স্তন্য পান করান। তাহার ফল এই দাঁড়ায় শিশুর ক্রন্দন নিবারিত হওয়া দূরের কথা বরং তাহা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে অপরন্তু শিশু অজীর্ণ উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে যদি কোন বলিষ্ঠ সবল সুস্থ যুবক পুনঃ পুনঃ ভোজন করেন তিনি চির উদরাময় ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া চিরজীবন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন, শিশুদিগের পক্ষেত কথাই নাই। মাতাদিগের একথা জ্ঞাত করান অবশ্য দরকার যে শান্তি রক্ষার্থ শিশুদিগকে স্তন্যদানে তৎপর হওয়াতে শান্তি সংরক্ষণ দূরের কথা বরং সংসারে চির অশান্তি আনয়ন করেন। শিশু শত ক্রন্দন করিলেও নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কখনও স্তন্য দান বিধেয় নহে।

প্রত্যেক আহারের সময় শিশু অন্ততঃ ১৫ মিনিট বসিয়া স্তন্য পান করিবে। অনেক সময় স্তন্য এত দ্রুত নিঃসরণ হয় যে শিশু তাহা ৮।১০ মিনিট মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। ইহাতে স্বল্প সময় মধ্যে পাকস্থলী পূর্ণ হওয়াতে পরিপাকের ব্যঘাত ঘটে এবং শিশু অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়। এরূপ স্থলে মাতাগণ তাহাদের স্তনের বোঁটা অঙ্গুলী দ্বারা

চাপিয়া ধরিবেন, এবং যাহাতে শিশু অন্ততঃ ১৫ মিনিটের পূর্ব্বে স্তন্য নিঃশেষ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। মাতাদিগের শিশুর পরিপাক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদান দরকার, শিশুদিগের পাক যন্ত্রের ব্যাঘাত হইলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার আবশ্যক। অনেক সময় মাতা শিশুকে নিয়মিত সময়ে আহার করান কিন্তু শিশু বর্দ্ধিত হইতেছেনা। তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে যথেষ্ট নহে। কাজেই কৃত্রিম খাদ্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নিয়মিত আহার প্রাপ্ত শিশুর সপ্তাহে ৬ আউন্স ভার বৃদ্ধি হয়। এই ওজনের বৈষম্য মাতাদিগের অভ্যস্থ দৃষ্টি সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারে। তখন মাতৃ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ২।১ বার গাভী দুগ্ধ জল অথবা বার্লী সহযোগে খাওয়ান অভ্যাস করাইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদর্শিত হয়।

এখন একটী প্রশ্ন এই যে কখন শিশুদিগকে স্তন্য ত্যাগ করান বিধেয়। সাধারণতঃ অনেকের মতে নবম মাসই স্তন্য ত্যাগ করাইবার প্রশস্ত সময়। আবার অনেকে বলেন যে শিশুর দন্তোৎগমনের পূর্ব্বে স্তন্য ত্যাগ করান কখনও উচিত নহে। কিন্তু অধিক দিন মাতৃ স্তন্যপায়ী Ricket রোগগ্রস্ত শিশুর দন্তোৎগমন হইতে অনেক বিলম্ব হয়। এবং সেইরূপ শিশুকে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করান অত্যাবশ্যক। সাধারণতঃ নবম হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে শিশুকে স্তন্য ত্যাগ করিতে অভ্যাস করান উচিত। বহুদিন মাতৃ স্তন্যপায়ী শিশুর অস্থি গঠনের ব্যাঘাত ঘটে এবং Ricket রোগগ্রস্ত হয়। আর একটী কথা মনে রাখা দরকার যে গ্রীষ্মকালে শিশুদিগকে মাতৃদুগ্ধ ত্যাগ করান কদাপি উচিত নহে। ঐ সময় সাধারণতঃ শিশুদিগের উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। মাতৃদুগ্ধ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যাধি জীবাণু বর্জ্জিত। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে নিরাপদ।

এখন মাতৃস্তন্য বঞ্চিত হতভাগ্য শিশুদিগের খাদ্যের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে আলোচনা করা যাইবে। যদি কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জগতের অমূল্য ধন মাতৃধনে বঞ্চিত হয়, সেরূপ শিশুকে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার নিকট প্রতিপালন করিতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, নারীদুগ্ধ অপেক্ষা কৃত্রিম খাদ্যে আমরা দেখিতে পাই সকলই এই আদর্শ খাদ্যের অনুকরণই ব্যতীত আর কিছুই নহে। যখন শিশুদিগকে খাওয়াইবার সকল প্রকার স্বাভাবিক উপায় দুর্ল্লভ হইবে তখন অবশ্যই কৃত্রিম খাদ্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সাধারণতঃ গাভীদুগ্ধই আমাদিগের সহজ লভ্য এবং ইহার নারী দুগ্ধের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যও বিদ্যমান আছে। এখন দেখা যাউক গাভীদুগ্ধ কিরূপে শিশুর উপযুক্ত খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্রমে আমরা অন্যান্য খাদ্য যাহা শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য তাহাই আলোচনা করিব।

গাভীদুগ্ধ নারী দুগ্ধের ন্যায় একই উপাদানে গঠিত। কিন্তু গাভীদুগ্ধে নারী দুগ্ধের অপেক্ষা অন্নসার পদার্থ দ্বিগুণ এবং শর্করা অর্দ্ধেক পরিমাণে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার

আমরা নিম্ন তালিকা হইতে দেখিতে পাই যে গাভী দুগ্ধে পনীরময় পদার্থ নারী দুগ্ধের প্রায় ৫ গুণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নারী দুগ্ধে যে পানীরময় পদার্থ আছে তাহা পাকস্থলীস্থ অম্লরস দ্বারা পাতলা ছানা কাটে কিন্তু গাভী দুগ্ধের পনীরময় পদার্থ অম্ল সংযোগে অত্যন্ত শক্ত ছানা কাটে ইহা শিশুদিগের পক্ষে পরিপাক করা সহজ নহে।

গাভী দুগ্ধ			নারী দুগ্ধ		
অম্লসার	পনীয়ময়—৩ ২৫ দুগ্ধনাল— ·৭৫	৪·০	অম্লসার	পনীয়— ·৬ দুগ্ধনাল—১·৪	২·০
তৈলময় পদার্থ		৩·৫	তৈলময় পদার্থ		৩·৫
শর্করা		৪	শর্করা		৭·০
খনিজ পদার্থ		.৭	খনিজ পদার্থ		·২
জল		৮৭·৮	জল		৮৭.৯

গাভীদুগ্ধ শিশুদিগকে খাওয়াইবার প্রধান অন্তরায় ইহার পনীরময় পদার্থ। অন্যান্য উপাদানগুলির হার প্রায় নারী দুগ্ধেরই মত। গাভী দুগ্ধের আর একটী দোষ এই যে ইহা ব্যাধি জীবাণু বর্জ্জিত নহে। কাজেই শিশুদিগকে খাওয়াইতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

শিশুদিগের আদর্শ খাদ্যই নারীদুগ্ধ সুতরাং যত প্রকার খাদ্য আমরা শিশুকে খাওয়াইবার জন্য প্রস্তুত করি না কেন, সকলই এই আদর্শ খাদ্যের অনুকরণে প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং গাভী দুগ্ধকে শিশুর খাদ্যে পরিণত করিতে হইলে (ক) উহার সহিত জল মিশ্রিত করিলে অম্লসার পদার্থের পরিমাণ নারীদুগ্ধের অম্লসার পদার্থের সম পরিমাণে আনয়ন করিতে হইবে অথবা (খ) গাভী দুগ্ধস্থিত পনীরময় পদার্থ যাহাতে জমাট না বাঁধে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কেবল মাত্র এক ভাগ জল ও এক ভাগ গাভীদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া উভয়ের অম্লসার পদার্থের হার সমপরিমাণে আনয়ন করিতে পারি। কিন্তু ইহাও শিশুর পক্ষে পরিপাক করা সহজ নহে। কারণ পনীরময় পদার্থ এবম্বিধ মিশ্রিত পদার্থেও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আরও তরল করা আবশ্যক। সাধারণতঃ ২ ভাগ জল ও এক ভাগ দুগ্ধ শিশুর পক্ষে চলিতে পারে। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের অম্লসার পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় শিশুর বয়সের তারতম্য অনুসারে কতটা জল মিশ্রিত করা আবশ্যক দেখান গেল।

বয়স	দুগ্ধ	জল অথবা অন্য তরলকারক পদার্থ
প্রথম সপ্তাহ	১	৩
দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ৬ষ্ঠ সপ্তাহ	১	২

বয়স	দুগ্ধ	জল অথবা অন্য তরলকারক পদার্থ
৬ষ্ঠ সপ্তাহ হইতে তৃতীয় মাস	২	৩
তৃতীয় মাস হইতে চতুর্থ মাস	১	১
চতুর্থ মাস হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৩	২
৬ষ্ঠ মাস হইতে অষ্টম মাস	২	১
অষ্টম মাস হইতে দ্বাদশ মাস	৩	১

এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, জল দ্বারা আমরা দুগ্ধ যতই তরল করিতেছি তৈলময় পদার্থ ও শর্করার অংশ ততই কমিয়া যাইতেছে। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত নির্দ্ধারিত আদর্শের সমপরিমাণ তৈলময় পদার্থ ও শর্করা মিশ্রিত করা আবশ্যক। শর্করার অভাব অতি সহজেই পূরণ করা যাইতে পারে, এক অথবা দেড় চাম্‌চে চিনি প্রত্যেক ৩ আউন্স মিশ্রিত দুগ্ধের পক্ষে যথেষ্ট। তৈলময় পদার্থের অভাব প্রতীকার করিতে হইলে পরিমাণমত মাটা মিশ্রিত করা আবশ্যক। কিরূপ মাটা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করা দরকার দেখা যাউক। প্রথমতঃ দুগ্ধের কোন অংশকে মাটা বলে? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে দুগ্ধে তৈলময় পদার্থ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কণিকা বিভক্ত হইয়া ভাসমান অবস্থাতে থাকে। মাটা দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে কেবল দুগ্ধ হইতে সাধারণ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈলময় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। মাটা (cream) দুই প্রকার উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে (ক) গুরুত্ব প্রণালী (খ) মন্থন প্রণালী। প্রথম প্রণালী গৃহস্থের পক্ষে সহজ সাধ্য।

তলদেশে ছিদ্র বিশিষ্ট কোন পাত্রে ছিপি বন্ধ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এবং ঐ পাত্র কোন ঠাণ্ডা নির্জ্জন স্থানে রাখিতে হইবে। ৩।৪ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ তৈলময় পদার্থ উপরিস্থিত দুগ্ধে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তখন ছিপি খুলিয়া নিম্নস্থ দুগ্ধ উপরিস্থ দুগ্ধ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। এইরূপ দুগ্ধে শতকরা ৮ ভাগ হইতে ১৬ ভাগ পর্য্যন্ত তৈলময় পদার্থ পাওয়া যায়! অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ঐরূপ ভাবে রাখিলে প্রায় সমুদয় তৈলময় পদার্থই উপরিভাগে পাওয়া যাইতে পারে। এই দুগ্ধকে দ্বিগুণ পরিমাণ তরল করতঃ তৈলময় পদার্থ ও অন্নসার পদার্থ মাতৃ দুগ্ধের সমপরিমাণে আনয়ন করিতে পারা যায়। বাজারে যে মাটা বিক্রয় হয় তাহা দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত। কিন্তু বাজারের মাটা কদাচ শিশুদিগের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ উহা টাট্‌কা এবং অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া বড়ই দুষ্কর। বিশেষতঃ উহাতে নানা প্রকার ভেজাল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। মন্থন দ্বারা যে মাটা পাওয়া যায়, তাহাতে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ তৈলময় পদার্থ পাওয়া

যায়। গৃহস্থের পক্ষে স্বল্প পরিমাণে এই উপায়ে মাটা প্রস্তুত করাও দুঃসাধ্য নহে। বাজারে এক প্রকার মাখন টানা কল পাওয়া যায়। এই সাহায্যে মন্থন করিয়া অতি সহজেই দুগ্ধ হইতে তৈলময় পদার্থ বিভক্ত করা যাইতে পারে। দুগ্ধ ১৫।২০ মিনিট মন্থনান্তর ২.৩ ঘণ্টা নির্জ্জন স্থানে রাখিলে, উপরিস্থিত দুগ্ধে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ তৈলময় পদার্থ পাওয়া যায়। এই দুগ্ধকে দশ গুণ তরল করিলেও আমরা মাতৃদুগ্ধের সমপরিমাণে তৈলময় পদার্থ প্রাপ্ত হই। তৎসঙ্গে আবার পনীরময় পদার্থ এত হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, অত্যন্ত অল্প বয়স্ক শিশুর পক্ষেও ইহা পরিপাক করা দুঃসাধ্য নহে।

নিম্নে শিশুর বয়স অনুসারে গাভী দুগ্ধে কি পরিমাণ জল ও মাটা মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান আবশ্যক তাহার তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকাস্থ মাটা মন্থন দ্বারা প্রস্তুত, এবং ইহাতে শতকরা ৪৫ ভাগ তৈলময় পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

বয়স	দুগ্ধ	মাটা (cream) ৪৫%	চিনি	জল
এক মাস	৫ ড্রাম	$\frac{১}{২}$ ড্রাম	$\frac{১}{২}$ চাম্‌চে	১০ ড্রাম
দুই মাস	১ আউন্স	১ ড্রাম	১ চাম্‌চে	$\frac{১}{২}$ আউন্স
তিন মাস	১$\frac{১}{২}$,,	,,	,,	,, ,,
ছয় মাস	৪ ,,	,,	১ $\frac{১}{২}$ চাম্‌চে	২ ,,
নয় মাস	৬ ,,	,,	,,	,, ,,

এখন দেখিতে হইবে যে এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার দ্বারা আমরা সন্তোষজনক ফল পাইতেছি কি না। যদি শিশুর ভার নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে অবশ্যই বুঝিবে যে ফল সন্তোষ জনক হইতেছে। নতুবা আমরা দেখিতে পাইব যে শিশু উদরাময় অজীর্ণ ও বমনাদি রোগে ভুগিতেছে। এইরূপ স্থলে নির্দ্ধারিত নিয়ম হইতে দুগ্ধ আরও তরল করিয়া খাওয়াইলে পরিপাক হইতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে জলের পরিবর্ত্তে জলবার্লী, oatmeal বা ভাতের মাড় দ্বারা দুগ্ধ তরল করিয়া খাওয়াইলে শিশুর পক্ষে পরিপাক করা সহজ হয়। যদি দেখা যায় যে শিশু দুগ্ধ খাওয়াইবার পরেই ছানা বমন করিতেছে, সেরূপ স্থলে দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ক্ষারময় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বমন নিবারিত হয়, ক্ষারময় পদার্থ (Alkaline substance) পাচন রসস্থিত অম্লরসকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। সুতরাং দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে পারে না। সাধারণতঃ ক্ষারময় পদার্থ চুণের জল ও সোডাবাইকার্ব্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। এক চাম্‌চে চুণের জল প্রতি ৩ আউন্স দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। চিনি মিশ্রিত চুণের জল Liquor calcis saccharatus ১০ ফোঁটা ঐ পরিমাণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে। এক গ্রেণ সোডা বাইকার্ব্ব প্রতি এক আউন্স দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক সময় এক ড্রাম fluid magnesia প্রতি

৩ আউন্স দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে অভিলষিত ফল প্রদর্শন করে। অতি দুর্ব্বল ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ও যে শিশু পনীর কোন মতে পরিপাক করিতে সক্ষম হয় না, তাহাদের পক্ষে ছানার জল বা whey অথবা peptonised milk বিশেষ ফল প্রদর্শন করে।

ছানার জল বা whey :—দুগ্ধের সহিত লেবুর রস অথবা অন্য কোন অম্লরস অথবা rennet মিশ্রিত করিলে পনীরময় পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে whey বলে। ইহাতে আমরা দুগ্ধলাল পদার্থ ও তৎসঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ তৈলময় পদার্থ পৃথক হইয়া আসে। জলীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে whey বলে। ইহাতে আমরা দুগ্ধলাল পদার্থ ও শর্করা নিয়মিত পরিমাণে প্রাপ্ত হই, কিন্তু তৈলময় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা শিশুদিগকে খাওয়াইতে হইলে পরিমাণ মত মাটা ও চিনি মিশ্রিত করা আবশ্যক।

Peptonised milk দুগ্ধস্থিত অম্লসার পদার্থ পাচন রসস্থিত pepsin এবং শ্লোমরস সংযোগে পরিপাক হইয়া থাকে। কাজেই দুগ্ধের সহিত peptogenetic milk powder অথবা liquor pancreatis মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদিগের পক্ষে পরিপাক করিতে কোনই কষ্ট হয় না। এইরূপ খাদ্য অতি দুর্ব্বল জীর্ণ শীর্ণ শিশুর পক্ষে উপকারী। কিন্তু ইহা অধিক দিন ব্যবহার করান কখনও উচিত নহে। ইহাতে পাকযন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং ভবিষ্যতে অম্লসার জাতীয় পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা গাভীদুগ্ধকে এইরূপে নানা প্রকার রূপান্তরিত করিয়া শিশুদিগের পাক-যন্ত্রের অবস্থানুসারে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে পারি। তথাপি অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, অন্যান্য পশুদুগ্ধও শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ ফল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। সাধারণতঃ গর্দ্দভী দুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধই আমাদের দেশে শিশুদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

গর্দ্দভী দুগ্ধ— যখন গাভী দুগ্ধস্থ পনীর শিশুর পক্ষে পরিপাক করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন গর্দ্দভী দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। গর্দ্দভীদুগ্ধে গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে পনীরময় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এবং এই দুগ্ধের পনীরময় পদার্থ অম্লসংযোগে নারীদুগ্ধেরই ন্যায় পাতলা ছানা কাটে; কাজেই শিশুদিগের পক্ষে পরিপাক করা অত্যন্ত সহজ। নিম্নস্থ তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাতে তৈলময় পদার্থও অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং ইহা অধিক দিন শিশুদিগের পক্ষে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। গর্দ্দভীদুগ্ধ সহজে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত দুর্মূল্য; কাজেই দরিদ্র শিশুদিগের পক্ষে অনুপযোগী। এই দুগ্ধের সহিত জল অথবা চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবার আবশ্যক হয় না।

উপাদান	নারী দুগ্ধ	গাভী দুগ্ধ	গর্দ্দভী দুগ্ধ	ছাগী দুগ্ধ
অম্লসার পদার্থ	২	৪	১.৮	৩.৭
তৈলময় পদার্থ	৩.৫	৩.৫	১.০	৪.২
শর্করা	৭.০	৪.০	৫.৫	৪.০
লবণময় পদার্থ	.২	.৭	.৪	.৫

ছাগীদুগ্ধ—এই দুগ্ধে তৈলময় পদার্থ ও পনীরময় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছাগীদুগ্ধের পনীরময় পদার্থ মাতৃদুগ্ধেরই ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতলা ছানা কাটে। কাজেই শিশুদিগের পরিপাক করা দুঃসাধ্য নহে। যে সকল শিশু গাভীদুগ্ধ পরিপাক করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে ছাগীদুগ্ধ বিশেষ উপকারী। এই দুগ্ধের একটী বিশেষ গুণ এই যে ইহা ব্যাধি বীজাণু বর্জ্জিত। ছাগীদুগ্ধ গাভীদুগ্ধেরই ন্যায় তরল করিয়া দুর্ব্বল শিশুদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মাতাদিগের সন্তানগণের পক্ষে গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগী দুগ্ধ খাওয়ানই বিধেয়। ইহাতে শিশু ব্যাধি বিমুক্ত হইতে পারে, এবং উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিলাভ করিতেও সক্ষম হয়।

এখন গাভী দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ এইরূপ দুই প্রকার খাদ্য দেখিতে পাই। (১) জমাট দুগ্ধ বা Condensed milk। (২) শুষ্ক দুগ্ধ বা Dried milk।

জমাট দুগ্ধ বা Condensed milk, গাভীদুগ্ধকে বায়ু নিষ্কাসিত পাত্রে উত্তাপ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। আমরা দুই প্রকার জমাট দুগ্ধ দেখিতে পাই। (১) মাটা তোলা গাভী দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বা Skimmed milk। (২) খাঁটী গাভী দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বা unskimmed milk। মাটা তোলা জমাট দুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে অখাদ্য কাজেই সে বিষয় আমরা কোন আলোচনাই করিব না। unskimmed milk আবার দুই প্রকার চিনি মিশ্রিত এবং চিনি বর্জ্জিত। গাভীদুগ্ধকে তিন গুণ ঘনীভূত করিয়া জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং এক ভাগ জমাট দুগ্ধের সহিত দুইভাগ জল মিশ্রিত কারিয়া খাঁটী গাভী দুগ্ধে পরিণত করা যাইতে পারে। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে ঐ প্রকার দুগ্ধ গাভীর দুগ্ধের সম গুণশালী নহে। শিশুদিগকে খাওয়াইতে হইলে ইহাকে নারীদুগ্ধের উপাদানগুলির সমহারে পরিণত করিতে হইবে। এক ভাগ খাঁটী জমাট দুগ্ধের সহিত ভাল জল মিশ্রিত করিয়া অম্লসার পদার্থ নারী দুগ্ধের সমহারে পরিণত করিতে পারি। তৎসঙ্গে পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে মাটা এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। চিনি মিশ্রিত জমাট দুগ্ধকে সাতগুণ তরল করা আবশ্যক। ইহাতে শুধু মাটা নিয়মিতপরিমাণ মিশ্রিত করিলেই চলিতে পারে।

শুষ্ক দুগ্ধ বা Dried milk স্বল্প পরিমাণ গাভী দুগ্ধ উত্তপ্ত ধাতব পাত্রের উপর দিয়া চালিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ "Glaxo" নামক শুষ্ক দুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; প্রস্তুত কারকের নিয়মানুযায়ী তরল করিলে ইহাতে শত করা ২.১ ভাগ অন্নসার পদার্থ ২.৫ ভাগ তৈলময় পদার্থ ও ৪.২ ভাগ শর্করা পাওয়া যায়। এই দুগ্ধের পনীরময় পদার্থ গাভীদুগ্ধের ন্যায় শক্ত ছানা কাটে না। কাজেই শিশুদিগের জীর্ণ করা সহজ সাধ্য। জমাট ও শুষ্ক দুগ্ধের একটী বিশেষ গুণ এই যে ইহা উত্তাপ দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া জীবাণু বর্জ্জিত।

এখন দেখা যায়, এই খাদ্য শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী কি না। এইরূপ খাদ্য শিশুদিগকে অধিক দিন কদাচ খাওয়ান উচিত নহে। Sir James Fredrick Goodhart M.B. LL.D. F. R. C. P. বলেন "There is probably no food which is more often responsible for "ricket" of every degree, not to mention various gastro-intestinal disorders and occassional production of scurvey"। এই দুগ্ধ শিশুদিগকে অধিক দিন খাওয়াইলে Ricket বা অস্থিগত ব্যাধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমরা প্রাকৃতিক খাদ্য হইতে যে কেবল দেহ পুষ্টির উপাদান প্রাপ্ত হই তাহা নহে, তৎসঙ্গে ব্যাধি প্রতিষেধক বস্তু সকলও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জমাট দুগ্ধ ও শুষ্ক দুগ্ধ উত্তাপ দ্বারা প্রস্তুত হয়; কাজেই ইহাতে যে কেবল ব্যাধি জীবাণু ধ্বংস হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে ব্যাধি প্রতিষেধক বস্তু সকলও নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দুগ্ধ প্রতিপালিত শিশু আশু ব্যাধি হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু একবার কোন উপায়ে ব্যাধি-জীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। Statisticsএ দেখা যায় যে উদরাময় ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হইয়া যত শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এরূপ খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই দুগ্ধের নানা প্রকার দোষ সত্ত্বেও অবস্থা বিশেষে শিশুদিগকে ব্যবহার করান যাইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু গাভীদুগ্ধস্থ পনীর কোন মতেই পরিপাক করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন জমাট দুগ্ধ বা শুষ্ক দুগ্ধ নিয়মিত মত তরল করিয়া খাওয়াইলে অভিলষিত ফল প্রদর্শিত করে। এই প্রকার তরল দুগ্ধ মাটা মিশ্রিত করা আবশ্যক নতুবা Ricket হইবার সম্ভাবনা। যখন সংক্রামক রোগের বিশেষ প্রকোপ দৃষ্ট হয় তখন গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা এই দুগ্ধ নিরাপদ সন্দেহ নাই। রেলে ষ্টীমারে সুদূর পথে যাইবার সময় গাভী দুগ্ধের অভাবে এই দুগ্ধ বিশেষ উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয়।

আমরা আজকাল ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে অসংখ্য, শিশুদিগের উপযোগী পেটেন্ট খাদ্যের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। কাজেই এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

আবশুক। যতই বিজ্ঞাপন ও প্রশংসা পত্রের ছড়াছড়ি হউক না কেন, এমন কোন পেটেণ্ট খাদ্য নাই যে তাহা শিশুদিগের পক্ষে নারী দুগ্ধ বা গাভী দুগ্ধের পরিবর্তে ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। অধিকাংশ পেটেণ্ট খাদ্যে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং শ্বেতসার (Starch) শর্করা এবং শর্করা জাতীয় (Dextrine) পদার্থ অত্যন্ত অধিক। সুতরাং এই প্রকার খাদ্য, "Fat baby of advertisement" তৈয়ার করিতে পারে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে Ricket ব্যাধিও অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য, অবস্থা বিশেষে ইহাও ব্যবহার করান যাইতে পারে। অধিক দিন ব্যবহার বিধেয় নহে। পেটেণ্ট খাদ্য ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। কতক খাদ্য যে বয়সের শিশুর পক্ষে উপযোগী তাহা আবার অন্য বয়সের শিশুর পক্ষে অনিষ্ট কর। কাজেই এই খাদ্যগুলির উপাদান ও হার জানা আবশ্যক। পেটেণ্ট খাদ্যগুলিকে উপাদান অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। শুষ্ক খাদ্যের সহিত শর্করীকৃত (malted) খাদ্য শস্যের দানা মিশ্রিত করিয়া যে যে খাদ্য প্রস্তুত। হরলিক্স্ মল্টেড্ মিল্ক (Horlicks malted milk) এলেনবারী ফুড্ (Allenbury food I & II) ১ ও ২ নম্বর এই জাতীয় খাদ্য। এই খাদ্যে শস্য দানা স্থিত শ্বেতসারকে (Starch) শর্করা বা তজ্জাতীয় (Dextine) পদার্থে পরিণত করান হইয়াছে।

২। শুষ্ক দুগ্ধের সহিত শর্করীকৃত (malted) শস্যের দানা এবং অধিকৃত শস্যের দানা মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত। নেসল্স্ ফুড্ বা মাইলো ফুড্ (Nestle's food or Milo food) এই জাতীয় খাদ্য। ইহাতে শ্বেতসার (Starch) শর্করা এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ (Dextrine) বিদ্যমান আছে।

৩। কেবল মাত্র সম্পূর্ণরূপে শর্করীকৃত শস্যের দানা দ্বারা প্রস্তুত। মেলিন্স্ ফুড্ (Melleins food) এই জাতীয় খাদ্য।

৪। আংশিক শর্করা বা তজ্জাতীয় পদার্থে পরিণত শস্য দানা হইতে শ্বেতসার (Starch) শর্করা ও তজ্জাতীয় পদার্থ (Dextrin) বিদ্যমান আছে। বেঙ্গারস্ ফুড Bengers food ও এলেনবারী ফুড্ Allenbury food ও এই জাতীয় খাদ্য।

৫। খাঁটী শস্য দানা। ইহা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। রবিন্সনস্ পেটেণ্ট বার্লী (Robinson's Patent Barley) এই জাতীয়।

পরপৃষ্ঠায় এই খাদ্যগুলির উপাদানের হার দেওয়া গেল।

উপাদান	এলেনবারী ১নং Allenbury food No. 1.	এলেনবারী ফুড নং ২ Allenbury food No. 2.	হরলিকস্ মলটেড মিল্ক Horlick malted milk	নেসলস্ ফুড বা মাইলো ফুড Milo food	মেলিনস্ ফুড Mellins food	এলেনবারী নং ৩ Allenbury No. 3.	বেনজারস্ ফুড Benger's food	রবিনসন্স বার্লী Robisons Barley
অন্নসার পদার্থ	৯'৭	৯'২	১৩'৮	১৪'০	১২'২	৯'২০	১০'২	৫'১
তৈলময় পদার্থ	১৪'৪	১২'২	৯'০	৫'২	০'৪	১'০	১'২	০'৯
শ্বেতসার	০	০	০	১৫'০	০	৬০'০	০	৮২'০
শর্করা ও তজ্জাতীয় পদার্থ	৬৬'৮৫	৭২'১	৭০'৮	৬০'৩	৮১'৮২	২৪'২৫	৭৯'৫	০'
লবণময় পদার্থ	৩'৭৫	৩'৫০	২'৭০	১'১৩	৩'৮০	'৫০	'৪০	১'৯৫
জল	৫'৭	৩'৯	৩'৭	৩'৬	৬'৩	৬'৫	৮'৩	১০'১

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, শিশুদিগের খাদ্য মাত্রেই নারী দুগ্ধের আদর্শে প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং এই খাদ্যগুলিকে নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া দেখিলে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন খাদ্য কোন অবস্থায় শিশুদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। এ কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ৭ মাস বা তন্নিম্ন বয়স্ক শিশু শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এলেনবারী ফুড ৩নং রবিনসনস্ বার্লী এবং মাইলো ফুড ঐ বয়স্ক শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। কিন্তু শ্বেতসার অপেক্ষাও তৈলময় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি প্রদান বিশেষ আবশ্যক। তৈলময় পদার্থের অভাব বশতঃই সাধারণতঃ শিশুদিগকে Ricket রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। প্রায় সকল পেটেণ্ট খাদ্যগুলিতেই এই পদার্থের অভাব। কাজেই ইহা অধিক দিবস ব্যবহার করিলে Ricket রোগ অবশ্যম্ভাবী। পেটেণ্ট খাদ্যগুলির আর একটী দোষ এই যে, জমাট দুগ্ধের ন্যায় ইহাদেরও ব্যাধি প্রতিষেধক ক্ষমতা নাই। এই খাদ্যগুলির নানা প্রকার দোষ থাকিলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শিশুদিগকে ব্যবহার করান যাইতে পারে। যে সকল শিশু পনীর পরিপাক করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে হরলিকস্ মলটেড্ মিল্ক, এলেনবারী ফুড ১ ও ২ নং বিশেষ উপকারী। উদরাময় ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের যত দিন না পাকযন্ত্রের কার্য্য ফিরিয়া আসে তত দিন কোন না কোন পেটেণ্ট খাদ্য সুন্দর ফল প্রদান করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মেলিন্স্ ফুড ও মাইলো ফুড জাতীয় খাদ্য গাভী দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুগণ পনীরময় পদার্থ অতি সহজেই পরিপাক করিতে সক্ষম হয়।

আমরা শিশুদিগের যত প্রকার খাদ্য হইতে পারে আলোচনা করিলাম। সবল সুস্থ শিশুদিগকে পেটেণ্ট খাদ্যের বশীভূত না করাই কর্ত্তব্য। নবম মাস পর্য্যন্ত

শিশুদিগকে গাভীদুগ্ধ নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে জল ও মাটা মিশ্রিত করিয়া খাওয়ানই বিধেয়। এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক যে গাভীদুগ্ধ নারীদুগ্ধের ন্যায় ব্যাধি জীবাণু বর্জ্জিত নহে। কাজেই ইহার শোধন ও জীবাণু বিমুক্ত করা আবশ্যক। সাধারণতঃ উত্তাপ দ্বারা ফুটাইয়া শোধন করা হয়। দুগ্ধস্থিত অন্নসার পদার্থ জমাট বাঁধে ও পৃথক হইয়া আইসে। কাজেই দুগ্ধ আর সেইরূপ পুষ্টি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। দুগ্ধ কোন বদ্ধ পাত্রে রাখিয়া ফুটন্ত জলে ১৫ মিনিট গরম করিয়া খাওয়ানই প্রশস্ত। পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে শিশুদিগকে সবল সুস্থ করিতে হইলে নিয়মিত ও পরিমাণ মত আহার করান আবশ্যক। এই বিষয় মাতাদিগের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। অনিয়মিত ও অপরিমিত আহারের দোষেই শিশুগণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। সুস্থ শিশুদিগকে বয়সের তারতম্যানুসারে খাওয়াইবার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

বয়স	যত ঘণ্টা অন্তর দিবসে আহার করাইতে হইবে	রাত্রি আহারের সংখ্যা	প্রত্যেক আহারের পরিমাণ	২৪ ঘণ্টার পরিমাণ
প্রথম সপ্তাহ	২ ঘণ্টা	২	১ আউন্স	১০ আউন্স
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ	২ ঘণ্টা	২	$১\frac{১}{২}$ হইতে ৩ আউন্স	১০—১২ আউন্স
চতুর্থ ও ৫ম সপ্তাহ	২ ঘণ্টা	১	$২\frac{১}{২}$ হইতে $৩\frac{১}{২}$,,	১২—১৬ আউন্স
৬ষ্ঠ হইতে ৪র্থ মাস পর্য্যন্ত	$২\frac{১}{২}$ হইতে ৬ ঘণ্টা	১	৩—৪ আউন্স	১৮—২৪ আউন্স
৫ম হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৩ ঘণ্টা অন্তর	—	৬ আউন্স	৩৬ আউন্স
১০ম মাস পর্য্যন্ত	৩ ঘণ্টা অন্তর	—	৮ আউন্স	৪০ আউন্স

উপসংহারে এ কথা বলা আবশ্যক, যে মাতা শিশুদিগের শারীরিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য ও সামান্য বৈষম্য ও যেরূপ সহজে বুঝিতে পারেন, অন্য কেহই তাহা সক্ষম হয় না। আমরা শিশুদিগের যত প্রকার খাদ্য সম্ভব হইতে পারে মোটামুটী আলোচনা করিলাম। মাতা শিশুর শারীরিক ও পাকযন্ত্রের অবস্থানুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন। মাতাদিগকে পুনরায় স্মরণ করান আবশ্যক যে, অপরিমিত ও অনিয়মিত আহারই সকল ব্যাধির মূল কারণ সুতরাং তাঁহারা কখনও শিশুদিগের আহারের নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না। মাতাদিগের সামান্য উদাসীনতার জন্য যদি কোন শিশু চিররোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইতে আর আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই।

অনন্ত মোহন দত্ত।

আলোক বিজ্ঞান।

ইতিহাস।

১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে বিভাগ হইতে আলোকের আদি প্রকৃতি ও গুণাবলীর বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহাকে আলোক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

এই বিভাগের গবেষণা করিতে গিয়া আমরা কত শত মনোমুগ্ধকর নয়নরঞ্জন দৃশ্যাবলীর সন্ধান পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা অতীব প্রয়োজনীয় শত শত যন্ত্র কেবল আলোক বিজ্ঞানের দয়াতে আমাদের আয়ত্তাধীন হইয়াছে। অতএব কি সৌন্দর্য্য হিসাবে কি উপকারিতা হিসাবে আলোক বিজ্ঞান পাঠে মনোনিবেশ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

২। আলোক বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ দুই বিভাগে বিভক্ত করা যায়—জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক। জ্যামিতিক বিভাগ দুইটী কল্পিত বিধির সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া কেবলমাত্র গণিতের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। রশ্মিমালা এই দুইটী বিধির প্রতিফলন বিধি এবং বক্রীকরণ বিধি দ্বারা শৃঙ্খলিত, সুতরাং আলোকের আদি প্রকৃতি ও কারণ নির্দ্দেশ এই বিভাগের বহির্ভূত। এই বিষয়ের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ ভাবে প্রাকৃতিক আলোক বিজ্ঞানের অধীন। প্রাকৃতিক শক্তির কিরূপ সমবায়ে আলোকের উৎপত্তি হয়, এবং কিরূপে আলোক রশ্মিমালায় পর্য্যবসিত হয়, এবং এই সমস্ত কারণ গতি বিজ্ঞানের দ্বারা বিশদ করাই প্রাকৃতিক আলোক-বিজ্ঞানের কার্য্য। এই দুইটী সাধারণ বিভাগ ছাড়া শারীরিক আলোক-বিজ্ঞান বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। শারীরিক আলোক বিজ্ঞানে কিরূপ আলোক চক্ষুর উপর পতিত হইয়া ইন্দ্রিয় বোধ জন্মায় সেই বিষয়ে আলোচিত হয়।

৩। অতি পুরাকালেও আলোক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইতে। ধাতুময় দর্পণের ব্যবহার অতি প্রাচীন কালের লোকেরও জানা ছিল। অতসী কাচেরও বিবরণ Old testament (Exodus and Job) এবং Aristophanes (খৃঃ পূঃ ৪২৪) দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। মোট কথা কাচ আবিষ্কারের অনতিপূরেই দর্পণ ও অতসী কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে।

রামধনু, মৃগতৃষ্ণা, জলাদিতে প্রতিফলিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও নিজের প্রতিবিম্ব প্রত্যেকের লোকেরই লক্ষীভূত হয়; এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহার কারণ নির্দ্দেশে—সে কারণ যতই অসার ও অলীক হউক না কেন—যত্নবান হয়েন। কিন্তু প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিষয়ের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই।

৪। সূর্য্য, নক্ষত্র, জ্বলন্ত পদার্থ প্রভৃতি আলোকের উৎপত্তি স্থান। এইরূপ যে সকল বস্তু অপরের বিনা সাহায্যে আলোকিত হয় তাহাদিগকে জ্যোতিস্মান বলে তদ্ভিন্ন পদার্থ সকলকে অজ্যোতিস্মান বলে। জ্যোতিস্মান পদার্থ হইতে স্বতঃই কিরণমালা নির্গত হয়, এবং যখন এই সকল কিরণমালা অজ্যোতিস্মান বস্তুর উপর পতিত হয় তখন তাহারা আলোকিত হয়।

প্রাচীন কালে পদার্থ সমূহ কিরূপে দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা লইয়া বিশেষ বিতণ্ডা ছিল। আলোকিত পদার্থ হইতে বিশেষ কিছু নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষুর উপর আঘাত করিয়া আমাদের দৃষ্টি বোধ জন্মাইত অথবা আমাদের চক্ষু হইতে বিশেষ কিছু নির্গত হইয়া পদার্থের উপর পতিত হইয়া দৃষ্টি বোধ জন্মাইত এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে প্রাচীন দার্শনিকেরা বহু প্রকার অদ্ভুত মতের সৃজন করিয়াছিলেন। Pythagoras এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মত ছিল যে পদার্থ হইতে অনবরত অতি সুক্ষ্ম কোন প্রকার কিছু নির্গত হইয়া চক্ষুর উপর পতিত হইয়া দৃষ্টি বোধ জন্মাইত; কিন্তু Empedocles এবং সশিষ্য প্লেটোর মত ছিল যে চক্ষু হইতে কিছু নির্গত এবং পদার্থ হইতে নির্গত বিশেষ দ্রব্যের সমবায়ে দৃষ্টি বোধ জন্মাইত। কিন্তু Aristotle প্রায় খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে এই দুই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আলোক গুণ বিশেষ, দ্রব্য নহে এবং এই গুণ আলোকিত পদার্থ এবং চক্ষুর মধ্যস্থিত বস্তুর দ্বারা চালিত হয়। Aristotle যদিও তাঁহার মতবাদ নিপুণ যুক্তি সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই তথাপিও তিনি আধুনিক তরঙ্গবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৫। রামধনু প্রভৃতির ব্যাখ্যা Aristotle তাঁহার মতানুযায়ী করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সূর্য্যকিরণ জলকণায় প্রতিফলিত হইয়া রামধনু সৃজন করে; এমন কি তিনি দাঁড়ের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জল কণার উপর সূর্য্য কিরণের প্রতিফলনে রামধনুর উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

যদিও প্রাচীন দার্শনিকদের আলোক কিরূপে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় এ বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা ছিল; তথাপি আলোক রশ্মি যে সরল রেখায় গমন করে এবং যখন প্রতিফলিত হয় তখন আদি রশ্মিও প্রতিফলিত রশ্মি, যে বস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই বস্তুর পৃষ্ঠের সহিত সমান কোণ করে তাঁহারা জানিতেন।

৬। প্রসিদ্ধ জ্যামিতি প্রণেতা Euclid আলোক সম্বন্ধে প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এক খানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাহার মধ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার কোনই চিহ্নই পাওয়া যায় না। পুস্তিকা খানি একবারেই অসার।

৭। মিশর দেশীয় Ptolemy আলোক সম্বন্ধে অতি বিশদ গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার আলোচনা অতীব প্রশংসনীয়। চক্রবাল (Horizon) রেখায় চন্দ্র সূর্য্য আসিলে তাহার আকৃতির বৈলক্ষণ্য কেন হয়, এই বিষয়ের কারণ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আলোক রশ্মিমালা যখন বক্রীভূত হয় তখন আদি রশ্মি এবং চক্রীভূত রশ্মির মধ্যস্থিত কোণ নিরূপণ পূর্ব্বক Ptolemy তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চক্রীকরণ বিধির আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

৮। প্রায় খৃঃ অঃ ৫০ Cleomedes জল পূর্ণ পাত্রের তলস্থিত মুদ্রা প্রভৃতি উন্নীত হয় লক্ষ্য করিয়া, সূর্য্য চক্রবাল রেখার ঈষৎ নিম্নে গমন করিলেও বায়ুস্তরে বক্রীভূত হইয়া আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়, ইহা আবিষ্কার করেন।

৯। আলোক বিষয়ে বেশ শৃঙ্খলার সহিত আলোচনা আরব দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Alhazen-এর সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তিনি আলোক বিষয়ে আলোচনার জন্য গণিতের সাহায্য প্রথম গ্রহণ করেন। তিনি চক্ষু ছেদ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত বিভিন্ন স্তর পর্য্যবেক্ষণ করেন ও তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান। কিরূপে গোধূলি উৎপত্তি হয় এবং কতক্ষণ গোধূলি থাকিতে পারে তাহার নির্ণয় করেন। এতদ্ভিন্ন আলোক বিষয়ে তিনি আরও অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন— চক্রবাল স্থিত সূর্য্যের আকারের বৃদ্ধি কিরূপে আমরা বস্তুর পরিমাণ হইতে তাহার দূরত্ব বুঝিতে পারি, দুই চক্ষুর দ্বারা অবলোকিত বস্তু কেন এক বস্তু বলিয়া মনে হয় (Binocular vision) ইত্যাদি। Alhazen-এর পর অনেক দিন প্রায় পাঁচ শত বৎসর আলোক সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য আলোচনা আর কেহই করেন নাই। Roger Bacon এ বিষয়ে একটু নাড়া চাড়া করিয়াছিলেন এবং Magic Lantern তিনিই আবিষ্কার করিয়াছেন এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

১০। দূরবীক্ষণ (Telescope) যন্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক দিন হইতে অনেকেই চেষ্টিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে বোধ হয় কেহ কেহ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কার লোক হিতার্থে সাধারণের গোচরীভূত করেন নাই এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাপ্রয়োজনীয় যন্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশল বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। Middeburg নিবাসী জনৈক চস্‌মা ব্যবসায়ী Hans Lippeshy দূরবীক্ষণ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন (খৃঃ অঃ ১৬০৮)। Galileo পর বৎসরে যখন শুনিতে পাইলেন দূরবীক্ষণ নামক অপূর্ব্ব যন্ত্র কোনও চস্‌মা ব্যবসায়ী আবিষ্কার করিয়াছে তখন তিনি নিজের অনন্য সাধারণ প্রতিভায় প্রভাব মৌলিক ভাবে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন। তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ এত সুন্দর হইয়াছিল যে তিনি ১৬১০ খৃঃঅঃ বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহের উপগ্রহ তাঁহার দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার পরে ওলন্দাজ জ্যোতিষী Xepter দুরবীক্ষণ বিষয়ে সুন্দর ভাবে গবেষণা পূর্ব্বক তাহার মূল সুত্রগুলি আবিষ্কার করেন—লেন্সের ফোক্যাল দৈর্ঘ্য (focal length) ম্যাগনিফায়িং ক্ষমতা (Magnifying power) প্রভৃতি নির্ণয় পূর্ব্বক দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণের কৌশল সুগম করিয়া গিয়াছেন।

১১। দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণের পর Wellebrod Snellius বক্রীকরণ বিধি আবিষ্কার করিয়া আলোক বিজ্ঞানে নূতন যুগ আনিয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে Ptolemy যদিও আলোক রশ্মির পরাবৃত্তি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন৷ তথাপি তিনি এ বিষয়ে কোনও বিধি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। Snell দেখিলেন যে যখন আলোক রশ্মি কাচ, জল কিম্বা অন্য বক্রকারী পদাথের উপর পতিত হইয়া তাহার ভিতর দিয়া যায় তখন আদি রশ্মি কোনও বক্র রশ্মি কোণের অনুপাত অবিচলিত (constant) বড়ই দুঃখের বিষয় যে Snell তাঁহার এই আবিষ্কার প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবং Descarte তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এই বক্রী করণ বিধি সাধারণে প্রকাশ করেন। Descarte অনেকটা Aristotle এর মতানুবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার মতে আলোক একপ্রকার চাপ pressure বিশেষ। এই চাপ মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ভিতর দিয়া আলোকিত বস্তু হইতে অন্যস্থানে নীত হয়। অর্থাৎ তাঁহার মতে এই মধ্য (medium) স্থিতি স্থাপক গুণ বিশিষ্ট।

১২। এতদিন সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে যখনই আলোক বক্রীভূত হয় তখনই বিভিন্ন রংএর উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের মহা পুরুষ কাৰ্ত্তিবান Newton ১৬৬৬ (খৃঃঅঃ) প্রমাণ করিলেন যে সূর্য্যের সাদা রশ্মিমালা অশেষবিধ রঙ্গীন রশ্মিমালার সমবায়ে গঠিত এবং পরাবৃত্তিকালে বিভিন্ন রশ্মি বিভিন্ন ভাবে বক্রীভূত হওয়ার জন্যই রঙ্গীন রশ্মিমালা দৃষ্ট হয়। Newton আলোক সম্বন্ধে অশেষবিধ গবেষণা করিয়াছেন।

Newtonএর মতে আলোকিত পদার্থ হইতে অনবরত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রতম কণা সকল (corpuscles) নির্গত হইতেছে এবং এই কণাসকলই আলোকের কারণ। Newtonএর সমসাময়িক Grimaldi আলোকের Deffraction আবিষ্কার করেন অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র গর্ত্তের ভিতর আলোক গমন করে তখন আলোক ঠিক সরল রেখায় যায় না, ঈষৎ বক্রীভূত হয়। পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই Deffraction আলোকের তরঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কত সাহায্য করিয়াছে। Grimaldi বোধ হয় আলোক আলোকের উপর পতিত হইয়া আলোক নির্ব্বাণ করে তাহা অনেকটা অগ্রাহ্যভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নাই। আলোকের বিরোধ (interference) তাঁহার সম্ভবতঃ অজ্ঞাতই ছিল।

হংসেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এস্ সি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে আইসে যে জগতব্যাপী কীটাণুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই মনুষ্য যেন জীবন লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই কীটানুগণসহ আমাদিগকে দিবারজনী সংগ্রাম করিতে হয়। তবে আমরা ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে সক্ষম। নিরস্ত করিবার অস্ত্র শস্ত্র ও অসংখ্য, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা এই সমুদায় কীটাণু নাশক উপায়ের আলোচনা করিব। কীটাণুগুলি আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে সমাচ্ছন্ন আছে। আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না সুতরাং মনে করি যে আমরা তাহদের আক্রমণ করিতে সক্ষম নহি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মলরাশি দূরে বিক্ষেপণ করিলেও পরিচ্ছন্ন থাকিলে আমরা বহুল পরিমাণে ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিগণকে স্বতন্ত্র রাখিলে ও তাহাদিগের নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিলে সেই সমস্ত রোগের আক্রমণ হইতে অধিকাংশ সময়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে প্রথা আছে যে বাটীতে বসন্ত অথবা অন্য কোন সংক্রামক রোগ হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে রাখা হয়। সকলেই রোগীর ঘরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। রোগীর ঘরে যাইবার পূর্ব্বে ও পরে হস্ত পদাদি সম্যকরূপে ধৌত করা হয়। বাটীতে ভিক্ষা, দান, কাপড় ধোপার বাটী পাঠান প্রভৃতি কার্য্য বন্দ রাখিয়া বাহিরের লোকের আগমন বন্ধ করিয়া রাখা হয়। মাছ মাংস ইত্যাদি আহার বন্ধ থাকে। এই প্রথাটী অতি উত্তম। এই প্রথার মূলে উপরোক্ত দুই বৈজ্ঞানিক নিয়ম নিহিত আছে। এই পথ অবলম্বন করিলে অধিকাংশ সময়ে অতি সুফল লাভ করা যায়। 'কুসংস্কার ব্যাধি' বলিয়া একটী বিশেষ ব্যাধি আমাদিগের সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমরা ভাল হউক মন্দ হউক সকল কার্য্যই কুসংস্কার বলিয়া মানিয়া লইয়া অনেক সময় নিজের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়া থাকি। আমরা যেমন আহারের অভাবে বাঁচিতে পারিনা সেইরূপ জলেতে কোন জীবই অনাহারে বাঁচিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রোগ-বীজাণুগুলির অধিকাংশই জীব ও উদ্ভিজ সুতরাং অনাহারে তাহারাও বাঁচিতে পারে না। রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিয়া ও মল মূত্রাদি সাবধানে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমরা রোগ-বীজাণু ধ্বংস করিতে পারি। উপরোক্ত দুই উপায় ভিন্ন অন্য অনেক উপায় আছে এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

জীবাণু ধ্বংসের প্রাকৃতিক উপায়। জীবাণু সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য আমাদিগের অনেকও সুহৃদ আছে। প্রকৃতি দেবী তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহার দত্ত রৌদ্র ও বায়ু আমাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল বীজাণু ধ্বংসের জন্য নহে জীবের জীবন উহাদিগের উপর নির্ভর করে। তবে রোগ বীজাণু গুলির বিষয় বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহারা আলোকে বাস করিতে পারে না ও উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে উহারা মরিয়া যায়। ক্ষয়কাশের পক্ষে সূর্য্যকিরণ এই জন্যই একটী তেজস্কর ঔষধ। বিশুদ্ধ বায়ু ও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে তাহারা শক্তিহীন হয় ও অনেক সময়ে মরিয়া যায়। সুতরাং আমাদিগের গৃহে যদি রৌদ্র ও বায়ু প্রবেশের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে তবে আমরা অনেকাংশে নিরাপদ থাকিতে পারি। রৌদ্রে যে শুধু জীবাণুগুলি মরিয়া যায় তাহা নহে। রৌদ্রের প্রভাবে ঘরগুলির আদ্রতা নষ্ট হইয়া যায় তজ্জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রোগভয় হইতে মুক্তি প্রদান করে (কারণ রোগ বীজাণুগুলি যে আদ্র স্থানে অতীব সত্বর বৰ্দ্ধিত হয় তাহা পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে)। সুতরাং পরিষ্কার ঘরে যদি রৌদ্র ও বায়ুর অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে তবে আমরা রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভের আশা করিতে পারি।

পুর্ব্বে যখন কলিকাতায় জল নিকাশের সুব্যবস্থা ছিল না, ময়লাদি যখন গঙ্গা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত, গৃহগুলি যখন পারাবত-কোটরের ন্যায় আলোক বায়ু বর্জ্জিত ছিল, গৃহাভ্যন্তর যখন ন্যাকার জনক আদ্রতা সহিত উপন্ন মলাদি মিশ্রিত পুতি গন্ধময় ছিল তখনকার কলিকাতার স্বাস্থ্য ও বর্ত্তমান কলিকাতার স্বাস্থ্য যে কতদূর প্রভেদ তাহা ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। তখন কলিকাতা সহর "মরণের আলয়" স্বরূপ ছিল। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগাদির লীলাভূমি ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে জল নিকাশের সুব্যবস্থা, মলাদি যথাসময়ে নিক্ষেপ, গৃহাদির উন্নতি হইয়া অনেকাংশে স্বাস্থ্যের লীলাভূমি হইয়াছে বলা যায়। পুর্ব্বে ঘরে দরজা জানালা ছিলনা বলিলেই হইত কিন্তু এখন দরজা জানালার ঘর বলিলেও চলে। এখন সাধারণেও আলো বাতাসের উপকারিতা বুঝিয়াছে। তাই এখন কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ের লোকে অধিকাংশ সময়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে জীবন অতিবাহিত করে বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। পাড়াগাঁয়ে আজিও দেখা যায় যে ঘরের বারান্দায় যাহারা জীবন অতিবাহিত করে, ঘরের ভিতরে যাহারা পারত পক্ষে থাকিতে চায় না, তাহার জীবনে ব্যাধিও কি তাহা জানে না। সুতরাং দেখা যায় বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোর প্রভাব কি সুন্দর। তাহারা যদি কেবল মাত্র পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে তবে তাহাদিগকে বোধ হয় জীবনে কোন প্রকার রোগ ভোগ করিতে হয় না। তবে তাহাদিগের গৃহের পরিবর্ত্তন আবশুক। যাহাতে তাহাদের গৃহেও বায়ু

ও আলো অবাধে প্রবেশ করিতে পারে সেই চেষ্টা করা উচিৎ। গৃহে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টাও যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের উপায় করা বিশেষ আবশ্যক, এ বিষয়ে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত করা যাইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আবার পুনরুক্তি করিতে হয় যে পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য লাভের ও রক্ষার প্রধান উপায়। যদিও কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা বীজাণু ধ্বংস করে তথাপি তাহারা বিষ। উহাদিগকে বীজাণু সংহারক (Disinfectant) বলে। সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত উহার ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ব্যতিরেকে উহার ব্যবহার করাই উচিত নহে।

রৌদ্র ও বায়ু ব্যতিরেকে অন্য উপায় আছে। রোগ বীজাণুগুলির বংশ বৃদ্ধি হইতে হইতে তাহারা যখন সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বীজাণুগুলি পরস্পরকে আক্রমণ করে। তখন তাহারা আক্রান্ত জীবের ন্যায় আপনাদিগকেও বিষে দগ্ধ করে, পরে তাহারা নিজের বিষে নিজে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। রোগীকে যদি অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখা যায় তবে যত রোগই হউক না কেন তাহার আক্রমণ হইতে সারিয়া উঠিতে পারে। কারণ প্রথমোক্ত ও বর্ণিত পরবর্ত্তী উপায়ে জীবাণুগণ ধ্বংস হইয়া যায় ও রোগের প্রাণনাশক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অনন্ত রোগ বীজাণু যে আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে সমাচ্ছন্ন আছে উহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার উপায়ও আমাদিগের যথেষ্ট আছে।

রক্ত পূর্ব্বে যে উপায়টির কথা বলা হইয়াছে তাহা আমাদিগের দেহ মধ্যস্থ এক প্রকার জীবাণু বিশেষ। ইহারা জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করে ও দুর্ব্বল করিয়া ফলে। তাহাদিগের বিষয় বুঝিতে হইলে অগ্রে আমাদিগের দেহস্থ রক্তের বিষয় সামান্য কিছু জানা উচিৎ। তজ্জন্য আমরা রক্তের সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিব।

রক্তের উপাদান। লোহিত রক্ত কণিকা। রক্ত এক প্রকার জলীয় ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা মিশ্রিত পদার্থ। প্রথমোক্ত পদার্থকে আমরা জলীয় অংশ বলিব (serum)। কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র মুদ্রার মত গোল চেপ্টা আণুবীক্ষণিক। কণিকাগুলি দ্বিবিধ—শ্বেত ও লোহিত। ইহাদিগের মধ্যে লোহিত কণিকাগুলি অসংখ্য। ইহাদিগকে দেখিতে ছোট ছোট মুদ্রার মত ও দুই দিক চাপ্টা। যখন দুই চারিটী ছড়াইয়া থাকে তখন ইহাদিগকে ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখায় কিন্তু যখন একত্রে অনেকগুলি থাকে তখন লোহিত বর্ণের বলিয়া বোধ হয় তজ্জন্য ইহাদিগকে লোহিত রক্ত কণিকা বলে। ইহারা শ্বাস বায়ুর অম্লজান গ্রহণ করিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অম্লজান প্রদান করে। সুতরাং ইহারাই আমাদিগের জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। যদি উচিতমত নিশ্বাস না লওয়া যায় তবে মানুষ সত্বর মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘন ধূঁয়ার মধ্যে বসিয়া থাকিলে বা জলের মধ্যে থাকিলে যে কষ্ট বোধ হয় তাহা শ্বাস রোধ

বোধ জন্মিত। শরীর মধ্যে অম্লজান বায়ুর অল্পতা নিবন্ধন উক্ত প্রকার কষ্ট বোধ হয়। লোহিত রক্তকণিকাগুলি আমাদিগের ফুসফুস মধ্যস্থ অম্লজান বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক দেহের প্রত্যেক স্থানে অম্লজান চালিত করে। ইহারা অম্লজানের সহিত এক প্রকার রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হয় ও সত্বরই অম্লজান ত্যাগ করে। সুতরাং এই লোহিত রক্তকণিকা আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান যন্ত্র স্বরূপ।

অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে আঙ্গুল অথবা শরীরের অন্য কোন স্থান জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সেই স্থান সবুজ হয় ও বেশীক্ষণ রাখিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় ও ফুলিয়া উঠে। ক্ষত স্থান হইতে অবিরত রক্ত পড়িতেছে তাহার উপরে বাঁধিয়া দিলে দেখা যায় যে রক্ত তখনই বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কোন স্থান জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে তন্নিম্ন স্থানে রক্ত সঞ্চালিত হয় না ও সেই জন্য সেই স্থান ফুলিয়া উঠে ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়। যদি যথা সময়ে সেই বন্ধন মুক্ত না করিয়া দেওয়া হয় তবে সেই স্থান সত্বরই পচিয়া উঠে। একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যায় যে আমাদের দেহের মধ্যস্থ লোহিত রক্ত কণিকাগুলি ফুসফুস হইতে শ্বাস বায়ুর অম্লজান লইয়া শরীরের ভিন্ন অংশে চালিত করে। অম্লজান ব্যতীত আমাদের দেহের কোন অংশই সতেজ থাকিতে পারে না। সুতরাং যে স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় সেই স্থানে আর অম্লজান যাইতে পারে না তজ্জন্য সেই স্থান সত্বরই নিজ তেজ হারাইয়া মৃতবৎ হয় ও পরে পচিয়া যায়। বীজাণুগুলির ক্রিয়া তখন অতীব অধিক হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলে আমরা দুটী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। প্রথমতঃ আমাদের শরীরের কোন স্থান জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাহা হইলে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া উক্ত স্থান ও উহার নিম্নাংশ পচিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ বায়ু অমাদের দেহের পক্ষে কি পরিমাণে আবশ্যক। ক্ষণেকমাত্র বিশুদ্ধ বায়ু না পাইলে আমাদের দৈহিক কত অবনতি হয়।

শ্বেত রক্ত কণিকা। লোহিত রক্ত কণিকা ভিন্ন শ্বেত কণিকা ও আমাদের রক্তে থাকে। ইহাদের সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার অপেক্ষা অনেক অল্প। সজীব দেহে উহারা রক্ত মধ্যে বেড়াইতে পারে। অণুবীক্ষণের বলে দেখিলে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব প্রাণী বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে ও তাহারা ক্ষুদ্র সজীব প্রাণী মাত্র। তাহারা দেখিতে ঠিক লোহিত রক্ত কণিকার মত চেপ্টা নহে। যদিও তাহারা লোহিত রক্ত কণিকার মত সংখ্যায় অত অধিক নহে তথাপি উহারাও অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্য সংসাধিত করে। তাহাদের প্রধান কার্য্য সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে বিবৃত করিব। পূর্ব্বে রোগবীজাণু ধ্বংসের আমাদের দেহে যে উপায় আছে বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এখন বলা হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রোগবীজাণুগুলি আমাদের দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া এক প্রকার বিষের সৃষ্টি করে। উহা